উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

অগ্নিযুগের বিপ্লবী-নায়ক

উপেনন্দ্রাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বসুমতী -- সাহিত্য -- মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

[প্রথম ভাগ]

অগ্নিযুগের বিপ্লবী-নায়ক

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১৩৫৭

বসুমতী--সাহিত্য--মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—২৷৷৹ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

সিন ফিন

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়র্লণ্ডে ইংরাজাধিকার

আজকাল বক্তারা বক্তৃতার মুখে প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, আয়র্লণ্ডবাসীদিগের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ডের সহিত মিলনপ্রার্থী, তাহাদের ন্যায্য অধিকারটুকু না দিবার ফলেই আয়র্লণ্ডে যত মারামারি, লাঠালাঠির উৎপত্তি। ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইলেই আয়র্লণ্ড শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ হইয়া উঠিবে। কথাটা বেশ আশাপ্রদ বটে; কিন্তু আয়র্লণ্ডের সমগ্র ইতিহাস একটু চোখ খুলিয়া পড়িলে কথাটা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় না! যেখানে ভৌগোলিক সম্বন্ধ ভিন্ন আর সমস্ত সম্বন্ধ গায়ের জোরে পাতান, সেখানে কতটুকু অধিকার ন্যায্য আর কতটুকু অন্যায্য, তাহা মীমাংসা করিবার উপযোগী দর্শনশাস্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আয়র্লণ্ডও সে কথাটা বেশ ভাল করিয়া বুঝে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়িয়া আসিতেছে। হোমরুল লাভের চেষ্টা সে নিয়মের ক্ষণিক ব্যতিক্রম মাত্র।

আয়র্লণ্ড-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া লিমারিকের (Limerick) পতন পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল আয়র্লণ্ডে রক্তারক্তি কখনও থামে নাই। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিগণ আয়র্লণ্ডকে শুধু রাজনৈতিক হিসাবে পরাধীন করিয়াই তুষ্ট ছিলেন না; ছলে, বলে, কৌশলে উহার আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতারও লোপ করিতে চেষ্টা করিতেন; আর আইরিসেরা প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই হোক, ইংরাজকে আপনাদের দেশ ও মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিত। এত দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব ইতিহাসে আর বড় একটা দেখা যায় না, কেননা ইহা শুধু "বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি" নহে, ইহা দুইটী জাতীয় প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। ইংরাজ যাহাকে বাহুবলে জয় করিয়াছে, তাহাকে কখনও প্রেমের বলে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; এমন কি, প্রথম আয়র্লণ্ড বিজয়ের পর ইংরাজ রাজপুরুষেরা আইরিসদিগকে তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতেই দিতেন না। কিন্তু আইরিস প্রকৃতি অন্যরূপ। যে সমস্ত ইংরাজ দুই পুরুষ ধরিয়া আয়র্লণ্ডে গিয়া বাস করিত, আইরিস প্রকৃতির গুণে তাহারা একেবারে হাড়ে হাড়ে আইরিস হইয়া যাইত। দেশের স্বাধীনতার জন্য খাঁটি আইরিসেরা যেমন প্রাণপণ করিয়া লড়িত, ইহারাও সেরূপ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বকৃতভঙ্গ ইংরাজ-সন্তানের উপর আর খাঁটি ইংরাজের বিশ্বাস করিবার উপায় ছিল না।

লিমারিকের যখন পতন হইল, তখন ইংলণ্ড ভাবিলেন যে, এত দিনে তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে; আয়র্লণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই আয়র্লণ্ডের তখন আর উত্থান-শক্তি নাই। সেই সুযোগে বাঁধনের উপর বাঁধন চড়াইয়া ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকে একটী প্রকাণ্ড কয়েদখানা করিয়া তুলিলেন। আইনের চক্ষে আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক সমাজের অস্তিত্বই রহিল না। তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকলা বেশ নির্ম্মম ভাবেই ধ্বংস করা হইল। প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাহাদের উপর খবরদারি করিবার অধিকার পাইলেন। ইংলণ্ডের পোষ্যপুত্ররূপে তাঁহারাই হইলেন—ঐ জেলখানার দারোগা। কিন্তু জেলখানার এমনি একটা গুণ আছে যে, সেখানে ঢুকিলেই কয়েদীই হোক আর দারোগাই হোক, সকলকেই পুরা মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে সকল ইংরাজেরা আয়র্লণ্ডে শান্তিরক্ষকরূপে বাস করিলেন, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন যে, খাঁটি আইরিসদিগের উপর অত্যাচার করিবার সুখটুকু তাঁহাদের আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা তাঁহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সাজিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়েন না। ঘুরের ঠাকুর

হইলে যে বিদেশের কুকুর হইতে হইবে, এমন ত কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তাই তাঁহারা সুর ধরিলেন যে, আয়লণ্ডের পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অধীন হইয়া থাকিবে না। অনেক কথা কাটাকাটি চলিল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কখন বা রাগ করিলেন, কখন বা ভয় দেখাইলেন; শেষে যখন দেখিলেন যে, আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টেরা বড় বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন অগত্যা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলেন। স্বীকৃত হইবারই কথা। কিছুদিন আগে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, পাছে আয়র্লণ্ডও সেই পথ ধরে, এ ভয় তাঁহাদের মনে যথেষ্টই ছিল। শুধু কথায় ভুলিবার পাত্র তাঁহারা নহেন। ফলে লিমারিকের পতনের পর একশত বৎসর যাইতে না যাইতেই ইংলণ্ডকে আয়র্লণ্ডের উপর কর্ত্তৃত্বসত্ত্ব ত্যাগ করিয়া এক আইন (Renunciation Act, 1783) বিধিবদ্ধ করিতে হইল। স্থির হইল যে, আয়র্লণ্ডের লোকে আইরিস পার্লামেণ্ট ও রাজা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন ভিন্ন অন্য কোনও আইন মানিতে বাধ্য নহে।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশটা যেন আবার একটু বাঁচিয়া উঠিল। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প আবার মাথা তুলিল। জাতীয় পতাকা কাঁধে লইয়া আবার আয়র্লণ্ডের বাণিজ্যতরী সমুদ্রবক্ষে দেখা দিল। দেশের সৌভাগ্য বলিতে তখন অবশ্য প্রোটেষ্টাণ্টদিগেরই সৌভাগ্য বুঝাইত; কেননা আয়র্লণ্ডের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের ভার তখন তাহাদেরই হাতে ন্যস্ত। তবে ক্যাথলিক সম্প্রদায় নানা বিষয়ে কঠোর শাসনের অধীন হইলেও সে সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। মানুষ খেয়াল বা বিদ্বেষের বশে অপরের জন্য যতই কঠোর বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলুক না কেন, এক সঙ্গে থাকিতে গেলে সে সমস্ত আর কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়া উঠিতে পারে না। ক্যাথলিকদের পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার না থাকিলেও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলেন। দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে ক্যাথলিক, সেখানে ক্যাথলিকদের ভোট পাইতে হইলে, কাজে কাজেই প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে ক্যাথলিকদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। বাস্তবিকই ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি আইরিস পার্লামেণ্টের ঘাড়ের উপর বসিয়া না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব কঠোর আইনগুলিই তিরোহিত হইতে পারিত।

কিন্তু আয়র্লণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ডের প্রাণে সহিল না। ইংলণ্ড যখন প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর আয়র্লণ্ডের কর্ত্তৃত্বভার দিয়াছিলেন, তখন আশা করিয়াছিলেন যে, আইরিসেরা চিরদিনের জন্য দুইটা পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়া থাকিবে। আইরিস জাতির পরকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতায় ইংরাজেরা বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়কার আর্কবিশপ বোলটার (Archbishop Boulter) তাই লিখিয়া গিয়াছেন:—The worst of this is that it tends to unite Protestant with Papist, and whenever that happens, good bye to the English interest in Ireland for ever." "এই সম্মিলন-প্রবণতার ফলে প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক এক হইয়া যায়, আর তাহা ঘটিলে ইংরাজের স্বার্থসংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া উঠে।" কিন্তু আইরিস কর্ত্তৃপক্ষের অতি-বুদ্ধির দোষে রাম উল্টা বুঝিয়া বসিল। তাঁহাদের ধর্ম্মবিদ্বেষ শুধু ক্যাথলিকদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না; প্রেসবিটারিয়ানদিগকেও তাহার যথেষ্ট ভাগ লইতে হইত। এই উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া আয়র্লণ্ডে "ইউনাইটেড আইরিস-মেন" (United Irishmen) নামে এক নূতন দল গড়িয়া তুলিল। সমস্ত সম্প্রদায়ই যাহাতে আইরিস পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকারী হয়, অনেকদিন ধরিয়া তাহারা সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা প্রাণপণে সে সম্বন্ধে বাধা দিতে লাগিলেন। শেষে আইরিসেরা বেশ বুঝিতে পারিল যে, ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিলে আয়র্লণ্ডের যথার্থ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। "ইউ-নাইটেড আইরিসমেন" তখন গুপ্তসভায় পরিণত হইল! আয়র্লণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিবার ইহাই প্রথম চেষ্টা। ফরাসী "দিরেকতোয়ার" (Directoire) এর সহিত এই গুপ্তসভার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। স্থির হইল যে, ফরাসীরা সৈন্য পাঠাইয়া আইরিস-দিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের সংবাদ ইংরাজ মন্ত্রিসভায় কানে উঠিল। তাঁহারা যে প্রতিকার ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে একাধারে হাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস রস সম্মিলিত। তাঁহাদের গুপ্তচরেরা আয়র্লণ্ডে গিয়া স্থানে স্থানে বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া লোকসাধারণকে গুপ্তসভায় যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদিকে আইরিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার ভাণ করিয়া দলে

দলে আয়র্লণ্ডে পল্টন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। বন্দোবস্ত যখন বেশ পাকা হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারাই বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিষা তাহা নির্ম্মমভাবে দমন করিতে লাগিয়া গেলেন। আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দিষা অবধি ইংরাজেরা একদিনও স্বস্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এইবার তাঁহারা এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার সংকল্প করিলেন। বিদ্রোহ ত শান্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আইরিস স্বাতন্ত্র্যও লুপ্ত হইল। ইংরাজেবা বুঝিলেন যে, হয় আয়র্লণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, নযত উহাকে একেবারে ইংলণ্ডের আয়ত্তাধীন করিষা রাখিতে হইবে। ইংরাজ মন্ত্রিগণ (Pitt ও Castlereagh) দেখিলেন যে, আয়র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট উঠাইষা দিয়া জনকতক আইরিস সভ্যকে ইংরাজী পার্লামেণ্টভুক্ত কবিষা লইতে পারিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আইরিস পার্লামেণ্টেব বিনা সম্মতিতে ত তাহাকে উঠাইয়া দিবার উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তখন উৎকোচের ব্যবস্থা করিলেন। কাহাকেও বড পদের লোভ দেখাইয়া, কাহাকেও পেন্সন দিয়া, কাহাকেও বা নগদ মূল্য ধরিয়া দিয়া, দুই দশ জনকে ভয় দেখাইয়া, উক্ত ব্যবস্থায় সম্মত করান হইল। সে সময়কার লোকসংখ্যার হিসাব করিলে আয়র্লণ্ডের যত জন সভ্য হওয়া উচিত, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক সভ্যও আয়র্লণ্ড হইতে লওয়া হইল না। সে সময়কার যে সমস্ত পত্রাদি আজকাল মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে আইরিস পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিবার মূল কারণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মুখে মন্ত্রিবর্গ বলিতে ছাড়িলেন না, যে, এই সম্মিলন ব্যবস্থা উভয় দেশের মঙ্গল-কামনা-প্রসূত !

উভয় রাজ্যের এক পার্লামেণ্ট হইয়া যাইবার পর আয়র্লণ্ডের অভিজাতবর্গ ও নেতৃবৃন্দ অনেকেই ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষাও ইংলণ্ডে হইতে লাগিল। ফলে দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা আর আইরিস রহিলেন না, ইংরাজ হইয়া গেলেন। আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ও দেখিলেন যে, সমান রাজনৈতিক অধিকার হইতে ক্যাথলিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইলে, ইংরাজের সাহায্য আবশ্যক। ইহাদের মিলনে "ইউনিয়নিষ্ট" (Unionist) দলের উৎপত্তি। যে অলস্টর (Ulster) এক সময়ে "ইউনাইটেড আইরিসমেন" দলের কেন্দ্র ছিল, তাহাই কালক্রমে "ইউনিয়নিষ্ট" দলের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মের গোঁড়ামি হইতেই এই সঙ্কীর্ণতার উৎপত্তি; সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্নপুষ্ট পাদরির দলও দিন দিন তাহা বাড়াইয়া তুলিতে ভুলিলেন না।

এদিকে ক্যাথলিক সম্প্রদায় একেবারে নিরাশ হইয়া পডিলেন। একে ত বাজনৈতিক দাসত্ব, তাহাব উপর ধর্ম্মেব নামে উৎপীড়ন; আর প্রতিকারেব কোন উপায়ও হাতে নাই। দুঃখের বাঁধনে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাবাই ক্রমে "ন্যাসনালিষ্ট" (Nationalist) দল গঠন কবিলেন। তাঁহাদেব আন্দোলন নানা অবস্থার মধ্যে পডিষা নানা রূপ ধারণ কবিয়াছে; কিন্তু বিজিত হইবার পর হইতেই যে আয়র্লণ্ডেব দুর্গতিব আরম্ভ, এ কথা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই। স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা-সৃষ্টির চেষ্টা যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম সোপান মাত্র—এ ভাবও তাঁহাদেব রক্তে মাংসে জড়িত হইয়া গিযাছে।

স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট উঠাইযা দিয়া ইংলণ্ড যখন প্রেমালিঙ্গনে আয়র্লণ্ডকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, "ইউনাইটেড আইবিসমেন" সভা তখনও একেবারে মবে নাই। ববার্ট এমেট একবার ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মবণ কামড় কামডাইবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফলে তাঁহাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইল। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আইরিসদিগকে দমন করিবার জন্য নিত্য নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়া আসিতেছে। ক্যাথলিকেরা দিনকতক একটু চুপ করিয়াছিল; শেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ওকনেল (O'Connell) প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত সমান অধিকার পাইবার জন্য বিপুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ওকনেল বৈধ আন্দোলনের একজন প্রধান পাণ্ডা। শুধু নৈতিক বলে জয় লাভ করা যাইবে, এই কথাই তিনি প্রচার করেন; তবে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের ভয় দেখাইতেও ছাড়েন নাই। দেশময় উত্তেজনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইংরাজ মন্ত্রিসভা বিচলিত হইয়া পড়েন। পাছে যথার্থই বিদ্রোহ হয়, সেই ভয়ে তাঁহারা ক্যাথলিকদিগকে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার দিয়া ফেলিলেন।

একবার কৃতকার্য্য হইয়া নৈতিক বলের উপর ওকনেলের অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। আয়র্লণ্ড যাহাতে পুনরায় স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পায়, সেই জন্য তিনি আবার নূতন করিয়া আন্দোলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে এক সভা স্থাপন করিলেন। দুই বৎসরের

মধ্যে প্রায় সমস্ত ক্যাথলিক ও অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট তাঁহার দলে আসিয়া জুটিল। দেশময় সভা সমিতির বৈঠক বসিল। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু নৈতিক বল-প্রয়োগের ভয়ে আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দিবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। অধিকন্তু ওকনেল-স্থাপিত সমস্ত সভাসমিতির অধিবেশন একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া শেষে ওকনেল আপনার জনকতক বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এক প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজপ্রতিনিধি লজ্জার মাথা খাইয়া যখন তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন ওকনেল এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া লিখিলেন—At breakfast, dinner and supper, let every Irishman recollect that he lives in a country where one Englishman's will is law." "ত্রিসন্ধ্যা আহারের সময় প্রত্যেক আয়র্লণ্ডবাসীই যেন স্মরণ রাখে, যে, সে যে দেশে বাস করে, সেখানে একজন ইংরাজের খেয়ালই আইন।" ওকনেলের নৈতিক বল-প্রয়োগ কিন্তু ক্রমাগতই ব্যর্থ হইতে লাগিল; শেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে গিয়াও তাঁহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

দেশের যুবকেরা কিন্তু নৈতিক বলের মোহিনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তাহারা ওকনেলের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'ইয়ং আয়র্লণ্ড' দল গঠন করিল। ডেভিস (Davis), ডফি (Duffy) ও মিচেল (Mitchel) এই দলের নেতা। কোন সাম্প্রদায়িক অভাবমাত্র দূর করা তাহাদের লক্ষ্য নহে। ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট সকলকেই এক জাতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া আয়র্লণ্ডকে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্ব্বের সমস্ত আন্দোলন বিফল হওয়ায় দেশে তখন উৎসাহের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজও সর্ব্বতোভাবে আয়র্লণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের বীজ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অনুগ্রহে বিদ্যালয় সমূহ হইতে আয়র্লণ্ডের জাতীয় "গেলিক" ভাষা বহিষ্কৃত হইল এবং আয়র্লণ্ডের ইতিহাস ও স্বদেশী কবিতার পঠন-পাঠনও নিষিদ্ধ হইল। আইরিস্ জাতির প্রাণ যাহাতে ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই হয়, সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি হইল না। এ দিকে ব্যবসা বাণিজ্য ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। দারিদ্র্যে দেশ ভরিয়া গেল; দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল; কিন্তু দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ হইল না। দেশে থাকিলে যাহাদের অনাহারে মরিতে হয়, তাহাদের দেশত্যাগ করা ভিন্ন আর উপায় কি? এই কারণে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক আয়র্লণ্ড ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

দেশের এই দুর্গতি দেখিয়া "ইয়ং আয়র্লণ্ডের" যুবকবৃন্দ দেশের লোককে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্ম-কুশল নেতার অভাবে সব আয়োজন বিফল হইল। মিচেল ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন, এবং অন্যতম নেতা স্মিথ ওব্রায়েনের (Smith O'Brien) বিদ্রোহ চেষ্টাও অচিরে বিনষ্ট হইল।

যে দেশে বৈধ আন্দোলনে কোন প্রতিকার হয় না, এবং জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার উপায়ান্তর নাই, সেখানে স্বতঃই লোকে রাজনীতির উপর ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। আয়র্লণ্ডেও কতকটা তাহাই হইল! সমস্ত চেষ্টা যে এতদিন ধরিয়া কেন বিফল হইতেছে, লোকে তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যদি দেশের স্বাধীনতা লাভের ফলে সাধারণ প্রজাদিগের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহারা শুধু জনকতক নেতার কথায় অপরের সুবিধার জন্য প্রাণ দিতে যাইবে কেন? আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা সমস্তদিন খাটিয়াও অনাহারে মরে, না হয়, জমিদারের উৎপীড়নে দেশত্যাগী হয়, আর বিলাসী জমিদারেরা কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ লইয়া বিদেশে বাবুয়ানি করিয়া বেড়ায়। কৃষকদের এই দুর্দ্দশা যদি না ঘুচে ত স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পাইলেই কি তাহাদের প্রাণ শীতল হইয়া যাইবে? জনকতক হোমরা চোমরাকে লইয়া দেশ নহে; তাহাদের আবেদন বা আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। যিনি এই নূতন ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁর নাম লেলর (Lalor)। তিনি কৃষকদিগকে উপদেশ দিলেন,—"তোমরা জোর করিয়া জমি দখল কর। খাজনা দিও না। কেহ খাজনা আদায় করিতে আসিলে প্রতিপদে বাধা দাও।" প্রজাশক্তি জাগিলেই যে দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর, এ কথা অনেকেই বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন যে, জমিদারদিগের সহিত মিলিতে যাইয়াই মিচেল ও ওব্রায়েনের বিদ্রোহচেষ্টা বিফল হইয়াছে। জমিদারেরা নামে আইরিস হইলেও

কাজে আইরিস নহে। তাহারা বিদেশীর হাত হইতে মুক্ত হইতে চায়, কিন্তু দরিদ্র স্বদেশীকে দাবাইয়া রাখিতে পরাঙ্মুখ নহে। যে বিপ্লব প্রজাতন্ত্র-মূলক নহে, তাহা এ যুগে নিস্ফল হইবেই হইবে।

একদিকে কৃষিজীবীদিগের এই আন্দোলন চলিতে লাগিল, অপর দিকে "ইয়ং আয়র্লণ্ড" এর ভগ্নাবশেষ লইয়া একটি নূতন গুপ্তসভা গঠিত হইল। ইহার নেতারা সকলেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব-চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষ্টিফেন্স ও ও'মেলরীই প্রধান। বিপ্লব নিস্ফল হইবার পর উভয়েই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারিসে ছিলেন। ষ্টিফেন্স (Stephens) আয়র্লণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ফিনিয়ান (Fenian) গুপ্তসভা গঠন করিলেন। ওমেলরী (O'Malory) নিউ ইয়র্কে গেলেন। আমেরিকার অন্তর্বিগ্রহের সময় সহস্র সহস্র আইরিস উভয় দিকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধিকাংশই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ষ্টিফেন্স আমেরিকা হইতে অর্থ ভিন্ন অন্য কোনরূপ সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হন। অর্থ অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল; সুতরাং ষ্টিফেন্স যথাসময়ে তাঁহার লোকদিগকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতে পারিলেন না। এই লইয়া উভয় পক্ষে মনোমালিন্য হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সভার কার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগের মধ্যে ১৩০০০ ও পুলিস বিভাগে ততোধিক ফিনিয়ান ছিল। কিন্তু সরকারী গুপ্ত পুলিসের হাত তাঁহারা এড়াইতে পারিলেন না। ষ্টিফেন্স ধৃত হইয়া জেলে গেলেন; সেখান হইতে তিনি প্রথমে ফ্রান্স ও পরে আমেরিকায় পলাইয়া যান। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নেতৃবৃন্দের অধীনে পুনরায় বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু তাহাও পূর্ব্ববৎ বিফল হইয়া যায়।

যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বিপ্লবের আয়োজন, তাহা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আয়লণ্ডের দুর্দ্দশার দিকে আকৃষ্ট হইল। গ্লাডষ্টোন আইরিস কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

তাঁহার আশা ছিল যে, কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইয়া উঠিলে, তাহারা আর ফিনিয়ানদিগের সহিত যোগ দিতে যাইবে না। সে আশা কতকটা ফলবতীও হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর প্রকাশ্যভাবে আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহের চেষ্টা হয় নাই। আইরিস সভ্যেরা পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিয়াই আপনাদের শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

পার্নেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আইরিস আন্দোলন আবার সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি শুধু প্রতিপদে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; আয়র্লণ্ড ও আমেরিকাকে এ কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হোমরুল-স্থাপনের চেষ্টা জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান মাত্র। এই জন্যই ফিনিয়ানদিগের ভগ্নাবশেষ তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকটা নিজেরই দোষে যখন তাঁহার পতন হইল, তখন পার্লামেণ্টের আইরিস দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। লিবারেলদিগের ভোটের লোভে তাহারা পার্নেলকে নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিল, কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমস্ত শক্তিই বিলুপ্ত হইল। তাহারা লিবারেল-দিগের হাতে খেলার পুতুল মাত্র হইয়া রহিল।

বহুকাল পরে রেডমণ্ডের নেতৃত্বে আইরিসেরা আবার সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু রেডমণ্ডের আদর্শ পার্নেলের আদর্শ হইতে পৃথক। পার্নেলের হোমরুলের মধ্যেও একটা স্বাধীনতার তীব্র গন্ধ ছিল। ব্রিটীস সাম্রাজ্যকে তিনি কখনও আপনার বলিয়া ভাবেন নাই। সাম্রাজ্যের সহিত আয়র্লণ্ডের যে কোন প্রাণের টান আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতেন না। সাম্রাজ্যের গৌরব তাঁহার দেশের গৌরব নহে! আয়র্লণ্ডের আন্দোলনকে তিনি আইরিস জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু রেডমণ্ড আয়র্লণ্ডকে ব্রিটীস সাম্রাজ্যের অংশ রূপেই দেখিতেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যেরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া আসিতেছে, তিনি আয়র্লণ্ডের জন্য তাহাই দাবী করিতেন। সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সংকল্প তিনি কখনও করেন নাই। কিন্তু আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। হোমরুল বিল কাগজে-কলমেই আবদ্ধ রহিয়া গেল। শেষে বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে নিজের দেশবাসীর নিকটেই "England's recruiting sergeant" বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে হইল। পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিয়া কতটুকু পাওয়া সম্ভব, তাহা পার্নেল ও রেডমণ্ড দেখাইয়া গিয়াছেন। যথার্থভাবে দেখিতে

গেলে, তাঁহারা সমগ্র আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধি নহেন। যাহাদের লইয়া দেশের তিন-চতুর্থাংশ, সেই কৃষক বা শ্রমজীবীর প্রাণের ব্যথা তাঁহাদের কথায় সম্যক ধ্বনিত হয় নাই। তাঁহাদের আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালীর মূলেই বিফলতার বীজ নিহিত ছিল। রেডমণ্ড যখন পার্লামেণ্টের দ্বারে হোমরুল ভিক্ষা করিতে ব্যস্ত, তখন হইতেই আয়র্লণ্ডের জন্য বিধাতা অলক্ষ্যে অন্য অস্ত্র শাণিত করিয়া তুলিতেছিলেন। উহার নাম সিন ফিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিনফিনের জন্মকথা

১৮৪৮ ও ১৮৬৭ সালের বিদ্রোহ-চেষ্টা নিষ্ফল হইবার পর আয়র্লণ্ডে সকলেই একরূপ বুঝিলেন যে, বাহুবলে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। এ দিকে পার্লামেণ্টে একশত বৎসর ধরিয়া বিধিসঙ্গত আন্দোলনের ফল দেখিয়া হতাশ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দয়া, ধর্ম্ম, সুবিচার, ন্যায়সঙ্গত অধিকার—এক কথায় দুর্ব্বল সবলের নিকট যে সমস্ত বুলি আওড়াইয়া কৃপা ভিক্ষা করে, সেগুলি পার্লামেণ্টের কানে সময়ে অসময়ে ধ্বনিত করিতে আইরিসেরা ছাড়ে নাই। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

আইরিসেরা দেখিল যে, জাতীয় পরাধীনতার ফলে তাহাদের পেটের ভাতও মারা যাইতে বসিয়াছে। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ভার বহনের জন্য ন্যায়তঃ তাহাদের যে কর দেওয়া উচিত, পার্লামেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে তাহার অপেক্ষা বাৎসরিক ৭৫০,০০০ পাউণ্ড অধিক আদায় করিয়া লইতেছে। ইংরাজ ব্যবসাদারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আইরিস ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ের কাজকর্ম্ম চালান হইতেছে। আইরিসদের সওদাগরী জাহাজগুলি অনেক দিন হইল মারা পড়িয়াছে। দেশে লোহা কয়লা প্রভৃতি যা' কিছু খনিজ দ্রব্য ছিল, সেগুলা বাহির হইলে পাছে ইংরাজ ব্যবসাদারদের ক্ষতি হয়, এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা সে দিকে ফিরিয়াও চান না। লোকসংখ্যা এত দ্রুতবেগে কমিয়াছে যে, ইউরোপে তাহার তুলনা মেলাই ভার। ইংরাজ-ভক্ত "অলষ্টরেরই" লোকসংখ্যা সত্তর বৎসরের মধ্যে প্রায় আধাআধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্ত দুর্ঘটনা চুপ করিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। কারণ যে কি, তাহা সকলেই জানে ও বুঝে, কিন্তু সেই সর্ব্বনাশা কারণ দূর করিবার সামর্থ্য যে কাহারও নাই।

তা' হোক, কিন্তু মানুষ সহজে হাল ছাড়ে না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ তাহার আশ। স্বাধীনতা গিয়াছে, শ্রীসম্পদ গিয়াছে—কিন্তু জাতির প্রাণটুকু যতক্ষণ ধুক্‌ধুক্ করে, ততক্ষণ সব ফিরিয়া পাইবার আশা যায় না। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা জাতির প্রাণ। আয়র্লণ্ডের সবই গিয়াছিল; কেবল একেবারে যায় নাই গেলিক ভাষা। জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষীণ আলো ঐ দীপেই মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আয়র্লণ্ডের অতীত যুগের গৌরব-কাহিনী, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের ইতিহাস ঐ ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। বিদেশী আসিয়া সবই কাড়িয়া লইয়াছিল; কেবল অতীতের গৌরব-মণ্ডিত সুখস্মৃতিটুকু বহুদিন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা"র নাম দিয়া যেদিন হইতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাদান আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে "গেলিক" ভাষার কপাল পুড়িল। আইরিস ইতিহাসের পঠন পাঠন বন্ধ হইল; জাতীয়-ভাব-উদ্দীপক কবিতাদি পাঠ্যপুস্তক হইতে বহিষ্কৃত হইল, এবং পিতৃপুরুষের নাম ভুলিয়া আইরিস বালকেরা আপনাদিগকে "ব্রিটিশ" নামে পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিতে শিখিল। দুই এক পুরুষের মধ্যেই জাতীয় "গেলিক" ভাষা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন "সিনফিনের" উৎপত্তি। বিদেশীকে অস্ত্রবলে দেশ হইতে তাড়াইবারও সামর্থ্য নাই; আর তাহার দ্বারে "ধরণা" দিয়াও লাভ নাই দেখিয়া, কয়েক জন আইরিস স্থির করিলেন যে, বিদেশীর প্রভুত্ব সর্ব্ব বিষয়ে অস্বীকার করিয়া, আত্মনির্ভরশীল হইয়া, দেশের সমস্ত কাজ যথাসম্ভব নিজের হাতে করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ স্বদেশী ভাবাপন্ন হওয়ারই নাম আইরিস ভাষায়—সিনফিন।

আইরিসেরা দেখিলেন যে, জাতীয় ভাব বাঁচাইতে গেলে আগে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য বাঁচাইতে হয়; এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "গেলিক লিগ" নামক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্যাথলিক হোক, প্রোটেষ্টাণ্ট হোক, সকলেই এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। ধর্ম্ম

বা রাজনীতিসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই সেখানে উঠিত না। "লিগ" শুধু জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রচারেই মনোযোগ করিতেন। কিন্তু জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাবও পুনর্জীবিত হইতে লাগিল; জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির সহিত গেলিক লিগের কোন সংস্রব না থাকিলেও উহার প্রভাব ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একটা জাতি নবজীবনের আস্বাদ পাইয়া যখন জাগিয়া উঠে, তখন তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

গেলিক লিগ স্থাপনের পর হইতেই নানা স্থানে "সাহিত্য-সভা" স্থাপিত হইতেছিল; সেগুলি প্রাচীন "ইয়ং আয়র্লণ্ড" দলের ভাবেই রঞ্জিত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর্থার গ্রিফিথ "ইউনাইটেড আইরিসম্যান" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবল স্বদেশী ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে যেরূপ স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা ছিল, গ্রিফিথ তখন তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু আয়র্লণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইলেও তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য বিপ্লবস্থষ্টির সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেন:—"আয়র্লণ্ডের উপর ইংরাজের কোনও অধিকার আমরা স্বীকার করিব না। পার্লামেণ্টে কোনও আইরিস সভ্য পাঠাইব না; কেননা তাহা হইলে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, ইংরাজের আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে আইন গড়িবার অধিকার আছে। তবে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও আমরা করিব না; অস্ত্রধারণ অন্যায় বলিয়া নহে, সে সামর্থ্য আমাদের আপাততঃ নাই বলিয়া। আমাদের জাতীয় জীবন আমরা আত্মশক্তিবলে গড়িয়া তুলিব। প্রথমে মানসিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে; রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।"

গ্রিফিথ নিজে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টমূলক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও, যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহাদের প্রবন্ধাদিও "ইউনাইটেড আইরিসম্যানে" প্রকাশিত ও আলোচিত হইত।

এই সমস্ত শিক্ষার প্রভাবে আয়র্লণ্ডে কতকগুলি নূতন নূতন স্বদেশী দল গড়িয়া উঠিতেছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত Cuman na Geadhal (কুমান না গেডাল) ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মুখ্যতঃ জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যায়াম-চর্চ্চা ও শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার এবং গৌণতঃ আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করাই এ সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলে এ আদর্শ স্বীকার করিল না। তাহারা বলিল—"সাময়িক রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ রাখা চাই। দেশের বুকের উপর বসিয়া যাহারা রাজত্ব করিতেছে, তাহাদের অস্বীকার করিব বলিলেই তো আর তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। দেশের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যখন একদিন না একদিন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেই হইবে, তখন শুধু জাতীয় সাহিত্য ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির দিকে মন দিলে চলিবে না, দেশকে সংঘবদ্ধ করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।" এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য Cuman na Gaedhal (কুমান্ না গেডাল) সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৯০২ খৃষ্টাব্দে) গ্রিফিথ যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তাঁহার আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠে। সভায় স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আর যাহাতে আইরিস সভ্য না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পার্লামেণ্টের আইরিস সভ্যেরা স্বদেশের এই অপমানজনক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেশে থাকিয়া দেশরক্ষায় ব্রতী না হন, ততদিন যেন বিদেশবাসী আইরিসেরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য না করেন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে সিনফিনের জন্ম। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডবলিন শহরে জাতীয় পরিষদের (National Council) প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রিফিথ প্রস্তাব করেন যে, ৩০০ সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া আয়র্লণ্ডের এক পার্লামেণ্ট গঠিত হউক। ইংরাজী পার্লামেণ্টের যে সমস্ত আইরিস সভ্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যাইতে অস্বীকৃত, তাঁহারাও এ নূতন পার্লামেণ্টের সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। দেশের মধ্যে যত মিউনিসিপ্যালিটী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভা আছে, সেগুলি যাহাতে এই পার্লামেণ্টের আদেশ অনুসারে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আইন ভঙ্গ না করিয়াও যে যে উপায়ে আয়র্লণ্ডকে কার্য্যতঃ ইংরাজের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা যায়, জাতীয় পরিষদ তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, প্রথমতঃ শিক্ষার ভার নিজেদের হস্তে লইয়া এমন একদল যুবককে

গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহারা দেশের কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য ও শাসন-কার্য্য পরিচালন করিতে পারে। কাউন্টী সভার (County Council) তত্ত্বাবধানে যত কিছু কর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মে প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলে এই সমস্ত যুবককে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলে ক্রমশঃ ইহাদের দ্বারা একটা "আইরিস সিভিল সার্ব্বিস" গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দূত রাখিয়া বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আইরিস ব্যাঙ্কসমূহ যদি আইরিস শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ না দেয়, তাহা হইলে লোকে যাহাতে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আইরিসদিগের তত্ত্বাবধানে নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বদেশী শিল্পরক্ষার জন্য আয়র্লণ্ড হইতে ইংরাজী পণ্য বহিষ্কার করিতে হইবে এবং বিচার ভিক্ষার জন্য যাহাতে ইংরাজের দ্বারে না যাইতে হয়, সে জন্য 'সালিসী' বিচারালয় স্থাপিত করিতে হইবে। এক কথায়, দেশের মধ্যে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সিনফিনের প্রথম অবস্থার কার্য্য-প্রণালী।

দুই বৎসর কাজকর্ম্ম বেশ উৎসাহের সহিত চলিল; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিনফিনের চীৎকার যেন অরণ্যে রোদন হইয়া দাঁড়াইল। ন্যাসনালিষ্ট (Nationalist) দলের নেতা রেডমণ্ড তখন পার্লামেণ্টের নিকট হইতে হোমরুল আদায় করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ। সিনফিনের নেতারাও স্থির করিলেন যে, এ সময় রেডমণ্ডকে বাধা দিয়া হোমরুল প্রাপ্তির অন্তরায় হওয়া সমীচীন নহে।

১৯১০ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত সিনফিন একরূপ নির্জীব হইয়াই পড়িয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য শক্তি ধীরে ধীরে আয়র্লণ্ডে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। তাহারাই ক্রমে ক্রমে সিনফিনের সহিত মিলিত হইয়া সিনফিনকে পুষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিনফিনের পরিণতি

সিনফিন যে প্রথমাবস্থায় সমগ্র আইরিস জাতির সহানুভূতি পায় নাই, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিকে ইহারা তত দৃষ্টি রাখে নাই। কিন্তু সারা ইউরোপে শ্রমজীবীদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আয়র্লণ্ডেও একটা প্রবল শ্রমজীবীদল গড়িয়া উঠিতেছিল; ও'কনলীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া ইহারা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে একটা প্রজাতন্ত্রমূলক সোসিয়ালিষ্ট দল গঠন করিয়া তুলে। প্রথম অবস্থায় সিমফিন দলের সঙ্গে এই শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার আশা করেন, তাঁহারা কতদূর ভ্রান্ত। পতিত দেশের উদ্ধার করিতে গেলে, দেশের মধ্যে যাহারা পতিত, তাহাদেরই উদ্ধার আগে করিতে হয়।

আয়র্লণ্ডের পুরাতন বিপ্লবপন্থীদের ভগ্নাবশেষ-গুলি ক্রমে ক্রমে এই শ্রমজীবী-সংঘের সহিত মিলিত হইয়া একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিল। যাঁহারা হোমরুলের আশায় রেডমণ্ডের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হোমরুল বিলের রূপ দেখিয়া তাঁহারাও অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। অধিকন্তু এই ভাঙ্গা-চোরা হোমরুল বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য অলষ্টর-বাসিগণ যখন অস্ত্র ধারণের ভয় দেখাইল, এবং গোপনে তাহারা কামান বন্দুক সংগ্রহ করা সত্ত্বেও যখন ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন না, তখন ন্যাশনালিষ্ট দলের অনেকেই বিপ্লবপন্থী হইয়া দাঁড়াইলেন।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে ইউরোপে তুমুল সংগ্রামের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ যে একদিন অনিবার্য্য, একথা দুই তিন বৎসর হইতে অনেকেই বুঝিয়াছিল। যুদ্ধ যখন ঘোষিত হইল, তখন যদি রেডমণ্ড জিদ ধরিতেন যে, হোমরুল কার্য্যে পরিণত না হইলে আয়র্লণ্ড হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে হয় ত হোমরুলের এমন অকাল-মৃত্যু ঘটিত না, কিন্তু তিনি নিতান্ত ভদ্র-

লোকের মত ইংলণ্ডের কথার উপর নির্ভর করিয়া-আইরিসদিগকে সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ফলে ৪০ হইতে ৫০ হাজার আইরিস সৈন্য সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য প্রাণ দিতে ছুটিল। সিনফিনদিগের মুখপত্র এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, ইহার ফল বিষময় হইবে :—
"If England wins this war she will be more powerful than she has been at any time since 1864 and she will treat Ireland which kissed the hand that smote her as such as Ireland ought to be treated."

'ইংলণ্ড যদি এ যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পর এমনটি আর হয় নাই; এবং যে আয়র্লণ্ড ঘাতকের হস্ত লেহন করিয়াছে, তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, সেইরূপই করিবে।'

আজ আয়র্লণ্ডের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে।

সিনফিনদিগের মুখপত্রে অন্যত্র লিখিত হয়—"যুদ্ধের সময় আইরিস স্বেচ্ছা-সৈনিকগণকে যদি আয়র্লণ্ড রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা আইরিস সেনাপতির অধীনে ও আইরিস পতাকার তলে তাহা করিবে। আর তাহা না হইলে তাহারা আপনাদের দেশের দাসত্ব চিরস্থায়ী করিবে মাত্র।"

যুদ্ধ-ঘোষণার তিন মাস পরে সিনফিন, শ্রমজীবী ও প্রজাতন্ত্র দলের সমস্ত সংবাদ-পত্র পুলিসে বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আইরিসদের বিদেশ যাত্রা করা উচিত কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। রেড-মণ্ডের ন্যাশনালিষ্ট দল ও অলষ্টরের ইউনিয়নিষ্ট দল ইংলণ্ডের সাহায্য করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহের পক্ষপাতী আর সিনফিন ও প্রজাতন্ত্রের দল উহার বিরোধী রহিলেন। অবস্থার চাপে পড়িয়া ক্রমশঃ সিনফিন ও প্রজাতন্ত্রবাদীরা এক হইয়া উঠিতেছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে গ্রিফিথ একখানা নূতন সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়া ইংরাজ-স্বার্থের বিরুদ্ধ মত প্রচার আরম্ভ করেন, কিন্তু ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সেখানির প্রচার বন্ধ করিতে হয়।

এদিকে ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-সমূহের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য উচ্চকণ্ঠে আয়র্লণ্ডবাসীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের মনে শুধু এই কথাই উঠিতে লাগিল—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিদের জন্য যাহাদের এত গভীর সহানুভূতি, তাহারা আয়র্লণ্ডের জন্য কিছু করে না কেন?" ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা চিরদিনই সন্দিহান; এখন তাহাদের বেশ দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, হোমরুল-বিল পুঁথির মধ্যেই থাকিয়া যাইবে; কাজে কখনও লাগিবে না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার উপায় নাই, বিরোধী সংবাদপত্রের পরমায়ু নিতান্তই অল্প। শেষে গ্রিফিথ "Scissors and Paste" নাম দিয়া এক সংবাদ-পত্র প্রচার আরম্ভ করেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য শুধু একটী মাত্র প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল—বাকি সমস্ত সংবাদাদি অন্যান্য সংবাদ-পত্র হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু সেই একটীমাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আয়র্লণ্ডের মনের কথা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল :—

"It is high treason for an Irishman to argue with the sword the right of his small nationality to equal political freedom with Belgium or Servia or Hungary. It is destruction to the property of his printer now when he argues it with the pen. Hence while England is fighting the battle of the small nationalities, Ireland is reduced to Scissors and Paste. Up to the present the sale and use of these instruments have not been prohibited in Ireland."

"বেলজিয়াম, সার্বিয়া বা হাঙ্গারীর মত স্বাধীনতা পাইবার জন্য আইরিসেরা যদি তরবারি লইয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলে তাহার নাম রাজদ্রোহ; সে স্বাধীনতার কথা লইয়া যদি সংবাদ-পত্রে বিচার বিতর্ক করে, তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তাই ইংলণ্ড যখন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ-নিরত, তখন আয়র্লণ্ডকে 'কাঁচি ও কাই' সার হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ওগুলির ক্রয় ও ব্যবহার আয়র্লণ্ডে এখনও নিষিদ্ধ হয় নাই।"

বলা বাহুল্য, এ সংবাদ-পত্রখানিও অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভাবপ্রচার কার্য্য বন্ধ হইল না। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হইয়া আইরিসদিগের দ্বারে দ্বারে স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্রমে আয়র্লণ্ডে যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত স্বেচ্ছাসৈন্যের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। রেডমণ্ড

রেডমণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে রহিলেন, যাঁহারা ইংলণ্ডের সাহায্য-প্রয়াসী, তাঁহাদের নাম হইল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যে একদিন যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্ততঃ অলষ্টারের হাত হইতে হোমরুল বিলকে বাঁচাইতে হইলেও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে, এই বিশ্বাস বুকে লইয়া আইরিস ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতা জেমস্‌ ও'কনলীর সহিত প্রজাতন্ত্রীদলের তখনও একটা বোঝাপড়া হয় নাই। ও'কনলী শুধু জাতীয় পতাকা, জাতীয় পার্লামেণ্ট বা জাতীয় স্বাধীনতার নামে ভুলিতে চাহিতেন না। তিনি বলিতেন যে, যে জাতীয় স্বাধীনতার ফলে আপামর সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের আপন আপন জীবন স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিবার শক্তি না আসিবে, সে স্বাধীনতায় শুধু শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য লাভ হইবে মাত্র; তাহার জন্য মরিয়া লাভ নাই।

এদিকে পিয়ার্সের (P. H. Pearse) শিক্ষার ফলে আইরিস ভলান্টিয়ারগণও ব্যাপকভাবে স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিল। যে উলফটোন আইরিস স্বাধীনতার ভাব-কেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার শিক্ষা বিশ্লেষণ করিয়া পিয়ার্স দেখাইতে লাগিলেন যে, ও'কনলীর শিক্ষার সহিত উহার মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই; উলফটোন শুধু শ্রেণী-বিশেষের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়া যান নাই; সর্ব্ব-শ্রেণীর স্বাধীনতাই তাঁহার মূলমন্ত্র। "Let no man be mistaken as to who will be lord in Ireland when Ireland is free. The people will be lord and master." "If the men of property will not support us, they must fall, we can support ourselves by the aid of that numerous and respectable class of the community, the men of no property,"

"আয়র্লণ্ড স্বাধীন হইলে কর্তৃত্ব কাহার হাতে আসিবে, এ বিষয়ে যেন আমাদের ভুল ধারণা না থাকে। প্রজাসাধারণই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবে।" "ধনী সম্প্রদায় যদি আমাদের সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহাদের পতন অনিবার্য্য। যাহারা অর্থ-সম্পদহীন, সেই বহুসংখক ভদ্রশ্রেণীর সাহায্যের উপর আমরা নির্ভর করিব।" বলা বাহুল্য, অর্থ-সম্পদহীন ভদ্রশ্রেণী অর্থে শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

পিয়ার্স এবং ও'কনলীর শিক্ষার ফলে প্রজা-তন্ত্রের দলের সহিত শ্রমজীবীদল একীভূত হইয়া গেল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আয়র্লণ্ডে ইহারা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সিনফিন দলের সহিত এ বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু বিপ্লব যখন দমন করা হইল, তখন সিনফিন দলের নেতারাও দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বিদ্রোহের সময় আয়র্লণ্ড সম্পূর্ণরূপে সিনফিন বা প্রজাতন্ত্রমতাবলম্বী হয় নাই। রেড্‌মণ্ডের ন্যাসনালিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল; বিদ্রোহের পর বেশ বুঝা গেল যে, হোমরুল বিল কার্য্যে পরিণত হইবার আর বড় আশা ভরসা নাই। প্রজাতন্ত্রবাদীদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; বিদ্রোহ থামিবার অল্প দিন পরেই একটা গুপ্ত বিচারের পর পিয়ার্স, ও'কনলি ও অপর তের জন নেতাকে গুলি করিয়া মারা হইল! দেশময় ধরপাকড় আরম্ভ হইল; ৩০০০ জনকে কারাবদ্ধ করিয়া দেশান্তরিত করা হইল। বিদ্রোহদমন কার্য্যটা বেশ জাঁকজমকের সহিতই সম্পন্ন হইল।

আয়র্লণ্ড চুপচাপ করিয়া দেখিল। শেষে ক্রমে ক্রমে সকলের মাথায় এই কথাটা ঢুকিল যে, এতগুলা লোককে যে গুলি করা হইল, ইহারা যদি ইংরাজ হইত ত প্রকাশ্য বিচারালয়ে ইহাদের বিচার হইত; জর্ম্মাণ হইলে ইহারা যুদ্ধের বন্দীর মত ব্যবহার পাইত, কিন্তু পরাধীন আয়র্লণ্ডবাসী বলিয়াই ইহাদের আজ এই বিড়ম্বনা। শেষে ইংলণ্ডের প্রধান সচিব যখন পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন যে, আইরিস বিদ্রোহীদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহার সাধারণ ইংলণ্ডবাসীর অভিপ্রায়-সম্মত, তখন আয়র্লণ্ড একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। লোকে শুধু দুঃখ বা রাগ প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। যাহারা পূর্ব্বে ও'কনলী বা পিয়ার্সের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহারাও বুঝিতে চাহিল যে, অকাতরে এ লোকগুলা এমন করিয়া প্রাণটা দিল কেন? সিনফিন-সাহিত্য পড়িবার জন্য লোকে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। লোকে ক্রমে ক্রমে বুঝিল যে, উলফটোন হইতে আরম্ভ করিয়া পিয়ার্স, ও'কনলী পর্য্যন্ত সকলেই আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে; হাজার হাজার সৈন্য যে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিয়া মরিল—তাহারা বৃথায় মরিয়াছে।

কিন্তু অস্ত্রবলে ইংরাজকে তাড়ান ত সম্ভব নয়। সিনফিন যে ইংরাজ-শাসন কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতে বলিতেছে—সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের শাসনপ্রণালীর ধূয়া ধরিলে আর চলিবে না। যাহারা আয়র্লণ্ডের জন্য প্রাণ দিয়াছে—তাহাদের প্রচারিত প্রজাতন্ত্রই আদর্শ বলিয়া মানিতে হইবে।

সারা আয়র্লণ্ডের মনে দেখিতে দেখিতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বড় একটা সংবাদ রাখিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, রাজনৈতিক কয়েদীদের ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে একটা হোমরুলের বন্দোবস্ত করিলেই দেশ শান্ত হইয়া যাইবে। কয়েদীরা ছাড়া পাইল, প্রধান মন্ত্রী বলিলেন যে, অচিরে আয়র্লণ্ডের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু তিনি রাজ্যময় সকল দলের কাছেই তাহাদের মনোমত এক একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার প্রতিজ্ঞার আর কাহারও নিকট মূল্য রহিল না।

১৯১৭ সালে সিনফিনের কর্ত্তৃপক্ষগণ আবার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। "জাতীয়তা" (Nationality) নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক বাহির হইল। এবার দেশশুদ্ধ লোক তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডে যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহারা আয়র্লণ্ডের বিরোধী; সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিল যে, পার্লামেণ্টে গিয়া বক্তৃতা দিয়া আর কোনও লাভ নাই। সিনফিন-নির্দ্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ বলিয়া সকলে মানিয়া লইল। এদিকে 'আইরিস নেশনাল লিগ' নামে সিনফিন-ভাবাপন্ন একটী স্বতন্ত্র দল গড়িয়া উঠিল। অন্যান্য দেশের নিকট আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়া ও আয়র্লণ্ডের আত্মশক্তির পরিপুষ্টি-সাধন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আয়র্লণ্ডে যাহাতে বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহ (conscription) না চলিতে পারে, ও আয়র্লণ্ড যাহাতে দুই ভাগে বিভক্ত না হয়, তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সমগ্র আয়র্লণ্ডই সিনফিন-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ ১০।১২ খানি কাগজে সিনফিন মতবাদ সমর্থিত হইতে লাগিল। পার্লামেণ্টে যখন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় আসিল, তখন সিনফিনেরই জয় হইল। কর্ত্তৃপক্ষ আবার ভাবিত হইয়া পড়িলেন; শেষে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনরায় নির্ব্বাসিত করাই স্থির করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন তাহাতে খণ্ডিত হইল না। সিনফিন শান্তি সমিতির (Peace Conference) নিকট বিচার-ভার দিবার জন্য ডাবলিনে এক সভা আহ্বান করিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একটা জোড়াতাড়া হোমরুল খাড়া করিয়া বলিলেন—'হয় ইহা গ্রহণ কর; নয় সমগ্র আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া তাহাদের মনোমত একটা প্রস্তাব খাড়া করুক।' সিনফিন দলকে এই প্রতিনিধি-সভায় পাঁচ জন মাত্র সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইল, অথচ আয়র্লণ্ডে তখন সিনফিন মতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক;—কাজে কাজেই সিনফিন এই সভায় যোগদান করিল না। এদিকে আবার নূতন করিয়া "আইরিস ভলাণ্টিয়ারের" দল সরকারী পক্ষ হইতে সহস্র বাধা সত্ত্বেও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'ন্যাসনালিষ্ট' ভলাণ্টিয়ারদের নিকট হইতেও অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় তাহারাও মনে মনে ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধী হইয়া উঠিল।

সরকারী প্রতিনিধি-সভার বিচার-বিতণ্ডা একদিকে চলিতে লাগিল, অপরদিকে সিনফিনদল আপনাদের এক সভা আহ্বান করিয়া ডি, ভ্যালেরাকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করিলেন। ডি, ভ্যালেরা প্রথমে প্রজাতন্ত্রবাদী বিপ্লবপন্থী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সিনফিনের সভাপতিত্ব-গ্রহণে প্রমাণিত হইল যে, সিনফিনদল ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্রবাদী হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিপ্লবপন্থীরাও বিদ্রোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সিনফিন-মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছেন। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান সিনফিনের আরম্ভ। উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ডি, ভ্যালেরা বলিয়াছেন—"সিনফিন অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আয়র্লণ্ডকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। সে চেষ্টা সফল হইবার পর সমস্ত আইরিস জাতি মিলিয়া যে শাসন-প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে। ইংলণ্ড বা অন্য কোনও বিদেশী শক্তির আয়র্লণ্ডের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার শক্তি তাহারা স্বীকার করিবে না; ইংলণ্ড সৈন্যবল বা অন্য কোনও শক্তি দ্বারা আয়র্লণ্ডকে পরাধীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, তাহারা যে কোনও উপায়ে হোক সে শক্তির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে; আয়র্লণ্ডের জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এক প্রতিনিধি-সভার উপর সমস্ত বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের ভার অর্পিত হইবে।"

পুরাতন সিনফিন হইতে এই নূতন সিনফিন দুই এক বিষয়ে পৃথক। পূর্ব্বে সিনফিন একমাত্র স্বাবলম্বনেরই পক্ষপাতী ছিল; এখন ইহা শান্তি-সভা প্রভৃতি বহিঃশক্তিরও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হইল না। পূর্ব্বে ইহা অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী ছিল না, এখন সে কথার উপর আর বড় একটা জোর দিল না।

সিনফিন দল যখন ক্রমে দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য খাদ্যদ্রব্য দেশের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিতে লাগিল, তখন সাধারণ লোকে উহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ আয়র্লণ্ডের শাসন-প্রণালী স্থির করিবার জন্য যে প্রতিনিধি-সভার (Convention) আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা পরিণামে নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইলেও, যখন আইরিসদিগকে বাধ্য করিয়া সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার কথা উঠিল, তখন আয়র্লণ্ডের সর্ব্বসাধারণ তাহাতে বাধা দিবার জন্য সিনফিনের সহিত যোগ দিল। ফলে ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের মানসিক বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। সেইদিন হইতে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছে, আজও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

—:০:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভূমিকা

বাংলায় বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত যুবক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সরকারী কাগজপত্রে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহাদিগকে 'আনারকিষ্ট' (anarchist) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সর্ব্ববিধ শাসনপ্রণালীর বিরোধী, ইংরাজীতে তাহাদিগকেই আনারকিষ্ট বলে। এরূপ কোনও দল ভারতবর্ষে আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। যে সমস্ত পরাধীন দেশে লোকমত প্রভাবে বিদেশীয় শাসনযন্ত্র পরিবাত্তত করিবার উপায় নাই, সে সমস্ত দেশে স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়া উঠিলে গুপ্ত সভা-সমিতির সৃষ্টি অনিবার্য্য! ইটালী, পোলাণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত কারণে বিপ্লবপন্থীদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেই কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই এখানেও বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছিল। আমাদের শাসকসম্প্রদায়ও সে কথা বেশ ভাল করিয়া জানেন বলিয়াই তাড়াতাড়ি রিফর্ম বিলের শান্তিজল ছিটাইয়া দিয়া সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল কি ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য যে, এদেশের বিপ্লবপন্থীরা আনারকিষ্ট নহেন! বিপ্লব-সমিতিগুলির ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। সে কথা প্রমাণ করিবার জন্য অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে সে বিস্মৃত ইতিহাস আপাততঃ টানিয়া বাহির করিবার আবশ্যকতা নাই। বাঙালীদের আত্মসম্মানবোধ রাজপুরুষদিগের ব্যবহারে প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল বলিয়াই, ইংরাজাধিকারে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই, বাঙালীরা তাহাদের ক্ষীণ প্রাণের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া ইংরাজের দুর্জ্জয় শক্তি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত সভা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড কর্জ্জনকৃত অপমানে যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি। দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনা-স্রোত বহিতেছিল, তাহাই আধার বিশেষে ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লবকেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। 'যুগান্তর' ছিল ঐরূপ একটি বিপ্লবকেন্দ্রের মুখপত্র। ঐ সংবাদপত্রের পরিচালকগণের সংস্রবে আসিয়াই আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়াছিলাম।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তখন শীতকাল। আসর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় সবে মাত্র 'সন্ধ্যা'য় চাটিম চাটিম বুলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার জন্য বরোদার চাকরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। বিপিনবাবুও পুরাতন কংগ্রেসী দল হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন; সারা দেশটা যেন নূতনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। আমি তখন সবেমাত্র সাধুগিরির খোলস ছাড়িয়া জোর করিয়া মাষ্টারীতে মনটা বসাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় এক সংখ্যা "বন্দেমাতরম্" হঠাৎ একদিন হাতে আসিয়া পড়িল। ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করিতে করিতে লেখক বলিয়াছেন—"We want absolute autonomy free from British control." আজকাল এ কথাটা হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে খুব সস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালের বড় বড় রাজনৈতিক পাণ্ডারাও মুখ ফুটিয়া কথাটা বাহির করিতেন না। একেবারে ছাপার অক্ষরে ঐ কথাগুলা দেখিয়া আমার মনটা তড়াং করিয়া নাচিয়া উঠিল। সেকালের নেতারা ভাজিতেন ঝিঙ্গা, আর বলিতেন পটোল। যখন Self-Government সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার পিছনে colonial কথাটা জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুইই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাততালিও পড়িত।

কিন্তু আমার কেমন পোড়া অদৃষ্টের লিখন! ঐ ছাপার অক্ষরগুলা ভোঁ ভোঁ করিয়া কানের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিল। মনটা কেবল থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—"আরে ওঠ, ওঠ, সময় যে হয়ে গেল।" সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। শুইয়া শুইয়া স্থির করিলাম, এ সব কথার মূলে কিছু আছে কিনা, খোঁজ লইতে হইবে। সত্যই কি এর সবটা শুধু বচনং খোঁজ লইতে বাহির হইয়া যে সমস্ত অদ্ভুত গুজব শুনিলাম, তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। পাহাড়ের কোন্ নিভৃত গহ্বরে বসিয়া নাকি লাখ দুই নাগা সৈন্য তলোয়ার সানাইতেছে, হাতিয়ার সব মজুত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশও নাকি প্রস্তুত, শুধু বাংলা পিছাইয়া আছে বলিয়া তাহারা কাজে নামিতে একটু বিলম্ব করিতেছে। হবেও বা!

সেই সময় কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" কাগজখানা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকে কানাকানি করে যে, যুগান্তরের আড্ডাটা নাকি একটা বিপ্লবের কেন্দ্র। বিপ্লবের নাম শুনিয়াই অনেক যুগের সঞ্চিত রোমান্স আমার মনের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া উঠিল; ফ্রান্সের রবসপিয়ের হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দমঠের জীবানন্দ পর্য্যন্ত সবাই এক একবার মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল। এ দেশে যাহারা বিপ্লব আনিবে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যাঁহারা মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেগুলি কি রকমের জীব, তাহা দেখিবার বড় আগ্রহ হইল। আমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আর পাঁচজনে মিলিয়া রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়া লইবে, এতো আর সহ্য করা যায় না।

কলিকাতার যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম, ৩।৪টি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলি-গোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এবিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত। কাল না হয় দুদিন পরে যুগান্তর আফিসটা যে গবর্ণমেণ্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে, সেবিষয়ে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। কথায়, বার্ত্তায়, আভাষে, ইঙ্গিতে এই ধারণাটা আমার মনে আসিয়া পড়িল

যে, এসবের পশ্চাতে একটা দেশব্যাপী বড় রকমের কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

দুই চারিদিন আনাগোনা করিতে করিতে ক্রমে "যুগান্তরের" কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। দেখিলাম—প্রায় সকলেই জাতকাট ভবঘুরে বটে। দেবব্রত (ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বি-এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছিলেন; হঠাৎ ভারত উদ্ধার হয়-হয় দেখিয়া, আইন ছাড়িয়া "যুগান্তরের" সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভুপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিণী-বিশেষ। যুগান্তরের ম্যানেজারি হইতে আরম্ভ করিয়া, ঘর-সংসারের অনেক কাজের ভারই তাহার উপর। বারীন্দ্রের সহিত আলাপ হইতে একটু বিলম্ব হইল, কেন না সে তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। পরে তাহার হাড় ক'খানার উপর চামড়া জড়ানো শীর্ণ শরীর, মাঠের মত কপাল, লম্বা লম্বা বড় বড় চোখ, আর খুব মোটা একটা নাক দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, কল্পনা ও ভাবের আবেগে যাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে, বারীন্দ্র তাহাদেরই একজন। অঙ্কশাস্ত্রের জ্বালায় কলেজ ছাড়িয়া অবধি সারেঙ্গ বাজাইয়া, কবিতা লিখিয়া, পাটনায় চায়ের দোকান খুলিয়া, এযাবৎ অনেক কীর্ত্তিই সে করিয়াছে। বড় লোকের ছেলে হইয়াও বিধাতার কৃপায় দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার ৫০৲ টাকা পুঁজি লইয়া যুগান্তর চালাইতে বসিয়াছে। দেখা হইবার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবেই হইবে।

ভারত-উদ্ধারের এমন সুযোগ ত আর ছাড়া চলে না! আমিও বাসা হইতে পুঁটলী-পাঁটলা গুটাইয়া যুগান্তর আফিসে আসিয়া বসিলাম।

কিছুদিন পরে দেবব্রত 'নবশক্তি' আফিসে চলিয়া গেল। ভুপেনও পূর্ব্ববঙ্গে ঘুরিতে বাহির হইল। সুতরাং 'যুগান্তর' সম্পাদনের ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। আমিও "কেষ্ট বিষ্টু"দের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইলাম।

বাংলার সে একটা অপূর্ব্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" কোন্ দৈব স্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগযুগান্তের আঁধার যেন মুছিয়া দিয়াছিল। "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"—রবীন্দ্র যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি। সত্যসত্যই তখন একটা জলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য; ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেসিনগান—ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজীর রাজ্য, এ তাসের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম; মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

হু হু করিয়া দিন দিন 'যুগান্তরে'র গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল। ছোট প্রেসে ত আর অত কাগজ ছাপা চলে না। লুকাইয়া অন্য প্রেসে ছাপান ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা বাক্সে 'যুগান্তর' বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখন কাহাকেও দেখি নাই। কত টাকা আসিত আর কত টাকা খরচ হইত, তাহার হিসাবও কেহ লইত না। যুগান্তর আফিসে অনেকগুলি ছেলেও মাঝে মাঝে আসিয়া খাইত ও থাকিত। তাহাদের বাড়ী কোথায়, তাহারা কি করে, এসংবাদ বড় কেহ রাখিত না। এইটুকু শুধু জানিতাম যে, তাহারা "স্বদেশী"; সুতরাং আমাদের আত্মীয়।

বাহিরে যাইবার সময় বাড়ীর সুমুখে দুই একটা লোককে প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম, আমাদের দেখিলে তাহারা কেহ আকাশ পানে চাহিত, কেহ সম্মুখের চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িত, কেহ বা শীস দিতে দিতে চলিয়া যাইত। শুনিতাম—সেগুলি নাকি সি-আই-ডির অনুগৃহীত জীব। সি—আই—ডি! ফুঃ। কে কার কড়ি ধারে?

দিন এইরূপে কাটিতে লাগিল। একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, যুগান্তরে যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে, তাহা রাজদ্রোহ-সূচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির! আইন কিরে, বাবা? আমরা

ভারতের ভাবী সম্রাট, গবর্ণমেণ্ট-হাউসের উত্তরাধিকারী—আমাদের আইন দেখায় কেটা ?

একদিন কিন্তু সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল। ইন্সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ী জনকতক কন্সটেবল লইয়া যুগান্তর আফিসে খানাতল্লাসী করিতে আসিলেন। যুগান্তরের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সম্পাদক কে ? এ বলে 'আমি', ও বলে 'আমি'। শেষে ভূপেনই একটু মোটা-সোটা ও তাহার বেশ মানানসই রকমের দাড়ি আছে বলিয়া, তাহাকেই সম্পাদক বলিয়া স্থির করা হইল। ভূপেন যখন আদালতে সাফাই গাহিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল না, তখন দেশে ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এ কাণ্ডটা নূতন আজগুবী কাণ্ড বটে! ভূপেন যাহাতে ত্রুটি স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি পায়, সরকারী পক্ষ হইতে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভূপেন রাজী হইল না। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে ঠেলিয়া দিলেন।

এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের মামলার ধূম লাগিয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা সুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিণ্টার বসন্তকুমারকে জেলে যাইতে হইল।

একে একে এরূপ অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল—"এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে।" এই সঙ্কল্প হইতেই মাণিকতলার বাগানের সৃষ্টি।

মাণিকতলায় বারীন্দ্রদের একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে, একটা নূতন দলের উপর 'যুগান্তরে'র ভার দিয়া, যুগান্তর আফিসের জনকতক বাছাই বাছাই ছেলে লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে। যাহাদের সংসারের টান নাই, অথবা টান থাকিলেও অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিতে পারে, এরূপ ছেলেই লইতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন লাভ না হইলে এরূপ চরিত্র প্রায় গড়িয়া উঠে না; সেই জন্য স্থির হইল যে, বাগানে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তখন সাধুগিরির ফেরত আসামী; সুতরাং পুঁথিগত মামুলী ধর্ম্মশিক্ষার উপর আমার যে বড় একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা নয়। বারীন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা! গেরুয়ার উপর তাহার তখন অসীম ভক্তি। একজন ভাল সাধু-সন্ন্যাসীকে ধরিয়া আমাদের দলে পুরিতে পারিলে তাহার শিক্ষায় দীক্ষায় যে ছেলেদের ধর্ম্মজীবনটা গড়িয়া উঠিবে, এই আশায় সে সাধু খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িল। কি করিব, সঙ্গে আমিও চলিলাম। কিন্তু যাই কোথা? আমাদের পাল্লায় পড়িবার জন্য কোথায় সাধু বসিয়া আছে? বরোদায় থাকিবার সময় বারীন্দ্র শুনিয়াছিল যে, নর্ম্মদার ধারে কে নাকি একজন ভাল সাধু আছে। অতএব চলো সেইখানে। তাহাই হইল। কিন্তু যে আশা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা মিটিল না। সাধুজী তাঁহার কাটা জিহ্বাটী উল্টাইয়া তালুতে লাগাইয়া দমবন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন। শুনিলাম —তিনি নাকি ঐরূপে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত সুধাধারা পান করিয়া থাকেন। বিশ পঞ্চাশ রকমের আসনও তিনি আমাদের বাৎলাইয়া দিলেন, রকম বেরকমের ধৌতি বস্তির কসরৎও দেখাইতে ভুলিলেন না। কিন্তু আমাদের পোড়া মন তাহাতে উঠিল না।

দুই তিন দিন বেশ মোটা মোটা ঘৃতসিক্ত রুটী ও অড়হর ডাল ধ্বংস করিয়া আমরা তাঁহার আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বারীন্দ্র কিন্তু নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নয়। আমায় বলিল— "দেখ, গিরিডির কাছে কোথায় একজন সাধু আছেন শুনেছি। তুমি একবার সেইখানে গিয়ে খোঁজ কর, আর রাস্তায় কাশীতেও একবার ঢুঁ মেরে যেয়ো। আমি এই অঞ্চলে আরও দিন কতক দেখি।" আমি 'তথাস্তু' বলিয়া গিরিডি যাত্রার নাম করিয়া সটান মাণিকতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দিন কয়েক পরে শুনিলাম—বারীন আর একটী সাধুকে পাকড়াও করিয়াছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ঝান্সীর রাণীর পক্ষ হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তারপর সাধু হইয়া চুপচাপ এতদিন সাধন-ভজন করিতেছিলেন। বারীন্দ্রের সংস্পর্শে আবার সেই বহুদিনের নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বারীন্দ্র তাহাকে বলিল—"ঠাকুর, তুমি আমায় একখানা গেরুয়া কাপড় আর কানে যা হয় একটা মন্তর ফুঁকে দাও; বাকি সবটা আমিই করে নেব।" সাধু বারীনকে বড় ভালবাসিতেন; তিনি তাহাতেই রাজী হইলেন। বারীন সাধুর নিকট যথাশাস্ত্র মন্ত্রদীক্ষা লইল। কিছুদিন পরে বারীনকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"সাধু কি মন্ত্র দিলেন?" বারীন্দ্র বলিল—"ভুলে মেরে দিয়েছি।" যাই হোক, বারীন্দ্র তাঁহাকে লইয়া মধ্যভারতের কোনও তীর্থস্থানে একটা আশ্রম গড়িবার সঙ্কল্প করে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জলাতঙ্করোগে বাবাজীর মৃত্যু হওয়ায় সে সঙ্কল্প আর কাজে পরিণত হইল না।

কিছুদিন পরে বারীন্দ্র আর একজন সাধুর নিকট হইতে সাধন লইয়া দেশে ফিরিল। ঐ সাধুটী মধ্যভারত ও বোম্বাই অঞ্চলে একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে তাঁহাকে আমিও দেখিয়াছি। তিনি যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বারীন্দ্র ফিরিয়া আসিবার পর একটা আশ্রম গড়িবার ঝোঁক আমাদের ঘাড়ে খুব ভাল করিয়াই চাপিল। কিন্তু মনের মত জায়গা মিলিল না। শেষে স্থির হইল, যতদিন না ভাল জায়গা পাওয়া যায়, ততদিন মাণিকতলার বাগানেই আশ্রমের কাজ চলুক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাণিকতলায় বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল, তখন সেখানে চার পাঁচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটীও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা বাপদের কাছ থেকেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, দুবেলা দু'মুঠো ভাত ত চাই। দু একজন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, আর স্থির হইল যে, বাগানে শাকসব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকী খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম, কাঁঠালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলা জমা দিয়াও কোন্ না দু-দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত সুবিধা হইল এই যে, বারীন তখন ঘোরতর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশ বা পেঁয়াজের খোসাটী পর্য্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল, লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং খরচ কতকটা কমিয়া গেল।

উপার্জ্জনের আরও একটা পথ বারীন্দ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—হাঁস ও মুরগী রাখা। কতকগুলা হাঁস ও মুরগী কেনাও হইয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল যে, তাহাদের ডিম ত পাওয়াই যায় না; অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। কতক শেয়ালে খায়, কতক বা লোকে চুরি করে। অধিকন্তু আমাদের পাড়াপড়শীদের আমাদের বাগানে মুরগী রাখা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। একদিন একজন হাড়ি তাড়ি খাইয়া আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া মুরগী পালনের যে রকম ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া গেল, তাহাতে তাড়াতাড়ি মুরগী কয়টাকে বেচিয়া ফেলা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর রহিল না। হাড়ি বাবুটীর নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তা' না হইলে ব্রাহ্মণসভায় লিখিয়া তাঁহাকে একটা উপাধি জোগাড় করিয়া দিতাম।

আমাদের বাজে খরচের মধ্যে ছিল চা। ওটা না থাকিলে সংসার নিতান্তই ফিকে ফিকে, অনিত্য বলিয়া মনে হইত। বিশেষতঃ বারীন চা বানাইতে সিদ্ধহস্ত। তাহার হাতের গোলাপী চা, ভাঙ্গা নারিকেলের মালায় ঢালিয়া চক্ষু বুজিয়া তারিফ করিতে করিতে খাইবার সময় মনে হইত যে, ভারত উদ্ধারের যে কয়টা দিন বাকি আছে, সে কয়টা দিন যেন চা খাইয়াই কাটাইয়া দিতে পারা যায়।

প্রথম দিনেই বারীন আইন জাহির করিয়া দিল যে, নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। এক আধ জন ত রাঁধিবার ভয়ে বাগান ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু তা বলিয়া বাগানের ভিতর ত আর বাহিরের লোককে ঢুকিতে দেওয়া যায় না—বিশেষতঃ পয়সার অভাব। কিন্তু চিরদিন বাড়ীতে মায়ের হাতের আর মেসে ঠাকুরের হাতের রান্না খাইয়া আসিয়াছি। সাধুগিরির সময় ভিক্ষা করিয়া যা খাইয়াছি, তাও পরের হাতের রান্না। আজ এ আবার কি বিপদ! পালা করিয়া প্রত্যহ দুই জনের উপর রান্নার ভার পড়িল। সুতরাং আমাকেও মাঝে মাঝে রন্ধন-বিদ্যার নিগূঢ় রহস্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেও ও-বিদ্যাটা কখনও বড় বেশী আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

থালা, ঘটী, বাটীর নাম গন্ধ বাগানে বড় বেশী ছিল না। প্রত্যেকের এক একটা নারিকেল-মালা আর একখানা করিয়া মাটীর সানকি ছিল; তাহাই আহারাদির পর ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হইত। কাপড় সকলেই নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচিয়া লইত; যাহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাহারা পরের কাচা কাপড় পরিয়াই কাজ চালাইয়া দিত।

ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০ জন ছেলে আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে ৫।৭ জন অধিকাংশ সময় কাজকর্ম্ম লইয়া থাকিত আর যাহারা বয়সে একটু ছোট, তাহারা প্রধানতঃ পড়াশুনা করিত। পড়াশুনার মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চ্চা, আর কর্ম্মের মধ্যে বিপ্লবের আয়োজন। অনেক রকম ছেলে আসিয়া আমাদের কাছে জুটিয়াছিল। কলেজী বিদ্যার হিসাবে কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা মূর্খ; কিন্তু এখন মনে হয় যে, অনন্যসাধারণ একটা কিছু সকলেরই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয়দের কাছে যেসব ছেলে পড়া মুখস্থ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া গণ্য, অনেক সময় দেখিয়াছি তাহারা মানুষ হিসাবে "ভাল ছেলেদের" চেয়ে ঢের বেশী ভাল। ইংরাজীতে যাহাকে Adventurous বলে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে সেরকম ছেলের স্থান নাই। ঘ্যান ঘ্যান করিয়া পড়া মুখস্থ করা তাহাদের পোষায় না; কাজে কাজেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যাজ্যপুত্র; কিন্তু যেখানে জীবন মরণ লইয়া খেলা, যেখানে আমাদের ভাবী ডেপুটী-মার্কা ছেলেরা এক পা আগাইয়া গিয়া দশ পা পিছাইয়া আসে, সেখানে ঐ "দস্যি" "বয়াটে" "লক্ষীছাড়া" ছেলেগুলোই হাসিতে হাসিতে কাজ হাসিল করে।

বাগানের কাজকর্ম্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেবব্রতের তখন বাগানের কাজর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু ছিল না; কিন্তু তাহার মনটা তীর্থস্থানের সাধু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কাজকর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না।

প্রথমেই গিয়া এলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম। বাজারের পুরি কিনিয়া খাই, আর লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকি। মাঝে মাঝে এক একবার উঠিয়া এ সাধু ও সাধুর কাছে ঢু মারিয়া বেড়াই। মাঝে একজন স্থানীয় বন্ধু জুটিয়া আমাদের 'ঝুসি' দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম—গঙ্গার ধারে শিয়ালের মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া দুই চারিজন সাধু সেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছেন। এক জায়গায় দেখিলাম, একটী সিন্দুর মাখান রামমূর্ত্তি; সম্মুখে ভক্তপ্রদত্ত চার পাঁচটি পয়সা, আর পাশেই একটী ছাইমাখা সাধু হাঁপানীতে ধুঁকিতেছে। শুনিলাম—মাটির নীচে সাধুদের সাধন ভজনের জন্য অনেক-গুলি ঘর আছে; কিন্তু আমাদের বন্ধুটীর নিকট সাধনের যে রকম বীভৎস বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে দেবব্রতেরও সাধুদর্শনের আগ্রহ অনেকটা কমিয়া গেল।

প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্ম্মশালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম। মাঠের মাঝখানে একখানি ছোট কুঁড়েঘর বাঁধিয়া একজন জটাজুটধারী সাধু সেখানে থাকেন। প্রণাম করিয়া তাহার কাছে বসিবামাত্র তাহার মুখ হইতে অনর্গল তত্ত্বকথা ও থুথু সমান বেগে ছুটিতে লাগিল। বাবাজী আহারাদির কোনও চেষ্টা করেন না; তবে তাঁহার কাছে ভক্তেরা যা প্রণামী দিয়া যায়, তাঁহার একজন গোয়ালা ভক্ত তাহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে সাধুকে দুধসাগু তৈয়ার করিয়া দেয়। ঐ দুধসাগু খাইয়াই তিনি জীবনধারণ করেন। থুথু ও তত্ত্বকথা সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, এক গেরুয়া পরিহিতা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী আমাদের কম্বল দখল করিয়া বসিয়া আছেন। দেবব্রত ব্রহ্মচারী মানুষ, স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে না; সে ত ভৈরবীকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। এই সন্ধ্যার সময় তাহার পর্ব্বতপ্রমাণ বিপুল দেহভার লইয়া বেচারা কম্বল ছাড়িয়া যায়ই বা কোথায়? ভৈরবীর আপাদ-মস্তক দেখিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

ভৈরবী—"আমি সাধুসঙ্গ করতে চাই।"

দেবব্রত—"সাধুসঙ্গ করতে চান ত আমাদের কাছে কেন? দেখছেন না আমরা বাবুলোক; আমাদের পরণে ধুতি, চোখে সোনার চশমা?"

ভৈরবী—"তা হোক, আমি জানি—আপনারা ছদ্মবেশী সাধু।"

আমরা অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে, আমরা ছদ্মবেশীও নই, সাধুও নই, কিন্তু ভৈরবী ঠাকরুণ

সেখান হইতে নড়িবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। শেষে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর দেবব্রতই রণে ভঙ্গ দিয়া সে রাত্রি এক গাছতলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিল।

কিন্তু ভৈরবী হইলে কি হয়, বাঙ্গালীর মেয়েত বটে! সকাল বেলা ঘুরিয়া আসিয়া দেখি, কোথা হইতে চাল ডাল যোগাড় করিয়া ভৈরবী রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। বেলা দশটা না বাজিতে বাজিতে আমাদের জন্য খিচুড়ী প্রস্তুত। কামিনী-কাঞ্চনে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, কিন্তু কামিনীর রান্না খিচুড়ী সম্বন্ধে শাস্ত্রের ত কোন নিষেধ নাই; সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে সেই গরম গরম খিচুড়ী গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে তবে ভৈরবী আহার করিতে বসিলেন। দেখিলাম, বাঙালীর মেয়ের স্নেহক্ষুধাতুর প্রাণটুকু গৈরিকের ভিতর দিয়াও ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকূটে আসিলাম। ষ্টেশনে নামিতে না নামিতে ছোট বড় মাঝারি অনেক রকমের পাণ্ডা আমাদের উপর আক্রমণ করিল। আমরা যে তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে চিত্রকূটে আসি নাই, একথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইলাম। কিন্তু তাহারা ছিনেজোঁকের মত আমাদের পিছনে লাগিয়াই রহিল। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় আমরা পাণ্ডাদের আস্তানা ছাড়িয়া নদীর ধারে একটা পোড়ো ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িলাম। কিন্তু পাণ্ডাদের অদ্ভুত অধ্যবসায়। পাঁচ সাত জন আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। তীর্থে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করে না—এ আবার কেমন তীর্থযাত্রী? তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর গালি দিতে দিতে একে একে সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল—একটী ১০।১২ বছরের ছোট ছেলে নাছোড়বান্দা। সে তখনও বক্তৃতা চালাইতে লাগিল। একখানি হাত আপনার পেটের উপর রাখিয়া, একখানি হাত দেবব্রতের মুখের কাছে ঘুরাইয়া বলিল—"দেখ বাবু—যে জীবাত্মা, সেই পরমাত্মা। আমাকে খাওয়ালেই পরমাত্মার সেবা করা হবে।" পেটের জ্বালার সঙ্গে পরমার্থের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া দেবব্রত হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"দেখ, তোর কথাটার দাম লাখ টাকা। তবে আমার কাছে এখন অত টাকা নেই বলে তোকে এযাত্রা একটা পয়সা নিয়েই বিদায় হতে হবে।" জীবরূপী পরমাত্মা তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল।

যে ঠাকুরবাড়ীতে আমরা পড়িয়া রহিলাম, তাহার চারিদিকে গাছে গাছে বানর ছাড়া আর কোন জীবের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না। সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে রেওয়ার রাজা বৈষ্ণব সাধুদের জন্য একটা মঠ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে "আচারী" ও "বৈরাগী" প্রধানতঃ এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধুরা থাকেন। তাঁহাদের দুই একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইত।

একদিন সকাল বেলা বসিয়া আছি, এমন সময় সেখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তিনি যুবা পুরুষ; বয়স আন্দাজ ৩২।৩৩; পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার জন্মস্থান গুজরাত; তাঁহার গুরুর আদেশ অনুযায়ী এই অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। আমাদের যে রাজনীতির সহিত কোনোও সম্পর্ক আছে, তাহা তিনি কি করিয়া টের পাইলেন, ভগবানই জানেন। দুই একটা কথার পরই তিনি আমাদের বলিলেন—"দেখ, তোমরা যে মনে কর এ অঞ্চলের লোক দেশের অবস্থা বুঝে না—সেটা মিথ্যা। সময় আসিলে দেখিবে, ইহারাও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইয়া আছে।" আমরা কথাটা চুপ করিয়া শুনিলাম—দেখি শ্রাদ্ধ কোন্ দিকে গড়ায়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখ, তোমাদের একটা কথা বলিয়া রাখি। বিশ্বাস কর ত কথাটা খুবই বড়, আর না করত বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়া দিও। জগতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভগবান আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন; তবে এখনও প্রকট হন নাই। তাঁহাকে নরদেহে টানিয়া আনিবার জন্যই যোগীদের সাধনা। সে সাধনা এবার সিদ্ধ হইবে। ভারতের দুঃখ তখনই ঘুচিবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এসংবাদ জানিলেন কিরূপে?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে হনুমানজীর সাধন করিতাম। অনেক সাধন করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় একবার নিরাশ হইয়া দেহত্যাগ করিতে চাই। সেই সময় হনুমানজী আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া এই আশার সংবাদ আমাকে দিয়া যান।" ব্যাপারটা সন্ন্যাসীর মাথার খেয়াল, কি ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে, তাহা ভাগবানই বলিতে পারেন।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আমরা বিদায় লইয়া একবার অমরকণ্টক যাইব স্থির করিলাম। বিন্ধ্য

পর্ব্বতের যেখান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি, অমরকণ্টক সেইখানে। কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া কোথা কোথা দিয়া যে সেখানে গিয়াছিলাম, এই দীর্ঘকাল পরে তার সবই ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু মনে আছে যে, রাস্তায় একজন আসামী ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হইয়া দিন দুই বেশ চব্যচোষ্য আহার করিয়াছিলাম। বহুদূর হাঁটিয়া ত' বিন্ধ্য পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতটা কিন্তু আমাদের ভাল লাগিল না। কেমন নেড়া-নেড়া মনে হইতে লাগিল। শৃঙ্গ-সম্বলিত হিমালয়ের বেশ একটা প্রাণকাড়া সৌন্দর্য্য আছে; বিন্ধ্যাচলের তাহার নামগন্ধ নাই। তিন চার দিন চড়াই-উৎরাই-এর পর যখন অমরকণ্টকে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম উহা আশ্রমের উপযুক্ত স্থান একেবারেই নয়। চারিদিকে শুধু বন-জঙ্গল আর মাঝখানে একটা ভাঙ্গা ধর্ম্মশালায় জনকয়েক রামায়ৎ সাধু বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। যেখানে পাহাড় হইতে বুদ্ বুদ্ করিয়া নর্ম্মদার ধারা বাহির হইতেছে, সেখানে নর্ম্মদা দেবীর একটী ছোট মন্দির আছে; তাহাও সংস্কারাভাবে নিতান্তই জীর্ণ। অমরকণ্টক এককালে যে বৌদ্ধদিগের তীর্থ ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও সেখানে বর্ত্তমান। ব্রহ্মদেশীয় পাগোদার মত অনেকগুলি পুরাতন কাঠের মন্দির সেখানে রহিয়াছে। কোন কোনটীর মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা অন্য সম্প্রদায়ের সাধুরা বুদ্ধমূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া রাম বা কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। চারিদিকে শালবন,—সেখানে বাঘের দৌরাত্ম্যও যথেষ্ট। আশপাশের গ্রাম হইতে গরু ছাগল প্রায়ই বাঘে লইয়া যায়। যখন দুই চারজন মানুষকে লইয়া বাঘে টানাটানি করে, তখন রেওয়া রাজ্যের সিপাহীরা একশ বৎসর আগেকার মুঙ্গেরী বন্দুক লইয়া গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করে। সাধারণ লোকেদেরও বাঘের হাতে মরা সহিয়া গিয়াছে। জঙ্গলে ঢুকিবার আগে তাহারা বাঘের দেবতার পূজা দেয়, তাহার পরেও যদি বাঘে ধরে ত সেটাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সাধুদেরও সেই অবস্থা; তবে তাঁহারা নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে বাহির হইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া বাহির হন। এই নর্ম্মদা-পরিক্রম আমার বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। অমরকণ্টক হইতে আরম্ভ করিয়া পদব্রজে নর্ম্মদার ধারে ধারে গুজরাত পর্য্যন্ত যাইতে ও গুজরাত হইতে পুনরায় নর্ম্মদার অপর পার ধরিয়া অমরকণ্টকে ফিরিয়া আসিতে চার পাঁচ বৎসর লাগে। কত সাধুই যে এই কাজ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কোন স্ত্রীলোককে গণ্ডি কাটিতে কাটিতে নর্ম্মদা পরিক্রম করিতে দেখিয়াছি। ফল কি হয় জানি না। তবে এইটুকু মনে বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার শতাংশের একাংশ পাইলেও আমরা মানুষ হইয়া যাইতাম।

অমরকণ্টকের চারিধারে দশ বারো ক্রোশ পর্য্যন্ত বনে জঙ্গলে ঘুরিলাম। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে চণ্ডাল-পল্লীর যে রকম বিবরণ পাওয়া যায়, সেরূপ কতকগুলি পল্লীও দেখিলাম। সেখানকার পালিত কুকুরগুলি প্রায় একক্রোশ আমাদের তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। নদীর ধার ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে এক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ ও সদ্য-নিঃসৃত রক্তচিহ্নও দেখিলাম। ভবিষ্যতে আন্দামানে যাইতে হইবে, সে কথা যদি তখন জানিতাম, তাহা হইলে ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা না করিয়া বাঘের আশায় সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম! কিন্তু সে যাত্রা বাঘও দেখা দিল না, আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের আশ্রমের উপযোগী স্থানও কোথাও মিলিল না। পাহাড় হইতে অগত্যা নামিতে হইল। নামিয়াই দেখিলাম—বারীনের চিঠি বলিতেছে "শীঘ্র ফিরিয়া এস"!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বারীনের চিঠি পাইয়াই তল্পি-তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম। তল্পির মধ্যে লোটা কম্বল আর তল্পার মধ্যে একগাছা মোটা লাঠি। সুতরাং বেশী দেরি হইবার কোনও কারণ ছিল না। বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম একেবারে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে, উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে একজন। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসেল সাহেব বাঙ্গালীর ছেলেদের গালি দিয়াছিল বলিয়া, উল্লাসকর একপাটী ছেঁড়া চটীজুতা বগলে পুরিয়া কলেজে লইয়া যায় এবং রসেল সাহেবের পিঠে তাহা সজোরে বখ্শিস দিয়া কলেজের মুখদর্শন বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার পর কিছুদিন বোম্বাই-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঘুরিয়া আসিয়া, দেশ গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে সময়ে কিংসফোর্ড

সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিসের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশসুদ্ধ লোক হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—"নাঃ, এ আর চলে না। ক' বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।" তথাস্ত। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—যখন সাহেবদের মধ্যে ছোটলাট আণ্ড্রু ফ্রেজারের মাথাটাই সবচেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে করা দরকার। কিন্তু লাট-সাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া ত সোজা কথা নয়। ডিনামাইট কার্ট্রিজ লাটসাহেবের গাড়ীর তলায় রাখিয়া দিলে কাজ চলিতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য চন্দননগর ষ্টেশনের কাছাকাছি রেলের উপর গোটা কয়েক ডিনামাইট কার্ট্রিজ রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উড়া ত দূরের কথা—ট্রেণখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্ট্রিজ ফাটার গোটা দুই ফট্ ফট্ আওয়াজ শূন্যে মিলিয়া গেল, লাট-সাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্য্যন্ত হইল না। দিন কতক পরে শোনা গেল যে, লাট-সাহেব রাঁচি না কোথা হইতে কলিকাতায় স্পেসাল ট্রেণে ফিরিতেছেন। মেদিনীপুরে গিয়া নারায়ণগড় ষ্টেশনের কাছে ঘাঁটী আলগান হইল। বোমা-বিদ্যায় যিনি পণ্ডিত, তিনি পরামর্শ দিলেন যে, রেলের জোড়ের মুখের নীচে মাটির মধ্যে যেন বোমাটা পুঁতিয়া রাখা হয়। তাহার পর সময়মত তাহাতে "স্লো ফিউজ" লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু লাট-সাহেবের এমনি অদৃষ্টের জোর যে, বোমা পুঁতিবার দিন আমাদের ওস্তাদজী পড়িলেন জ্বরে, আর যাঁহারা কেল্লা ফতে করিতে ছুটিলেন, তাঁহারা একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস"। কাজেই বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল, কিন্তু গাড়ী উড়িল না। তবে ইঞ্জিনখানা নাকি জখম হইল; এবং খড়্গপুর ষ্টেশন হইতে আর এব একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাট-সাহেবের স্পেসালকে টানিয়া আনিতে হইল।

এই গাড়ী-ভাঙ্গা পর্ব্ব সাঙ্গ হইবার পর চারিদিকে গুজব রটিয়া গেল যে, রুশিয়া হইতে নাকি এদেশে নিহিলিষ্টের আমদানী হইয়াছে। একদিন আমার আত্মীয় একজন বৃদ্ধ সরকারী কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ইউরোপ হইতে এদেশে নিহিলিষ্টরা আসিয়াছে। ঐ নিহিলিষ্ট দলের একজন যে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নিতান্ত ভাল মানুষটির মত চা খাইতেছে, একথা জানিতে পারিলে বৃদ্ধ কি করিতেন কে জানে? যাই হোক, পুলিসের কর্ত্তারা গাড়ী ভাঙ্গার আসামী ধরিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। সুতরাং আসামীর অভাব হইল না। জনকতক রেলের কুলিকে ধরিয়া চালান করা হইল; তাহারা নাকি পুলিসের কাছে আপনাদের অপরাধও স্বীকার করিল। জজ-সাহেবের বিচারে কাহারও পাঁচ, কাহারও বা দশ বৎসর দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। পুলিসের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যখন লোককে বিনা বিচারে অন্তরীণে রাখা হয়, আর লাট-সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী পেয়াদা পর্য্যন্ত পুলিসকে নির্ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য একেবারে পঞ্চমুখে বক্তৃতা জুড়িয়া দেন, তখন ঐ নারায়ণগড়ের ব্যাপার মনে করিয়া আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

এই সময় পুলিসের ঘোরাঘুরি একটু বাড়িয়াছে দেখিয়া, আমাদের মনে হইল যে, কিছুদিনের জন্য বাগানে বেশী ছেলে রাখিয়া কাজ নাই। উল্লাস প্রভৃতি আমরা চার পাঁচ জন দেশটা একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কলিকাতা হইতে গয়া গিয়া বাঁকীপুর পৌছিবার পর একদল উদাসী সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী সাধুর সহিত মিশিবার সুবিধা হইয়া গেল।

গুরু নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদের মাথায় লম্বা লম্বা জটা; গায়ে ছাই মাখা; কোমরে একটু কম্বলের টুকরা পিতলের শিকল দিয়া আঁটা। গাঁজার কলিকা অষ্ট প্রহর সকলকার হাতে হাতেই ঘুরিতেছে। যাঁহারা ইহাদের দলপতি, দেখিলাম একশো আট ছিলিম গাঁজা না খাইলে তাঁহাদের মুখ দিয়া কথাই বাহির হয় না। তামাকু সেবনও ইঁহারা করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এমনি প্রচণ্ড যে, তাহাতে একটান মারিলেই আমাদের মত পার্থিব জীবের মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। গাঁজা ও তামাকের এই সদ্ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় গুরুগোবিন্দ সিং শিখদের মধ্যে গাঁজা ও তামাক খাওয়া রহিত করিয়া দিয়া যান।

সাধুদের দলে একটী দশ বারো বৎসরের আর একটী পনেরো ষোল বৎসরের বাচ্ছা সাধু দেখিলাম। আমাদের দেশের সৌখিন ছেলেরা যেমন কামাইয়া গোঁফ তোলে, ইহারাও তেমনি চাঁচর কেশে আটা লাগাইয়া জটা বানায়। সংসারটা যে মরীচিকা, তা ইহারা এত অল্প বয়সে কি করিয়া আবিষ্কার

করিয়া ফেলিল, জানিবার জন্য আমার বড় কৌতুহল হইল। শেষে জানিলাম যে, ইহারা গরীবের ছেলে, সাধু হইলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে বলিয়া, ইহাদের মা বাপ ইহাদের সাধুর দলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে।

সাধুরা ভোর বেলা উঠিয়া স্নান করে; অর্থাৎ মাথা ছাড়া আর সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া ফেলে। দশ বারো দিন অন্তর জটা এলাইয়া এক এক বার মাথা ধুইবার পালা আসে। মেয়েদের খোঁপা বাঁধার চেয়ে ইহাদের জটাবাঁধা আরও জটিল ব্যাপার। পাকের পর পাক রাখিয়া চুলের গুছি দিয়া আঁটিয়া কেমন করিয়া সাজাইলে জটাগুলি বেশ চূড়ার মত মানানসই দেখায়, তাহা ঠিক করা একটা দস্তর মত ললিত শিল্পকলা। সকালবেলা স্নানের পর ধুনি জ্বালিয়া সকলে গায়ে ছাই মাখিতে লাগিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্র পাঠও চলে। বেলা আটটা নয়টার সময় 'কড়া-প্রসাদের' বন্দোবস্ত। সত্যপীরের সিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া, মা কালীর প্রসাদ পর্য্যন্ত, এ বয়সে অনেক রকম প্রসাদই খাইয়াছি। কিন্তু এই কড়াপ্রসাদের তুলনা নাই। এটা আমাদের হালুয়ার পাঞ্জাবী সংস্করণ। অনিত্য সংসারে এই ভগবৎ প্রসাদই যে সার বস্তু, তাহা খাইতে না খাইতেই বুঝিতে পারা যায়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-রসে ভিজিয়া মনটা উদাস হইয়া আসে। মধ্যাহ্নে তোফা মোটা মোটা নরম নরম ঘৃতসিক্ত পাঞ্জাবী রুটি ও ডাল—এবং রাত্রিকালেও তদ্বৎ। দেখিতে দেখিতে চেহারাটা বেশ একটু লালাভ হইয়া উঠিল, আর মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল যে, মাণিকতলার বাগানে পোড়া খিচুড়ীর মধ্যে আর ফিরিয়া গিয়া কাজ নাই। এই সাধুদের মধ্যেই জটাজুট রাখিয়া বৈরাগ্য সাধনায় লাগিয়া যাই! কিন্তু কপাল যাহার মন্দ, তাহার এত সুখ সহিবে কেন?

নেপালে 'ধুনি সাহেব' নামে উদাসী সম্প্রদায়ের এক তীর্থস্থান আছে। সাধুরা সেইখানে তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। আমরা স্থির করিলাম তাঁহাদের সহিত রওনা হইব। কিন্তু আমাদের শ্রীঅঙ্গে তখন এক একটা গেরুয়া আলখেল্লা আঁটা; এবং উদাসী সম্প্রদায়ের ঐ গেরুয়াটা সম্বন্ধে বিষম আপত্তি। গেরুয়া পরা সাধুদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা নিজেদের ছাই-মাখা অবধূত-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সে কথাটা আমাদের জানা ছিল না; তাহা হইলে গেরুয়া না পরিয়া খানিকটা ছাই মাখিয়াই বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু এখন উপায়? একজন প্রবীণ সাধু এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিয়া বলিলেন যে, আমরা যদি তাঁহাদের নিকট দীক্ষা লইয়া উদাসীদের সেবকরূপে গণ্য হই, তাহা হইলে গেরুয়ার সঙ্গে একটা রফা করা যাইতে পারে। আমরা ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমাদের দীক্ষা দিবার আয়োজন হইল। একজন সাধু একটা বড় বাটীতে একবাটী চিনি গুলিয়া লইয়া আসিলেন। যিনি মঠাধ্যক্ষ, তিনি ঐ চিনি-গোলায় আপনার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডুবাইয়া আমাদের তাহা খাইতে দিলেন। আমরা চোঁ চোঁ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিবার পর বৃদ্ধ আমাদের "এক ওঙ্কার সৎনাম কর্ত্তাপুরুষ" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করাইয়া আমাদের পিঠে এক একটা চড় মারিয়া বলিয়া দিলেন যে, আজ হইতে আমরা উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। দীক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় আমাদের গেরুয়ার দোষ খণ্ডিত হইল। আমরাও ভক্তি, বিস্ময় ও পুলক ভরে আমাদের নূতন গুরুজীর পদধূলি মাথায় লইয়া কড়া প্রসাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

তীর্থদর্শনে যাত্রা করিলাম আমরা পাঁচ সাতজন বাঙ্গালী, আর ঐ ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন পাঞ্জাবী সাধু। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নামিবার পর যখন হাঁটাপথ আরম্ভ হইল, তখন বুঝিলাম ব্যাপারটা নিতান্ত সুবিধার নহে। কুশী নদীর ধারে ধারে গভীর জঙ্গল; আর তাহার মাঝ দিয়া পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া প্রত্যহ পনেরো ষোল ক্রোশ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আমার পায়ে ত গোদ নামিয়া গেল! কিন্তু সাধুদের ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, কাতরোক্তি নাই। দিনের পর দিন তাহারা রোদ মাথায় করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়াছে।

"তরাই" অতিক্রম করিয়া ক্রমে নেপালে একটা ছোট শহরে আসিয়া পৌছিলাম। জায়গাটার নাম হনুমান নগর। অধিবাসী প্রায় সমস্তই হিন্দুস্থানী; অনেকগুলি মারোয়াড়ীর দোকানও আছে; কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা সমস্তই গুর্খা। শহরের রাস্তাঘাট-গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এবং বড় রাস্তার ধারে ধারে ফুট-পাথও আছে। নেপালকে ছেলেবেলা হইতে আমার একটু "জঙ্গলী" বলিয়া ধারণা ছিল; আজ সে ধারণা অনেকটা গেল। স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছি, এই কথা ভাবিয়া মনটা যেন তোলপাড় করিতে

লাগিল। ভক্তিভাবে নেপালের মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া হাঁ করিয়া খুব খানিকটা স্বাধীন দেশের হাওয়া খাইলাম। দেশটা বাস্তবিকই বড় সুন্দর।

পাড়াগাঁয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম যে, চালাঘরগুলি আমাদের দেশের চালা ঘরের চেয়ে ঢের বেশী সুশ্রী। যে দিকে চাও, যেন সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে, কোথাও একটু বিষাদ বা দৈন্তের ছায়ামাত্র নাই। গ্রামবাসীরা সাধুদের বিশেষ ভক্ত। একদিন চলিতে চলিতে জরাক্রান্ত হইয়া একটা গ্রামের ধারে মাঠের উপর পড়িয়াছিলাম। আমার সঙ্গীটি গ্রামের মধ্যে জল আনিতে গিয়া তাঁহার প্রকাণ্ড লোটা ভরিয়া দুধ লইয়া আসিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত সাধুকে কি জল দেওয়া যায়! শুনিলাম নেপালে সাধুদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ক্ষুধায় কাতর হইলে সাধুরা যে কোন স্থান হইতে আহার্য্য উঠাইয়া লইতে পারেন। তাহার জন্য তাঁহারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হ'ন না।

'ধুনি সাহেবে' উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—চারিদিকে শুধু শাল বন আর শাল বন। একজন উদাসী সাধু—বাবা প্রীতম্ দাস—বহুকাল পূর্ব্বে এইখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া, তাঁহার ধুনি আজ পর্য্যন্ত সেখানে জ্বলিতেছে; এবং সেই ধুনি হইতেই এইস্থানের নামকরণ হইয়াছে। অনেক রকম অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। বাবা প্রীতম্ দাসের দুই শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে আম খাইতে চাহিলে, তিনি সিদ্ধির বলে দুটী শাল গাছে আম ফলাইয়া দিয়াছিলেন; আর সেই অবধি সেই দুটী শাল গাছে নাকি এখনও দুই একটা আম ফলে। গঞ্জিকাসিদ্ধি কি সোজা কথা!

তিন দিন সেই সিদ্ধপুরীতে বাস করিয়া আবার নরলোকে ফিরিয়া আসিলাম। বাঁকীপুরে আমাদের দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজগৃহে আমাদের থাকিবার জন্য মঠ বানাইয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু বাংলাদেশের মাটি আমাদের নাড়ী ধরিয়া টানিতেছিল। আমরা রওনা হইয়া পড়িলাম। ফিরিবার পথে একখানা কাগজে পড়িলাম যে, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে কে গুলি করিয়াছে। বুঝিলাম, এবার শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে।

বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বারীন সেখানে নাই। সে কংগ্রেস উপলক্ষে সুরাত গিয়াছে। সুরাতে যে সেবার একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবে, তা' মেদিনীপুরের কন্‌ফারেন্সে গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দুই একদিন পরে বারীন ফিরিয়া আসিল। সুরাতে নরম, গরম, অতি-গরম, সব রকম নেতারাই একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বারীন যাহা সার-সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা সে এক কথায় বলিয়া দিল—"চোর, বেটারা চোর।"

সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম—

"কেন? কেন? কেন?"

বারীন বলিল—"এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাংলা-দেশের খাতিরে তাঁরা ব'সে আছেন। গিয়ে দেখি না সব ঢুঁ ঢুঁ। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্ত্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। দু'একটা ছেলে একটু আধটু কাজ করবার চেষ্টা করছে, তা'ও কর্ত্তাদের লুকিয়ে। খুব কসে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি!"

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম বর্গীরা একেবারে খাপ খুলিয়া বসিয়া আছেন; আর আজ এই সব ফক্কিকারের কথা শুনিয়া মনটা বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। কিন্তু বারীন বলিল—

"কুছ্ পরোয়া নেই। ওরা যদি সঙ্গে এল তো এল; আর তা যদি না হয়—'ত একলা চলরে'। আমরা বাংলা দেশ থেকেই পাঁচ বছরের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব। লেগে যাও সবে আজ থেকে ছেলে জোগাড় করতে।"

সুতরাং চারিদিক হইতেই একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সাড়া পড়িয়া গেল। ক্রমাগতই নূতন নূতন ছেলে আসিয়া জুটিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের পিছে যে পুলিস লাগিয়াছে, এ সন্দেহ করিবারও নানা কারণ ঘটিল। ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিবার চেষ্টাও হইল, কিন্তু অতগুলা বাড়ী ভাড়া করিবার পয়সা কোথায়? ছেলেদের খাইবার পয়সা জোটানই যে মুস্কিল! শেষে বৈদ্যনাথের কাছে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই খানেই বোমার আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাওয়া স্থির হইল। বাগানটা প্রধানতঃ নূতন ছেলেদের পড়াশুনা করিবার আড্ডা হইয়া রহিল। বোমার আড্ডায় উল্লাসকর আড্ডাধারী হইয়া বসিল; আমি ষষ্ঠীবুড়ী হইয়া বাগানে ছেলেদের আগলাইতে লাগিলাম। বারীন চিরদিনই কর্ম্মী পুরুষ; তাহাকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিবার হুকুম বিধাতা দেন নাই। সে সমস্ত কর্ম্মের কেন্দ্রগুলি তদারক করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

এই সময় একটা দুর্ঘটনায় আমাদের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমাদের একটী ছেলে বোমা ফাটিয়া মারা পড়ে। আমাদের যতগুলি ছেলে ছিল, তাহাদের মধ্যে সেইটীই বোধ হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কি ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে, সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাথার মাঝখান হইতে কোমর পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া কি যেন একটা সড়াৎ করিয়া নামিয়া গেল। একটা অন্ধ রাগ আর ক্ষোভে মনটা ভরিয়া গেল। মনটা শুধু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"সব চুলোয় যাক, সব চুলোয় যাক্।"

বৈদ্যনাথে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে মন টিকিল না। অন্ধকার পথ যে দিন দিন আরও অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে, তাহা বেশ বুঝিলাম।

কিন্তু উপায় নাই—চলিতেই হইবে। অনশন, অর্দ্ধাশন, আসন্ন বিপদ ও প্রিয়জনের ভীষণ মৃত্যুর মধ্য দিয়া এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। এ বিবাহের যে এই মন্ত্র।

বাহিরে কাজকর্ম্ম তুমুল বেগে চলিতে লাগিল; কিন্তু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শক্তির অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। এই যে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, ইহার শেষ কোথায়? এই যে এতগুলা ছেলেকে ক্রমশঃ মরণের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছি, মরণের ভয়টা কি আমাদের নিজেদের মন হইতে সত্যসত্যই মুছিয়া গিয়াছে? আর তা'ও যদি না হয়, ত দিনের পর দিন অন্ধের মত ছেলেগুলোকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইব? পথ যে নিজেদের চোখেই ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে! বারীনের মনে এ সময় কি হইত ঠিক জানি না। কোন দুঃসাহসের কার্য্যে তাহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও ভয়ে পিছাইয়া আসিতে দেখি নাই। তবে সেও যেন মাঝে মাঝে নিজের ভিতর ঢুকিয়া শক্তি সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত বলিয়া মনে হয়। একটা কিছুর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আমাদের কাঁধের বোঝাটা যেন একটু হালকা হইয়া যাইত। এই জন্যই বোধ হয় যে সাধুটীর নিকট গুজরাতে সে দীক্ষা লইয়াছিল, তাঁহাকে এই সময় একবার বাংলাদেশে আসিবার জন্য সে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখে।

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধুটী মাণিকতলার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হন। দুই চারিদিন আমাদের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা যে পন্থা ধরিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। অশুদ্ধ মন লইয়া এ কাজে লাগিলে খানিকটা অনর্থক খুনোখুনির সম্ভাবনা। এ অবস্থায়, যাহারা দেশের নেতৃত্ব করিতে চায়, তাহাদের অন্ধের মত কাজ করা চলিবে না। ভবিষ্যতের পরদা যাঁহাদের চোখের কাছ থেকে কতকটা সরিয়া গিয়াছে, ভগবানের নিকট হইতে যাঁহারা প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এ কাজের যথার্থ অধিকারী। তোমাদের মধ্যে জন কয়েককে এই প্রত্যাদেশ পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।"

সাধনার ফরমাইস শুনিয়া ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। প্রত্যাদেশ না অশ্বডিম্ব! ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহার মধ্যে আবার ভগবানকে লইয়া এত টানাটানি কেন?

সাধু বলিলেন—"সকলের জন্য এ সাধনা নয়, শুধু নেতাদের জন্য। যাহারা দেশের লোককে পথ দেখাইবে, তাহাদের নিজেদের পথটা জানা চাই। দেশ স্বাধীন করিতে হইলেই যে খুব খানিকটা রক্তারক্তি দরকার,—এ কথাটা সত্য নাও হইতে পারে।"

বিনা রক্তপাতে যে দেশোদ্ধার হইবে, এ কথাটা আমাদের নিতান্ত আরব্য উপন্যাসের মত মনে হইল। আমরা একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাও কি সম্ভব?"

সাধু বলিলেন—"দেখ, বাবা, যে কথা আমি বলিতেছি, তাহা জানি বলিয়াই বলিতেছি। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে উপায়ে হইবে ভাবিতেছ, সে উপায়ে নয়। আমার বিশ বৎসরের সাধনার ফলে আমি ইহাই জানিয়াছি। চারিদিকের অবস্থা এক সময় এমনি হইয়া দাঁড়াইবে যে, সমস্ত রাজ্যভার তোমাদের হাতে আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। তোমাদের শুধু শাসন-ব্যবস্থা-প্রণালী গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র। আমার সঙ্গে তোমরা জন কতক এস; সাধনার প্রত্যক্ষ ফল যদি কিছু না পাও, ফিরিয়া আসিও।"

সে-দিন সাধু চলিয়া যাইবার পর আমাদের মধ্যে বিষম তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। বারীন ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"কিছুতেই নয়। কাজ আমি ছাড়বো না। বিনা রক্তপাতে ভারত উদ্ধার—

এটা ওঁর খেয়াল। সাধুর আর সব কথা মানি, শুধু ঐটে ছাড়া।"

আমার মনটা কিন্তু সাধুর কথায় বেশ একটু ভিজিয়াছিল; দেখাই যাক না, রাস্তাটা যদি কোন রকমে একটু পরিষ্কার হয়! নিজের সঙ্গে বেশ একটা বোঝাপড়া না হইলে কোন কাজেই যে মন যায় না!

আমি আর দুই একটী ছেলেকে লইয়া সাধুর সঙ্গে যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। সাধু আর একদিন বারীনকে বুঝাইতে আসিলেন; কিন্তু পরের উপদেশ লইবার সু-অভ্যাস বারীনের একেবারেই নাই। কোন রকমে বারীনকে বাগাইতে না পারিয়া শেষে সাধু বলিলেন—"দেখ, এ রাস্তা যদি না ছাড়, ত তোমাদের অল্পদিনের মধ্যে ভীষণ বিপদ অনিবার্য্য।"

বারীন দুই হাত নাড়িয়া বলিল—"না হয় ধ'রে ঝুলিয়ে দেবে—এই বৈ ত নয়! তার জন্য ত প্রস্তুত হয়েই আছি।"

সাধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"যা ঘটবে, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ!"

সে-দিনের সভা ঐ খানেই ভঙ্গ হইল। সাধু ফিরিয়া যাইবার দিন স্থির করিলেন। কিন্তু সে-দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, আমার পা-ও যেন ততই বাগান ছাড়িয়া উঠিতে চাহিল না। স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেটা তত কঠিন বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু যাহারা আমাদের দেখিয়া মা বাপের স্নেহ, ভবিষ্যতের আশা, এমন কি প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহাদের ছাড়িয়া আজ কোথায় পলাইব? অনেক আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি, উৎসাহ এই বাগানের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে; আজ সেই গড়া জিনিস ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে আপনার লক্ষ্য খুঁজিতে বাহির হইব? নির্দ্দিষ্ট দিনে সাধুর সহিত আর আমাদের যাওয়া হইল না। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি একাই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধু চলিয়া যাইবার পর আবার ভাঙ্গা মন জোড়া দিয়া কাজ কর্ম্মে লাগিয়া গেলাম। আমরা তখন স্থির করিয়াছিলাম যে, দেশময় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেশের শক্তি বেশ সংহত করিয়া তাহার পর বিপ্লবের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিব। কিন্তু দেশের লোকের মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে। সুদূর আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নীরবে সমস্ত লজ্জা, অপমান, নির্য্যাতন সহ্য করা যে কত কঠোর সাধনা সাপেক্ষ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে না। দেশের সে শিক্ষা তখনও হয় নাই,—এখনও হইয়াছে কি?

অর্থ সংগ্রহ করা ক্রমে বিষম দায় হইয়া উঠিল। কাজ বাড়িতেছে; ছেলের সংখ্যাও বাড়িতেছে—কিন্তু টাকা কোথায়? এক আধ জন ধনবান কাপ্তেন না পাকড়াইলে ত আর কাজ চলে না। কিন্তু তাহাদের তুষ্ট করিতে গেলে এক আধটা বড় লাট বা ক্ষুদে লাটের ঘাড়ে বোমা ফেলিতে হয়!

যাতায়াতের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য বোমার আড্ডা দেওঘর হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হইল। সেখানে যাহাতে লোকের গতিবিধি কম হয় ও পুলিসের নজর না পড়ে, সেই জন্য ভবানীপুরে আর একটী বাড়ীতে পুরাতন ছেলেদের রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল। বাগানে রহিল প্রধানতঃ নূতন ছেলেরা।

কিন্তু শত চেষ্টায়ও পুলিসের দৃষ্টি অমরা এড়াইতে পারিলাম না।

পুলিস যে আমাদের সন্দেহ করিয়াছে, একথা মনে করিবার নানা কারণ ঘটিতে লাগিল। দেখিলাম বাগানের আশে-পাশে রকম বেরকমের অজানা লোক ঘুরিতেছে। রাস্তা চলিবার সময়ও দুই একজন পিছে পিছে চলিয়াছে। একদিন চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখিলাম একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফের উপর হইতে দুইটা গোল গোল চোখ আমার দিকে প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া আছে। যেদিকে যাই, চোখ দুইটা আমার পিছে পিছে ছুটিতে লাগিল। শেষে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়া যেদিন কোনরূপে সে শনির দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

মাণিকতলার সব-ইন্স্পেক্টর বাবুও মাঝে মাঝে বাগানে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে বৃথাই সন্দেহ করিতাম। তিনি বাগানটীকে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীর আশ্রম বলিয়াই জানিতেন।

এই রকমে আরও একটা মাস কাটিল। শেষে মোজাফরপুরে বোমা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের পরমায়ু ফুরাইল!

* * *

সেদিনের কথা আমার চিরকালই মনে থাকিবে। একে বৈশাখ মাস, দারুণ রৌদ্র। তাহার উপর সমস্ত দিন টো টো করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিলাম, তখন হাত পা এবং পেট সকলেই সমস্বরে আমাকে বাপান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং যমরাজ যদি তাঁহার মহিষটীর স্কন্ধে চড়িয়া আমাকে তখন তাড়া করিয়া আসিতেন, তাহা হইলেও আমি এক পা নড়িয়া বসিতাম কিনা সন্দেহ। সকলেরই প্রায় ঐ এক দশা। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা; দুটী রাঁধিয়া না খাইলে নয়। আমাদের ত আর রাঁধুনী বা চাকর ছিল না যে, ঘুরিয়া আসিয়া বাড়া ভাতের থালে বসিয়া যাইব। ভাত রাঁধা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাট দেওয়া, সবই আমাদের নিজের হাতে করিতে হইত। ছেলেরা তাড়াতাড়ি রাঁধিতে বসিয়া গেল, আর আমরা কল্পনার রথে চড়িয়া ভারত উদ্ধার করিতে বাহির হইলাম। কিন্তু সেদিন আমাদের উপর শনির এমন খরদৃষ্টি যে, ভাত নামাইবার সময় হাঁড়ি ফাঁসিয়া সব ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। ছেলেরা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম সে দিন মা লক্ষ্মী আর অদৃষ্টে অন্ন লেখেন নাই। পেটে তিনটা কিল মারিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু বারীন্দ্র চিরদিনই উদ্যোগী পুরুষ, দমিবার পাত্র নয়; সে সেই রাত দশটার সময় জ্বালানী কাঠের অভাবে খবরের কাগজ জ্বালাইয়া ভাত রাঁধিতে গেল। রাত এগারটার সময় ভাত খাইতে বসিতেছি, এমন সময় আমাদের এক বন্ধু কলিকাতা হইতে নাচিতে নাচিতে উপস্থিত। কি সংবাদ? তিনি ভাল লোকের কাছে খবর শুনিয়া আসিয়াছেন যে, বাগানে শীঘ্রই পুলিসের খানাতল্লাস হইবে; সুতরাং আমাদের বাগান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। তথাস্তু; কিন্তু এ রাতে ত ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া বাহির না করিলে কেহ বাগান ছাড়িতে রাজী হইবে না। সুতরাং স্থির হইল যে, কাল সকালেই সকলে আপন আপন পথ দেখিবে। বারীন্দ্র কিন্তু কয়েকজন ছেলেকে লইয়া সেই রাত্রেই কোদাল ঘাড়ে করিয়া, যে দুই চারিটা রাইফেল ও রিভলভার বাহিরে পড়িয়াছিল, সেগুলাকে মাটীর তলায় পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল। আমাদের শুইতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল।

* * *

রাত্রি যখন প্রায় চারটা, তখনও কতকটা গ্রীষ্মের জ্বালায়, কতকটা মশার কামড়ে শুইয়া শুইয়া ছটফট্ করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে, কতকগুলা লোক মস্‌মস্ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছে; আর তাহার একটু পরেই দরজায় ঘা পড়িল—গুম্ গুম্ গুম্। বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই একটা অপরিচিত ইউরোপীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল :—

. . "Your name ?"

.."Barindra Kumar Ghose"

হুকুম হইল—"বাঁধো ইস্‌কো।"

বুঝিলাম, ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই সমাপ্ত। তবুও মানুষের যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। পুলিস প্রহরীরা ঘরে ঢুকিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে, কিন্তু ঘর তখনও অন্ধকার। ভাবিলাম—Now or never. আর এক দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম চারিদিকে আলো জ্বালিয়া পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। রান্নাঘরের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়া যায়; সেখানে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম নীচে দুইজন পুলিস প্রহরী। হায়রে! অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়! অগত্যা বারান্দার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল, তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরটী ভাঙ্গাচুরা কাঠ কাঠরায় পরিপূর্ণ; আরসুলা ও ইন্দুর ভিন্ন অপর কেহ সেখানে বাস করিত না। চাহিয়া দেখিলাম একটা জানালার সম্মুখে একখানা জরাজীর্ণ চটের পরদা ঝুলিতেছে। তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া পুলিস প্রহরীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে রাতটুকু যেন আর কাটে না!

ক্রমে কাক ডাকিল; কোকিলও এক আধটা বোধ হয় ডাকিয়াছিল। পূর্ব্বদিক একটু পরিষ্কার হইলে দেখিলাম, বাগান লাল পাগড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলা গোরা সার্জ্জেন্ট হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাবুক লইয়া ঘুরিতেছে। পাড়ার যে কয়জন কোচম্যান জাতীয় জীবকে খানাতল্লাসির সাক্ষী হইবার জন্য পুলিসের কর্ত্তারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারা এক বিপুলকায় ইন্সপেক্টর সাহেবের পশ্চাৎ "হুজুর, হুজুর" করিতে করিতে ছুটিতেছে। পুকুর ঘাটের একটা প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় আমাদের হাতবাঁধা ছেলেগুলা জোড়া জোড়া বসিয়া আছে; আর উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে বসিয়া ইন্সপেক্টর সাহেবের ওজন

তিন মণ কি সাড়ে তিন মণ এই সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ক্রমে ছয়টা বাজিল, সাতটা বাজিল; আমি তখনও পর্দ্দানসিন বিবিটির মত পর্দ্দার আড়ালে। ভাবিলাম, এ যাত্রা বুঝি কর্ত্তারা আমাকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু সে বৃথা আশা বড় অধিকক্ষণ পোষণ করিতে হইল না। আমাদের অতিকায় ইন্সপেক্টর সাহেব জুতার শব্দে পাশের ঘর কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। পাছে নিশ্বাসের শব্দ হয়, সেই ভয়ে আমি নাক টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু বলিহারী পুলিসের ঘ্রাণশক্তি! সাহেব সোজা আসিয়া আমার লজ্জানিবারিণী পর্দ্দাখানি একটানে সরাইয়া দিলেন। তারপরেই চারিচক্ষের মিলন—কি স্নিগ্ধ! কি মধুর! কি প্রেমময়! সাহেব ত দিগ্বিজয়ী বীরের মত উল্লাসে এক বিরাট "Hurrah" ধ্বনি করিয়া ফেলিলেন। সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চার পাঁচজন পার্ষদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ ধরিল আমার পা, কেহ ধরিল হাত, কেহ ধরিল মাথা। তাহার পর কাঁধে তুলিয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে আমাকে একেবারে হাতবাঁধা ছেলের দলের মাঝখানে বসাইয়া দিল। আমার হাত বাঁধিবার হুকুম হইল। যে পুলিস প্রহরী আমার হাত বাঁধিতে আসিল—হরি! হরি!—সে যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' আফিসের ভূতপূর্ব্ব বেহারা! কতকাল সে আমাকে 'বাবু' বলিয়া সেলাম করিয়া চা খাওয়াইয়াছে। আজ আমার হাত বাঁধিতে আসিয়া সে বেচারী লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

এদিকে খানাতল্লাসী করিতে করিতে গত রাত্রের পোঁতা রাইফেল ও বোমাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনও জিনিস কোথাও পোঁতা আছে কি না জানিবার জন্য পুলিস ছেলেদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া, বারীন্দ্র ইন্সপেক্টর জেনারেল প্লাউডেন সাহেবের নিকট নালিস করে। সাহেব হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দেন। বলেন—"You must not expect too much from us" "আমাদের নিকট হইতে বড় বেশী কিছু আশা করিও না।"

সেদিন ভিন্ন ভিন্ন থানায় লইয়া গিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইল। অদৃষ্টে তিনখানা পুরী ভিন্ন আর কিছু জুটিল না। পরদিন প্রাতঃকালে সি-আই-ডি পুলিস আফিসে গিয়া শুনিলাম যে, বাগান ভিন্ন আরও দুই তিন স্থানে তল্লাসী করা হইয়াছে এবং আমাদের সহিত সংশ্রব ছিল না, এরূপ অনেক লোকও ধৃত হইয়াছেন। ডেপুটী সুপারিণ্টেনডেণ্ট রামসদয় বাবু আমাদিগকে দিদি-শাশুড়ীর মত আদর যত্ন করিয়া তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের মত মাদুলী বাহির করিয়া বলিলেন যে, তিনি খ্যাতনামা সাধক কমলাকান্তের বংশধর; আর ঐ মাদুলীর মধ্যে কমলাকান্তের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন পদধূলি বিদ্যমান। আমাদের মাথায় সেই মাদুলীটি ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, কখনও হাসিয়া কখনও বা কাঁদিয়া কমলাকান্তের বংশধরটী আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মত সুহৃদ আমাদের আর ত্রিভুবনে নাই। তিনি নাকি আমাদের কাজ-কর্ম্মের সহিত গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন! তবে কি করেন, পেটের দায়—ইত্যাদি। বাগবাজারের আর একজন ইন্সপেক্টর বাবু অশ্রুনীরে গণ্ড প্লাবিত করিয়া আধ আধ স্বরে আমাদের জানাইয়া দিলেন যে, আমাদের ধরিয়া তিনি যে কসাইবৃত্তি করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত! বলা বহুল্য, আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি (Confession) বাহির করাই এ সমস্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্য। আইন কানুন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যেরূপ প্রচণ্ড, তাহাতে আমাদিগকে বধ করিতে তাঁহাদের বড় অধিক বেগ পাইতে হইল না। উল্লাস বলিল যে, যে সমস্ত বাহিরের লোক বিনা কারণে আমাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের বাঁচাইবার জন্য আমাদের সব সত্য কথা বলা দরকার। উল্লাসের ধারণা আমরা সত্যকথা বলিলেই ধর্ম্মাত্মা পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহা বিশ্বাস করিয়া বেচারাদের ছাড়িয়া দিবে। বারীন্দ্র বলিল—"আমাদের দফা ত এই-খানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতে-ছিলাম, তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।" এই সমস্ত কথা লইয়া বিচার বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় রায় বাহাদুর রামসদয় এক খণ্ড হাতেলেখা কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মহা উৎসাহে বলিলেন—"এই দেখ, বাবা, হেমচন্দ্রের statement; সে সব কথাই স্বীকার করেছে।" বলা বাহুল্য, কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা; হেমচন্দ্রের বলিয়া যে Statementটা তিনি আমাদের শুনাইলেন, তাহা একেবারেই তাঁহার মনগড়া। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, সমস্ত ব্যাপারটা যে আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য অভিনয়মাত্র, তাহা বুঝিয়া

উঠিতে পারিলাম না। আমরা দুই একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সে রাত্রের জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম।

পর দিন দুপুর বেলা যখন আমাদের লালবাজার পুলিস কোর্টে হাজির করা হইল, তখন ধর-পাকড়ের উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে; ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। একটী ছেলে কাছে আসিয়া বলিল—"দাদা, পেটের জ্বালাতেই মরে গেলুম! কাল সমস্ত দিন পেটে ভাত পড়েনি। দুপুর বেলা শুধু দুটী মুড়ি খেতে দিয়েছিল।" বারীন্দ্র লাফাইয়া উঠিল। কাছেই ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্ত দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহাকে বলিল—"বাপু, আমাদের ফাঁসি মাসি যা কিছু দিতে হয় দাও; ছেলেগুলোকে এমন ক'রে দগ্ধাচ্ছ কেন?" বিনোদ গুপ্ত তাড়াতাড়ি—"এই, ইয়া ল্যাও, উয়া ল্যাও" করিয়া একটী সবইন্সপেক্টর বাবুর উপর খাবার আনিবার জন্য হুকুম চালাইলেন; সবইন্সপেক্টর বাবুটী হেড কন্সটেবল ও হেড কন্সটেবলটী একজন অভাগা কন্সটেবলের উপর হুকুম জাহির করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ফলে পুনঃ পুনঃ তাগাদায় এক গ্লাস জল ভিন্ন আর কিছু আসিয়া পৌঁছিল না। বিনোদ গুপ্তকে সে কথা জানাইলে তিনি একজন কাল্পনিক কন্সটেবলের উপর ভাঁটার মত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতে করিতে কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন, তাহা আমরা খুঁজিয়াও পাইলাম না।

পুলিস কোর্টের লীলা সাঙ্গ হইবার পর আমাদের গাড়ীতে পুরিয়া আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইল। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রাস্তায় পুলিস কর্ম্মচারীরা আমাদের দুই খানা করিয়া কচুরী ও একটা করিয়া সিঙ্গাড়া খাইতে দিয়াছিলেন, এমন কি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে Statement করিবার সময় গলা যাহাতে না শুকাইয়া যায়, সেই জন্য কাহাকে কাহাকেও এক এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন! তবে সেটা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ধমক খাইবার পর।

কোর্টে গিয়া দেখিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি (Birley) সাহেব বিকট বদনে উঁচু তক্তের উপর বসিয়া আছেন। মুখখানি যেন সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। দেখিলে মনে হয় যেন একটী মূর্ত্তিমান শাসনযন্ত্র। তিনি আমাদের Statement গুলি লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি মনে কর তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পার?"

কথাটা শুনিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাহেব, দেড়শ বৎসর পূর্ব্বে কি তোমরা ভারত শাসন করিতে? না, তোমাদের দেশ হইতে আমরা শাসনকর্ত্তা ধার করিয়া আনিতাম?"

সাহেবের বোধ হয় উত্তরটা তত ভাল লাগিল না। তিনি খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের বারণ করিয়া দিলেন যে, আমাদের সহিত তাঁহার এ সমস্ত কথাবার্ত্তাগুলা যেন ছাপা না হয়।

কোর্ট হইতে গাড়ীবন্ধ হইয়া যখন আলিপুর জেলের দরজার কাছে হাজির হইলাম, তখন সন্ধ্যা। জেল তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; অন্ন ব্যঞ্জনও প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জেলার বাবু কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক এক মুঠা ভাত ও একটু করিয়া ডাল আমাদের খাইতে দিলেন। প্রায় দুই দিন অনাহারের পর সেই এক মুঠা ভাতই যেন অমৃত বলিয়া মনে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে জেলে গিয়া পৌঁছিলাম, সে রাত্রে আর ভালমন্দ কিছু ভাবিবার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্র বলিয়াছিল—My mission is over—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে!—কিন্তু সে কথার প্রতিধ্বনি ত নিজের মধ্যে একটুও খুঁজিয়া পাইলাম না। দেশের কাজ ত সবই বাকি!—শুধু আমার কাজই ফুরাইয়া গেল! প্রাণভরা সহস্র আকাঙ্ক্ষা, কত কি বিচিত্র কল্পনা লইয়া যুগান্তর গড়িতে নামিয়াছিলাম—এক ভূমিকম্পে সবটাই ধূলিসাৎ হইয়া গেল! এ জগতে শুধু পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ীটাই সত্য, আর বাকি সবটাই মায়া? অতীতের কত স্মৃতি তুবড়ীবাজীর মত মাথায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল তিন চার মাস দেশময় টো টো করিয়া ঘুরিয়া যখন শীর্ণ ক্লান্ত দেহভার লইয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়াছিলাম, তখন মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমান ভরে বলিয়াছিলেন—"ছেলের আমার আর মায়ের রান্না ভাত ভাল লাগে না! কোথায় দীন দুঃখীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াস, বাবা!

'ভদ্দর লোকের' ছেলে; শেষে কি কোন্ দিন পুলিসে ধরে 'অপমান্তি' করবে!"—আজ সত্য সত্যই পুলিসে ধরিয়া 'অপমান্তি' করিল! আবার মনে পড়িল সেই পাহারাওয়ালার কথা, যে আসিতে আসিতে বলিয়াছিল—"বাবুজী, তোমরা যদি একটা কিছু গোলাগুলি ছুঁড়তে, তাহলে আমরা সবাই পালিয়ে যেতুম।" তাইত! চুপচাপ একেবারে ভেড়ার দলের মতো ধরা পড়িলাম। এ দুঃখ যে মরিলেও ঘুচিবে না! একজন পুলিস সার্জ্জেন্ট ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"এরা এমনি সুবোধ ছেলে যে, বাগানে ঘুমাইবার সময় রাস্তায় একজন পাহারা পর্য্যন্ত রাখে নাই।" কথাটা সারারাত মাথার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু এখন আর হাত কামড়ান ছাড়া উপায় নাই। একবার উল্লাসের উপর রাগ ধরিল। পুলিসের দল যখন প্রথম বাগানে আসিয়া ঢুকে, তখন সে জাগিয়া উঠিয়াছিল; ইচ্ছা করিলে সে পলাইতেও পারিত। কিন্তু নির্ব্বিকার সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় সে ব্যাপারটা চুপ চাপ বসিয়া দেখিয়াছিল মাত্র; পলাইবার কথা তাহার মনে আসে নাই!

সে রাতটা এই রকম দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া কুঠরীর (cell) বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—নরক একেবারে গুলজার। আমাদের সব আড্ডাগুলির ছেলেরাই আসিয়া জুটিয়াছে। অধিকন্তু পাঁচ সাতজন অপরিচিত ছেলেও দেখিলাম। ইহারা আবার কোথাকার আমদানী? একটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাপু হে, তুমি কে বট?"

ছেলেটী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, আমার বাড়ী মাণিকতলায়। আপনাদের বাগানের কাছে সকালবেলা একটু মর্ণিং ওয়াক করাটা যে এত বড় মহাপাপ তা'ত জানতুম না।"

দেখিলাম নগেন সেনগুপ্ত আর তাহার ভাই ধরণীকেও পুলিস জেলে পুরিয়াছে। বেচারারা বোমার 'ব' পর্য্যন্ত জানে না। পুলিসে বোমার আড্ডার সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া উল্লাসকর বোমাগুলি কোথায় সরাইয়া রাখিবে স্থির করিতে না পারিয়া, বাল্যবন্ধু নগেনের বাড়ীতে একটা বোমার প্যাটরা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্যাটরার ভিতর যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে, নগেন বা ধরণী তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। তাহাদের বাঁচাইবার জন্যই উল্লাস পুলিসের নিকট সব কথা স্বীকার করিল। উল্লাসের বিশ্বাস ছিল যে, সত্য কথা জানিতে পারিলেই পুলিসের কর্ত্তারা নগেন ও ধরণীর উপর আর মোকদ্দমা চালাইবে না। পুলিস যে ঠিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বংশ-সম্ভূত নয়, এ কথাটা তখন উল্লাসের মাথায় ভাল করিয়া ঢুকে নাই।

ক্রমে পুলিস নানা জেলা হইতে অনেকগুলি ছেলে আনিয়া হাজির করিল। শ্রীহট্ট হইতে সুশীল সেন ও তাহার দুই ভাই বীরেন ও হেমচন্দ্র আসিল। সুশীলকে আমরা পূর্ব্বে চিনিতাম কিন্তু তাহার দুই ভাইকে ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মালদহ হইতে কৃষ্ণজীবন, যশোহর হইতে বীরেন ঘোষ ও খুলনা হইতে সুধীরও আসিয়া পৌছিল।

আর আসিয়া পৌছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু পণ্ডিত হৃষীকেশ। হৃষীকেশ আমার কলেজের সহপাঠী। কলেজ হইতে মা ইংরাজী সরস্বতীকে বয়কট করিয়া আমি যখন সাধুগিরি করিতে বাহির হই, তখন পণ্ডিত হৃষীকেশ ভাবাধিক্যবশতঃ নিমতলার ঘাটে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সমস্ত সৎকর্ম্মে সে আমার সহগামী হইবে। একে নিমতলার ঘাট—মহাতীর্থ বলিলেই হয়; তাহার উপর মা গঙ্গা—একেবারে জাগ্রত দেবতা। সেখানকার প্রতিজ্ঞা কি আর বিফল হইবার জো আছে? মা গঙ্গা কি কুক্ষণেই তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে মনে 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু সেইদিন হইতে আজ অবধি পণ্ডিত হৃষীকেশ আমার পিছনেই লাগিয়া আছে। শাস্ত্রে বলে যে উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে একসঙ্গে গিয়া দাঁড়ায়, সেই বান্ধব। হৃষীকেশের বিবাহে ও তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমি লুচি খাইয়া আসিয়াছি, দুর্ভিক্ষের সময় দুজনে পীড়িতের সেবা করিয়াছি; এক সঙ্গে উভয়ে সাধুগিরি করিয়া ফিরিয়াছি, মাষ্টারীও করিয়াছি। আজ রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে গিয়া একসঙ্গে উভয়ে পুলিসের হাতে ধরাও পড়িলাম। ভবিষ্যতে যে উভয়কে একসঙ্গে শ্রীধাম আন্দামান বাস করিতে হইবে, তাহা তখন জানিতাম না। বান্ধবত্বের সব লক্ষণই মিলিয়াছে; বাকি আছে শুধু শ্মশানটুকু। নিমতলার ব্রতটুকু এখন নিমতলায় উদ্‌যাপন করিয়া আসিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

যাক, সে ভবিষ্যতের কথা। জেলে গিয়া দুই দিন বিশ্রাম করিতে না করিতেই দেখি পণ্ডিত হৃষীকেশ বিশাল দেহভার দোলাইতে দোলাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সহিত

মাণিকতলার বাগানের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না; আমাদের কার্য্যকলাপের কিছু কিছু সে জানিত মাত্র। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণও ছিল না। বাগানের কাগজ-পত্রের মধ্যে দু এক জায়গায় তাহার নাম পাইয়া পুলিস সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গাজল ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা ত আর বিফল হইবার নয়! তাহাকে যে আন্দামানে যাইতেই হইবে! পুলিস যখন তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গিয়া হাজির করে, তখন তাহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ দেখিয়াই বন্ধুর আমার মেজাজটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। মহামান্য সরকার বাহাদুরের রাজ্য ও শাসননীতি সম্বন্ধে বন্ধু আমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর এখানে পুনরুদ্ধৃত করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে বিপদে পড়িবার আমার ইচ্ছা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেবের টম-ফুলারির (tom foolery) আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, লাট মর্লীর পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে সবই ছিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেলের মধ্যে এক পৃথক কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া হাজির হইলেন শ্রীমান দেবব্রত। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যুগান্তরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নবশক্তির সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। নবশক্তি উঠিয়া যাওয়ার পর আপনার সাধন ভজন লইয়াই বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা দেখাশুনা করিতেন না। চলমান পর্ব্বতবৎ তিনিও একদিন সুপ্রভাতে জেলে আসিয়া হাজির হইলেন।

পুলিস কোর্টে শুনিয়াছিলাম যে, আমরা যে-দিন ধরা পড়ি সে-দিন অরবিন্দ বাবুকেও ধরা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জেলের যে অংশে আবদ্ধ ছিলাম, সেখানে তাঁহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম তাঁহাকে অন্যত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

হৃষীকেশকে যে দিন পুলিস ধরিয়া আনে, তাহার দুই একদিন আগে শ্রীরামপুর হইতে গোস্বামীদের বাড়ীর নরেন্দ্রকেও ধরিয়া আনিয়াছিল। সে আমাদের সহিত এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল।

আমাদের বাগানে একখানা নোটবুকে একটা নাম লেখা ছিল—চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরী। খুলনার ইন্দুভূষণকে আমরা চারু বলিয়া ডাকিতাম। পুলিস তাহা না জানিয়া চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে স্থির করিল যে, চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ই ঐ চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরী। চারুবাবুর বোধ হয় অপরাধ যে কানাইলাল দত্ত ও আমি উভয়েই তাঁহার ছাত্র ও উভয়েরই বাড়ী চন্দননগর। যাঁহার ছাত্রেরা এমন রাজদ্রোহী, তিনি 'রায়'ই হোন, আর 'রায়' চৌধুরী'ই হোন, তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাঁহাকে ত ধরিতেই হইবে!

যাক্ সে কথা। অল্পদিনের মধ্যেই এক এক করিয়া পুলিস প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন লোককে হাজতে টানিয়া আনিল। তিন চারটা কুঠরীতে তিন তিন জন করিয়া রাখিল; বাকি সকলের জন্য পৃথক পৃথক কুঠরীর ব্যবস্থা হইল।

ধরাপড়ার উত্তেজনা সামলাইতেই প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম একটী প্রায় সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া কুঠরীর মধ্যে আমরা তিনটী প্রাণী আবদ্ধ আছি। আমি ছাড়া দুইটীই ছেলে মানুষ; একটীর বয়স বছর কুড়ি, আর একটীর বয়স পনেরো। প্রথমটী নলিনীকান্ত গুপ্ত—প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, নিতান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাল ছেলে; আর দ্বিতীয়টি শচীন্দ্রনাথ সেন—ন্যাশন্যাল কলেজের পলাতক ছাত্র—একেবারে শিশু বা বাচ্ছা বলিলেই হয়। সেই কুঠরীর এক কোণে শৌচ প্রস্রাবের জন্য দুইটী গামলা। তিন জনকেই সেইখানে কাজ সারিতে হয়; সুতরাং একজনকে ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য অশ্লীল কর্ম্মটুকু করিতে গেলে আর দুই জনের চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরীর সামনে একটী ছোট বারান্দা। সেইখানে হাত মুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান, আর তাহার পরেই অভ্রভেদী প্রাচীর। প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুঃশূল। সেটা যেন অহরহঃ চীৎকার করিয়া বলিত—"তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে যখন পড়িয়াছ, তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।"

প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল এইটুকু লইয়াই; বাকি সবটাই একেবারে নিরেট গদ্য। আর সব চেয়ে কটমটে গদ্য আহারের ব্যবস্থাটা। প্রথম দিন তাহা দেখিয়া হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ

ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল। সকাল বেলা উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান বালতি হইতে সাদা সাদা কি খানিকটা আমাদের লোহার থালার উপর ঢালিয়া দিয়া গেল। শুনিলাম, উহাই আমাদের বাল্যভোগ এবং আলীপুরী ভাষায় উহার নাম 'লপ্‌সী'। লপ্‌সী কিরে বাবা! শচীন দূর হইতে খানিকটা পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"ওহো! এ যে ফেন মিশান ভাত!"—পরদিন দেখিলাম, ডালের সহিত মিশিয়া লপ্‌সী পীতবর্ণ ধরিয়াছে; তৃতীয় দিন দেখিলাম উহা রক্তবর্ণ। শুনিলাম উহাতে গুড় দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই আমাদের প্রাতরাশের রাজ সংস্করণ! সাড়ে দশটার সময় একটা টীনের বাটীর এক বাটী রেঙ্গুন চালের ভাত, খানিকটা অরহর ডাল, কি খানিকটা পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ ও একটু তেঁতুল গোলা। সন্ধ্যার সময়ও তদ্বৎ, কেবল তেঁতুল গোলাটুকু নাই!

ডাক্তার সাহেব ও জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিবামাত্র আমরা একটা প্রকাণ্ড উদরনৈতিক আন্দোলন সুরু করিয়া দিলাম। ডাক্তার সাহেব জাতিতে আইরিস, নিতান্ত ভদ্রলোক। আমাদের সব কথাগুলি চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"উপায় নাই। জেলের কয়েদীর খোরাক একেবারে সরকারের হিসাব মত বাঁধা।" কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে তিনি হাঁসপাতাল হইতে পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় অন্য আহার দিবার অধিকার তাঁহার নাই। জেলার বাবু বলিলেন,—"জেলের বাগানে আলু বেগুন কুমড়া পেঁয়াজ প্রভৃতি সব তরকারীই ত হয়; জেলের খোরাক ত মন্দ নয়।" শচীন নিতান্ত ঠোঁটকাটা ছেলে; সে বলিল—"বাগানে ত হয় সবই; কিন্তু পুই ডাঁটা আর এঁচোড়ের খোসা ছাড়া বাকি সব গুলা বোধ হয় রাস্তা ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।"

দেখিলাম অসুখ করা ছাড়া আর বাঁচিবার উপায় নাই। কাজেই আমাদের সকলকার অসুখ করিতে লাগিল। নিত্য নিত্য নূতন অসুখ কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? পেট কামড়ান, মাথা ধরা, বুক দুড় দুড় করা, গা বমি বমি করা, সবই যখন একে একে ফুরাইয়া আসিল, তখন বাহিরে প্রকাশ পায় না এমন অসুখ আবিষ্কারের জন্য আমাদের মাথা ঘামিয়া উঠিল। রোগ ত একটা কিছু চাই—তা না হইলে প্রাণ যে বাঁচে না।

ডাক্তার সাহেব আসিলে পণ্ডিত হৃষীকেশ গম্ভীর ভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার বামচক্ষুর উপরের পাতা তিনদিন ধরিয়া নাচিতেছে, সুতরাং তিনি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মনে হইতেছে যে, হাঁসপাতালের অন্ন ভিন্ন তাঁহার বাঁচিবার আর উপায় নাই। ডাক্তার বেচারা হাসিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন।

হঠাৎ আমরা আরও একটা পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। সেটা এই, পয়সা থাকিলে জেলখানার মধ্যে বসিয়াই সব পাওয়া যায়। জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলেই ভাতের ভিতর হইতে কৈমাছ ভাজা ও রুটির গাদার ভিতর হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারী বাহির হইয়া আসে; এমন কি পাহারাওয়ালার পাগড়ীর ভিতর হইতে পান ও চুরুট বাহির হইতেও দেখা গিয়াছে।

একটা মহা অসুবিধা ছিল এই যে, এক কুঠরীর লোকের সহিত অপর কুঠরীর লোকের কথা কহিবার হুকুম ছিল না। প্রথমে লুকাইয়া লুকাইয়া এক আধটা কথা কওয়া হইত; তাহাতে পাহারা-ওয়ালাদের ঘোরতর আপত্তি! তাহারা জেলারের কাছে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। হঠাৎ কিন্তু একদিন দেখা গেল তাহারা বেশ শান্ত শিষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমরা চীৎকার করিয়া কথা কহিলেও আর তাহারা শুনিতে পায় না। অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের একজন বন্ধু রৌপ্য-খণ্ড দিয়া তাহাদের কানের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিবার সময় তাহারাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল। রৌপ্যখণ্ডের যে অনন্ত মহিমা, তাহা এতদিন কানেই শুনিয়াছিলাম, এইবার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া মানব জন্ম সফল হইল। কিন্তু একটা দুঃখ কতকটা ঘুচিতে না ঘুচিতে আর এক দুঃখ দেখা দিল।

আমরা জেলে আসিবার পর হইতেই জেলের মধ্যে সি-আই-ডির কর্ত্তাদিগের শুভাগমন আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হইত যেন আমাদের বীরত্বের গৌরবে তাঁহাদের বুক ফুলিয়া দশ হাত হইয়াছে, আমাদের সহিত সহানুভূতিতে প্রাণ যেন তাঁহাদের ফাট-ফাট। কথাগুলি তাঁহাদের এমনি মোলায়েম, হাব-ভাব এমনি চিত্তবিমোহন যে, দেখিলে শুনিলেই মনে

হইত ইহারা আমাদের পূর্ব্বজন্মের পরমাত্মীয়। তবে ধরা পড়িবার পরদিন তাঁহাদের ঘরে একরাত্রি বাস করিয়া এসব ছলাকলার পরিচয় অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম—তাই রক্ষা। ইহারা সপ্তাহ খানেক যাতায়াতের পর নরেন্দ্র গোস্বামী যেন হঠাৎ একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু হইয়া দাঁড়াইল। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও বিপ্লবের কেন্দ্র আছে কি না, আর থাকিলে সেখানকার নেতাদের নাম কি—ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্নই সে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষের এক আধ জনের কথাবার্ত্তায়ও বুঝিলাম—একটা গোলমাল কোথাও লাগিয়াছে।

হৃষীকেশ একদিন আসিয়া আমায় বলিল—"গোটা দুই তিন বেয়াড়া রকমের মাদ্রাজী বা বর্গি টর্গির নাম বানিয়ে দিতে পারিস্?"

"কেন?"

"নরেন বোধ হয় পুলিসকে খবর দিচ্ছে; গোটা কতক উদ্ভট রকমের নাম বানিয়ে দিতে পারলে স্যাঙ্গাতরা দেশময় অশ্বডিম্ব খুঁজে খুঁজে বেড়াবে খ'ন।" তাহাই হইল; মহারাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন শ্রীমান্ পুরুষোত্তম নাটেকার, গুজরাতের সভাপতি হইলেন কিষণজী ভাওজী বা এই রকম একজন কেহ; কিন্তু মাদ্রাজের ভার লইবেন কে? মাদ্রাজী নাম যে তৈয়ারী করা শক্ত। খবরের কাগজে তখন চিদম্বরম্ পিলের নাম দেখা গিয়াছিল। হৃষীকেশ বলিল, যখন চিদম্বরম্ মাদ্রাজী নাম হইতে পারে, তখন বিশ্বম্ভরম্ কি দোষ করিল? আর পিলের বদলে যকৃৎ বা অমনি একটা কিছু জুড়িয়া দিলেই চলিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নানা প্রকারের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন আমাদের অদৃষ্ট খুলিয়া গেল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ হুকুম দিলেন যে, ৪৪ ডিগ্রী হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়া আমাদের একত্র রাখা হইবে। ভাগ্য-বিধাতা সহসা প্রসন্ন হইয়া কেন উঠিলেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু আমরা ত হাসিয়াই খুন। আলিঙ্গন, গলা-জড়াজড়ি, লাফালাফি আর চীৎকার থামিতেই এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম যে, তিনটি পাশাপাশি কুঠরীতে আমাদের রাখা হইয়াছে; তাহার মধ্যে পাশের দুইটা কুঠরী ছোট; আর মাঝেরটা অপেক্ষাকৃত বড়। অরবিন্দ বাবু ও দেবব্রতের মত যাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর-প্রকৃতি, তাঁহারা পাশের দুইটী কুঠরীতে আশ্রয় লইলেন; আর আমাদের মত "চ্যাংড়া" যাহারা, তাহারা মাঝের বড় কুঠরীটি দখল করিয়া সর্ব্বদিনব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাননগুও আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বে কখনো বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার অবসর পাই নাই; এবার কাছে আসিয়া দেখিলাম যে, যাঁহাদের মাথার চুল পাকে, বুদ্ধিও পাকে, কিন্তু বয়স বাড়ে না, হেমচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। অসাধারণ শক্তিমত্তার সহিত বালসুলভ তরলতা মিশিলে যে অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি হয়, হেমচন্দ্রের তাহাই ছিল। দুই একদিনের মধ্যেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি সাধারণের "হেমদা" হইয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের পাশের দুইটি ঘরে লেখাপড়া ও ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল; আর আমাদের ঘরটী হইয়া উঠিল নাচ, গান, হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ও চিমটি-কাটাকাটির কেন্দ্র। বলা বাহুল্য, উল্লাসকর আমাদের সহিত একত্রই ছিল। সে না থাকিলে আসর জমিত না। আমরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া যে জেলে আসিয়াছি, হট্টগোলের মধ্যে সে কথা মনেই হইত না।

দিন কয়েক পরে সুখের মাত্রা আরও এক পর্দ্দা চড়িয়া গেল। বাহির হইতে পুলিশ আরও কয়েক জনকে ধরিয়া আনিল। মোট আমরা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন হইলাম। এত লোককে তিনটী কুঠরীর মধ্যে পুরিতে গেলে অন্ধকূপহত্যার পুনরভিনয় করিতে হয়। ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে, একটা ওয়ার্ড খালি করিয়া আমাদের সকলকে সেখানে রাখা হোক। কাজেই সকলে আসিয়া একসঙ্গে মিশিলাম। নরক একেবারে গুলজার হইয়া উঠিল।

জেলের খাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ করায়, ডাক্তার সাহেব আমাদের জন্য বাহির হইতে ফল মূল বা মিষ্টান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সুশীল সেনের পিতা প্রায়ই আম, কাঁঠাল ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেন। কলিকাতার অনুশীলন সমিতির ছেলেরাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও মাংস পাঠাইয়া দিত। সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ "হেমদা" সেগুলি হাসপাতালে লইয়া গিয়া পোলাও বানাইয়া আমাদের

ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আম কাঁঠাল এত অধিক পরিমাণে আসিত যে, খাইয়া শেষ করা দায় হইত; সুতরাং সেগুলি পরস্পরের মুখে ও মাথায় মাখাইয়া সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত, কয় জনেই বেশ গাহিতে পারিত; কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ—বড় একটা গাহিতনা। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল। ভারত-ব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত। গান বা পদ্য কস্মিনকালেও আমার বড় একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতের সেই গানটার দুই এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে—

"উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল!
* * *
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলি,
বীর-রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্ত-চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণ-বাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখন স্পর্শও করিতে পারিবে না।

ছেলেরা অনেকেই সেকালের স্বদেশী গান গাহিত। তাহাদের অদম্য উৎসাহ আর স্ফূর্ত্তি চাপিয়া রাখাই দায়। শচীন সেন ছিল তাহাদের অগ্রণী। পনেরো বৎসর যখন তাহার বয়স, তখন সে মা-বাপের কথা ঠেলিয়া, একরূপ জোর করিয়াই, কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। কিন্তু তাহার প্রাণের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা কলেজের বিদ্যায় মিটিল না; শেষে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া সে বাগানে যোগ দিল। জেলে আসিবার পর চীৎকার করিয়া, লাফালাফি করিয়া, গান গাহিয়া, কাঁধে চড়িয়া, আম কাঁঠাল চুরি করিয়া, সে যে শুধু আমাদেরই অস্থির করিয়া তুলিল, তাহা নহে; জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহার বক্তৃতার ও গানের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। রাত বারোটা একটা বাজিয়া চলিয়াছে, শচীনের গানের আর বিরাম নাই। জেলার বাবুটী নিতান্ত ভদ্রলোক। এতগুলা ভদ্রলোকের ছেলেকে তাঁহার জেলের মধ্যে পুরিয়া দেওয়ায় তিনি নিতান্তই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে সরকারী চাকরী, পেন্সন পাইবার আর বৎসর খানেক মাত্র বিলম্ব—আর অপর দিকে চক্ষুলজ্জা—এই দোটানায় পড়িয়া বেচারার একেবারে প্রাণান্ত। একে ভদ্রলোক প্রৌঢ় বয়সে চতুর্থ না পঞ্চম পক্ষের পাণিপীড়ন করিয়াছেন, তাহার উপর রাত্রিকালে ছেলেদের গানের জ্বালায় অস্থির! একদিন প্রাতঃকালে তিনি নিতান্ত ভাল মানুষের মত আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, ছেলেদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া যেন আমরা একটু শান্ত করিয়া রাখি। কেন-না রাত্রিকালে গৃহিণীর ও মশকের উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের গানের উপদ্রব আসিয়া জুটিলে, তাঁহার আর এক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া পেন্সন ভোগ করিবার সুবিধা মিলিবে না। এ হেন সদ্‌যুক্তির পর আর কি করা যায়? কথামালা ও শিশুশিক্ষা হইতে উদ্ধৃত করিয়া অনেকগুলি ভাল ভাল উপদেশ ছেলেদের শুনাইয়া দিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিলাম; কিন্তু সদুপদেশ মত কার্য্য করিবার বুদ্ধিসুদ্ধিই যদি তাহাদের থাকিবে, তাহা হইলে আর ভারত-উদ্ধার করিবার কুপ্রবৃত্তি তাহাদের স্কন্ধে চাপিবে কেন?

অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত, তবে মধ্যে মধ্যে উঁহারাও যে বাদ পড়িতেন—তাহা নহে। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্রের মনে কোথায় একটা বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সে প্রায় সমস্ত দিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। দেবব্রত সকালে উঠিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সেই যে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার পাঁচটা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা গীতা ও ভাগবত পড়িত। তাহার সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত। অরবিন্দ

বাবুর জন্য একটা কোণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানে আপনার সাধন ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টা পায়চারী করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তবে সন্ধ্যাবেলায় এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলেখেলায় যোগ না দিলে তাঁহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম বা বিস্কুট লুকান আছে, তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সে দিন এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুন্নমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি—কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দ বাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দ বাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন; নিদ্রাভঙ্গের আর কোন লক্ষণই দেখা গেল না! চুরিও ধরা পড়িল না।

রবিবারে আমাদের স্ফূর্ত্তির মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইত। আত্মীয়-স্বজন ও বাহিরের অনেক লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন; সুতরাং অনেক প্রকার সংবাদাদি পাওয়া যাইত। মিষ্টান্নও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। বিপুল হাস্যরসের মাঝে মাঝে একটু আধটু করুণ রসও দেখা দিত। শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কি রকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপ্‌সীর নাম করিল। পাছে লপ্‌সীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া তাহার পিতার মনে কষ্ট হয়, সেই ভয়ে শচীন লপ্‌সীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল—"লপ্‌সী খুব পুষ্টিকর জিনিস।" পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বাড়ীতে ছেলে আমার পোলাওএর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপ্‌সী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।" ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয়, তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাষ যে একেবারে পাই নাই, তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া, তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্ত্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল!

এইরূপে ত' সুখে দুঃখে জেলখানায় আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। ওদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারও আরম্ভ হইয়া গেল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য; আদালতে উকিল ব্যারিষ্টারের ছড়াছড়ি; কিন্তু আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সবটাই যেন আমাদের চোখে একটা প্রকাণ্ড তামাস' বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কত রকম বেরকমের সাক্ষী আসিয়া সত্য মিথ্যার খিচুড়ী পাকাইয়া যাইত; আমরা শুধু শুনিতাম আর হাসিতাম। তাহাদের সাক্ষ্যের সহিত যে আমাদের মরণ বাঁচনের সম্বন্ধ, এ কথাটা মনেই আসিত না। স্কুলের ছুটীর পর ছেলেরা যেমন মহাস্ফূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে গাহিতে চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত, তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেণ্টুলানটা কোথায় ছেঁড়া আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট-ইন্সেপেক্টারের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরসুলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত, আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম। কিন্তু এই হাসি-পর্ব্বের পর যে একটা প্রকাণ্ড কান্না-পর্ব্ব আছে, তাহা ভাল করিয়া তখন বুঝি নাই।

নরেন্দ্র গোস্বামীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা যাহা ভয় করিয়াছিলাম, ফলে তাহাই হইল। বিচার আরম্ভ হইবার দুই চারি দিন পরেই সে সরকারী সাক্ষী হইয়া কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সাক্ষ্যের ফলে চারিদিকে নূতন নূতন খানা-তল্লাসী আরম্ভ হইল; আর পণ্ডিত হৃষীকেশের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত মারাঠি ও মাদ্রাজী নেতৃবৃন্দকে

আবিষ্কার করিবার জন্য পুলিশ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

নরেন সরকারী সাক্ষী হইবার পরেই তাহাকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া, হাসপাতালে ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। পাছে কেহ তাহাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়ে জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিতেন। জেলার বেচারী একদিন বলিলেন—"দেখুন, আমার হয়েছে তালগাছের আড়াই হাত। তালগাছ সবটা চড়া যায়, কিন্তু শেষ আড়াই হাত ওঠবার সময় প্রাণটা বেরিয়ে যায়। এতদিন চাকরী করে এলুম, বেশ নির্ব্বিবাদে কেটে গেল। আর এই পেন্‌সন্ নেবার সময় আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছি। এখন মানে মানে আপনাদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।" কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তালগাছের শেষ আড়াই হাত আর তাঁহাকে চড়িতে হইল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের মোকর্দ্দমা সেসনে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরাও লম্বা ছুটি পাইলাম। নিষ্কর্ম্মার দল—কাজেই সকলেই হাসে, খেলে, লাফালাফি করে, মোকদ্দমার ফলাফল লইয়া মাঝে মাঝে বিচার-বিতর্কও করে। ছেলেরা কাহাকেও বা ফাঁসিকাঠে চড়ায়, কাহাকেও বা খালাস দেয়। কানাইলাল একদিন বলিল "খালাসের কথা ভুলে যাও, সব বিশ বৎসর করে কালাপানি।" শচীনের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি। সে প্রমাণ করিতে বসিল যে, বিশ বৎসরের মধ্যে দেশ স্বাধীন হইবেই হইবে। কানাইলাল খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল—"দেশ মুক্ত হোক আর না হোক, আমি হবো। বিশ বৎসর জেলখাটা আমার পোষাবে না।" এই কথার দুই একদিন পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পেটে হাত দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে বলিল যে, তাহার পেটে ভারি যন্ত্রণা হইতেছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি সে হাসপাতালেই রহিয়া গেল। মেদিনীপুরের সত্যেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে পুলিস ধরিয়া আনিয়াছিল। কঠিন কাশরোগগ্রস্ত বলিয়া সেও হাসপাতালেই থাকিত।

কানাই হাসপাতালে যাইবার তিন চারি দিন পরেই, একদিন সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া আমরা মুখ-হাত ধুইতেছি, এমন সময় হাসপাতালের দিক হইতে দুই একটা বন্দুকের মত আওয়াজ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চারিদিক হইতে কয়েদী পাহারাওয়ালারা হাসপাতালের দিকে ছুটিতেছে। ব্যাপার কি? কেহ বলিল—বাহির হইতে হাসপাতালের উপর গোলা পড়িতেছে, কেহ বলিল—সিপাহিরা গুলি চালাইতেছে। হাসপাতালের একজন কম্পাউণ্ডার ঘুরপাক খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিয়া জেলের অফিসের কাছে শুইয়া পড়িল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে সংবাদ দিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার পেটের মধ্যেই রহিয়া গেল। প্রায় দশ পনের মিনিট এইরূপ উৎকণ্ঠায় কাটিল, শেষে একটা পুরাণো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল—

"নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি রে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু; কানাই বাবু তা'কে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ঐ দেখুন গে না—কারখানার সুমুখে সে একদম লম্বা হয়ে পড়েছে। আর জেলার বাবুরও আর একটু হলে হয়ে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে খুব প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"

প্রায় পনের মিনিট পরে জেলের পাগলা ঘণ্টা (alarm bell) বাজিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জেলের প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া হাসপাতালের দিকে চলিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তাহারা কানাই ও সত্যেনকে ধরিয়া ৪৪ ডিগ্রীর দিকে লইয়া চলিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নানারূপ গুজবের মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম, তাহা এই:—হাসপাতালে থাকিবার সময় সত্যেনের মনে হয় যে, যখন কাশরোগে ভুগিতেছি, তখন ত অল্পদিনের মধ্যে মরিতেই হইবে; বৃথা না মরিয়া নরেনকে মারিয়া মরিলেই ত বেশ হয়। কানাইলাল সে কথা শুনিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পিস্তল লইয়া হাসপাতালে আসে। পেটের যন্ত্রণা শুধু ডাক্তারকে ঠকাইবার জন্য ভাণ মাত্র। তাহার পর সত্যেন নরেনকে বলিয়া পাঠায় যে, জেলের কষ্ট আর তাহার সহ্য হইতেছে না; সেও নরেনের

মত সরকারী সাক্ষী হইতে চায়; সুতরাং পুলিসের কাছে কি কি বলিতে হইবে, তাহা যদি দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করে, তাহা হইলে আদালতে জেরার সময় কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। সত্যেনের ছলনায় ভুলিয়া নরেন তাহাই বিশ্বাস করিল এবং একজন ইউরোপীয় প্রহরী সঙ্গে লইয়া সত্যেনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া তাহার উরু লক্ষ্য করিয়া গুলি করে, তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটা গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল হাসপাতালে নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে, তখন সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে, নরেন কোথায় পলাইয়াছে, তাহা যদি সে বলিয়া না দেয়, ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে, নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার, ডেপুটী জেলার, অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার, সবাই সদলবলে হাসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝে কানাই-এর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; তবে জেলার বাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল, তখন বন্দুক, কীরিচ, লাঠি সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।

এখন প্রশ্ন এই, পিস্তল আসিল কোথা হইতে? কয়েদীরা গুজব রটাইল যে, বাহির হইতে আমাদের জন্য যে সমস্ত ঘিয়ের টিন বা কাঁঠাল আসিত, তাহার মধ্যে ভরিয়া কেহ পিস্তল পাঠাইয়া থাকিবে। কানাইলাল বলিল, ক্ষুদিরামের ভূত আসিয়া তাহাকে পিস্তল দিয়া গিয়াছে। প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের এক আধখানা বই পড়িয়াছি, কিন্তু ভূতকে পিস্তল দিয়া যাইতে কোথাও দেখি নাই। আর আমাদের স্বদেশী ভূতেরা গৃহস্থের বাড়ীতে ইট-পাটকেল ফেলে; খুব জোর কচুপাতায় মুড়িয়া এক আধটা খারাপ জিনিষ ছুঁড়িয়া মারে; সুতরাং পিস্তলের ব্যাপারে ভূতের থিওরিটা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কাঁঠাল বা ঘিয়ের টিনও ডাক্তার-সাহেব নিজে পরীক্ষা করিয়া দিতেন, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া দুই দুইটা রিভলভার আসা তত সুবিধার কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাঁজা, গুলি, আফিম, সিগারেট, সবই যে রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, সে রাস্তা দিয়া পিস্তল যাওয়া ত বিচিত্র নয়।

যাক্ সে কথা। তাহা লইয়া এখন মাথা ঘামাইয়া কোন ফল আর নাই। কিন্তু নরেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অদৃষ্ট পুড়িল। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সশস্ত্র সিপাহি শান্ত্রী লইয়া ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর একে একে আমাদের সকলের তল্লাসী লইয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর ব্যারাকের তল্লাসী আরম্ভ হইল। বিছানার মধ্যে বা এদিক ওদিক দশ বিশটা টাকা লুকান ছিল। তল্লাসীর সময় প্রহরীরা তাহা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া লইল। আমাদের কাছে ত কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় পুলিসের কর্ম্মচারীতে জেল ভরিয়া গেল। আরও রিভলভার জেলের মধ্যে লুকান আছে কি না, পুকুরের মধ্যে দুই একটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না—ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণা চলিতে লাগিল। আমাদের বড় আশা হইয়াছিল যে, রিভলভার অনুসন্ধান করিবার জন্য যদি জেলখানার পুকুরের জল ছেঁচিয়া ফেলে, তাহা হইলে এক আধদিন যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। অধিকন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল আসিয়া আবার আমাদের পৃথক্ পৃথক্ কুঠরীর (cell) মধ্যে বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া

গেলেন। ডিগ্রী খালি করিয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্রলোকের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন—"মশায়, এতই যদি আপনাদের মনে ছিল, ত জেলের বাইরে কাজটা করলেইত হতো। দেখছি, ত আপনারা একেবারে মরিয়া ; তবে ধরা পড়তে গেলেন কেন?" আমরা সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, এ কার্য্যের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝতেই পারচি। যাই হোক, আপনাদের যা হবার তা হবে; এখন আমার দফা রফা হয়ে গেল।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই ৪৪ ডিগ্রী হইতে সমস্ত কয়েদী অন্যান্য জেলে চালান করিয়া আমাদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হইল। জেল যে কাহাকে বলে, এতদিনে তাহা বুঝিলাম।

পুরাতন সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপর নরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার পড়িল; তাঁহার জায়গায় নূতন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। পুরাতন জেলার ও ডাক্তার বদলি হইয়া গেলেন। আমাদের হাঁসপাতাল যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। অসুখ হইলে কুঠরীর মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইত। কাহারও সহিত আর কাহারও কথা কহিবার উপায় রহিল না। সমস্ত দিন কুঠরীর মধ্যে খাও দাও, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। জেলের অন্যান্য অংশ হইতেও কোন লোক ৪৪ ডিগ্রীতে ঢুকিতে পাইত না।

ক্রমে দেশী প্রহরীর পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় প্রহরী আসিল, আর দিনের বেলা ও রাত্রি কালে দুইদল গোরা সৈন্য আসিয়া জেলের ভিতরে ও বাহিরে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হইয়াছিল যে, আমরা বোধ হয় জেল হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথম দুই কুঠরীতে কানাই ও সত্যেন আবদ্ধ থাকিত। পাঁচ সাত দিন অন্তর এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে বদলী হইতাম। যখন কানাই বা সত্যেনের কাছাকাছি কোন কুঠরীতে আসিতাম, তখন রাত্রিকালে চুপি চুপি তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। দিনের বেলা কাহারও সহিত কথা কহিবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রাতঃকালে ও বৈকালে আধঘণ্টা করিয়া উঠানের মধ্যে ঘুরিতে পাইতাম ; কিন্তু সকলকেই পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইত। প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা হইত না।

সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার যে কি যন্ত্রণা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। একদিন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে পড়িবার জন্য বই চাহিলাম। তিনি দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নরেনের মৃত্যুর পর তাঁহার হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম, তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম, কানাইলালের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমরা সেদিকে যাইবার সময় প্রহরীও বাধা দিল না। পরে শুনিলাম যে, কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইএর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটী নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে, সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসীকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর নিকট শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিরোধের এমন পথও আছে, যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত!

তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজশাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা। কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?" যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।

কিছুদিন কুঠরীতে বদ্ধ থাকিবার পরে আলিপুরের জজের আদালতে আমাদের মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। দিনের মধ্যে ঘণ্টা কয়েকের জন্য একটু খোলা হাওয়া খাইয়া ও লোকজনের মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণগুলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুই একজন ভিন্ন মোকর্দ্দমার খরচ যোগাইবার পয়সা কাহারও নাই; সুতরাং অরবিন্দ বাবুর সাহায্যের জন্য যে চাঁদা উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই উকিল-ব্যারিষ্টারদের অল্পস্বল্প খরচ দেওয়া হইতে লাগিল। যাঁহাদের অল্প দক্ষিণায় পোষাইল না, তাঁহারা দুই চারিদিন পরেই সরিয়া পড়িলেন; শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

হাইকোর্ট ছাড়িয়া আলিপুরে মোকর্দ্দমা চালাইতে আসায় ব্যারিষ্টারদের অনেক অসুবিধা; সুতরাং মোকর্দ্দমা যাহাতে হাইকোর্টে যায়, সে জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ, হাইকোর্টে গেলে বিচারের ভার জুরির উপর পড়িত। বারীন্দ্রের বিলাতে জন্ম; সে একজন পুরাদস্তর European British-born subject, সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বিলাতী সাহেবের অধিকার চায় কি না, তখন সে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিল—না। কাজে কাজেই আলিপুরের জজের কাছে আমাদের বিচার আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিচারের কে খবর রাখে, আমরা হট্টগোল লইয়াই ব্যস্ত। আদালত খোলার আরও একটা মহাসুবিধা এই যে, দুপুর বেলা জলখাবার পাওয়া যায়। জেলের ডাল-ভাত খাইয়া খাইয়া প্রাণপুরুষ যেরূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, তাহাতে অনন্তকাল যদি এই মোকদ্দমা চলিত, তবুও জলখাবারটুকুর খাতিরে তিনি ঐ ব্যবস্থায় রাজী হইয়া পড়িতেন।

কোর্টে আসিবার ও যাইবার সময় আমাদের হাতকড়ার ভিতর দিয়া শিকল বাঁধা থাকিত। দুপুর বেলা শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গেলে সেই হাতকড়া পরান অবস্থায় পুলিশ আমাদের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না; কেন না "ন্যাংটার নেই বাট-পাড়ের ভয়।" যাহার মান নাই, তাহার আবার মানহানি কি? কিন্তু অরবিন্দ বাবুকে হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে মনটার ভিতর একটা বিদ্রোহ জমাট হইয়া উঠিত। তিনি কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিরোধ ভদ্রলোকের মত সমস্তই নীরব হইয়া সহ্য করিতেন।

সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত; আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল, ব্যরিষ্টারের জেরা; পুলিশ-কর্ম্মচারীদের ছুটাছুটি, সবই যেন একটা বিরাট তামাসা। আমাদের হাস্য-কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিষ্টারেরা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে অনুরোধ করিতেন "ছেলেদের একটু থামতে বলুন।" অরবিন্দবাবু নির্ব্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; ব্যারিষ্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে, ছেলেদের উপর তাঁহার কোনও হাত নাই।

বিচারসংক্রান্ত সব স্মৃতিটাই প্রায় ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু মনে আছে, ইন্সপেক্টর শ্যামশূল আলমের কথা। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল। মিষ্ট কথায় কিরূপে কাজ গোছাইতে হয়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন; তাই ছেলেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গান গাহিত—"ওগো, সরকারের শ্যাম তুমি, আমাদের শূল। তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু, তুমি দেখবে চোখে সরসে-ফুল!" আমাদের মোকর্দ্দমা শেষ হইবার পর সরকার বাহাদুর তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি করিয়া দেন, কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাকে সে পদ-গৌরব অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কোর্ট-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত আবদর রহমান সাহেবের কথাও মনে পড়ে, কেননা আমাদের জলখাবার যোগাইবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত তিনিই ছিলেন পুলিস-কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক মাত্র ভদ্রলোক। আমাদের সম্ভবতঃ দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া, তাঁহার মুখে যে করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিত, তাহা আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

কিন্তু এ সমস্ত বাহিরের কথা আমাদের খুব বেশী আন্দোলিত করিত না। আমাদের মধ্যে তখন অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহাই তখন আমাদের কাছে মোকর্দ্দমার দৈনন্দিন ঘটনা অপেক্ষা ঢের বেশী সত্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শুধু কাজ লইয়া যাহাদের একতার বাঁধন, কাজ ফুরালেই তাহাদের একতাও ফুরাইয়া আসে। ধরা পড়িবার পর আমাদের কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী, তাঁহারা সকলেই এক ভাবের ভাবুক নহেন। দেশের পরাধীনতা দূর হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্বাধীন হইবার পর দেশকে কিরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাহার পর আমরা যে ধরা পড়িলাম, তাহা কতটা আমাদের নিজেদের দোষে, আর কতটা ঘটনাচক্রের দোষে—তাহা লইয়াও আমাদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিত। বাহিরে কাজ-কর্ম্মের তাড়ায় যে সমস্ত ভেদ চাপা পড়িয়া থাকিত, ধরা পড়িবার পর তাহা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

একদল শুধু ধর্ম্মচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন; আর যাঁহারা রাজনীতির উপাসক, তাঁহারা ঐ দলকে ঠাট্টা করিয়া দিন কাটাইতেন। ঐ সময় আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র "ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকা" কথাটার সৃষ্টি করেন। হেমচন্দ্রের বিশ্বাস যে, ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিলে মানুষের বুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া যায়, আর সে কাজের বাহির হইয়া পড়ে। ডকের মধ্যে বসিয়া উভয় দলেরই বিচার কার্য্য চলিত। দেবব্রত ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন; হেমচন্দ্র ধার্ম্মিকদিগের নামে ছড়া ও গান বাঁধিতেন। বারীন্দ্র এককোণে দু' একটি অনুচর লইয়া কখনও বা ধর্ম্মালোচনা করিত, কখনও বা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। আমি উভয় দলেরই রসাস্বাদন করিয়া ফিরিতাম।

এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন—অরবিন্দ বাবু। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত—তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত—তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। ভাত খাইবার সময় আরস্বলা, টিকটিকি ও পিঁপড়াদের ভাত খাইতে দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে, অরবিন্দ বাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি স্নান করবার সময় মাথায় তেল দেন?" অরবিন্দ বাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—"আমি ত স্নান করি না।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার চুল তবে অত চক্‌চক্ হয় কি করে?" অরবিন্দ বাবু বলিলেন—"সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলা পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল বসা (fat) টেনে নেয়।"

দুই একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে, অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন ক'রে কি পেলেন?' অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি।"

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে

অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম, তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম, তাহা নহে; তবে, এই ধারণাটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এই অদ্ভুত মানুষটীর জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা করিয়াছিলেন, তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ বাবু বলিলেন যে, একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমি ছাড়া পাব।"

ফলে তাহাই হইল। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল, তখন দেখা গেল, সত্যসত্যই অরবিন্দ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির, আর দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। বাকি অনেকের পাঁচ সাত দশ বৎসর করিয়া জেল বা দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল; বলিল,—"দায় থেকে বাঁচা গেল।" একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাঁহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—Look look, the man is going to be hanged and he laughs! (দেখ, লোকটার ফাঁসি হইবে, তবু সে হাসিতেছে)। তাঁহার বন্ধুটী আইরিশ; তিনি বলিলেন—"Yes, I know; they all laugh at death" (হাঁ, আমি জানি; মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের জিনিস।)

১৯০৯ এর মে মাসে রায় বাহির হইল। আমরা পনের ষোল জন মাত্র বাকি রহিলাম; বাকি সবাই হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল। আমরাও হাসিতে হাসিতে তাহাদের বিদায় দিলাম; কিন্তু সে হাসির তলায় তলায় একটা যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটা যেন হঠাৎ অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িল। পণ্ডিত হৃষীকেশ মূর্ত্তিমান বেদান্তের মত বলিয়া উঠিলেন—"আরে কিছু নয়, এ একটা দুঃস্বপ্ন।" হেমচন্দ্র বুকে সাহস বাঁধিয়া বলিলেন—"কুচ পরোয়া নেহি, এ ভি গুজর যায়েগা" (কোন ভয় নেই, এদিনও কেটে যাবে)। বারীন্দ্র ফাঁসির হুকুম শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"সেজদা (অরবিন্দ) বলে দিয়েছে, ফাঁসী আমার হবে না।" আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম; কিন্তু বীরের মন যে ধাতু দিয়া গঠিত হয়, আমার মন যে সে ধাতু দিয়া গঠিত নয়, তাহা এইবার বেশ ভাল করিয়াই দেখিতে পাইলাম। মনটা যেন নিতান্ত অসহায় বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে! উঃ! এর চেয়ে যে ফাঁসী ছিল ভাল। ভগবানের দোহাই দিয়া যে নির্ব্বিবাদে দুঃখকষ্ট হজম করিব, সে উপায়ও আমার ছিল না। ভগবানের উপর বিশ্বাসটা অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ছেলেবেলা একবার বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে লইয়া সাধু সাজিতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন ভগবানের উপরে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব বেশ একটা ছিল। মায়াবতীর মাঠে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট নির্গুণ ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হইবার পর ধীরে ধীরে সে ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায় উড়িয়া গেল। স্বামীজী বিদ্রূপ ও যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিয়া যেদিন আমার ভগবানটিকে নিহত করেন, সে দিনের কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। এই বিশাল মায়া-সমুদ্রের মাঝখানে একাকী ডুব-সাঁতার কাটিতে কাটিতে সম্পূর্ণ হিমাঙ্গ হইয়া ওপারে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উঠিতে হইবে ভাবিয়া, আমার রক্ত একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছিল। নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুব দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকার নামই মুক্তি—এ তত্ত্ব আমার মাথার মধ্যে বেশী দিন রহিল না। চরম তত্ত্ব বলিয়া একটা কিছু মানুষ আপনার মধ্যে পাইয়াছে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল, নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আরম্ভ করিয়া জাগ্রত অবস্থা পর্য্যন্ত সব অবস্থাগুলাই অনন্তের এক একটা দিক মাত্র; এ দুই অবস্থার উপরে ও নীচে এরূপ অনন্ত অবস্থা পড়িয়া আছে। সেই অনন্তের মধ্যে এমন একটা কিছু সত্য আছে, যাহা মানুষের জীবনে কর্ম্মরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং জীবনকে ছাড়িয়া পলাইতে যাইব কেন? সমাধির চেয়ে কর্ম্ম কিসে ছোট?

কর্ম্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লেলে আসিয়া যখন আমাদের মধ্যে ভক্তিমূলক সাধনা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন, তখন মহাবিজ্ঞের ন্যায়

তাঁহার ভক্তিবাদকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। সবটাই যখন সেই অনন্তের মূর্ত্তি, তখন ভগবানের যে রূপ জগতে মূর্ত্ত, তাহা ছাড়িয়া অন্য রূপ ধ্যান করিবার সার্থকতা কি? লেলে তখন শুধু এই কথাটী বলিয়াছিলেন—"যাহা বলিতেছ, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর আমার বুঝাইবার কিছু নাই; কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতেরও স্থান আছে, এ কথা ভুলিও না।"

আজ যখন বিধাতা জোর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন, তখন নিজের মধ্যে কোন অবলম্বনই খুঁজিয়া পাইলাম না; একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশ্রয় পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম; প্রাণটা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর"।

বিপদে পড়িলে আর কিছু লাভ না হোক, মানুষ নিজেকে চিনিবার অবসর পায়। কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাই আরম্ভ হইল। সেসন্স কোর্টের রায় বাহির হইতেই আমাদের পায়ে বেড়ী লাগাইয়া কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় এক একবার মনে হইত যেন পাগল হইয়া গেলাম। মাথার ভিতর উন্মত্ত চিন্তার তরঙ্গ যেন মাথা ফাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দিন কাহারও সহিত কথা কহিবার জো নাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় পাশের কুঠরীতে একটী ছেলে চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাল মান লয়ের সহিত সে গানের বড় একটা সম্বন্ধ নাই; কিন্তু সে গান শুনিয়া খুব এক চোট হো হো করিয়া হাসিয়া আর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া যে আমার প্রচণ্ড মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ মনে পড়ে। গান শুনিয়া চারিদিক হইতে ইউরোপীয় প্রহরীরা ছুটিয়া আসিল; এবং পরদিন সুপারিন্টেনডেণ্ট সাহেবের বিচারে বেচারার চারিদিন চালগুঁড়া সিদ্ধ (penal diet) খাইবার ব্যবস্থা হইল।

আর একটী ছেলে একদিন দেওয়াল হইতে চুণ খসাইয়া দরজার গায়ে লিখিয়া রাখিল—Long live Kanailal!" তাহারও চারিদিন সাজা হইল।

প্রহরীদের মধ্যে সকলেই আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টায় ফিরিত। কিন্তু দু একজন বেশ ভালমানুষও ছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা সাজা পাইত, তাহাদের জন্য একজন ইউরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পুরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইত।

একজন লম্বা চওড়া হাইলাণ্ডার প্রহরী মাঝে মাঝে আমাদের জ্বালাতন করিয়া আপনার প্রহরীজন্ম সার্থক করিত। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম "Ruffian warder"; মাঝে মাঝে সে আমাদের বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিত যে, সে ও তাহার স্বজাতিরা ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের চেয়ে মিষ্টমুখ সয়তান ছিল চিফ্ ওয়ার্ডার স্বয়ং। সে আবার মাঝে মাঝে ধর্ম্মের তত্ত্বকথাও আমাদের শুনাইত; এবং আশা দিত যে, জীবনের বাকি কয়টা দিন সৎ হইয়া চলিলে স্বর্গে গিয়া আমরা ইংরাজের মত ব্যবহারও পাইতে পারি। হায়রে ইংরাজের স্বর্গ! জেলখানার মধ্যে গালাগালি, মারামারি সবই সহ্য হয়; কিন্তু ইহাদের মুখে ধর্ম্মের বক্তৃতা সহ্য করা দায়!

আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র চিত্র-বিদ্যায় বেশ নিপুণ। তিনি দেওয়ালের শ্যাওলা, চুণ, ইটের গুঁড়া ঘসিয়া নানারূপ রং প্রস্তুত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়ালের গায়ে আঁকিয়া রাখিতেন! প্রহরীদের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য মাঝে মাঝে কাগজের উপর নখ দিয়া নানারূপ ছবিও তাহাদিগকে আঁকিয়া দিতেন।

যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ নন, তাঁহারা মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে কবিতা লিখিয়া মনের খেদ মিটাইতেন। একদিন এক কুঠরীর মধ্যে গিয়া দেখিলাম, একজন অজ্ঞাতনামা কবি দেওয়ালের গায়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট, শরীর হইল কাঠ,
সোনার বরণ হৈল কালি।
প্রহরী যতেক বেটা, বুদ্ধিতে বোকা পাঁটা,
দিন রাত দেয় গালাগালি॥

আমাদের সে সময় কাজ ছিল পাট-ছেঁড়া।

মাঝে মাঝে এক আধটী বেশ ভাল কবিতাও নজরে পড়িত। আমার মনের ফাঁদে কবিতা প্রায় ধরা পড়ে না; কিন্তু এই দুইছত্র কিরূপে আটকাইয়া গিয়াছিল—

"রাধার দুটী রাঙ্গা পায়
অনন্ত পড়েছে ধরা—
উঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।"

হায়রে মানুষের প্রাণ! জেলের কুঠরীর মধ্যে বন্ধ থাকিয়াও রাধার দুটী রাঙ্গা পায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে!

সেসন্স কোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই হাইকোর্টে আমাদের আপিলের শুনানি চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম বন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল। অনেকের কারাদণ্ড কমিয়া গেল, কেবল হেমচন্দ্রের ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পাছে দড়ি পাকাইয়া ফাঁসি খাই, সেই ভয়ে আমাদের পাট ছিঁড়িতে দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই যাহারা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত তাহারা ভিন্ন অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমরা আন্দামানের জাহাজের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই পুলিসের আনাগোনা একটু ঘন ঘন আরম্ভ হইয়াছিল—সাজা কমাইবার প্রলোভনে যদি কেহ কোন নূতন কথা বলিয়া দেয়! আমাদের ধরা পড়িবার পরই নানা কারণে এতকথা বাহির হইয়া গিয়াছিল যে, পুলিসের জানিবার আর বোধ হয় বেশী কিছু বাকী ছিল না! কিন্তু তথাপি পুলিস একবার নাড়া চাড়া দিয়া দেখিল, আর কিছু সংগ্রহ করা যায় কিনা। নির্জ্জন কারাবাসের সময় মানুষের মন অপরের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যেরূপ অস্থির হইয়া উঠে, পুলিসেরা তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। দুই এক মাস যদি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের টিকটিকি, আরসুলার সহিতই কথা কহিতে ইচ্ছা হয় —পুলিস ত তবু মানুষ! কতকগুলা বাজে কথা কহিতে গেলে তাহার সহিত দুই একটা গোপনীয় কথাও বাহির হইবার সম্ভাবনা। বিশ ত্রিশ জন লোকের নিকট ঘুরিলে অন্ততঃ চার পাঁচ জনের নিকট হইতে এরূপ এক আধটা কাজের কথা পাওয়া যায়! পুলিসের তাহাই ভরসা।

কথা বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, নামে 'গুপ্তসমিতি' হইলেও, কতকটা অভিজ্ঞতা ও কতকটা অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় গুপ্তসমিতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে; এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত বিনা প্রয়োজনে পরিচিত হইবার অবসর পায় না। সমিতির অধ্যক্ষদের এই চেষ্টা থাকে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কর্ম্ম ভিন্ন অপরের কর্ম্ম না জানিতে পারে। এইরূপ নিয়ম থাকায় এক আধ জনের দুর্ব্বলতায় সমস্ত কাজ নষ্ট হইতে পায় না। নানা কারণে সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হইয়া উঠে নাই, আর তাহার উপর আমাদের স্বভাবসিদ্ধ গল্প করিবার প্রবৃত্তি ত আছেই। আমাদের দেশে প্রত্যেক সমিতির ভিতর হইতে যে দুই একজন করিয়া সরকারী সাক্ষী বাহির হইয়াছিল, কার্য্যপ্রণালীর শিথিলতাই তাহার প্রধান কারণ। দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলেও অনেক সময় অনেক সমিতির গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতালোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য্য।

একটা সুবিধার কথা এই যে, গল্প করিবার প্রবৃত্তি শুধু আমাদের মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় প্রহরীরাও প্রায় সমস্ত দিন জেলের মধ্যে থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যেও বেশ একটু দলাদলি ছিল। একদল অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরও সাহায্যপ্রার্থী হইত; এবং তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে জেলের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইত।

কিছুদিন এইরূপ থাকিবার পর শুনিলাম যে, Civil Surgeon আমাদের আন্দামানে পাঠাইবার জন্য পরীক্ষা করিতে আসিবেন। যথাসময়ে Civil Surgeon আসিয়া পেট টিপিয়া, চোখ দেখিয়া, সাতজনের ভবনদী পারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সুধীর ও আমি তখন রক্ত-আমাশয়ে ভুগিতেছিলাম বলিয়া আমাদের আরও কিছুদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সাধারণ কয়েদীর পক্ষে নিয়ম এই যে, একবার রোগের জন্য আন্দামান যাওয়া বন্ধ থাকিলে, আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হয়; কিন্তু আমাদের বেলা সে আইন খাটিল না। সরকার বাহাদুরের

আদেশক্রমে আমাদের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কারাগৃহ হইতে একবার দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। একদিন ভোরবেলা আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া আমাদের একখানা গাড়ীতে চড়ান হইল। দুই পাশে দুইজন সার্জ্জেন্ট বসিল; আর গাড়ী খিদিরপুর ডকের দিকে ছুটিল।

জাহাজে উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জ্জেন্ট বিদ্রূপ করিয়া বলিল—Now say, 'my native land, farewell,' আমরা হাসিয়া বলিলাম—"Au revoir।" বলিলাম বটে, কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি মনে হইতে লাগিল।

রাজনৈতিক কয়েদী আমরা শুধু দুই জন মাত্র ছিলাম—সুধীর ও আমি। জাহাজের খোলের মধ্যে একটা কামরায় আমরা ছিলাম; অপর কামরায় অন্যান্য কয়েদী ছিল। জাহাজের একজন বাচ্ছা কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের ফটো তুলিয়া লইল। বিলাতের কোন্ কাগজে সে এই সমস্ত ফটো ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কথাটা শুনিবামাত্র পাগড়ীটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইলাম। সম্ভাদরে যদি একটা ছোট খাট বড়লোক হইয়া পড়া যায় ত মন্দ কি।

তিন দিন তিন রাত সেই জাহাজের খোলের মধ্যে চিড়া চিবাইতে চিবাইতে যাইতে হইবে দেখিয়া, সুধীর ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে একটা হাতীর মত জোয়ান—তিন মুঠো চিড়া চিবাইয়া তাহার কি হইবে? পুলিসের একজন পাঞ্জাবী মুসলমান হাওলদার বলিল—"বাবু, যদি আমাদের হাতের ভাত খাও, ত দিতে পারি।" মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতিও আছে, আর ভাত খাওয়াইয়া হিন্দুর জাত মারিবার ইচ্ছাও একটু একটু আছে। আমরা বলিলাম—"খুব ভাল কথা। আমাদের জাত এত পাকা যে, যে কোন লোকের হাতের ভাত খাইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না।" সেখানে শিখ হাওলদারও ছিল, তাহারা ভাবিল পেটের জ্বালায় আমরা পরকালটা একেবারে নষ্ট করিতে বসিয়াছি। তাই তাহারাও আমাদের ভাত দিতে চাহিল। আমরা নির্ব্বিবাদে উভয় দলের রান্না ভাত খাইয়া পেটের জ্বালাও থামাইলাম, ও আপনাদের উদারতাও প্রমাণ করিলাম। শিখেরা ভাবিল—"বাঙ্গালী বাবুরা বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান একেবারে নাই।" যাই হোক, ধর্ম্ম বাঁচিল কি মরিল, তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু দুটি ভাত খাইয়া সে যাত্রা প্রাণটা বাঁচিয়া গেল। জাহাজে আমাদের নোয়াখালী জেলার অনেকগুলি বাঙ্গালী মুসলমান মাল্লাও ছিল, তাহাদের হাতে রান্না ভাত ও কুমড়ার ছক্কা যেন অমৃতোপম মনে হইল।

যাই হোক, কোনও রূপে তিন দিন জাহাজে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে পোর্টব্লেয়ারে হাজির হইলাম। দূর হইতে জায়গাটি বড়ই রমণীয় মনে হইল। সারি সারি নারিকেল গাছ, আর তাহার মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলোগুলি যেন একখানি ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত। ভিতরের কথা তখন কে জানিত?

দূরে একখানা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী দেখাইয়া দিয়া একজন সিপাহী বলিল—"ঐ কালাপানীর জেল, ঐখানে তোমাদের থাকিতে হইবে।"

জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া সকলকে পরীক্ষা করিয়া গেল। তাহার পর ডাঙ্গায় নামিয়া আমরা বিছানা মাথায় করিয়া বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে জেলের দিকে রওনা হইলাম।

জেলের মধ্যে ঢুকিবামাত্র একজন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমাদের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"So, here you are at last! Well, you see that block yonder. It is there that we tame lions. You will meet your friends there, but mind you don't talk"

(এই যে এসেছে! ঐ দেখছো বাড়ীটা, ঐখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই। ওখানে তোমার বন্ধুদের দেখতে পাবে, কিন্তু খবরদার, কথা ক'য়ো না)।

আমরাও শ্বেতাঙ্গটিকে একবার চক্ষু দিয়া মাপিয়া লইলাম। লম্বায় পাঁচ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় তিন ফুট। একটি প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙকে কোট-পাণ্টলান পরাইয়া মাথায় টুপি পরাইয়া দিলে যেরূপ দেখায়, অনেকটা সেই রকম। তখন জানিতাম না, ইনিই মহামহিম শ্রীমান্ ব্যারী, জেলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার বুলডগের মত মুখখানি দেখিলে মনে হয় যে, কয়েদী তাড়াইতে যাঁহাদের জন্ম, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান নির্জ্জনে বসিয়া ইঁহাকে কালাপানির জেলে কর্ত্তৃত্ব করিবার

জন্তুই গড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে Uncle Tom's Cabin এর লেগ্রিকে মনে পড়ে।

ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম, কেননা প্রায় এগার বৎসর তাঁহার অধীনে এই জেলে বাস করিতে হইয়াছিল।

ইনি রোমান ক্যাথলিক আইরিশ। সারা বৎসর কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যে পাপের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, তাহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে গির্জ্জায় গিয়া পাদরী সাহেবের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া আসিতেন। বৎসরের মধ্যে ঐ একদিন তিনি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ধরিতেন; সে দিন কোন কয়েদীকে তাড়না করিতেন না; আর বাকি ৩৬৪ দিন মূর্ত্তিমান যমের মত কয়েদী তাড়াইয়া বেড়াইতেন।

কয়েদীদের স্বভাবের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে, দুর্দ্দান্ত লোকদিগের প্রতি তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং এইরূপ লোকদিগেরই সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। ব্যারী সাহেবের নিকট প্রহার খাইবার পর অনেক কয়েদীকে বলিতে শুনিয়াছি—"শালা বড় মরদ হৈ।" যাহারা ভাল মানুষ, তাহারা কয়েদীদের মতে স্ত্রী জাতীয়। কয়েদীরা কোন কুকার্য্য করিয়া ভগবানের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিলে ব্যারী বলিতেন—"জেলখানা আমার রাজ্য; এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্টব্লেয়ারে আছি; একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই।" —ব্যারী সাহেবের মুখের কথা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

জেলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ, তাহাদের পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। দেশের জেলে ঐরূপ কোনও নিয়ম না থাকিলেও, কালাপানিতে ঐ নিয়মই বলবৎ। জেল জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে জাতিভেদ মরিয়া প্রেতদশা লাভ করিয়াছে। তবে মুসলমানদের দাড়ি বা শিখের চুলে হাত দেওয়া হয় না; কিন্তু গোবেচারা ব্রাহ্মণের পৈতা কাড়িতে সবাই ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার কারণ—শিখ, মুসলমান গোঁয়ার, কিন্তু ব্রাহ্মণ নিরীহ। যাই হোক, তেজহীন ব্রাহ্মণের নির্ব্বিষ খোলসখানাকে ত্যাগ করিয়া আমরা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেলাম।

জেলে ঢুকিলে প্রথমেই নজরে পড়ে বহু জাতির সমাবেশ। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্ম্মা, মাদ্রাজী, সব মিশিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান; বর্ম্মীও যথেষ্ট। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় হিন্দুর এক-চতুর্থাংশ কিন্তু জেলখানায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান কি করিয়া হইল, তাহা স্থির করিতে গেলে উভয় জাতির একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশে লোকসংখ্যা মোট এক কোটী; অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ; কিন্তু এখানে বাঙ্গালী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। খুন, মারামারি করিতে ব্রহ্মদেশীয় লোক বিশেষ মজবুদ্। অল্পদিন মাত্র তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষের লোকের মত একেবারে শিষ্ট শান্ত হইয়া যায় নাই। হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্য দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুব কম। শিক্ষা প্রচারের আধিক্যবশতঃই হোক বা প্রকৃতির নিরীহতাবশতঃই হোক, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমরা যে সময় উপস্থিত হইলাম, তখন জেলখানার মধ্যে পাঠানের প্রাধান্য খুব বেশী। সব জাতিকে একত্র রাখার ফলে যে দুর্ব্বল জাতিদের উপর অযথা অত্যাচার যথেষ্ট হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

দিনকত থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে, জেলখানায় দুর্ব্বলের পক্ষে সুবিচার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-সাবুদ দিবার বুকের পাটা কয়েদীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। পরের জন্য নিজের ঘাড়ে বিপদ কে টানিয়া আনিতে যাইবে? যে যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইতেই ব্যস্ত। যাহারা খোসামোদ করিতে সিদ্ধহস্ত, মিথ্যা কথা যাহারা জলের মত বলিয়া যাইতে পারে, তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ভাল মানুষ এবং তাহারাই প্রভুদিগের প্রসাদ লাভে সমর্থ। আর যাহারা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করিয়া অপরের জন্য লড়াই করিতে যায়, তাহাদের অদৃষ্টে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘটে! মিথ্যা মোকদ্দমার ফাঁদে পড়িয়া তাহারা অযথা প্রহার খাইয়া মরে। ফলে জেলখানায় যত কয়েদী আসে, তাহার মধ্যে একজনও যে জেল খাটার ফলে সচ্চরিত্র হইয়া যায়, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বাস্তবিকই কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের মোটেই নাই বলিলে চলে। অসচ্চরিত্র করিয়া তোলাতেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণাও তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে

হয় না। কয়েদী তাঁহাদের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে, সে তত কাজের লোক ; তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।

আর একটা মজার কথা এই যে, সে উল্টা রাজার দেশে মুড়ি মিছরী সব একদর—সব রকম অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীই প্রায় এক রকম ব্যবহার পায়। কঠোর বা লঘু পরিশ্রমের সঙ্গে সব সময় অপরাধের গুরুত্বের বা লঘুত্বের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। যে সময় কোথাও নারিকেল ছোবড়ার তার (cior) পাঠাইবার দরকার হয়, সে সময় সকলকেই ছোবড়া কুটিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর যখন নারিকেল বা সরিষার তেলের আবশ্যক হয়, তখন একটু মোটাসোটা সকলকেই ধরিয়া ঘানি গাছে জুড়িয়া দেওয়া হয়। সবটাই ব্যবসাদারী কাণ্ড! কয়েদী সরকার বাহাদুরের গোলাম; আপনাদের দেহের রক্ত জল করিয়া সরকারী কোষাগার পূর্ণ করাতেই তাহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা!

অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা সরকারী পুঁথিতে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুণো পুঁটি অফিসার পর্য্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি। কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই আর মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই।

একবার একটী পাগলকে জেলখানায় দেখিয়াছিলাম। বেচারীর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়; জেলখানায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। তাহার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অতি অস্পষ্ট; কেন যে সে সাজা পাইয়া কালাপানিতে আসিয়াছে, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিত না। এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ক ভাই?" সে উত্তর করিল—"সাত।" তাহাদের নাম করিতে বলায় সে আঙ্গুলের গাঁট গণিয়া পাঁচ জনের নাম করিল। বাকি দুইজনের নাম করিতে বলায় উত্তর দিল—"ভুলে গেছি।" তাহার খাওয়া-পরার বড় একটা ঠিকানা থাকিত না; কখন আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা সারাদিন রাস্তা পরিষ্কার করিয়া বেড়াইত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, লোকটার মাথা খারাপ। তাহাকে পাগলা গারদে না দিয়া কোন্ সুবিচারক যে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। এরূপ দৃষ্টান্ত জেলখানায় অনেক পাওয়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে দুই একজন এমন ওস্তাদ মিলে, যাহারা কাজের ভয়ে পাগল সাজে। একজন বাঙালীকে ঐরূপ দেখিয়াছিলাম। একদিন বেগতিক বুঝিয়া সে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গান জুড়িয়া দিল। চোখে চুণের সামান্য গুড়া লাগাইয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া লইল; আর আবল তাবল বকিতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরীরা তাহাকে জেলারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। জেলার গোটা দুই কলা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে কলা দুটো খাইয়া পরে খোসাগুলোও মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। জেলার স্থির করিলেন লোকটা সত্য সত্যই পাগল; তা' না হইলে খোসা চিবাইতে যাইবে কেন? লোকটা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁরে, খোসা চিবুতে গেলি কেন?" সে বলিল—"কি করি, বাবু সাহেব, বেটাকে ত বোকা বানাতে হবে! একটু কষ্ট না করলে কি আর পাগল হওয়া চলে?"

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলা ভাষায় "উঠ্‌তে লাথি, বস্‌তে ঝাঁটা" বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহার অর্থ যে কি, তাহা জেলখানায় দুই চারি দিন থাকিতে থাকিতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। একেত আমাদের পরস্পরের সহিত কথা কহিবার জো নাই; তাহার উপর যেখানে আমাদের রাখা হইয়াছিল, সেখানে শুধু মাদ্রাজী আর ব্রহ্মদেশীয় লোক। কাহারও কথার এক বর্ণও বুঝিবার উপায় নাই। আহারের ব্যবস্থা দেখিলে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। রেঙ্গুন চালের ভাত, ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় এক রকম চলে; কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসাসমেত কাঁচা কলা ও পুঁই শাক, ছোট কাঁকর আর ইন্দুরনাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়, তরকারীর বদলে তাহার ব্যবহার করিতে গেলে

চক্ষে জল না আসে, বাঙলা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে এ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও বড় বিরল।

কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থাও বেশ চমৎকার। কালাপানিতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায়। সেগুলি সবই সরকারী সম্পত্তি। সেই জন্য সেখানে প্রধানতঃ নারিকেল লইয়াই কারবার। নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তার বাহির করা ও তাহা হইতে দড়ি পাকান, শুষ্ক নারিকেল ও সরিষা ঘানিতে পিষিয়া তেল বাহির করা, নারিকেলের মালা হইতে হুঁকার খোল প্রস্তুত করা—এই সমস্তই জেলখানার প্রধান কাজ। এ ভিন্ন এখানে বেতের কারখানাও আছে। তাহাতে প্রধাধানতঃ অল্পবয়স্ক ছেলেরাই কাজ করে।

ঘানি ঘুরান ও ছোবড়া পেটাই সব চেয়ে কঠিন। আমাদের মধ্যে বারীন্দ্র ও অবিনাশ নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন বলিয়া, তাহাদিগকে দড়ি পাকাইতে দেওয়া হইল; অপর সকলের ভাগ্যে ছোবড়া পেটা মিলিল। সকাল বেলা উঠিয়া শৌচকর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরেই সকলে অন্ন বা "কঞ্জি" গলাধঃকরণ করিয়া, "ল্যাঙ্গোটি" আঁটিয়া, ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেককে বিশটী নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেওয়া হয়। একখণ্ড কাঠের উপর এক একটি ছোবড়া রাখিয়া একটী কাঠের মুগুর দিয়া তাহা পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটী নরম হইয়া আসে। ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুসি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তারগুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটী গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথম দিন এই ছোবড়া পেটা ব্যাপারটা হাঁ করিয়া বুঝিতেই আমাদের অনেকক্ষণ গেল; তাহার পর পিটিতে গিয়া দেখিলাম, হাতময় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন মাথা খুঁড়িয়া কোন রকমে আধ পোয়া তার প্রস্তুত করিলাম। অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যখন বেলা তিনটার সময় কাজ দাখিল করিতে হাজির হইলাম, তখন দাঁত খিচুনির বহর দেখিয়াই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। গালাগালিটা নির্ব্বিবাদে হজম করিবার সু-অভ্যাস কস্মিনকালেও ছিল না; আজ বিদেশে এই শত্রু-পুরীর মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও গালাগালি সম্বল করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইতে হইবে ভাবিয়া, যেন প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। আর সে গালাগালির বা কি বাহার! শরৎবাবুর কি একখানা বইএ পড়িয়াছিলাম যে, গালাগালিতে হিন্দুস্থানীর মত লম্বা জিহ্বা আর কোন জাতির নাই। তাঁহাকে একবার পোর্টব্লেয়ারে গিয়া ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিতে আমাদের সবিনয় অনুরোধ। হিন্দুস্থানীর সহিত পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচ মিশিয়া যে অমৃতের উৎস সেখানে খুলিয়া দিয়াছে, তাহার আস্বাদন একবার যাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, সেই মজিয়াছে। সাত জন্ম সে ভাষা চর্চ্চা করিলেও আমাদের দেশের হাড়ী, বাগ্দী পর্য্যন্ত সে রসে সম্যক অধিকারী হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। বীভৎসতার মধ্যে এত রকমারি থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।

মাঝে মাঝে এক আধজন প্রহরী একটু ভাল কথাও বলিত। একদিন সন্ধ্যার সময় গালাগালি খাইয়া মুখ চুণ করিয়া কুঠরির মধ্যে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন পাঠান প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, কি হয়েছে?" আমি গালাগালি খাওয়ার কথা বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল—"দেখ বাবু, আমি প্রায় চার পাঁচ বৎসর এই জেলে আছি। গালাগালি খেয়ে যারা মন গুমরে বসে থাকে, তারা হয় পাগল হয়ে যায়, নয় ত মারামারি করে ফাঁসি খায়। ও সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল। খোদাতালার হুকুমে এমন দিন চিরকাল থাকবে না।" অযাচিত উপদেশ প্রায়ই ভাল লাগে না, কিন্তু পাঠানের মুখে খোদাতালার নাম সে রাত্রে বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। মানুষ যখন সব আশ্রয় হারাইয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে, তখন অগতির গতিকে তাহার মনে পড়ে। সেই জন্যই জেলখানায় দেখিতে পাই যে, যাহারা দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড, তাহারাও এক একগাছা মালা লইয়া নাম জপ করে। প্রথম প্রথম এসব দেখিয়া বড় হাসি পাইত। তাহার পর মনে হইতে লাগিল—ইহাতে হাসিবার কি আছে? আর্ত্তভক্তও ত ভগবানের ভক্তের মধ্যে গণ্য।

ছোবড়া পিটিয়া, কচু পাতার তরকারী ও গালাগালি খাইয়া, একরকমে ত দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলাম; কিন্তু উপদেবতাদের দৌরাত্মে ক্রমে জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশের জেলে যেমন 'মেট' ও কালাপাগড়ী, কালাপানিতে সেইরূপ warder, petty officer, tindal ও জমাদার। সাধারণ কয়েদীই পাঁচ সাত বৎসর সাজা কাটিবার পর এই সব পদে উন্নীত হয়; কিন্তু

কালাপানিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ কর্ম্মের ভার ও কর্ত্তৃত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত। যমরাজার কারাধ্যক্ষের ইহারাই প্রহরী। ছেলেবেলা একজন সুরসিক বাঙালী বক্তার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, যিনি "আষ্টে পিষ্টে" মারেন, তিনিই "মাষ্টার"। আমারও সেইরূপ মনে মনে একটা বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, "প্রহার" শব্দের সহিত "প্রহরী" শব্দের নিশ্চয় একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গালাগালি ও মারপিটে ইহারা সকলেই সিদ্ধহস্ত। "রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে, দাও উহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই, অতএব উহার গোঁফ ছিঁড়িয়া লও; বকাউল্লার পায়খানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডাণ্ডা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও।" এইরূপ বহুবিধ সদ্‌যুক্তি প্রয়োগে তাঁহারা জেলখানার শান্তি (discipline) রক্ষা করেন।

কয়েদীরা অনেক সময় গলার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া পয়সা-কড়ি লুকাইয়া রাখে; নানারূপে অত্যাচার করিয়া কয়েদীর নিকট হইতে সেই পয়সার ভাগ আদায় করাই প্রহরীদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের ত পয়সা-কড়ি নাই, আমরা যাই কোথায়? বারীন্দ্র নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ বলিয়া হাসপাতাল হইতে তাহার প্রত্যহ বারো আউন্স দুগ্ধ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের petty officer খোয়েদাদ মিঞার মুখে সেই দুধটুকু ঢালিয়া দিয়া তবে সে অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার পাইত। খোয়েদাদ একজন প্রচণ্ড নমাজী মোল্লা; পুরাদস্তুর "খোদাকা বন্দা।" তিনি তাঁহার গোঁফছাঁটা মুখখানির মধ্যে দুধটুকু ঢালিয়া দিতে দিতে বলিতেন—"ইয়াঃ বিসমিল্লা! খোদানে কেয়া আজব্ চিজ পয়দা কিয়া!"

আরও বিপদের কথা এই, এ সকল অত্যাচারের প্রতিকার নাই। রক্ষকই যেখানে ভক্ষক, সেখানে প্রাণ বাঁচে কিরূপে?

এইরূপে ছয় মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ হইতে দশ বারো জন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বসমেত আমাদের সংখ্যা হইল প্রায় বিশ বাইশ জন।

এই সময় আমাদের ভাগ্যগগনে নূতন জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টরূপী এক ধূমকেতুর উদয় হইল। আমাদের কপাল এইবার পুরাপুরি ভাঙ্গিল। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই আমাদের জনকতককে ঘানিতে দিয়া তেল পিষাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল, তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ীর দেশী ঘানির মত; আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রভৃতি বাকি কয়জনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল, তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক এক জনকে দশ পাউণ্ড সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া যায়; আর আমাদের যে কি দশা হইল, তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেল পেষা হয়, দুইজন পাঠান পেটী-অফিসার তখন সেখানকার হর্ত্তাকর্ত্তা। সেখানে ঢুকিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন তাহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে, কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে সে আমাদের নাকগুলি ঘুসার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবে। কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর পঞ্চাশ পাউণ্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে ত কাজ নয়, রীতিমত মল্লযুদ্ধ। আট দশ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। রাগের চোটে মনে মনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ। একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝি এ জ্বালা মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় তাহাও পারিলাম না। দশটার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে, আর কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। প্রথমেই দেখিলাম বৃদ্ধ হেমচন্দ্র এককোণে চুপচাপ বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, কি রকম?" দাদা হাত দু'খানা দেখাইয়া বলিলেন—"দারুভূতো মুরারি।" কিন্তু হাত দুখানা আড়ষ্ট হইয়া দারুময়ই হোক আর পাষাণময়ই হোক, তাঁহার মনের জোর কখনও একবিন্দু কমিতে দেখি নাই। দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিতে, তীব্র যন্ত্রণার মাঝখানে অবিচলিতভাবে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতে, হেমচন্দ্র একরূপ অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্রকে আত্মহারা হইতে কেহ বড় একটা দেখে নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন কেহ কেহ একটা যা-হয়-কিছু করিয়া ফেলিবার

সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন হেমচন্দ্রই আপনার মনের বল তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন।

অতটা মনের জোর আমাদের ছিল না। একে ত আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়াল অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে পঁচিশ বৎসর এই রূপ কর্ম্মভোগ; তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল, গলায় একগাছা দড়ি লাগাইয়া না হয় ঝুলিয়া পড়ি; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কাজে কাজেই যথাসাধ্য তেল পিষিয়া সরকারী তেলের গুদাম ভর্ত্তি করিতে লাগিলাম।

এক দিনের দুর্দ্দশার কথা বেশ মনে পড়ে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘানি ঘুরাইয়াও ত্রিশ পাউণ্ড তেল পুরা করিতে পারিলাম না। হাত পা এমনি অবশ হইয়া গিয়াছে যে, মনে হইতেছিল বুঝি বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। তাহার উপর সমস্ত দিন প্রহরীদের কাছে কাজের জন্য গালি খাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলা আমাকে জেলারের নিকট লইয়া গেল। জেলার ত সুশ্রাব্য ভাষায় আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্দেশে বেত লাগাইবার ভয় দেখাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিলাম, তখন খাইব কি, দুঃখ ও অভিমানে পেট ফুলিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। একজন হিন্দু প্রহরীর মনে একটু দয়া হইল। সে বলিল—"বাবুলোক তকলিফমে হৈ; খানা জাস্তি দেও।" কথাগুলা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল। নিজের গলাটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলাম। এ সময় লাথি ঝাঁটা সহ্য করা যায়; কিন্তু সহানুভূতি সহ্য হয় না।

রবিবারেও কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। নীচে হইতে বালতি বালতি জল উঠাইয়া দোতলা ও তেতলার বারান্দা নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। একদিন ঐরূপ পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম, উল্লাসকর কিছু দূরে কাজ করিতেছে। কথা কহিবার হুকুম নাই, তবু কথা কহিবার বড় সাধ হইল। দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া উল্লাসের কাছাকাছি গিয়া তাহাকে ডাকিবামাত্র আমার পিঠের উপর গুম্ করিয়া একটা বিষম কিল পড়িল। পিছনে মুখ ফিরাইবামাত্র গালে আর এক ঘুসি! মূর্ত্তিমান যমদূতসদৃশ পাঠান প্রহরী মহম্মদ সা এইরূপে সরকারী হুকুম তামিল ও জেলের শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

সেবার কিছুদিন এইরূপে কাটাইয়া ঘানির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কিন্তু জেলার নাছোড়বান্দা। দিন কতক পরেই আবার ঘানিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আমি তখন মোরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছি। একেবারে সাফ জবাব দিয়া বসিলাম—"আমি ঘানি পিষব না, তুমি যা করতে পার কর।" জেলার ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। একটা কুঠরীতে বন্ধ রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে হাতকড়ি, বেড়ী ও কঞ্জির (penal diet) ব্যবস্থা হইল। শেষে শরীর যখন নিতান্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তখন আবার ছোবড়া পিটিবার অধিকার পাইলাম; কিন্তু ছোবড়া পিটিয়াই কি শান্তি আছে? প্রহরী, বিশেষতঃ পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানেরা স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, আমাদের দাবাইতে পারিলেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। কাজেই তাহারা সর্ব্বদা আমাদের বিপদে ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকিত। ছোটখাট খুঁটিনাটি লইয়া যে কতজনকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। একদিন কুঠরীর মধ্যে পায়ে বেড়ী দিয়া শুষ্ক ছোবড়া পিটিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মে ও কঠোর পরিশ্রমে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঘামের স্রোত ছুটিয়াছে, ছোবড়া পিটিবার মুগুর মাঝে মাঝে লাফাইয়া লাফাইয়া আমারই মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কুঠরীর বাহিরে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রহরীকে দেখিয়া ছোবড়াগুলো ভিজাইবার জন্য একটু জল চাহিলাম। সে একেবারে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—"না, না, হবে না, ঐ শুক্‌নো ছোবড়াই পিট্‌তে হবে।" আমারও মেজাজটা বড় সুবিধার ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জল না হয় নাই দেবে, কিন্তু অত দন্ত বিচ্ছেদ করছ কেন?" প্রহরী রুখিয়া দাঁড়াইল, "কেয়া গোস্তাকি করতা?" আমি দেখিলাম, এখন আর হটিয়া যাওয়া চলে না। বলিলাম—"কেন, তুমি নবাবজাদা নাকি?" বলিবামাত্র প্রহরী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার গলার হাঁসুলি ধরিয়া এমনি টান মারিল যে, জানালার লোহার গরাদের উপর আমার মাথা ঠুকিয়া গেল। রাগটা এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে, লোকটা যদি কুঠরীর ভিতরে থাকিত, তাহা হইলে হয়ত তাহার মাথায় মুগুর বসাইয়া দিতাম। কিছু

একটা না করিলেই নয়, কিন্তু করিবই বা কি? শেষে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া এমনি কামড় বসাইয়া দিলাম যে, তাহার হাত কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাত লইয়া সে জেলারের কাছে নালিশ করিতে ছুটিল; কিন্তু রাস্তার মাঝখানে আমাদের বন্ধু একজন হিন্দু পেটি-অফিসার (Petty officer) তাহাকে কতকটা ভাল কথা বলিয়া কতকটা ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিল। প্রহরীদের সঙ্গে আরও দুএকবার এইরূপ ঝগড়া হইয়াছে, কিন্তু দেখিয়াছি, যাহাদের নিকট তাহারা হারিয়া যায়, তাহাদেরই ভক্ত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের উপর নির্য্যাতন সব জায়গায়ই হয়, আর সে নির্যাতন পাঠানেরাই বেশী করে। কিন্তু পাঠানদের সহস্র দোষ সত্ত্বেও একটা গুণ দেখিয়াছি যে, যাহাকে একবার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, নিজের মাথায় বিপদ লইয়াও তাহার সাহায্য করে। তাহাদের মধ্যে নৃশংসতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের মনের দৃঢ়তা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অধিক। ধর্ম্মঘটের সময় জেলার আমাদের দাবাইবার জন্য আমাদের উপর পাঠান প্রহরী লাগাইয়া দিত; কিন্তু পাঠান অনেক সময় বিশেষ ভাবে আমাদের বন্ধু হইয়া উঠিত। জেলে দলাদলির অন্ত নাই। প্রবল দলকে আপনাদের স্বপক্ষে রাখিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতাম।

হিন্দুমুসলমানের ভেদটা জেলখানার মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র হইয়া উঠিত। স্বধর্ম্মীদের উপর টানটা মুসলমানদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটু বেশী; সেজন্য জেলের মধ্যে কর্ত্তৃত্বের জায়গাগুলা যাহাতে মুসলমানদের হাতেই থাকে, এজন্য তাহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। অধিকন্তু নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা হিন্দুকে মুসলমান করিতে পারিলেও ছাড়িত না। কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারার খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাঁটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহেস্তে যে খোদাতাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে। আর কালাপানির আর্ত্তভক্তদের মধ্যে মোল্লারও অসদ্ভাব নাই। কাজে কাজেই হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মধ্বজীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-ঝগড়ি চলিত। একজন হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ঘানি পিষিতে যায়, তাহা হইলে পাঁচ সাতজন মোল্লা মিলিয়া তাহাকে নানারূপ বিপদে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করে। আর সে যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে যে কিরূপ সুখে দিন কাটাইতে পারিবে, সে সম্বন্ধে নানারূপ প্রলোভন দেখায়। মুসলমানদের মত আর্য্যসমাজীরাও জেলের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকে এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সেরূপ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তাহারা দল হইতে বাহির করিয়া দিতেই জানে, নূতন কাহাকেও দলে টানিয়া লইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। এই দলাদলির ফলে আর কিছু হোক নাই হোক, হিন্দুর টিকি ও মুসলমানের দাড়ী সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাংলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা দেশে কস্মিনকালেও টিকি রাখে না, তাহারাও কালাপানিতে গিয়া হাত দেড়েক টিকি গজাইয়া বসে, আর মুসলমানেরা দুলিয়া দুলিয়া "আলির সহিত হনুমানদের যুদ্ধ", "শিবের সহিত মহম্মদের লড়াই", "সানাভান বিবির কেচ্ছা" প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যায়। আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতেই নির্ব্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া, মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী। রাজনৈতিক কয়েদী মাত্রেরই শেষে সাধারণ নাম হইয়া উঠিল—বাঙালী।

দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে যে, দলাদলিটা শুধু সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যেও দলাদলির অভাব ছিল না। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলাদলির বেশ পুষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা টলষ্টয়ের (Tolstoy) Resurrection নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সে পুস্তকখানিতে বিপ্লবপন্থীদিগের মনস্তত্ত্বের কিরূপ সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা যে কত সত্য, তাহা নিজেদের দলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বাস্তবিকই সাধারণ বিপ্লবপন্থীরা নিজেদের একটু বড় করিয়াই দেখে। একটু

অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বেশী করিয়া থাকে বলিয়াই হয়ত তাহারা কাজে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, তাহাদের চরিত্রে যতখানি তীব্রতা থাকে, ততখানি গভীরতা থাকে না। তাহারা সাধারণতঃ কল্পনাপ্রবণ ও একদেশদর্শী; এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই neurotic। রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে নূতন ছেলে আসিলেই আমি সন্ধান লইতাম যে, তাহাদের পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে তিন পুরুষের মধ্যে কেহ বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বায়ুরোগের ইতিহাস পাইতাম। আমার পুরাতন বন্ধুবর্গ কথাটা শুনিয়া আমার উপর চটিয়া যাইবেন, কিন্তু ক্রোধের সেরূপ অপব্যয় করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ আমিও তাঁহাদের দলভুক্ত এবং আমার পিতামহী বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন।

বিপ্লবপন্থীদিগের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব জেলের বাহিরে কাজকর্ম্মের উত্তেজনায় অনেক সময় চাপা পড়িয়া থাকে, কিন্তু জেলের ভিতর অনুরূপ উত্তেজনার অভাবে তাহা নানারূপ নিরর্থক দলাদলির রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। কোন্ দল বেশী কাজ করিয়াছে, কোন্ দল ফাঁকি দিয়াছে, কোন্ নেতা সাঁচ্চা আর কোন্ নেতা ঝুটা—এরূপ গবেষণার আর অন্ত ছিল না। এবং প্রায় প্রত্যেক দলই আপনাকে 'আদি ও অকৃত্রিম' বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিত। এই প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টার সহিত প্রাদেশিক ঈর্ষ্যা মিশিয়া ব্যাপারটাকে বেশ বীভৎস করিয়া তুলিত। জাতীয় সম্মিলন ও ভারতীয় একতার দোহাই দিয়া কত অদ্ভুত জিনিস যে প্রচার করিবার চেষ্টা হইত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানে সপ্তকোটী কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটী কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন "বঙ্গ আমার, জননী আমার"—সেই হেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন পাঞ্জাবী আর্য্যসমাজী নেতা তাঁহার বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচার করিবার আর কোন রাস্তা না পাইয়া, একদিন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক! এরূপ যুক্তির পাগলা-গারদ ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই। মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙালী-বিদ্বেষের ভাবটা কিছু বেশী প্রবল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত—ইহাই যেন তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্ব্বল ও ভীরু—একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ—নানা যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের নিজেদের অন্তর্বিরোধের ফলে আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারে বাধা দিতে পারি নাই। শেষে কষ্টের যখন বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল, তখন নিজেদের বিরোধ চাপা দিয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীমান নন্দগোপাল। নন্দগোপাল পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। দীর্ঘকায় সুপুরুষ, ১২৪-ক ধারায় অভিযুক্ত হইয়া দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। তিনি ঘানিতে যাইয়া এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। প্রথমেই বলিলেন "অত জোরে ঘানি ঘুরান আমার পোষাইবে না।" ঘানি সাধ্যমত আস্তে আস্তে ঘুরিতে লাগিল; ফলে দশটার মধ্যে তেলের এক-তৃতীয়াংশও পেষা হইল না। দশটার সময় নীচে আসিয়া সাধারণ কয়েদীরা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া লইয়া আবার কাজ করিতে ছুটে। দশটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত আইন অনুসারে আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, কাজ পাছে শেষ না হয়, এই ভয়ে তাহারা বিশ্রাম লইতে সাহস করে না। কাজ শীঘ্র শেষ হইলে হাত পা ছড়াইয়া একটু জিরাইতেও পায়। নন্দগোপালের সে ভয় নাই। পেটি-অফিসার আসিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া লইবার জন্য তাঁহার উপর হুকুম জারি করিল। নন্দগোপাল তাহাকে স্মিতবদনে স্বাস্থ্যনীতি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, তাড়াতাড়ি আহার করিলে পাকস্থলীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা; আর দশ বৎসর যখন তাঁহাকে সরকার বাহাদুরের অতিথি হইয়া থাকিতেই হইবে, তখন কোনও কারণে তিনি আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া সরকারের বদনাম করিতে অপারগ। জেলার সাহেবের কাছে রিপোর্ট পৌঁছিল; তিনি আসিয়া দেখিলেন,

নন্দগোপাল ধীরে ধীরে গ্রাস পাকাইয়া বত্রিশ দাঁতে চৌষট্টি কামড় মারিয়া এক এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিতেছেন। খুব খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিনি নন্দগোপালকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কাজ যথা সময়ে শেষ করিতে না পারিলে বেত্রাঘাত অনিবার্য্য। নন্দগোপাল নিতান্ত ভদ্রভাবে স্বাস্থ্যনীতি পুনরাবৃত্তি করিয়া জেলার সাহেবকে মধুর হাস্যে জানাইলেন যে, সরকার বাহাদুর যখন দশটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ত নিজে সে আইন ভঙ্গ করিবেনই না, অধিকন্তু জেলার সাহেবও যাহাতে সে আইন ভঙ্গ না করেন, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য, জেলার সাহেবের অঙ্গ জুড়াইয়া দ্রব হইয়া গেল। তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মানে মানে প্রস্থান করিলেন। আহারাদি যথাসময়ে শেষ করিয়া নন্দগোপাল কুঠরীতে গিয়া ঢুকিলেন। বিব্রত পেটি-অফিসার ভাবিল এইবার বুঝি কাজ আরম্ভ হইবে। নন্দগোপাল কিন্তু একখানি কম্বল লইয়া আস্তে আস্তে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। অজস্র গালাগালিতেও তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইল না। Passive resistanceএ তিনি মহাত্মা গান্ধিরও গুরু। বারোটার সময় উঠিয়া নন্দগোপাল আরও একঘণ্টা ঘানি ঘুরাইলেন, যখন দেখিলেন যে, বালতিতে প্রায় পনেরো পাউণ্ড তেল হইয়াছে, তখন বাকি নারিকেল বস্তায় বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজের ত অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে, বাকি অর্দ্ধেক এখন করিবে কে? নন্দগোপাল বলিলেন, "যাহার খুসি সেই করিবে। আমি সত্যই কলুর বলদ নই যে, সমস্ত দিনই তেল পিষিব। দিনে ত ছয় পয়সাও খোরাক পাই না, তা ত্রিশ পাউণ্ড তেল পিষিব কেমন করিয়া?" কর্ত্তৃপক্ষ মহলে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তর্জ্জন গর্জ্জন অনেক হইল; কিন্তু নন্দগোপাল নির্ব্বিকার পরমপুরুষের মত নিষ্পন্দ এবং সদা স্মিতবদন। নন্দগোপালের নিকট হইতে ত্রিশ পাউণ্ড তেল বাহির হইবার কোন আশাই নাই দেখিয়া, সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে পায়ে বেড়ী দিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (till further orders) কুঠরীতে বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

এইরূপে আরও এক মাস কাটিল। ইতিমধ্যে জেলার সাহেব নন্দগোপালের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন যে, চার দিন পুরা কাজ করিলে তিনি ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঘানি ঘুরান হইতে অব্যাহতি দিবেন। নন্দগোপালও রাজি হইয়া অল্পাধিক পরিমাণে অপরের সাহায্যে চার দিন পুরা কাজ দাখিল করিয়া সে-যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন।

এ নিষ্কৃতির আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিন পরেই আবার তাঁহাকে বড় ঘানিতে তেল পিষিতে দেওয়াতে তিনি সে কাজ করিতে অস্বীকৃত হন। ফল—বেড়ি ও কুঠরী বন্ধ। হুকুম হইল—সকলকে পুনরায় তিন দিনের জন্য জেলে ঘানি ঘুরাইতে হইবে; একে ত আমরা সকলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আবদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যহ এই ঘানির বিভীষিকা। সকলেই বুঝিলেন যে, কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সুবিধা রকমের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া না লইতে পারিলে, পোর্টব্লেয়ারেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। সাজা ত আছেই, তবে আর নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দেওয়া কেন? অনেকেই এবার ঘানিতে কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল।

কর্ত্তৃপক্ষও রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। জেলখানা ভরিয়া সে এক আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সাজার উপর সাজা চলিতে লাগিল। চার দিন কঞ্জিভক্ষণ ও সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ি, ইহাই সাধারণতঃ সাজার প্রথম কিস্তি। গুঁড়া চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢালিয়া দিলে যে সুখাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আমাদের কঞ্জি। তাহাই মাপিয়া এক এক পাউণ্ড করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দেওয়া হয়, এবং কয়েদী কোনও উপায়ে আর কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইতে না পায়, সে বিষয়ে কড়া পাহারা থাকে। জেলের শাস্ত্র অনুসারে চার দিনের অধিক এ কঞ্জি (penal diet) খাওয়াইবার নিয়ম নাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আমাদের উপর দয়ার আধিক্যবশতঃই হোক আর যে কারণেই হোক, উল্লাসকর, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে বারো তেরো দিন এই কঞ্জি খাওয়াইয়া রাখা হয়। ১৯১৩ সালে যখন শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ক্র্যাডক পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তখন নন্দগোপাল তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করেন; কিন্তু সাজা দিলেও কর্ত্তৃপক্ষগণ টিকিটে এ সম্বন্ধে কোনও কথা লিখেন নাই। জেলার সাহেবও অম্লানবদনে বলিলেন যে, অভিযোগ মিথ্যা। সুতরাং ফল কিছুই হইল না। জেলারের বিরুদ্ধে কয়েদীর কথা কোন কালেই প্রমাণিত হয় না।

সাজার পর সাজা চলিতে লাগিল; নানা রকমের বেড়ীর পালা শেষ করিয়া আমাদের কুঠরীতে বন্ধ করা হইল। তাহারও একটু রকমারি আছে। সাধারণ কয়েদীদের কুঠরী বন্ধ করা হইলে, তাহারা নীচে আসিয়া স্নানাহার করিতে পারে; অপর কয়েদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবারও তাহাদের বাধা নাই। এখন নূতন আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, আমাদের সঙ্গে কেহ কথা কহিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সুতরাং নামে পৃথক কারাবাস (separate confinement) হইলেও কার্য্যতঃ আমাদের পক্ষে উহা নির্জ্জন কারাবাস (solitary confinement) হইয়া দাঁড়াইল। অনেককেই তিন মাস বা ততোধিক কাল এইরূপ কুঠরী-বদ্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইল।

অনেকেরই এই সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। একে পোর্টব্লেয়ারে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ; জরজাড়ি লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আমাশয় সুরু হইল। কর্ত্তৃপক্ষও বোধ হয় ভাবিলেন যে, ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন দরকার। সেই জন্য আমাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া জন কয়েককে করোনেশন উৎসবের সময় জেলের বাহিরে Settlementএ পাঠান হইল। বারীন্দ্র গেলেন Engineering fileএ, অর্থাৎ রাজমিস্ত্রীর সহিত মজুরী করিতে, উল্লাসকর গেলেন মাটি কাটিয়া ইট বানাইতে; কেহ গেলেন জঙ্গলে (Forest Department) কাঠ কাটিতে; কেহ বা রিকৃশ টানিতে; আর কেহ বা গেলেন বাঁধ বাঁধিতে।

আমাদের কিন্তু অদৃষ্টগুণে 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া দাঁড়াইল। জেলখানার মধ্যে কাজ যতই কঠোর হোক না কেন, সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট খোরাক পাওয়া যাইত, আর জল-বৃষ্টিতে বেশী ভিজিতে হইত না। বাহিরে গিয়া সে সুখটুকুও চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে ১টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ত করিতেই হয়; অধিকন্তু রৌদ্রে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। বিশেষতঃ পোর্টব্লেয়ারে বৎসরে সাত মাস বর্ষাকাল, তাহার উপর জঙ্গলে জোঁকের উপদ্রব। জঙ্গলে কাজ করিবার ভয়ে কত লোক যে পলাইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

একেত এই কষ্ট, তাহার উপর পুরা খোরাক মিলে না। কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া বাজারে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হয়। সাধারণ কয়েদী হইতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই এই চুরির কথা বেশ জানেন; কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হয় না। অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ঘুষখোর; সুতরাং এ চুরি-রোগের প্রতিকার নাই। সাধারণ কয়েদী ইহার বিরুদ্ধে সহজে কিছু বলিতে চায় না; কেননা সে বিলক্ষণ জানে যে, মুখ খুলিলেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

রোগীর জন্য জেলের বাহিরে চারিটি হাঁসপাতাল; কিন্তু সেগুলি বাঙালী Asst. Surgeonএর তত্ত্বাবধানে বলিয়া, চীফ-কমিশনার কর্ণেল ব্রাউনিং আদেশ দিলেন যে, আমাদের অসুখ হইলে আমরা সে সমস্ত হাসপাতালে যাইতে পারিব না; আমাদিগকে জেলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বিছানা ও থালা বাটী ঘাড়ে করিয়া পাঁচ-সাত-দশ মাইল হাঁটিয়া আসা বড় সুবিধার কথা নয়। আর জেলে আসিয়াই বা সুচিকিৎসা কোথায়? হাসপাতাল-সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরীর মধ্যে আমাদের দিনে প্রায় একুশ ঘণ্টা পড়িয়া থাকিতে হইত; আর সেই কুঠরীর মধ্যেই একটি গামলায় মল-মূত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত। বৃষ্টির সময় পিছন দিকের ঘুলঘুলি দিয়া জলের ছাট আসিবার বেশ সুব্যবস্থা আছে, কিন্তু কুঠরীতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের তেমন উপায় নাই। ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে যে জেল-কমিশন পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তাঁহারা এই কুঠরীগুলির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, এগুলির সংস্কার করিতে বলেন।

এত দিন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, বুঝি জেলের বাহির হইতে পারিলেই আমাদের দুঃখ কতকটা ঘুচিবে; কিন্তু সে আশা এবার নির্ম্মূল হইল। আমাদের জন্য জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ; সাধারণ কয়েদী ক্রমে ওয়ার্ডার, পেটি-অফিসার বা লেখাপড়া জানিলে মুন্সি হইয়া কঠোর কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পায়; কিন্তু আমাদের সে পথও বন্ধ।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই ক্রমে বাহিরের কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া জেলে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। ইন্দুভূষণ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। তাহার বলিষ্ঠ শরীর কঠোর পরিশ্রমেও কখন কাতর হয় নাই; কিন্তু জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে সে যেন দিন দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; মাঝে মাঝে

বলিত—'জীবনের দশটা বৎসর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।' একদিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগাইয়া ফাঁসি খাইল। রাত্রেই জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে টেলিফোন করা হইল, কিন্তু পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা মিলিল না। সে দিন রাত্রে জেলারের সহিত যে সমস্ত প্রহরী ইন্দুভূষণের কুঠরীতে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বলিল, যে, তাহার গলায় হাঁসুলিতে (neck ticket) একখণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু সে কাগজের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে আমরা জেলার সাহেবকে ঐ কাগজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ইন্দুভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে পোর্টব্লেয়ারের ডেপুটী কমিশনারের উপর ঐ ভার অর্পিত হয়। ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। ব্যাপারটা হ-য-ব-র-ল হইয়া চাপা পড়িয়া গেল।

এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাঁহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের যিনি Junior Medical Officer, তিনি বলিলেন যে, উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের কথা গোরা Overseer সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন? উল্লাসকরকে সেই কার্য্যেই বহাল রাখা হইল। ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন। তাঁহার সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাত দিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথম দিনই বেলা ৪৷৷০টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে, উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই! আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্ব্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত।

জেলখানার প্রকৃত মূর্ত্তি যেন সেই দিন আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। বাঁচিয়া দেশে ফিরিবার ত আর আমাদের কোনও আশা নাই—কেহ ফাঁসি খাইয়া মরিবে, কেহ বা পাগল হইয়া মরিবে। আর যদি মরিতেই হয়, তবে আর স্বহস্তে এই যন্ত্রণার বোঝা উঠান কেন? প্রায় সকলেই স্থির করিলেন যে, যত দিন আমাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয়, তত দিন কাজ কর্ম্ম করা হইবে না। এদিকে আমরা ultimatum দিয়া তাল ঠুকিয়া মরিয়া হইয়া রহিলাম, ওদিকে কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের তূণ হইতে চোখা চোখা বাণ হানিতে আরম্ভ করিলেন।

বেশ একচোট গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহার কিছু পূর্ব্বে চুঁচুড়ার ননীগোপাল ও ঢাকার পুলিনবাবু প্রভৃতি তিন চার জন আসিয়া পৌছিলেন। ননীগোপাল ছেলেমানুষ হইলেও তাহাকে ঘানি প্রভৃতি কঠোর কর্ম্ম দেওয়া হয়। সেও বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। অন্য সকল কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া আমাদের এক আলাদা ব্লকে বন্ধ রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের উপর বাছা বাছা পাঠান প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। খাদ্যের পরিমাণ আরও কমাইয়া দেওয়া হইল, এবং যাহাতে আমরা পরস্পরের সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা চালাইতে না পারি, সে বিষয়েও সতর্কতার অভাব রহিল না। পায়খানায় গিয়া পাছে কথা কহি, সে জন্য সম্মুখে প্রহরী খাড়া থাকিত। কিন্তু বাঁধন বেশী শক্ত করিতে গেলে অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়; আর আইনের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, শুধু ভয় দেখাইয়া তাহাদের আইন মানাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা প্রধানতঃ তিনটা জিনিস চাহিলাম—ভাল খাওয়া-পরা, পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি ও পরস্পরের সহিত মেলামেশার সুবিধা।

মধ্যে চার পাঁচ কুঠরী ব্যবধান রাখিয়া এক এক জনকে বন্ধ করা হইল। ফলে কথাবার্ত্তা আগে আস্তে আস্তে হইতেছিল, এখন চীৎকার করিয়া চলিতে লাগিল। হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখিলেও মানুষের মুখ ত আর বন্ধ করা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষের অবস্থা যেন সাপে ছুঁচো ধরা গোছ হইয়া দাঁড়াইল। সুনাম বা prestigeএর খাতিরে আমাদের আবদার শুনাও চলে না, আর এদিকে ধর্ম্মঘটও ভাঙ্গে না। এমন সময়ে আমাদের নূতন সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট বদলি

হইয়া পুরাতন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পরামর্শে চীফ কমিশনার আমাদের জন কয়েককে সহজ কাজ দিয়া জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা বলিলাম যে, সকলকে যদি জেলের বাহিরে পাঠান হয়, তাহা হইলে আমরা বাহিরে কাজ করিতে স্বীকৃত হইব, নচেৎ পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিব।

প্রায় দশ বারো জনকে নারিকেল গাছের পাহারাওয়ালা করিয়া বাহিরে পাঠান হইল। নারিকেল গাছ সরকারী সম্পত্তি, তাহা হইতে নারিকেল না চুরি যায়, ইহা দেখাই পাহারাওয়ালার কাজ। কাজ খুব সহজ, কিন্তু সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল, পাছে পরস্পর দেখা শুনা হয়।

জেলখানায় কিন্তু ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল। নন্দগোপাল ও ননীগোপালকে কিছুদিন পরে Viper দ্বীপে একটা ছোট জেলে বদলি করা হইল। সেখানে গিয়া ননীগোপাল আহার ত্যাগ করিল। জেল হইতে সকলকে বাহিরে পাঠাইবার যে কথা ছিল, তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

এদিকে যাহাদিগকে জেলের বাহিরে কাজ করিতে পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারাও একজোটে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। পরস্পরের ঠিকানার সন্ধান লইয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইল। তিন মাসের সাজা লইয়া তাঁহারা যখন জেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে, জেলখানার ধর্ম্মঘট প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিরাশ হইয়া অধিকাংশ লোকেই কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ননীগোপালকে চার দিন অনশনের পর জেলে ফিরাইয়া আনা হইল; নাকে রবারের নল পুরিয়া তাহার অল্প অল্প দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা হইল, পাছে সে মরিয়া গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বদনাম করে। সেবারকার ধর্ম্মঘটের কর্ম্মভোগের বোঝা ননীগোপাল, বীরেন প্রভৃতি দুই তিনটী ছেলেকেই বহিতে হয়। সাজার পর সাজা খাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া একে একে সকলেই ধর্ম্মঘট ছাড়িল; শেষে একা ননীগোপাল যেন মরণ পণ করিয়া বসিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, ননীগোপাল কঙ্কালের মত শীর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু আপনার গোঁ ছাড়িল না। যখন সে দেড় মাসের অধিককাল অনশন-ক্লিষ্ট, তখনও তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। ফলে দেখিতে দেখিতে আবার Hunger strike ছড়াইয়া পড়িল এবং কর্ত্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ, ননীগোপালের কথা দেশের কানে আসিয়া পৌঁছিল। সংবাদপত্রে সে বিষয় আলোচনার ফলে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার Lukis সাহেবকে তদন্তের জন্য পোর্টব্লেয়ারে পাঠান। Lukis সাহেবের রিপোর্ট আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার রিপোর্টের ফলে উল্লাসকরকে মান্দ্রাজের পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর সকলেও অল্পদিনের জন্য একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

ননীগোপালকেও অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাহার বন্ধুবান্ধবেরা আহার করিতে স্বীকৃত করান এবং ইহার অল্পদিন পরেই যাঁহারা তিন মাসের সাজা লইয়া জেলখানায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদিগকে আবার জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ধর্ম্মঘটের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই সমাপ্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিধি যাহার প্রতি বাম, তাহার মরিয়াও নিস্তার নাই। আমরা বাহিরে রহিলাম বটে, সুখে দুঃখে একরূপ দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার জেলখানা হইতে গোলমালের সংবাদ পাইলাম—'উৎপীড়িত হইয়া ননীগোপাল আবার কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়াছে।' শাস্তিস্বরূপ তাহাকে চটের কাপড় পরিতে দেওয়ায় সে তাহা পরিতে অস্বীকৃত হয়। জোর করিয়া তাহার জাঙ্গিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কুঠরীর মধ্যে চটের জাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সে "Naked we came out of our mother's womb and naked shall we return—'মায়ের পেট থেকে নগ্ন এসেছি, নগ্নই ফিরে যাব' এই মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে চটের জাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া বসিয়া থাকে। গলার টিকিট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, চীফ কমিশনার কাছে আসিলে দাঁড়ায়ও না, সেলামও করে না। কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"কিছু চাই না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেটা কি শেষে পাগল হইয়া গেল?—এই ভাবনাই সকলের মনে উঠিল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল—না, জ্ঞান বেশ টনটনে আছে। ইংরাজ যখন নিজের খুসিমত আইন আদালত

বানাইয়াছে, সে সকল ব্যবস্থার সহিত যখন তাহার দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন কেন যে সে এই সমস্ত আইন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য, এ প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াই ননীগোপাল ব্যস্ত। তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি যাহাতে সায় দেয় না, শুধু প্রাণটা বাঁচাইবার জন্য সে কেন সে কাজ করিতে যাইবে? প্রাণ রাখিতে রাখিতেই যেখানে প্রাণান্ত হইতে হয়, সেখানে প্রাণের মূল্য কতটুকু?

ভগবান্ যাহার মনের উপর স্বাধীনতার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন, অতি বড় প্রচণ্ড শাসনকর্ত্তাও তাহার শরীরকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে পারে না, এই আশ্বাস ও অভয় ভিন্ন আমরা প্রশ্নের আর যে কি উত্তর দিব—তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না।

এদিকে আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল। কলিকাতার কাগজে এই সময় আন্দামানের রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল; কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা—আমরাই সে সমস্ত সংবাদ পাঠাইতেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমরাও যে সকল বিষয়ে আইন-কানুন মানিয়া চলিতে পারিতাম, তাহা নহে। পেটের জ্বালায় নানা স্থান ঘুরিয়া আমাদের ফলটা পাকড়টা ও মুখরোচক কিছু কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত, আর সাধারণ কয়েদীদের সহিত মেলা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই আমাদের লুকাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। কর্ত্তারা হয় তাহা বুঝিলেন না; অথবা না বুঝিবার ভাণ করিয়া আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—সে কথা ভগবানই জানেন।

একদিন সুপ্রভাতে চারিদিকে তল্লাসীর ধুমধাম পড়িয়া গেল। আমাদের থাকিবার বসিবার শুইবার সব স্থান পুলিসে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। মাণিকতলা বাগানের একটা প্রহসনাত্মক পুনরভিনয়—tempest in a tea-pot হইয়া গেল। দুই একখানা বাক্সে চিঠি ও এক আধটা কবিতা ভিন্ন আর কিছুই মিলিল না; কিন্তু চীফ কমিশনারের আদেশ মত আমাদের সকলকেই জেলে পাঠান হইল। ক্রমে নানারূপ গুজব শুনিতে লাগিলাম, আমরা নাকি বোমা বানাইয়া পোর্টব্লেয়ার উড়াইয়া দিয়া একখানা সরকারী steamer পাকড়াও করিয়া পলাইয়া যাইবার সংকল্প করিতেছিলাম; আর অন্তর্য্যামী চীফ কমিশনার লালমোহন সাহা নামক এক হিতৈষী কয়েদীর কথায় সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে তাঁহার রাজ্যটীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। চীফ কমিশনার জেলে আসিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—'কর্ত্তা, ব্যাপারখানা কি? অধীনদের উপর এ অযথা আক্রমণ কেন?" কর্ত্তা নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত বলিলেন—"আমি কিছুই জানি না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ আদেশ পাইয়াছি, সেইরূপ করিয়াছি।"

ভাল, এ কথার আর উত্তর কি। কিন্তু কিছুদিন পরে শুনিলাম—আমাদের সহিত মিশিত বা কথাবার্ত্তা কহিত বলিয়া বাহিরের অনেক লোককে সাজা দেওয়া হইতেছে, এবং পুলিসের একজন সাক্ষী কোথা হইতে গ্রামোফোনের পিন, লোহার টুকরা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নিঃসংশয়ে আমাদের বোমা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছে। নারায়ণগড়ে লাট সাহেবের ট্রেণ ভাঙ্গা লইয়া যখন জনকতক নিরপরাধ লোক দণ্ডিত হয়, তখন হইতেই আমরা পুলিসের অপার মহিমার কথা বেশ জানিতাম। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোনও সন্দেহ বা প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ চোরাগোপ্তা চাল না চালিয়া আমাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হয় না কেন?" কর্ত্তরা কিন্তু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়াই মুখ টিপিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

মাস কয়েক পরে সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক্ (Sir Reginald Craddock) পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান। আমরা ভাবিলাম, খুব কাপ্তেন পাকড়াইয়াছি; এইবার আমাদের যা' হয় একটা ব্যবস্থা হইবে। তাঁহার নিকট দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিতে না করিতে চীফ কমিশনার নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তোমরা বাহিরে রাজদ্রোহের পরামর্শ (Conspiracy) করিতে-ছিলে।"

আমরা জবাব দিলাম, "তাই যদি আপনার ধারণা, ত প্রথমে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম তখন ভাল মানুষ সাজিয়া 'জানি না' বলিয়াছিলেন কেন? আর সে কথা বলিবার পরে যদি আমাদের অপরাধের প্রমাণ পাইয়া থাকেন, ত প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করিতে এত সঙ্কোচ বোধ করেন কেন?" সার রেজিনাল্ড মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"কি জান, —এ সব কথার প্রমাণ হয় না।"

ননীগোপালও তাহার সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিল; মহামান্য ক্র্যাডক সাহেব শুধু উত্তর করিলেন—"তুমি সরকারের শত্রু, তোমাকে মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল।"

"তাই যদি উচিত, ত আইন-আদালতের এ ঠাট সাজাইয়া রাখিয়া বৃথা পয়সা খরচ কেন? কাজটা সংক্ষেপে সারিলেই ত ছিল ভাল।"

বিচার ত এইখানে সাঙ্গ হইয়া গেল। এখন উপায়? নিরুপায়ের যিনি উপায়, তিনি না মুখ তুলিয়া চাহিলে আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এবার তাঁহারও সিংহাসন বুঝি টলিয়াছিল।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই পুনরায় কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সাজা দিয়া যখন হাঁপাইয়া পড়িলেন, তখন যাঁহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নন, তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ডেপুটী কমিশনার Lowis সাহেবের উপর সেই ভার পড়িল। তিনি বিচারের পূর্ব্বে একদিন ধর্ম্মঘটের কারণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া অনুসন্ধান করিতে আসিলেন।

আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে, আমাদের প্রতি সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা না হয়; এ বিষয়ে পোর্টব্লেয়ারের কাহারও কোনও হাত নাই।" কিন্তু সাধারণ কয়েদীর যে সমস্ত সুবিধা আছে, আমাদের সে সমস্ত কিছুই নাই। সাধারণ কয়েদী লেখাপড়া জানিলে আফিসে ভাল কাজ-কর্ম্ম পায়; তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও ওয়ার্ডার, পেটি-অফিসার হইতে পারে, আমরা যে সে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত! অপরে পাঁচ বৎসর পরে মাসে বারো আনা করিয়া মাহিনা পায় এবং দশ বৎসর পরে নিজে উপার্জ্জন করিয়া খাইতে পারে, আর আমাদের যে চিরদিনই জেলে পচিয়া মরিবার ব্যবস্থা! Lowis সাহেব উত্তর করিলেন যে, এ সমস্ত ব্যবহার ও দায়িত্ব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব, ভাল করিবার কোন অধিকারই তোমাদের নাই, শুধু কি সাজা দিবার অধিকারটুকুই হাতে রাখিয়াছিলে?"

সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"কি করিব? জেলের শান্তি (discipline) ত রক্ষা করিতে হইবে।"

"ন্যায়ই হোক, অন্যায়ই হোক, disciplineটা রক্ষা করিতেই হইবে, মোট কথা এই, না?"

সাহেব এ কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। ব্যাপারটা কি, তাহা তিনি বেশই জানিতেন; কিন্তু তিনিও ত সরকারী চাকর। তাই কাহারও এক মাস, কাহারও তিন মাস, কাহারও বা ছয় মাস সাজা বাড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে একবার ইঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে উল্লাসকরের কথা উঠিলে তিনি বলেন—"Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen, but he is too idealistic." "উল্লাসের মত মহাপ্রাণ ছেলে খুব কম দেখিয়াছি, তবে সে বড় বেশী উচ্চভাবপ্রবণ।" অথচ চাকরীর খাতিরে তাঁহাকে উল্লাসকরকে সাজা দিতেও হইয়াছিল।

Discipline আইন-কানুন রক্ষার জন্য ত সাজা, কিন্তু ক্রমশঃ সেই শান্তিরক্ষাই দায় হইয়া উঠিল। আমাদের দেখাদেখি সাধারণ কয়েদী-দের মধ্যেও ধর্ম্মঘটের দল বাড়িয়া উঠিল। জেলের কাজকর্ম্মের ক্ষতি হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন, একটা কিছু না করিলেই নয়।

রাজনৈতিক অপরাধীর মধ্যে যাঁহারা মেয়াদী কয়েদী (term convict), তাঁহাদের সাত আট জনকে হঠাৎ একদিন দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং যে জেলার আমাদের গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিই একদিন নিতান্ত ভদ্রভাবে আমাদের ধর্ম্মঘট ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"Now you can retreat with honour"—"এখন তোমরা আপন সম্মান বজায় রেখে কাজে নেমে পড়তে পার"। তিনি নাকি সংবাদ পাইয়াছেন যে, অধিকাংশ মেয়াদী কয়েদীকে দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং যাঁহারা পোর্টব্লেয়ারে থাকিয়া যাইবেন, তাঁহাদের কাজ-কর্ম্ম ও আহারাদির একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

আমরা বলিলাম—"তথাস্তু, কিন্তু দুই মাসের মধ্যে যদি আপনাদের বিশেষ ব্যবস্থার নমুনা না দেখা যায়, তাহা হইলে পুনর্ম্মূষিক হইয়া আমরাই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া লইব।"

এইরূপে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

অল্পদিনের মধ্যে আলিপুরের বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও আমি, ঢাকার পুলিনবিহারী ও সুরেশচন্দ্র

এবং নাসিকের সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও যোশী ভিন্ন অপর সকলকে দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেয়াদী কয়েদীদিগকে যখন ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ছয় সাত জন বাকি রহিলাম, তাহাদের যখন পোর্টব্লেয়ারে থাকিতেই হইবে, তখন আর বেশী গোলমাল করিয়া লাভ কি? ছাড়া পাইবার যখন কোন আশা নাই, তখন মরণের অপেক্ষায় শান্তভাবে দিন কাটানই ভাল।

কিন্তু অদৃষ্টে সে শান্তি আমাদের ছিল না। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্যের স্রোত আসিয়া ধাক্কা মারিল, তাহায় ফলে লাহোর ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি ও 'গদর' দলের প্রায় পঞ্চাশ জনের পোর্টব্লেয়ারে আগমন। পল্টনের অনেক শিখ সিপাহীও রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইল। বাংলা দেশ হইতেও পনেরো ষোল জন আসিল। ফলে পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা এবার রাজনৈতিক কয়েদীতে ভরিয়া, এ সুখের নরক গুলজার হইয়া উঠিল। ইঁহাদের মধ্যে চার পাঁচ জন ভিন্ন অপর কাহাকেও ঘানি ঘুরাইতে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু নারিকেলের ছোবড়া পেটাও বড় কম পরিশ্রম নহে। তাহার উপর আর এক উপসর্গ এই যে, সরকারী খোরাকে ইহাদের পেট ভরে না। একে ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী, তাহার উপর অনেকেই বহুদিন আমেরিকায় থাকার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসাদি খাইতে অভ্যস্ত। সুতরাং দুইখানা রুটী ও এক বাটী ভাত ইঁহাদের পেটের এক কোণে কোথায় তলাইয়া যায় তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্রও ইঁহারা নহেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই জেলের কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে ইঁহাদের নরম গরম খটাখটি বাধিয়া উঠিল।

ঝান্সির পরমানন্দকে লইয়াই ঝগড়া আরম্ভ হইল। কি একটা কথা লইয়া তাঁহাকে জেলারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। জেলার আপনার কর্তৃত্ব জানাইয়া যে ওজনের কথা কহিলেন, পরমানন্দও সেই ওজনের কথা ফিরাইয়া দিলেন। মুখোমুখি শেষে হাতাহাতিতে দাঁড়াইল। বিচারে পরমানন্দের বিশ ঘা বেত্রদণ্ড হওয়ায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহা অধিক দিন হইল না। জেলার নিজেই সকলকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করিবার আশা দিয়া সে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গাইয়া দিলেন।

অসন্তোষের বীজ কিন্তু মরিল না। দিন কতক পরে সামান্য কারণে আবার গোলমাল বাধিল। রবিবারে কয়েদীদের ছুটী, সেদিন আপন আপন বস্ত্রাদি পরিষ্কার ভিন্ন অন্য কর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পোর্টব্লেয়ারে কিন্তু সেদিন জেলের উঠানে ঘাস ছিঁড়িতে হয়। একে ত ছুটীর দিন সমস্ত দুপুর বেলা কয়েদীদিগকে কুঠরীর মধ্যে বন্ধ থাকিতে হয়, তাহার উপর সকাল বেলা ঘাস ছিঁড়িয়া বেড়াইতে হইলে তাহাদের ছুটী নিতান্তই নামমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার 'গদর' পত্রিকার সম্পাদক জগৎরাম প্রভৃতি কয়েকজন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া রবিবারে ঘাস ছিঁড়িতে অস্বীকৃত হন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া বেড়ি ও কুঠরীবদ্ধ হওয়ার দণ্ড হয়। বলা বাহুল্য, লঘুপাপে এই গুরুদণ্ড দেখিয়া কেহই বিশেষ প্রীত হন নাই। তাহার পর, দিনের পর দিন যখন কষ্টের মাত্রা কমিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অনেকেই আবার কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। এই সময় একটা ব্যাপার লইয়া বড় গোলমাল হয়। একজন বৃদ্ধ শিখের সহিত জেলের প্রহরীদিগের বিবাদ হয়; তিনি বলেন যে, প্রহরীরা তাঁহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া অত্যন্ত প্রহার করে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, ফলে কিন্তু তিনি দুই এক দিনের মধ্যে কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আসেন। সেখানে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা পড়েন। সেখানকার অনেকের বিশ্বাস যে, গুরুতর প্রহারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ, কিন্তু কর্তৃপক্ষ একথার সত্যতা অস্বীকার করেন। এই ব্যাপারের কোনও প্রতিকার হইল না ভাবিয়া চার পাঁচ জন আহার ত্যাগ করিলেন। পৃথ্বী সিং তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহাকে নাক দিয়া জোর করিয়া দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইত। এ অবস্থায় তিনি পাঁচ মাস থাকেন। অন্যদেশে হইলে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত; কিন্তু পোর্টব্লেয়ারের সংবাদ কে রাখে? সেখানে দুই দশ জন কয়েদী মরিলেই বা কাহার কি আসে যায়?

শিখদের মধ্যে আরও তিন চার জন এই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দুই তিন মাস ভুগিয়া

মারা যান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জেলে ঢুকিবার সময় শ্যামদেশ হইতে ধৃত পণ্ডিত রামরক্ষার পৈতা কাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া, তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন; এই সময় যক্ষ্মারোগে তাঁহারও মৃত্যু হয়। অব্যাহতির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, একজন একখণ্ড সিসা খাইয়াও মরিয়াছিলেন।

যাঁহারা মরিলেন, তাঁহারা ত বাঁচিয়া গেলেন; যাঁহারা পাগল হইয়া জীবন্ত মরিয়া রহিলেন, তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বালেশ্বর মোকর্দ্দমার যতীশচন্দ্র পাল তাঁহাদের অন্যতম। কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়, পরে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়। এখন বহরমপুর পাগলা গারদে তাঁহার দিন কাটিতেছে।

এরূপ ঘটনার সংখ্যা নাই। কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা লিখিব? ছত্র সিংহ নামে একজন শিখ লায়লপুর খালসা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দেশে তাঁহার অপরাধ কি জানি না; কিন্তু পোর্টব্লেয়ারে তাঁহাকে প্রথম হইতে কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ধর্ম্মঘট লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছিল, তখন তিনি একদিন উত্তেজিত হইয়া সুপারিনটেনডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া প্রবাদ। ফলে প্রহরী-গণ তাঁহাকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। তাহার পর তাঁহাকে কুঠরীতে পোরা হয়; তাহা হইতে তাঁহাকে দুই বৎসরের অধিক কাল আর বাহির করা হয় নাই। বারান্দার এক কোণে জাল দিয়া ঘিরিয়া তাঁহার জন্য পিঁজরা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেই পিঁজরার মধ্যেই তাঁহাকে আহার, ভাঁড়ে শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগ, রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহাকে ক্রমে মরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। আর একজন শিখ অমর সিংএরও ঐরূপ অবস্থা।

মৃত্যুর হার যখন ক্রমে বাড়িতেই চলিল, তখন কর্তৃপক্ষদিগের একটু হুঁস হইল। অনেককে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ (দড়ি পাকান) দেওয়া হইল। জগৎরাম বহুদিবস পৃথক-কারাবাসের (separate confinement) ফলে শিরোরোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁহাকে ও অপর দুই এক জনকে ছাপাখানার কাজ দেওয়া হইল। দয়ানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ ধর্ম্মঘটে কখনও যোগ দেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অধিক দিন সে সুখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চিঠি হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া সংবাদপত্রে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠান। চীফ কমিশনার ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পরমানন্দকে বিনা বিচারে হাজতে বন্ধ করিলেন। পরমানন্দ বলেন যে, তাঁহার এই চিঠি যথারীতি জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের হাত দিয়া পাস হইয়া গিয়াছিল। সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু তথাপি পরমানন্দ লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। সকলেই একটা অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মঘটের ফলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে রফা হইল, তাহার মোদ্দা কথা এই যে, আমাদের চৌদ্দ বৎসর কালাপানির জেলে বন্ধ থাকিতে হইবে! চৌদ্দ বৎসরের পর আমাদের জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, আর তখন আমাদিগকে কয়েদীর মত পরিশ্রম করিতে হইবে না। জেলখানার ভিতরেও আমরা বাহিরের কয়েদীর মত নিজের নিজের আহার রাঁধিয়া খাইতে পারিব ও বাহিরের কয়েদীর মত পোষাক পরিতে পারিব অর্থাৎ জাঙ্গিয়া, টুপি ও হাতকাটা কুর্ত্তা না পরিয়া, কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্ত্তা পরিতে পাইব আর মাথায় একটা চার হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী জড়াইবার অধিকার পাইব। অধিকন্তু দশ বৎসর যদি আমরা ভাল ব্যবহার করি অর্থাৎ ধর্ম্মঘটে যোগ না দিই বা জেলের কর্ত্তাদের সহিত ঝগড়া না করি, তাহা হইলে দশ বৎসর কয়েদ খাটিবার পর সরকার বাহাদুর বিবেচনা করিবেন আমাদের আরও অধিক সুখে রাখিতে পারেন কি না। জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া আট হাতি মোটা কাপড় পরিয়া বা মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আমাদের সুখের মাত্রা যে কি বাড়িয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে নিজের হাতে রাঁধিবার অধিকার পাইয়া প্রত্যহ কচুপাতা সিদ্ধ খাইবার দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের হাতও এড়াইলাম। বারীন্দ্রকে বেতের কারখানার

তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল; হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ করা হইল, আর আমি হইলাম ঘানি-ঘরের মোড়ল। প্রাতঃকাল ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া লইবার কথা; কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারিয়া লওয়া অসম্ভব দেখিয়া, আমরা সাধারণ ভাণ্ডারা (পাকশালা) হইতে ভাত ও ডাল লইতাম; শুধু তরকারিটা নিজেদের মনোমত রাঁধিয়া লইতাম। রন্ধন-বিদ্যায় হেমচন্দ্রের ওস্তাদ বলিয়া নামডাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে মাংস, পোলাও প্রভৃতি নবাবী খানা তিনি বেশ রাঁধিতে পারিতেন, তবে সোজাসুজি তরকারি রাঁধিতে আমাদের চেয়ে বেশী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটা মোচা পাইয়া বহুকাল পরে মোচার ঘণ্ট খাইবার সাধ হইল। কিন্তু কি করিয়া রাঁধিতে হয়, তাহাত জানি না। মোচার ঘণ্ট রাঁধিবার জন্য যে প্রকাণ্ড কনফারেন্স বসিল, তাহাতে রন্ধন-প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিল না। বারীন্দ্র বলিল—"আমার দিদিমা হাটখোলার দত্তবাড়ীর মেয়ে এবং পাকা রাঁধুনী, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" হেমচন্দ্র বলিল—"আমি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী রান্না শিখে এসেছি, সুতরাং আমার মতই ঠিক।" আমাদের সব স্বদেশী কাজেই যখন বিদেশী ডিপ্লোমার আদর অধিক, তখন আমরা স্থির করিলাম যে, মোচার ঘণ্ট রান্নাটা হেমদার পরামর্শ মতই হওয়া উচিত। আমি গম্ভীর ভাবে রাঁধিতে বসিলাম, হেমদা কাছে বসিয়া আরও গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কড়ার উপর তেল চড়াইয়া যখন হেমদা পেঁয়াজের ফোড়ন দিয়া মোচা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, তখন তাঁহার রন্ধন-বিদ্যার ডিপ্লোমা সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ হইল। মোচার ঘণ্টে পেঁয়াজের ফোড়ন কি রে বাবা? এযে বেজায় ফরাসী কাণ্ড! কিন্তু কথা কহিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া তাহাই করিলাম। মোচার ঘণ্ট রান্না হইয়া যখন কড়া হইতে নামিল, তখন আর তাহাকে মোচার ঘণ্ট বলিয়া চিনিবার জো নাই। দিব্য তোফা কাল রং আর চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ! খাইবার সময় হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বারীন্দ্র বলিল—"হাঁ, দাদা একটা ফরাসী chef-de cuisine বটে; দিদিমা আমার এমনটী রাঁধিতে পারিত না।" হেমদা হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ! তোমরা সবাই দিদিমা-পন্থী, দিদিমা যা করে গেছেন তা আর বদ্‌লাতে চাও না!" মোচার ঘণ্ট যে দিন রন্ধনের গুণে মোচার কাবাব হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিন কতক পরে একবার সুক্ত রাঁধিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু সুক্ত রাঁধিবার সময় কি কি মসলা দিতে হয়, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়া গেল। হেমদা বলিলেন যে তরকারীর মধ্যে এক আউন্স কুইনাইন মিক্‌চার ফেলিয়া দিলেই তাহা সুক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নবীনা গৃহিণী পাঁচ খণ্ড পাক-প্রণালী কোলে করিয়া রাঁধিতে বসেন, তাঁহারা সুক্ত রাঁধিবার এই অভিনব প্রণালীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁহারা একাধারে আহার ও পথ্যের আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারিবেন। দাদারও জয় জয়কার পড়িয়া যাইবে।

রাঁধিবার জন্য আমরা জেল হইতে কিছু কিছু তরকারী লইতাম, তবে তাহার মধ্যে চুবড়ী আলু আর কচুই প্রধান। কাজে কাজেই বাজার হইতে মাঝে মাঝে অন্য তরকারী আনাইয়া লইতে হইত। সরকার বাহাদুরের নিয়মানুযায়ী আমরা মাসিক বেতন পাইতাম বারো আনা। আমরা শারীরিক দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের প্রত্যেককে বারো আউন্স করিয়া দুধ দিয়া তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ মাসিক আট আনা কাটিয়া লইতেন। বাকি চার আনার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিছুদিন পরে জেলের মধ্যে একটা ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বারীন্দ্রের উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়; আর হেমচন্দ্রকে বই-বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় সুপারিন্-টেনুডেণ্ট সাহেব উহাদের প্রত্যেককে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া ভাতা দিবার জন্য চীফ কমিশনারের অনুমতি চান। পাঁচ টাকার নাম শুনিয়াই চীফ কমিশনার লাফাইয়া উঠিলেন। কয়েদীর মাসিক ভাতা পাঁচ টাকা। আরে বাপ! তাহা হইলে ইংরেজরাজ যে ফতুর হইয়া যাইবে! অনেক লেখালেখির পর মাসিক একটাকা করিয়া বরাদ্দ হইল। যথা লাভ!

ক্রমে ক্রমে আমাদের রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট পুদিনার ক্ষেত দেখা দিল; তাহার পর দুই চারিটা লঙ্কা গাছ, এক আধটা বেগুন গাছ ও একটা কুমড়া গাছও আসিয়া জুটিল। এ সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া জেলার মাঝে মাঝে তাড়া

করিয়া আসিত; কিন্তু সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের মনের এক কোণে আমাদের উপর একটু দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেন না। জেলারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিতেন—'এরা যখন চুপ চাপ করে আছে, তখন এদের আর পিছু লেগো না।' এরূপ দয়া প্রকাশের কারণও ঘটিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আট ঘাট বন্ধ রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দেশের খবরের কাগজে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহাদের মেজাজটা প্রথম প্রথম বিলক্ষণই উগ্র হইয়া উঠিত; কিন্তু শেষে অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাঁহারাও শিখিয়াছিলেন যে, কয়েদীকে বেশী খাটাইয়া লাভ নাই।

মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইবার প্রবলতর কারণ জার্ম্মাণীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধিবার অল্প-দিনের মধ্যেই কর্ত্তাদের মুখ যেন শুকাইয়া গেল। কয়েদীদের তাড়া করিবার প্রবৃত্তি আর বড় বেশী রহিল না। অষ্ট্রীয়ার রাজপুত্রের হত্যাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারী নগরীর কুড়ি মাইলের মধ্যে জার্ম্মান সৈন্যের আগমন সংবাদ সবই আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া পাইতেছিলাম। শেষে যখন 'এমডেন' আসিয়া মাদ্রাজের উপর গোলা ফেলিয়া চলিয়া গেল, তখন ব্যাপারটা আর সাধারণ কয়েদীর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইল না। ইংরেজের বাণিজ্য ব্যাপারের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, তাহা কয়েদীদের বুঝিতে বাকি রহিল না। আগে পিপা পিপা নারিকেল ও সরিষার তৈল পোর্টব্লেয়ার হইতে রপ্তানী হইত, এখন সে সমস্তই গুদামে পচিতে লাগিল। জেলে ঘানি চালান বন্ধ হইয়া গেল। শেষে যখন কয়েদীর নিকট হইতে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (war loan) করা হইতে লাগিল, তখন পোর্টব্লেয়ারে গুজব রটিয়া গেল যে, ইংরাজের দফা এবার রফা হইয়া গিয়াছে। জেলের দলাদলি ভাঙ্গিয়া গিয়া শত্রুমিত্র সবাই মিলিয়া জার্ম্মাণীর জয় কামনা করিয়া ঘন ঘন মালা জপিতে আরম্ভ করিল। জার্ম্মণীর বাদশা নাকি হুকুম দিয়াছে যে, সব কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে! সাহেবদের আরদালীরা আসিয়া খবর দিতে লাগিল যে, আজ সাহেব সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, সাহেব না খাইয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে ভবিষ্যদ্বক্তা জুটিয়া গেল। কেহ বলিল, পীর সাহেব স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, ১৯১৪ সালে ইংরেজের ভরা ডুবিবে; কেহ বলিল, এ কথা ত কেতাবে স্পষ্টই লেখা আছে! মোটের উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই একই আলোচনা চলিতে লাগিল।

কয়েদীদের মনের ভাব শেষে কর্ত্তৃপক্ষেরও অগোচর রহিল না। ইংরেজ যে যুদ্ধে হারিতেছে না, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য জেলের সুপারিন্-টেন্‌ডেণ্ট আমাদিগকে বিলাতের 'টাইমস্' পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়িতে দিলেন। কিন্তু 'টাইমসে'র কথা বিশ্বাস করাও ক্রমে দায় হইয়া উঠিল। টাইম্‌সের মতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য প্রত্যহ যত মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, মাস কতক পরে তাহা যোগ দিয়া দেখা গেল যে, তাহা সত্য হইলে, ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যদের জার্ম্মানী পার হইয়া পোলাণ্ডে গিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল; অথচ পোলাণ্ড ত দূরের কথা, রাইন নদীর কাছাকাছি হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণ কয়েদীরা ইংরাজের স্বপক্ষে কোন কথা কহিলে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিত। কর্ত্তারা যে মিথ্যা খবর ছাপাইয়া তাঁহাদের পট্টি দিতেছে, এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না!

নূতন নূতন যে সমস্ত কয়েদী দেশ হইতে আসিতে লাগিল, তাহারা নানা প্রকার অদ্ভুত গুজব প্রচার করিয়া চাঞ্চল্য আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক দল আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল যে, তাহারা বিশ্বস্তসূত্রে দেশ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে, এমডেন পোর্টব্লেয়ারের জেলখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে সশরীরে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে, গুজব মিথ্যা! তাহারা যে ভাল লোকের কাছে ও-কথাটা শুনিয়াছে! শ্রুতির চেয়ে প্রত্যক্ষটা ত আর বড় প্রমাণ নয়!

ক্রমে পাঠান ও শিখ পল্টনের অনেক লোক বিদ্রোহের অপরাধে পোর্টব্লেয়ারে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের কেহ কেহ ফ্রান্স, কেহ বা মেসোপোটেমিয়া হইতে আসিয়াছে। পাঠানদের মুখে মুখে এনভার বে'র দৈব শক্তি সম্বন্ধে যে সব চমৎকার গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া কয়েদীদের বুক আশায় দশ হাত হইয়া উঠিল। এনভার বে তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলে নাকি খোদার কোদরতে তোপের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি আবার নাকি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন

সুলতান সরিফে আসিয়া অচিরে জগদ্ব্যাপী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা দিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মানীর বাদশাও নাকি কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়া কয়েদীদের বিদ্বেষভাজন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও ফল নাই দেখিয়া, আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম। তবে যথাসম্ভব সত্য ব্যাপার জানিবার জন্য সংবাদ-পত্র জোগাড় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। গদর দলের শিখেরা পোর্টব্লেয়ারে কয়েদী হইয়া আসিবার পর পাছে জেলের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, সেই ভয়ে জেলে পাহারা দিবার জন্য দেশী ও বিলাতী পল্টন আমদানি করা হইয়াছিল। বিলাতী পল্টনের মধ্যে আইরিশ অনেক ছিল। আর তাহারা যে ইংরেজের বিশেষ শুভাথী ছিল, তাহাও নয়। সুতরাং সংবাদপত্র সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া নূতন নূতন যে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদী আসিতে লাগিল, তাহাদের নিকট হইতেও দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। এমডেন ধরা পড়িবার পরে একটা গুজব শুনিয়াছিলাম যে, ঐ জাহাজে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের একটা প্ল্যান ছিল; বোধ হয় ভবিষ্যতে কোনরূপ আক্রমণের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পোর্টব্লেয়ারে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল ও দুই চারিটা তোপের আমদানি করা হইয়াছিল।

পোর্টব্লেয়ারে মিলিটারী পুলিসের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদের মধ্যে শিখও যথেষ্ট। পাছে গদর দলের শিখেরা মিলিটারি পুলিসের সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায়, এই চিন্তায় পোর্টব্লেয়ারের কর্ত্তারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই ভয়ে জেলের ভিতরকার শিখদিগের উপর তাঁহাদের ব্যবহার বেশ একটু কঠোর হইয়া দাঁড়াইত। একে ত আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখদিগের রুটি ও মাংস খাওয়া অভ্যাস; জেলের খোরাক খাইয়া তাহাদের পেটই ভরে না; তাহার উপর মাথার লম্বা লম্বা চুল ধুইবার জন্য সাবান ও সাজিমাটি কিছুই পায় না। শেষে যখন তাহাদের উপর ছোট ছোট অত্যাচার সুরু হইল, তখন তাহাদের মধ্যে ছত্র সিং ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সুপারিনটেনডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। বেচারীকে তাহার ফলে দুই বৎসর কাল পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ধর্ম্মঘটও পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু যে সকল নেতা শিখদিগকে ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন, তাঁহারাই কার্য্যকালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেল। যুদ্ধ থামিয়া গেলে আমাদের ভাগ্যবিধাতা আমাদের জন্য কোন নূতন ব্যবস্থা করেন কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক মতামত লইয়া মাঝে মাঝে সুপারিনটেনডেণ্টের সহিত আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত। বলা বাহুল্য, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া যাওয়াই ভদ্রতাসঙ্গত; কিন্তু সে কথা জানিয়াও আমরা মাঝে মাঝে দুই চারিটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম। যেখানে গায়ের ঝাল মিটাইবার অন্য উপায় নাই, সেখানে জিহ্বা সঞ্চালন ভিন্ন আর কি করা যায়?

রুসিয়ায় তখন বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদিন জেলার আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট যে তোমাদের সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তা'র কি কারণ বলিয়া মনে হয়?"

আমি বলিলাম—"কি জানি, সাহেব! স্বজাতির গুণগান করা ছাড়া আর যদি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ত বলিতে পারি না।"

জেলার বলিলেন—"এ কথা বোধ হয় জান যে, ছয় মাস অন্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে তোমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক একখানি করিয়া রিপোর্ট যায়। তোমরা সুপরিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাছে যে মতামত প্রকাশ কর, তিনি সেগুলি নোট করিয়া রাখেন, আর তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। চারিদিকে যেরূপ হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ যদি হারে, ত ল্যাঠা চুকিয়াই গেল; আর যদি জয়ী হয় ত আনন্দের প্রথম ধাক্কায় তোমাদের

ছাড়িয়াও দিতে পারে। ইংরেজ রাজত্বটা যে কি, তাহা আমি আইরিশ, সুতরাং ভাল করিয়া বুঝি। জেলখানার ভিতর সব সময়ে পেটের কথা মুখে আনিয়া লাভ নাই।"

ভাবিয়া দেখিলাম, কথাগুলো ত ঠিক। জেলখানাটা ঠিক বক্তৃতা দিবার জায়গা নয়। শত্রুর মুখ হইতেও উপদেশ শাস্ত্রমত গ্রাহ্য; সুতরাং জিহ্বাটা সেই সময় হইতে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া ফেলিলাম।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মাঝে মাঝে যুদ্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। জার্ম্মাণী যে কি ভীষণ রকম পাজি, তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। আমরাও এক বাক্যে জার্ম্মাণীর পাজিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে জনাইয়া দিলাম যে, মরিবার পর জার্ম্মাণী নিশ্চয় নরকে যাইবে। দেবলোকে ইংরাজের পার্শ্বে স্থান পাইবার তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজচরিত্রে একটা কেমন সঙ্কীর্ণতা আছে— সে কোন জিনিসের নিজের দিক ছাড়া পরের দিক সহজে দেখিতে পায় না। তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী যে চিরদিন ইংরেজের আশ্রয়েই থাকিতে চায়, এ কথা বিশ্বাস করিবার জন্য ইংরেজের প্রাণ একেবারেই লালায়িত! ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে আদর্শ শাসনযন্ত্রের খুব কাছাকাছি, এ বিষয়ে তাঁহাদের বড় একটা সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিশ্বাস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের শেষ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের সময় ত বেচারা প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিলেন, কয়েদীর খরচ কমাইয়া সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা দিলেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর নিজের একমাত্র শিশু কন্যাকে বিলাতে রাখিয়া আসিবার জন্য যখন ছয় মাসের ছুটী চাহিলেন, তখন ছুটী আর মিলিল না। আবেদনের পর আবেদনের যখন কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—All governments are bad, I am an anarchist. শেষে চটিয়া গিয়া তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"The gods of Simla are incorrigible।" কিছুদিন পূর্ব্বে মণ্টেগু সাহেবের রিফর্ম বিলের খসড়ায় যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একেবারে সর্ব্বময় প্রভু করিয়া খাড়া করা হইয়াছিল, তখন ঐ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টই একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তাহাতে কোন দোষ হইবে না। The Government of India are sensible people." নিজের লেজে পা না পড়িলে কেহ পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।

যাক্—এ দিকে যুদ্ধ ত শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম, তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পর আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশা ও আশঙ্কায় দিন কাটান ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয়, তাহারা জেলখানায় যদি সাত বৎসর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বৎসর ছাড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে; এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই নাকি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

এ পর্য্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্টব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৭ সালে যাহারা সিপাহী বিপ্লবের পর পোর্টব্লেয়ারে গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল, তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে, একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে!

ক্রমে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইংলণ্ডে বিজয়-উৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু কই, কয়েদী ত ছাড়িল না। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর হইতেই দিন গণনা আরম্ভ করা গিয়াছে; দিন গণিতে গণিতে সপ্তাহ, সপ্তাহ গণিতে গণিতে মাস, ক্রমে মাস গণিতে গণিতে বৎসর ফুরাইয়া গেল; কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল না। খবরের কাগজে কিন্তু পড়িয়াছিলাম যে, অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে বিজয়-উৎসব হইবে, সুতরাং মনের কোণে একটু আশা রহিয়া গেল।

ভারতে যখন বিজয়-উৎসব ফুরাইয়া গেল, তখন মনটা ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করিল—খবর বুঝি এই আসে, এই আসে। শেষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খবরও একদিন আসিল। সুপারিন্‌-টেন্‌ডেণ্ট আমাদের অফিসে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে, সরকার বাহাদুর কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে বৎসরে একমাস করিয়া মাফ দিয়াছেন। —ব্যোম ভোলানাথ। এত দিনের আশা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

তখন দেখিলাম যে, পোর্টব্লেয়ারে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটান ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। তাই যদি করিতে হয় ত ভূতের বেগার আর খাটিয়া মরি কেন? চীফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলাম যে, সমস্ত মাফ লইয়া যখন আমাদের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তখন সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের জেলের কাজকর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু সে আবেদন-পত্র যে চীফ কমিশনারের দপ্তরে গিয়া কোথায় ধামা চাপা পড়িয়া গেল, তাহার আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

এই সময় জেল কমিটির পোর্টব্লেয়ারে আসিবার কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে, আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল-কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল-কমিটি চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন; সেখান হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া যাইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেজের উপর পড়িয়া স্ফূর্ত্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"একটু স্থির হও, দাদারা; এ বাড়ীতে ফলার করতে এলে না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকী। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই। আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুই দিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া ছাব্বিশ জন জেল হইতে বাহির হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ী বাজিতেছে। জেলের বাহির হইয়াই শিখেরা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওয়া গুরুজী কি ফতে।" তাহার পর গান আরম্ভ হইল।—

ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়ঁাসে বাজ তোড়ায়ে—"

(হে পিতঃ, হে দশম গুরু। চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে; তুমি ধন্য।)

আজ আবার চটক দিয়া বাজ শিকার করিবার দিন আসিয়াছে, তাই ঐ সঙ্গীতের তালে তালে আমাদের প্রাণও নাচিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম—"হে ভারতের ভাবী গুরু, হে ভগবানের মূর্ত্তপ্রকাশ, সমুদ্র পার হইতে তোমার দীন ভক্তের প্রণাম গ্রহণ কর।"

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্ট-ব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। Wordsworthএর কবিতা মনে পড়িল—"What man has made of man."

জাহাজ তিন দিন ধরিয়া ছুটিয়াছে; মনটা তাহার আগে আগে ছুটিয়াছে। ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহানা। আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌঁছিবে!

নাঃ—জাহাজ ত কৈ ডুবিল না। এ যে সত্য সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলিস প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলীপুরের জেলের দিকে চলিল।

আবার আলীপুরের জেল—কিন্তু সে চেহারা আর নাই। আমাদের শুভাগমন-বার্ত্তা সুপারিন্‌-টেনডেণ্ট সাহেবের কাছে গেল। আমাদের কাছে যা কিছু জিনিস-পত্র ছিল, প্রহরীরা আসিয়া তাহা বুঝিয়া লইল। বড় বিশেষ কিছু ছিলও না। পোর্ট-ব্লেয়ার হইতে আসিবার সময় বইটই সমস্ত নূতন নূতন ছেলেদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম, দেশে ফিরিয়া আর মা সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা হইবে না। চুপ করিয়া শুধু দুটি ভাত খাইব আর পড়িয়া থাকিব।

ঘণ্টা খানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিন্-টেনডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম, সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিলাম—"জায়গা যথেষ্ট আছে"; আর মনে মনে বলিলাম—"জায়গা না পাই, রাস্তায় শুয়ে থাকবো; একবার ছেড়ে ত দাও।"

সে রাত্রে হেমচন্দ্র, বারীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশের বাড়ী গিয়া দেখিলাম, তিনি বাড়ীতে নাই; তখন সেখান হইতে ফিরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধু হাই-কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র সে রাত্রে সেইখানেই রহিয়া গেল। আর আমি চন্দননগরে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম রাত ১০৷৷০টার সময় হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিব।

কিন্তু বাড়ীর বাহির হইয়া দেখিলাম যে, কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া যাইবার আর প্রবৃত্তি হইল না। শ্যামবাজারে শ্বশুরবাড়ী—ভাবিলাম, সেইখানে গিয়া রাতটা কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌছিলাম, তখন রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ। দুই চারিবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতার রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দ দেখা দিল। আজ বারো বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি। সঙ্গে জেলার নাই, পেটি-অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত নাই। অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনও দেখা দেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই, বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। বারো বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই; সুতরাং আজ নূতন জুতায় পা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলী দেখিয়া রাস্তায় এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বসিল—কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব, ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার মনে হইল সত্য কথা বলিয়াই দিই যে, আমি কালাপানির ফেরত আসামী; তাহা হইলে আর কিছু না হোক, থানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গা পাওয়া যাইবে। তাহার পর ভাবিলাম, আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্য কথা বলিতে গিয়া ত বারো বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম। শেষে বলিলাম—"আমি কালীঘাট হইতে আসিতেছি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব।" কনষ্টেবল সাহেব আমার বগলের পুঁটুলী পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উড়ে?" বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"হাঁ"। তখন তাঁহার নিকট হইতে যাইবার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে একটা দীর্ঘ সেলাম দিয়া আবার রওনা হইলাম। সেই রাত্রে রাত একটার সময় গাড়ী চড়িয়া যখন শ্যামনগরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম, তখন রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া যখন নিজেদের পাড়ার ঘাটে আসিয়া নামিলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা; রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য; টিম টিম করিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জানালায় ধাক্কা মারিয়া ভায়াদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটা জানালা খুলিয়া গেল আর ভিতর হইতে হর্ষোদ্বেগ-চঞ্চল একটী সুপরিচিত বামা-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"তুমি কে?" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জানালা খুলিয়া মা ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার আশা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সে যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে যেন কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। এক পাল ছেলে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আমার চারদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কারা এরা? ইহাদের কাহাকেও যে চিনি না। একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া আমার মুখের

দিকে চাহিয়া ছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—"এই আপনার ছেলে।" যাহাকে দেড় বৎসরের রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ তেরো বৎসরের হইয়াছে!

আবার নূতন করিয়া সংসারের খেলা-ঘর পাতিয়া বসিলাম।

ওগো খেয়াপারের কর্ণধার! এবার কোন্ কূলে পাড়ি দিবে?

সমাপ্ত

বর্ত্তমান সমস্যা

—:•:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নিবেদন

হে বাঙ্গালী, তোমার আত্মস্থ হইবার দিন আসিয়াছে। বিশ্বাস কর, বর্ত্তমান জীবন-যজ্ঞের তুমিই প্রধান ও প্রথম পুরোহিত। তোমার অতীত জীবনের সমগ্র সাধনা স্বারাজ্যসিদ্ধিকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মরূপিণী গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র স্বহস্তে অতি আদরে তোমার বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ; গগনভেদী হিমালয় তোমার মাথার মুকুট, অতলস্পর্শী সমুদ্র তোমার পাদপীঠ ; আর্য্য, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড়ী সভ্যতার সার তোমার মধ্যে সংগৃহীত। জ্ঞানের আদিগুরু কপিল ও তাঁহার অংশাবতার ন্যায়াচার্য্যগণের তোমরা বংশধর, ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যের প্রেম তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, কলির বেদ তন্ত্র শাস্ত্র তোমাদেরই দেশে উদ্ভূত।

আপনার অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গের সমন্বয় তোমাদের দেশেই সাধিত হইয়াছে। সে অতীত সাধনা লুপ্ত হয় নাই ; কর্ম্মজগতে তাহা প্রয়োগ করিবার দিন আজ আসিয়াছে। সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত তপস্যাই আজ তোমাকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। যে শক্তি জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মে ত্রিধারারূপে মানুষের মনে প্রবাহিত, তাহাই পূর্ণরূপে তোমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া, তোমাকে নব যুগধর্ম্ম প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিবে।

এক দিকে ভোগবাসনাপীড়িত অভিজাতবর্গের উন্মত্ত হুঙ্কার, অপর দিকে দীন-দরিদ্র-নির্য্যাতিতের আর্ত্ত ক্রন্দন। এক দিকে সংসারাতিক্রমপ্রয়াসী ইহামুত্রবিমুখ সাধু, অপর দিকে বাসনাচঞ্চল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ভোগবিলাসের দাস গৃহস্থ। দেখিতেছ না—মানুষ সর্ব্বত্রই আপনাকে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে ? মর্ত্ত্যে সর্ব্বদুঃখহরা অমৃত-মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করাইয়া তোমাকেই এই সংসারকে ভূস্বর্গে পরিণত করিতে হইবে।

হে আমার দেবাংশ-সম্ভূত স্বদেশবাসিগণ! তোমাদের বহুযুগের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ আবার পূত হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া, বঙ্গের—ভারতের—নিখিল জগতের চিত্তকমলারূঢ়া মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া কৃতার্থ হও।

বর্ত্তমান সমস্যা

—:*:—

ইংরেজের আগমন

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে প্রথম ব্যবসা করিতে আসে, তখন যদি তাহাদের ভাগ্য-বিধাতা ভবিষ্যতের পর্দ্দা উঠাইয়া তাহাদের দেখাইয়া দিতেন যে, কোন মেওয়া গাছ নাড়া দিয়া তাহারা সোণার ফল কুড়াইয়া লইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা আহ্লাদে ও বিস্ময়ে কাটিয়া চৌ-চির হইয়া যাইত। জব চার্ণকের প্রেতাত্মা যদি আজ প্রেতলোক হইতে ধপ্ করিয়া কলিকাতার উপর নামিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে বিস্ময়ে একটা এত বড় হাঁ করিয়া ফেলিবে যে, তাহা পয়সা খরচ করিয়া দেখিবার জিনিষ। নবাবদের সিংহাসনকে দূর হইতে কুর্ণিস করিতে করিতে যাহাদের কোমরে খিল ধরিয়া যাইত, নবাবদের বংশধরেরা আজ তাহাদের বংশধরদিগের জামাসেলাই করিয়া ও জুতা বানাইয়া কৃতকৃতার্থ। অদৃষ্টের পরিহাস।

ধীরে ধীরে যখন ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে কেল্লা বানাইতে আরম্ভ করিল, তখনও রাজ্যলাভের স্বপ্ন তাহাদের মনের কোণে উঠে নাই। বেণের জাত, দু পয়সা ট্যাঁকে পুরিতে পারিলেই তাহারা সুখী। কিন্তু কড়ি কুড়াইতে গিয়া তাহাদের হাতে ঠেকিল মোহর; আর মোহর খুঁজিতে খুঁজিতে মিলিয়া গেল একেবারে সোণার খনি। ব্যবসা হইতে একচেটিয়া ব্যবসা; তাহা রক্ষা করিবার জন্য লাঠালাঠি; লাঠালাঠির ফলে বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি; আর শেষে দেওয়ানি করিতে করিতে গুলিখোর নবাবকে ঠেলিয়া দিয়া একলম্ফে মসনদে আরোহণ—ইহাই ইংরাজের বাংলা অধিকারের ইতিহাস। আজ যেমন ভারত রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত দক্ষিণ-এসিয়া গ্রাস করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তেমনি বাংলা রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত ভারত গ্রাস করা ক্রমে ক্রমে আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিস্তার, অর্থসংগ্রহ—রাজ্যভার গ্রহণ তাহার উপায়মাত্র।

বিড়ালের মত পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইয়া ইংরাজ ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে ইঁদুর ছানার মত টুপ্ টাপ্ করিয়া মুখে ফেলিতে লাগিল। পণ্ডিচারীর ফরাসী শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে এ দেশের লোককে পল্টনে ভর্ত্তি করিয়া আমাদেরই শীল নোড়া দিয়া আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিবার যে সুলভ ও সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইংরাজ তাহাই কাজে লাগাইল। দলে দলে এ দেশের লোক ইংরাজের পল্টনে ভর্ত্তি হইয়া নিজেদের দেশ দখল করিয়া ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিল। বাকী ছিল মারাঠা ও শিখ। মারাঠা গৃহ-কলহে অবসন্ন হইয়া শেষে বিদেশীর নিকট মাথা নোয়াইল; আর রঞ্জিতসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিখেরও অদৃষ্ট পুড়িল। মাদ্রাজ, কলিকাতা ও বোম্বাই প্রথমে যে রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতের মানচিত্রে ছড়াইয়া পড়িল। ইংরাজ ঐতিহাসিক যে বলেন—The English acquired India in a fit of absent-mindedness—তা বড় ঠিক কথা। ইংরাজ রাজ্য-লোভে এদেশে আসে নাই; বিধাতার চক্রান্তে বাদসাহের মাথার কোহিনুর বণিকের পুঁটলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ আগে বণিক, তাহার পর রাজা।

কেন এমন হইল? সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া মুষ্টিমেয় লোকে এত বড় একটা দেশ দখল করিয়া রাজা হইয়া বসা ত তামাসার কথা নয়। জগতের ইতিহাসে এ হেন কাণ্ড আর ত ঘটে নাই। ব্যবসা বাণিজ্য করিতে করিতে হঠাৎ এত বড় রাজ্য লাভ করিয়া ইংরাজ নিজেই প্রথমে চমকাইয়া উঠিল। আমাদের সৌভাগ্যটা যে আমাদের নিজের গুণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল, এ কথা ভাবিতে পারিলে সকলেই মনে মনে বেশ একটু আরাম পায়; ইংরেজও সে আরাম লাভ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এক লক্ষ ইংরাজ যখন ত্রিশ

কোটী ভারতবাসীকে শাসন করে, তখন এক একজন ইংরাজ যে তিন তিন হাজার ভারতবাসী অপেক্ষা বলবান—এটা ত সোজা ত্রৈরাশিকের হিসাব। আর এই হিসাব ধরিয়া অনেক ইংরাজই আপনাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বগল বাজাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংরাজদের মধ্যেও যাঁহারা স্থিরভাবে ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া বেশ একটু ভাবিত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। তাঁহাদিগকে একটু আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে স্বীকার করিতে হইয়াছে—The Empire which was won in a day may vanish in a night—এক দিনে যাহা আসিয়াছে, এক রাত্রেই তাহা চলিয়া যাইতে পারে।

মোট কথা এই যে, ইংরাজ যখন এদেশে আসে, তখন তাহারা সংঘবদ্ধ, আর আমাদের তখন ভাঙনের দশা। স্বামী রামদাস ও গুরুগোবিন্দ সিংহের অন্তরে যে শক্তি আবির্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা শুধু ধ্বংসাত্মক নহে; তাহার মধ্যে সৃজনের সামর্থ্যও নিহিত ছিল। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিতেই তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া যায় এবং কালক্রমে তাহা প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। বাধাপ্রাপ্ত না হইলে কালে হয়ত মারাঠা ও শিখের হাতে স্বাধীন ভারত গড়িয়া উঠিত; কিন্তু সে ভারত কিরূপ হইত —কে জানে? মহাভারতের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়-শক্তি বিনিষ্ট করিয়া, আভিজাত্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, শূদ্রের অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কার যিনি করিয়া দিয়াছিলেন, মারাঠা বা শিখ-হস্ত-গঠিত ভারত হয়ত তাঁহার আদর্শানুগামী হইত না। সে যাহাই হোক, মারাঠা ও শিখশক্তি সম্পূর্ণ আমাদের অবস্থা বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ইংরাজের সহিত সংঘর্ষে বিনষ্ট হইল।

হিন্দু রাজার আমলে আমরা শ্রেণী বিশেষের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম; ফলে আমাদের পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পাঠান মোগেলর দাসত্ব করিতে হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের মধ্যে যে অভ্যুত্থান দেখা যায়, তাহাতে আমাদের পূর্ব্বের সে আভিজাত্য-গর্ব্ব ও মোহান্ধতা কতকটা কাটিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু দুঃখের যে কঠোর নিষ্পেষণে মানুষের সর্ব্ববিধ উপাধি অপেক্ষা তাহার মনুষ্যত্বই আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে, সে নিষ্পেষণ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমাদের তাই আরও দেড়শত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ফল

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, তখনও বাণিজ্য বিস্তারের দিকেই তাহার লক্ষ্য। রাজকার্য্য তখন প্রধানতঃ খাজনা আদায়। জমিদার যেমন নায়েব গোমস্তা দিয়া খাজনা আদায় করিয়াই আপনার কর্ত্তব্য শেষ করেন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও সেইরূপ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেন। দেশে শান্তি না থাকিলে খাজনা আদায় হয় না; সুতরাং পুলিশ প্রহরীর আবশ্যক। ছোট ছোট কাজকর্ম্ম ইংরাজ কর্ম্মচারী রাখিয়া করাইতে গেলে খরচপত্র বাড়িয়া যায়, সুতরাং দেশের দুই চারিজন লোককে অল্প অল্প ইংরাজী শিখাইয়া ব্যয় লাঘব করিবার ব্যবস্থা হইল। দশটাকা বেতনে নির্ব্বিবাদে প্রাণ দিবার লোক এদেশে অনেক পাওয়া যায়, সুতরাং পণ্টনেও অনেক দেশী সিপাহী ভর্ত্তি করা হইল। ভারতবর্ষ কোম্পানীর জমিদারী—এই হিসাবেই ভারতের শাসনকর্ত্তা চলিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে যতদিন ভারতের মানচিত্র রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছিল, ততদিন দেশের লোক যেন মোহাবিষ্টের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। লর্ড ডালহৌসীর আর বিলম্ব সহিল না। তাঁহার লেখনীর এক এক খোঁচায় যখন এক একটা রাজবংশ লোপ পাইতে লাগিল, তখন লোকের মনে যেন একটু ধাঁধা লাগিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ দীপ্তির মত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একবার জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজের ইতিহাসে তাহার নাম সিপাহী-বিদ্রোহ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হিন্দুস্থান ও মধ্যভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস। কিন্তু সে ভাব সমগ্র ভারতে তখনও ব্যাপ্ত হয় নাই। পাঞ্জাবী ও গুর্খার সাহায্যেই ইংরাজ সে প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল।

তাহার পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী লোপ পাইল। আমরা খাস ইংরাজ জাতির প্রজা হইয়া পড়িলাম।

ইংলণ্ডের রাণী ভারতেশ্বরী বলিয়া ঘোষিত হইলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার রহিল —বিলাতী পার্লামেণ্টের হাতে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিশিল্প, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সব কাজেরই তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন পার্লামেণ্ট; আর আমরা কচি খোকার মত বুকে হাঁটিয়া আধ-আধ বুলি কপচাইবার অধিকার পাইলাম। আমরা হইলাম সনাতন নাবালক, আর পার্লামেণ্ট হইলেন আমাদের রক্ষক।

সিংহাসনের উপর চাপিয়া বসিয়া ইংরাজ এইবার রাজকার্য্য বেশ গম্ভীরভাবে চালাইতে আরম্ভ করিল। ইংরাজের অনেক গুণের মধ্যে নিজের উপর অগাধ বিশ্বাসটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় গুণ। সে যে সব জাতির চেয়ে সব বিষয়ে বড়, এটা তাহার কাছে স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং আমরা যে তাহার চেয়ে সব বিষয়ে ছোট, এ কথাটা সে গোড়া হইতেই একেবারে ধ্রুবসত্য বলিয়া স্থির করিয়া লইল। আর তার প্রমাণ ত হাতের কাছেই পড়িয়া আছে! প্রথমতঃ আমরা কালো, তাহারা সাদা; আমরা হাত দিয়া ভাত খাই, তাহারা কাঁটা দিয়া রুটী খায়; আমরা পরি ধুতি চাদর, তাহারা পরে কোট পেণ্টলান; আমরা পরি চটিজুতা, তাহাও আবার সব সময় জুটে না—আর তাহারা পরে বুট। তাহাদের সহিত এতগুলা বিষয়ে যখন আমাদের সঙ্গে অমিল, আর তাহারা যখন সভ্য—তখন আমরা যে ঘোরতর অসভ্য, এ বিষয়ে ত আর মতদ্বৈধের স্থান নাই! ইংরেজ তাই আমাদের সুসভ্য করিয়া তুলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিল।

ইংরাজী শিক্ষা দিবার আরম্ভ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বহুপূর্ব্বেই হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারের কথাটা যখন প্রথম উঠে, তখন কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে শিক্ষার প্রণালী লইয়া মতভেদ হয়। একদল বলেন দেশী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হোক; মেকলে প্রমুখ আর একদল ঘাড় বাঁকাইয়া বলেন—"তাও কি হয়! খান কত ভাল ভাল ইংরাজী বই পড়িলে যা জ্ঞানলাভ হয়, গাড়ী গাড়ী সংস্কৃত বই পড়িলে তাহার কণামাত্র হয় না।" ইংরাজী-ওয়ালাদেরই জয়লাভ হইল। ইংরাজ যে মনোভাব লইয়া আমাদের ইংরাজী শিখাইতে বসিল, তাহা এই যে, এদেশী অসভ্য-গুলাকে ইংরাজী পড়াইয়া মানুষ করিয়া দিতে হইবে।

ব্যবসা ও সৈন্য-চালনা বিষয়ে দেশটাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিবার জন্য রেল ও টেলিগ্রাফের আমদানী হইল। তাহাতে দেশের লোকেরও সুবিধা হইল বটে; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সেগুলা আমাদের সুবিধার জন্য এদেশে আনীত হয় নাই।

বিলাতী সভ্যতার সাজ সরঞ্জাম সবই ক্রমে ক্রমে আসিয়া পৌছিল। বিলাতী হুইস্কীও দেখা দিল। সভ্যতার চাকা একেবারে গড় গড় করিয়া আমাদের বুকের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। ইংরাজী বুলি, চাল চলন, কায়দাকরণ, আসবাব-সরঞ্জাম—যেন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। ভারতীয় জিনিষ আমাদের চক্ষে হেয় হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইংরাজী-শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইল—ভিতরে বাহিরে যথাসাধ্য ইংরাজ বনিয়া যাওয়া। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারে, কথাবর্ত্তায় যিনি ইংরাজের যতখানি কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন, তিনি হইলেন ততখানি সভ্য। বিধাতার বিড়ম্বনায় গায়ের রংটা সাদা হইল না বলিয়া, ইংরাজী-নবীশেরা মনে মনে বেশ একটু লজ্জিত হইয়াই রহিলেন।

আমরা ত ইংরেজী শিখিয়া ইংরাজের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে গেলাম, কিন্তু ইংরাজ আমাদের কাছে ঘেঁসতে দিল না। পরকে আপনার করিয়া লইবার অভ্যাস ইংরাজের নাই; অপরের ঘেঁস সে সহিতে পারে না। ফরাসী বা স্পেনীয়রা যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেখানকার লোকদের যথাসাধ্য কালাফিরিঙ্গি বানাইয়া লইয়া তাহাদিগকে কতকটা রাজনৈতিক সমান অধিকার দিয়াছে; এ বিষয়ে তাহারা কতকটা মুসলমানদের মতো। কিন্তু ইংরাজ সে ধাতের জীব নহে, সে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া যাহাদের জাত মারে, তাহাদের সমান অধিকার দেয় না।

রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে যে নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, তাঁহারা প্রধানতঃ হইয়া দাঁড়াইলেন ইংরাজের শাসন-যন্ত্র চালাইবার কর্ম্মচারী। ইংরাজ আপনার বাণিজ্য প্রসারের জন্য রেল খুলিল; শিক্ষিত সম্প্রদায় হইলেন টিকিট কাটিবার বাবু। ইংরাজ সওদাগরী অফিস খুলিল; ইঁহারা হইলেন কেরাণী। ইংরাজ ট্যাক্স খাজনা আদায়

করিতে লাগিল; ইঁহারা হইলেন তাহার হিসাব-রক্ষক। ইংরেজ আদালত খুলিয়া বিচার করিতে বসিল; ইঁহারা হইলেন উকীল, পেশকার, মুহুরী; ইংরেজ ইস্কুল নাম দিয়া কেরাণী বানাইবার কল বসাইল, ইঁহারা হইলেন সেখানকার শিক্ষক নামধারী মিস্ত্রি। মোটের উপর ইঁহাদের প্রধান কাজ হইল —ইংরাজের শাসন-যন্ত্রের চাকায় তেল লাগান। ইঁহারা চাষ করিতে পারেন না, শিল্প-বাণিজ্য বোঝেন না, এবং যুদ্ধবিগ্রহে অপটু। ফলে দেশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া উঠিল ত বটেই; —সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প-বাণিজ্যও নষ্ট হইল। শিক্ষার ভার ইংরাজের হাতে—দেশ ষোল আনা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

ইহার অনিবার্য্য ফল যাহা, তাহাই ফলিল। একে ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীদেব মাহিনা ও পেন্সন যোগাইয়া দেশ ফতুর; তাহার উপর সরকারী ব্যয় সংকুলানের জন্য ইংলণ্ড হইতে যত টাকা ধার করা হইয়াছে, তাহারও সুদ গণিতে হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা এত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল যে, দেশের জমির খাজনা স্বরূপ যত টাকা রাজস্ব আদায় হইত, তাহাব সমস্তই সৈনিক-বিভাগে খরচ হইয়া যাইতে লাগিল। শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় অনেক লোকেরই কৃষিমাত্র নির্ভর হইয়া উঠিল। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেশকে ঘিরিল; রোগ, মহামারী লোকের নিত্য-সহচর হইয়া দাঁড়াইল।

উচ্ছিষ্ট খাইয়া যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পেট ভরিল না—তখন তাঁহারা দেশের দুর্দ্দশার প্রতীকারের জন্য আরম্ভ করিলেন—আন্দোলন। এই আন্দোলনের কেন্দ্র হইল কংগ্রেস। বৎসরে একবার করিয়া শীতকালে বড়দিনের সময় দেশের বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার মিলিয়া সরকার বাহাদুরের কাছে তাঁহাদের অভাব ও অভিযোগের একটা তালিকা পাঠাইতেন, সরকার বাহাদুরও ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে তাঁহাদের আবেদন নিবেদনের ফর্দ্দটি ফেলিয়া দিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। এইরূপে কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর কাটিল।

দেশের মধ্যে কিন্তু এমন কয়েকজন ছিলেন, ইংরাজী শিক্ষার মোহে যাঁহারা আত্মবিস্মৃত হন নাই। ইংরাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহার প্রকৃত রূপটা তাঁহাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বাংলা-দেশে বঙ্কিম, ভূদেব, হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কমলাকান্তের খেয়ালের মধ্যে যে তীব্র করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, ভূদেবের স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাসে যে চিত্র ফুটিয়াছে, হেমচন্দ্রের বীণার ঝঙ্কারে যে গীত ধ্বনিত হইয়াছে —তাহা কংগ্রেসী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু মোহাবিষ্ট দেশের কাণে তাহা ভাল করিয়া পৌঁছে নাই।

বিশ বৎসর ভিক্ষা করিয়াও যখন কংগ্রেসী নীতির কোন সফলতা দেখা গেল না, তখন কাব্যরসিকগণের মনেও একটা দ্বিধা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিক্ষুকের চীৎকার যে দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ নয়, এ কথাটা কংগ্রেসেরও মাথায় গিয়া ঢুকিল। কিন্তু রাজনৈতিক পেশা ত আর ছাড়া যায় না। তাই কংগ্রেস স্থির করিলেন যে, লাট কার্জ্জন-কৃত বঙ্গ-বিভাগের প্রতীকারের জন্য একদিকে আবেদন নিবেদন করিতে থাক, অপর দিকে ইংরাজের টাকার থলিতে যাহাতে হাত পড়ে, সেই জন্য ইংরেজের পণ্যদ্রব্য দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।

কিন্তু দেশের অন্তরে অন্তরে যে ক্ষীণ ধারা বহিতেছিল, অবসর বুঝিয়া তাহা এইবার ফুটিয়া বাহির হইল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বরাজ্য-শাসনের উপযুক্ত হইলে ইংরাজ নাকি কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে উপনিবেশের মত স্বায়ত্ত-শাসন বখ্‌সিস করিবে—কংগ্রেসের এ আশা যুবকেরা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিল। জাপান স্বাধীন, চীন স্বাধীন, কাবুলও স্বাধীন। শুধু আমরাই জগতে এত দীন হীন যে, পরের ভিক্ষাপুত্র হইয়া জীবন কাটাইব? ভারত-বর্ষ কি ইংরাজের উপনিবেশ, যে ইংরাজের নিকট শিক্ষাদীক্ষা লইয়া নকল-ইংরাজ সাজিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া তুষ্ট থাকিবে? উপনিবেশ-গুলি ইংলণ্ড হইতে জন্মিয়াছে, তাহাদের আচার ব্যবহার, শিক্ষা, আদর্শ অনেকটাই ইংরাজের মত; তাহাদের সম্বন্ধে যে কথা খাটে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহা খাটিবে কি করিয়া? ভারতের একটা গৌরবের অতীত আছে; জীবনের একটা পরিস্ফুট আদর্শ আছে; সামাজিক রীতি নীতি সব বিষয়েই সে ইংলণ্ড হইতে বিভিন্ন। যাহাদের ভারতের জাতীয় বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নাই, তাহারাই ভারতকে লইয়া উপনিবেশ গড়িতে চায়।

তাহাই হইল যুবকদিগের যুক্তি। পুরাতন রাজনৈতিক নেতাদিগের সহিত আদর্শ লইয়া এইখানে তাহাদের মতভেদ ঘটিল। তাহার পর উঠিল পন্থার কথা। একদল বলিলেন—ইংরেজের সাহচর্য্য যদি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজত্ব একদিনও টিকে না। আমরা ইংরাজের পুলিস হইয়া শান্তিরক্ষা করি, সিপাহী হইয়া যুদ্ধ করি, কর্ম্মচারী হইয়া শাসনকার্য্য চালাই, তবেই না ইংরাজের রাজ্য চলে। আর এই শাসনের খরচ জোগায় কে? ইংরাজ ত আর ঘরের পয়সা খরচ করিয়া এখানে রাজত্ব সুখভোগ করিবার জন্য বসিয়া থাকিবে না। অতএব দাও কাজ ছাড়িয়া; ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপার বন্ধ কর; সময় মত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিও; দেখিবে ইংরাজের এ রাজ-প্রাসাদ তাসের ঘরের মত একদিন ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইবে।

যুবকদিগের ভিতর আর একদল বলিলেন—তাও কি হয়? যদি সবাই মিলিয়া এ করা যায়, ও করা যায়, তা করা যায়—তাহা হইলে ইংরাজের রাজত্ব ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু এ অষ্টবজ্র মিলন হইবে কেমন করিয়া? দেশের সমস্ত লোক একেবারে একমত হইয়া ইংরাজের সংস্রব ছাড়িয়া দিবে—ইহা কল্পনা করিয়া সুখ হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইবার কোনও আশা নাই, আমেরিকা যখন যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইল, তখন আমেরিকায় এমন একদল লোক ছিল, যাহারা ইংলণ্ডের সহিত মিলনের পক্ষপাতী। আরও এক কথা, আমরা যে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপার বন্ধ করিয়া বা খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া ইংরাজ রাজত্বের গোড়া কাটিয়া দিব, ইংরাজ কি এমনি নাবালক যে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তামাসা দেখিবে? তাহার পকেটে হাত পড়িলেই সে ছলে বলে কৌশলে লাঠিবাজী সুরু করিয়া দিবে; অতএব সময় থাকিতে লাঠির বদলে লাঠি চালাইতে অভ্যাস কর। যেখানে পাও, গুলি, গোলা, বন্দুক জোগাড় কর, বিদেশে গিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা কর। কেহ অত্যাচার করিলে তাহার মাথা উড়াইয়া দাও।

দেশের যুবকেরা ক্রমে ক্রমে এই দ্বিতীয় দলেরই মতাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইল। কেন না দেখা গেল যে, যাঁহারা কেবলমাত্র সাহচর্য্য বর্জ্জনের পক্ষপাতী ও অস্ত্রধারণের বিরোধী, ইংরেজ তাহাদেরও সভাসমিতি পিউনিটিভ পুলিস বসাইয়া লাঠির গুঁতায় ভাঙ্গিয়া দিতে ইতস্ততঃ করে না। দেশের ছেলেদের মধ্যে তখন লাঠি খেলার ধূম পড়িয়া গেল। বন্দুক রিভলভার চারিদিকে চুরি হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বোমারও আমদানী হইল।

এক আধটা ছোটখাট খুন জখম হইবার পর, একদিন ইংরাজ কর্ম্মচারীদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দুম্ করিয়া বোমা ফাটিল। কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছে। চারিদিকে ধরপাকড়, খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। নূতন নূতন আইন গড়িয়া খবরের কাগজওয়ালাদের মুখবন্ধ করা হইল; লাঠিখেলার সভাসমিতি উঠাইয়া দেওয়া হইল; দেশের ছেলেরা আর টুঁ শব্দটী না করিতে পারে, সরকারের পক্ষ হইতে তাহার সম্যক প্রকার আয়োজন হইল। ছেলের দলে জেল ভরিয়া গেল; আন্দামানেও আর স্থান সংকুলান হইল না; কিন্তু খুন জখম রহিত হইল না।

কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন, একটা কিছু না করিলে নয়। তাঁহারা হঠাৎ সদয় হইয়া বঙ্গবিভাগ রহিত করিয়া দিলেন। পুরাতন নেতারা বলিয়া উঠিলেন—"আমরা ত বলিয়াই ছিলাম; আবেদন নিবেদনের মত আর জিনিষ নাই; বুঝাইয়া বলিতে পারিলে ইংরাজ কথা শুনিবেই শুনিবে।" নূতন দলের ছেলেরা বলিল—"তা'ত ঠিক; কিন্তু ইংরাজকে বুঝাইতে গেলে মুখের কথা ছাড়া আরো কিছু দরকার।"

বঙ্গবিভাগ রহিত হইল বটে, কিন্তু আগুন নিভিল না। দিনকতক একটু মিটুমিট করে, আবার মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এদিকে ইংরেজের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বিপ্লবপন্থীরা এই সময় একবার মরণ কামড় কামড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। জার্ম্মাণীর নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজন হইতে লাগিল। দেশীয় সৈন্যেরাও যাহাতে বিপ্লবে যোগ দেয়, তাহারও ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু সব ষড়যন্ত্রই ধরা পড়িয়া গেল।

একে বাহিরে প্রবল শত্রু জার্ম্মাণী; তাহার উপর ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থাও এইরূপ দেখিয়া ইংরাজ বেশ একটু ভড়কাইয়া গেল। একেবারে ফাঁকা কথায় যে আর কাজ চলিবে না, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বুঝিলেন, এবং কতটুকু ক্ষমতা দেশের লোকের হাতে ছাড়িয়া দিলে আপাততঃ কাজ চলিতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য খুব ঢাক ঢোল পিটাইয়া ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারী

এদেশে আসিয়া মতামত সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। সবাই হাঁ করিয়া ভাবিতে লাগিল—বুঝি বা একটা কিছু সত্য সত্যই মিলিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল,—ইংরাজ আপনার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। রিফর্ম বিলের নমুনা দেখিয়া লোকের "কমলাকান্তের পে বিলের" কথা মনে পড়িয়া গেল। দেশময় আবার হৈ চৈ উঠিল। পুরাতন নেতারা বলিতে লাগিলেন—"গরীবের পক্ষে যা মিলিয়াছে, তাই ভাল"—কিন্তু দেশের লোক আর সে কথা কাণে তুলিল না। তাহার পর পাঞ্জাবে শ্রীমান ও'ডায়ার ও ডায়ারের সাঙ্গোপাঙ্গগণ জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ বীরত্বের যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিলেন, তাহাতে লোকের চক্ষুকর্ণের বিবাদ একেবারেই মিটিয়া গেল।

বিলাতের লাটসভায় যখন ডায়ারের গুণগ্রাম কীর্ত্তন হইল, আর এ দেশের ও ইংলণ্ডের চুনোগলির টঁ্যাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ডিউক, ডচেস পর্য্যন্ত চাঁদার খাতা খুলিয়া ডায়ারের অধস্তন সাত পুরুষের নির্ভাবনায় বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তখন এ দেশের অতি বড় রাজভক্তকেও লজ্জায় মুখ লুকাইতে হইল।

মুসলমানদেরও চোখ কাণ ফুটিল। ১৯০৫ সালে স্বদেশীর যুগে তাঁহারা বেশ প্রাণ খুলিয়া স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। দেশ স্বাধীন হইলে সংখ্যাধিক্যবশতঃ পাছে হিন্দুরাই সব ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়া লয়, এ ভয় তাঁহাদের মনে মনে ছিল। ইংরাজের একটু কোল ঘেঁসিয়া থাকিলে যদি কতকটা সুবিধা পাওয়া যায় ত মন্দ কি? কিন্তু বিধাতার এমনি বিকট পরিহাস যে, ইংরেজ সিন্নিও খাইল, ভরাও ডুবাইল। তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় হাজার হাজার মুসলমান ইংরাজের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রাণ দিল। ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করিল যে, যুদ্ধের পর তুর্কীর যাহাতে বিশেষ অনিষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে দেখা গেল যে, সন্ধির সর্ত্তে একেবারে তুর্কীকে ছারখার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানেরা যখন দেখিলেন যে, ইংরাজ তাঁহাদেরই শীল নোড়া দিয়া তাঁহাদের দন্ত-সংস্কার করিয়াছে, তখন আর তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ত এ দুষ্কার্য্য সম্ভবপর হইত না। সুতরাং তাঁহারা ভারতে স্বরাজ্য স্থাপনের আন্দোলনে যোগ দিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন

রিফর্ম-বিলের কথাবার্ত্তা যতদিন চলিতেছিল, ততদিন দেশ আশায় উৎকণ্ঠায় চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু উহার স্বরূপ যখন প্রকাশ হইল, তখন দেশে ঐ পুরাতন দলগুলি আবার নূতন নামে মাথা তুলিল। কিন্তু দেখা গেল যে, পুরাতন মডারেট-দিগের সংখ্যা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে; তাঁহাদের নেতৃগণ ক্রমে ক্রমে রাজভক্ত হইতে রাজকর্ম্মচারীর সামিল হইয়া গেলেন; জনসাধারণের উপর তাঁহাদের আধিপত্য কিছুই রহিল না বলিলেই চলে। এদিকে বিপ্লবপন্থীরাও পনের বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখিলেন যে, বিপ্লব বলা যত সোজা, করা তত সোজা নয়। সুধু জনকতক ছেলে ও কতকগুলা রাইফেল ও রিভলভার জোগাড় করিলে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের খুন করা চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশ স্বাধীন হয় না। দেশের জনসাধারণের মধ্যে যদি আত্ম-চৈতন্য না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে জনকত মিলিয়া স্বাধীনতালাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সেইজন্য মহাত্মা গান্ধী যখন স্বরাজ্য-লাভের জন্য ইংরাজের সাহচর্য্য-বর্জ্জন-নীতি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুরাতন বিপ্লববাদীরা তাঁহার সহিতই যোগ দিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, স্বরাজ্য-লাভের পন্থা পরিশেষে সশস্ত্রই হোক আর নিরস্ত্রই হোক, তাহা লইয়া আপাততঃ গণ্ডগোল বাধাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের হাতে যখন অস্ত্র নাই, তখন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমাদের নিরস্ত্র পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না—সে ন্যায়ের বিচারটা আপাততঃ না হয় স্থগিত রহিল। দেশের মধ্যে ত আগে ইংরাজের সাহচর্য্য বর্জ্জন করিয়া একতা ফুটিয়া উঠুক—বাকী প্রশ্নটা পরে মীমাংসা করিলেও চলিবে।

সুতরাং ১৯০৫ সালের পুরাতন নিরস্ত্র-সহযোগিতা-বর্জ্জন-বাদই ১৯২০ সালে নূতন রূপ ধরিয়া আবার প্রবল হইয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী হইলেন এই ভাবের কেন্দ্র। ১৯০৫ সালের আন্দোলন প্রধানতঃ বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, ১৯২০ সালে উহা সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অভিজাতবর্গ ভিন্ন ইংরাজ রাজত্বের শুভাকাঙ্ক্ষী এদেশে আর নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্বে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল;

এবার দ্রুতবেগে ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। "ইংরেজের ইস্কুল কলেজে তাহার শাসন-যন্ত্র চালাইবার কর্ম্মচারী মাত্র প্রস্তুত হয়, অতএব ইস্কুল কলেজ ছাড়; আদালতে বিচার বিক্রয় করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি পায় ও দেশের উপর তাহার আধিপত্য বদ্ধমূল হয়, সুতরাং আদালত ত্যাগ কর; পুলিস ও সৈনিক বিভাগ দ্বারা দেশ শাসিত হয়, সুতরাং ঐ দুই বিভাগে যাহাতে কোন দেশীয় লোকে ভর্ত্তি না হয়, তাহার বন্দোবস্ত কর; মোট কথা, ইংরাজকে শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য কেহ আর্থিক, মানসিক বা শারীরিক কোনরূপ সাহায্য করিও না; ইংরেজ রাজত্ব আপনিই বিনষ্ট হইবে"—ইহাই এ আন্দোলনের মূল কথা।

বর্ত্তমানকালে এ আন্দোলন দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, কিন্তু ইহা স্থায়ী ও সফল হইবে কি না বুঝিতে গেলে, ইহার মূলে যে যে কারণ নিহিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের প্রতি ইংরাজের ব্যবহার দেখিয়া অনেকেই ইংরাজকে চিনিবার সুবিধা পাইয়াছে; কিন্তু সেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার সুবিধা যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অধীনতার প্রতি ঘৃণার ভাব হয়ত সত্য সত্যই জাগিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ যে এই আন্দোলনে যোগ দিতেছে, বর্ত্তমান দেশব্যাপী অন্নবস্ত্রের অভাব যে তাহার একটা প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯০৫ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার পর অনেকে সে আন্দোলন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এবারেও যদি জালিয়ানওয়ালাবাগের কর্ত্তাদিগের খানিকটা শাস্তি দেওয়া হয়; নূতন সন্ধির ফলে তুর্কির অবস্থা কতকটা উন্নত হয় এবং প্রেস য়্যাক্ট, রাউলাট য়্যাক্ট প্রভৃতি আইনগুলি তুলিয়া দিয়া রিফম বিলের দ্বিতীয় কিস্তি দিবার প্রস্তাব উঠে, তাহা হইলে বর্ত্তমান আন্দোলনের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া পড়িবে বলিয়াই যেন মনে হয়। তবে এখন সারা জগতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দেশে দুর্ম্মূল্যতা শীঘ্র ঘুচিবার বড় বেশী সম্ভাবনা নাই; এবং ইংরাজ যে শীঘ্র স্বেচ্ছায় রিফর্ম বিলের দ্বিতীয় কিস্তি লইয়া হাজির হইবে, তাহারও কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে, আন্দোলনের বেগ আপাততঃ বাড়িতেই থাকিবে। কিন্তু আন্দোলন বাড়িয়া চলিলেই দেশকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করা যাইবে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইংরাজের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি এখন হইতেই হইতে আরম্ভ হইয়াছে; আবগারী বিভাগ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহাতেও হাত পড়িয়াছে। ইংরাজ যে চুপ করিয়া এ অধিক ক্ষতি বহুদিন স্বীকার করিবে, তাহা মনে করিবার কারণ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। আমরা শান্ত-রস প্রচার করিলেই যে ইংরাজের মনে বীররস শুকাইয়া যাইবে—এরূপ নাও হইতে পারে। আমরা non-violent হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজের violent হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তখন ঠেকাইবার উপায় কি? কেহ কেহ হয়ত মনে করেন যে, ইংরাজ ও মূর্ত্তি ধারণ করিবার পূর্ব্বেই আমরা দেশকে সংহত করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিব। দেশকে সেরূপ সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবার শক্তি এ আন্দোলনের আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

এ পর্য্যন্ত এ আন্দোলনের যতটুকু প্রকাশ হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ নিষেধাত্মক। আমরা যা চাই না, তা সকলেই জানি; কিন্তু কি যে চাই, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা নিতান্তই অপরিস্ফুট। এই 'নেতি নেতি'র পথে হয় ত বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু সংসার চলে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। ছেলেরা কলেজ ছাড়িয়াছে, কিন্তু নূতন ভাবের কেন্দ্রস্বরূপ একটা কিছু গড়িয়া উঠে নাই। যাহারা প্রচার কার্য্য করিবে বলিয়া জনসাধারণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহারা ভাবে, ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে, আদর্শে জনসাধারণ হইতে বহু পরিমাণে পৃথক। ন' মাসে স্বরাজ স্থাপনের আদর্শে যাহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, দেশের যথার্থ অভাব-অভিযোগ বুঝিতেই হয়ত তাহাদের অনেক ন' মাস কাটিয়া যাইবে। আশাভঙ্গের পর যে একটা প্রতিক্রিয়া আছে তাহার হাত হইতে ছেলেরা অব্যাহতি পাইবে কি ?

এ আন্দোলনের কার্য্য-প্রণালী যে প্রধানতঃ নিষেধাত্মক হইয়া যাইতেছে, তাহার আরও একটা গূঢ়তর কারণ এই যে, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশের সহিত আমাদের নাড়ীর টান কতকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা ব্যবহারিক ভাবে যেমন সত্য, আধ্যাত্মিকভাবে আরও অধিক সত্য।

আমাদের অতীত যুগের শিক্ষার ধারা ও সাধনার সহিত আমরা অপরিচিত। রাজনীতি বলিলেই আমাদের মনে ভোট, ব্যালট, মেজরিটী ও পার্লামেণ্টের কথা জাগিয়া উঠে; অথচ যে ইউরোপের নিকট হইতেই আমরা এ সমস্ত জিনিষের আভাষ পাইয়াছি, সেইখানেই লোকে আজ এরূপ শাসন ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশের অতীত চিন্তা-প্রণালীর সহিত সংযোগ স্থাপন না করিয়া কেহ দেশের ভবিষ্যৎ গড়িতে পারে না। সেই জন্যই মনে হয় যে, যতদিন না আমরা আপনাদের মধ্যে দেশের চিন্তার ধারা, সাধনা, ও জীবনের আদর্শের সন্ধান না পাইব, ততদিন আমাদের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে গঠন অপেক্ষা ধ্বংসের ভাবই প্রবলতর থাকিবে।

প্রকৃতপক্ষে সহযোগিতা-বর্জ্জন যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মাত্র। আয়র্লণ্ড বহুবৎসর ধরিয়া দেশের সুপ্ত চৈতন্য শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে; তাহার ফলে আজ সে দেশে সিনফিনের উৎপত্তি। দেশের স্বাধীনতার পক্ষে সেরূপ জাগরণ একান্তই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা দেশময় আজ এই চাঞ্চল্য দেখিয়া মনে করেন যে, দেশের সুপ্ত আত্মা জাগিয়াছে, তাহারা ভুলিয়া যান যে, এই দেশাত্মবোধ একটা স্বয়ং-প্রকাশ জাগ্রত সত্য; ইহা শুধু 'নেতি নেতি'র সমষ্টি মাত্র নহে। আজ যাহা দেশে দেখা দিয়াছে, উহা national consciousness নহে; শুধু political consciousness মাত্র। আমরা কি চাই না, তাহা বুঝিয়াছি; যাহা চাই, তাহার সাক্ষাৎকার আজও পাই নাই। অথচ দেশকে জাগাইতে গেলে তাহাকেই পাওয়া আবশ্যক।

তবে কি বর্ত্তমান অন্দোলন ব্যর্থ? তাহা নহে। মিথ্যার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া উহা আমাদের সত্যানুসন্ধানস্পৃহা জাগাইয়া তুলিবে। সৃজনের জন্য যে শাস্ত্র জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা উহা ফুটাইয়া তুলিবে। জীবন-প্রভাতের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া, নবজীবন সৃষ্টির শক্তি সংগ্রহ করিয়া যখন আবার নূতন প্রেরণা আসিবে, তখন আমরা প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারিব—

স্বাগতং।

কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী

বোম্বায়ের একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিকে 'স্বরাজ' কথাটির ব্যাখ্যা দেখিতেছিলাম। লেখক প্রথমেই এই কথা বলিয়া মুখবন্ধ করিয়াছেন যে, স্বরাজ জিনিসটী যে কি, তাহা কথায় বুঝান যায় না। স্বরাজের এইরূপ বাক্যাতীত অবস্থার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাই বাক্যাতীতকে কথার বাঁধনে লেখক কেমন করিয়া ধরিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইল। প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিলাম, লেখক বলিতেছেন যে, অল্পকথায় স্বরাজের রূপবর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যদি খদ্দর পরিয়া অহিংসাব্রত গ্রহণ করে ও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যদি মৈত্রী স্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের যে অপূর্ব্ব অবস্থা হয়, তাহারই নাম স্বরাজ।

মনের চোখে কল্পনার চশমা আঁটিয়া একবার সখ মিটাইয়া সে রূপ দেখিবার চেষ্টা করিলাম; শেষে হতাশ হইয়া স্থির করিলাম, এ স্বরাজ শুধু বাক্যের অতীত নয়, মনেরও অতীত। এতদিন মনে মনে আমার বেশ একটু গর্ব্ব ছিল যে, স্বরাজের এরূপ ব্যাখ্যা লইবার মত বুদ্ধি বাংলাদেশে জন্মায় নী। কিন্তু কলিকাতা 'সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স' কমিটির নিকট কংগ্রেসের দুই একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সে ভুলও ভাঙ্গিয়াছে।

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যখন স্বরাজলাভের কথা উঠিয়াছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"আজ যদি দেশের লোকের হাতে তরবারি থাকিত, তাহা হইলে দেশের লোকে

তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।" আর তাহা নাই বলিয়াই দেশের নেতারা অন্য পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের আবিষ্কৃত পথ ধরিয়া আজ আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

নেতারা তখন স্থির করিয়াছিলেন যে, আমাদের বিদেশী কর্ত্তারা যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোদুর্গ দখল করিয়া বসিয়াছেন, আগে সেই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার। স্কুল, কলেজ, ব্যবস্থাপক সভা আর সরকারী উপাধিগুলা ছাড়িতে পারিলেই অনেকটা মানসিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এই সিদ্ধান্তেই তখন তাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন। মানসিক স্বাধীনতা পাইবার পর কেমন করিয়া তাহা ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহাও স্থির করা হইয়াছিল। প্রথমে বিদেশী ও দেশী কলের কাপড় ছাড়িয়া খদ্দর পরিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সালিসী আদালত প্রতিষ্ঠা ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে; আর সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া স্বাবলম্বী হইবার পর স্বরাজ্য ঘোষণা করিয়া দিয়া বিদেশী শাসন-যন্ত্রকে সাহায্য করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। খাজনা ট্যাক্স না পাইলে ত আর রাজ্য চলে না; কাজে কাজেই আমরা খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিলেই আমাদের বিদেশী শাসনকর্ত্তারা বাধ্য হইয়া আমাদের স্বাধীনতা মানিয়া লইবেন।

হিসাবটা বেশ সোজা। নৈবেদ্যের চাউল সরাইয়া লইলেই যেমন মাথার মণ্ডা নীচে গড়াইয়া পড়ে, এও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু মণ্ডার মত মোলায়েমভাবে নীচে গড়াইয়া পড়িতে ইংরেজ হয়ত সহজে রাজী হইবে না। লাঠি বা বন্দুকের ঠেকনা দিয়া নৈবেদ্যকে খাড়া করিয়া রাখিতে সে হয় ত কিছুমাত্র ইতস্ততঃ নাও করিতে পারে। সেইজন্য নেতারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, লাঠির ঘা বা সঙ্গীণের খোঁচা নির্ব্বিবাদে সহিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হওয়ার নামই অহিংসাসাধন।

গত বৎসর ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে যখন স্বরাজের শুভাগমনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ কারণ স্থির করিলেন যে, মানসিক স্বাধীনতার যে যে লক্ষণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গুলি আমাদের মধ্যে এখনও সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই; আর এই স্বাধীনতার বহিরঙ্গসাধনেও আমরা যথেষ্টদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। তাড়াতাড়ি এই ত্রুটিগুলি সারিয়া লইয়া স্বরাজ্যঘোষণা ও খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। স্বয়ং মহাত্মাজী বারদোলি তালুকে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারাদেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া দিন গণিতে লাগিল—এমন সময় চৌরিচৌরার লঙ্কাকাণ্ডে প্রমাণ হইয়া গেল যে, এ দেশের লোকগুলা সাত শত বৎসরের শিক্ষানবিশী সত্ত্বেও অহিংসাসাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক ঘটি দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়িয়া সব মাটী করিয়া দিল।

খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের আয়োজন স্থগিত হইয়া গেল। নেতারা নূতন ব্যবস্থা দিলেন যে, স্বরাজের ইমারত গোড়া হইতে আবার পাকা করিয়া গাঁথিতে হইবে। তাহার সহিত একটুখানি হিংসার খাদ মিশিয়া গেলেই আবার সব শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে। তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, জাতীয় শিক্ষা, অনাচরণীয় জাতির সামাজিক উন্নতি, সালিসী আদালত, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন ও খদ্দর ব্যবহার—এই গুলিই হইল স্বরাজ গাঁথিবার পাকা মালমসলা।

এই সময় হইতেই অহিংসা কথাটার উপর খুব জোর দেওয়া আরম্ভ হইল। এমন কি, কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, অহিংসা প্রচার করিয়া জগতে একটা নূতন যুগ লইয়া আসাই এই অসহযোগ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; ভারতবর্ষে স্বরাজস্থাপন গৌণ লক্ষ্য মাত্র। ক্রমে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিয়া বিদেশী শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিবার কথাটা দূরে পিছাইয়া যাইতে লাগিল। খদ্দর আর স্বরাজ প্রায় একার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইল। অনেকে খদ্দর পরিয়া অন্তরের স্বরাজ লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলেন।

যাঁহারা অত সহজে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা নানারূপ কূট প্রশ্ন তুলিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর সহিত সহযোগের সম্বন্ধ কোথায়? এ ত শুধু অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। ইহার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক কি? শাসনযন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগের নাম যদি অসহযোগ হয়, তাহা হইলে খদ্দর প্রচার, হিন্দুমুসলমান-প্রীতি, অপাংক্তেয় জাতির সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারকে অসহযোগ নাম দিবার ত কোন সার্থকতা নাই। এগুলি ত সমাজ-সেবার

অঙ্গ বিশেষ; অর্থনীতির সহিত ইহার একটা সম্বন্ধ আছে; কিন্তু রাজনীতির সহিত সম্পর্ক যে একেবারে নাই বলিলেই চলে। দেশের অর্দ্ধেক লোক যদি খদ্দর পরে, তবেই তাহাদের খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার জন্মিবে। যদি দেশের লোক সে পরিমাণ খদ্দরের ব্যবস্থা না করিতে পারে, তাহা হইলে রাজনীতি-চর্চ্চার ঐ খানেই শেষ। স্বরাজলাভ আর এ যাত্রায় হইল না।"

খদ্দরের যাঁহারা পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা বলেন—"খদ্দর শুধু একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। খদ্দর তৈয়ারি করিয়া পরিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তিতিক্ষা সাধনের প্রয়োজন; এবং এই তিতিক্ষা অহিংসা-লাভের প্রধান উপায়। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিলে যতটা কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত কি না, তাহা খদ্দরের প্রচার দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে।"

এ সমস্ত যুক্তিতর্কের সারবত্তা বিচার করিয়া বিশেষ লাভ নাই; কেন না, যাহাদের লইয়া দেশ, সেই সব সাধারণ লোক এই সব পণ্ডিতি যুক্তির বড় একটা ধার ধারে না। বারদোলির অনুশাসনের পর হইতেই তাহারা হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। যে স্বরাজলাভের আশায় তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দূরে সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা খদ্দরের ব্যবহারও কমাইয়া দিয়াছে। যাহারা দেশের কাজ করিবে বলিয়া স্কুল কলেজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ছিল, তাহারা আবার আস্তে আস্তে স্কুল কলেজে ফিরিয়া গিয়াছে। উকিল ব্যারিষ্টারদের মধ্যে অনেকেই আবার আদালতে যোগ দিতেছেন। ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিবার প্রস্তাবও কোথাও গৃহীত হইয়াছে। যে কারণেই হোক, এ পন্থার উপর আর লোকের ষোল আনা আস্থা নাই। জাতিগঠনের (Constructive Programme) যে পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সফলতালাভ করা দুই দশ বৎসরের কর্ম্ম নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ প্রীতিস্থাপন, পতিত জাতির উদ্ধার, অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, তাহার পর যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের চেষ্টা আরম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে আর এ জন্মে স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা নাই।

মহারাষ্ট্র, বাংলা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশে এ পন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা কোথাও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অথচ দেশের লোকের সম্মুখে সেরূপ একটা না ধরিতে পারিলে আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রথমে এই কথাই মনে হয় যে, বিদেশী শাসন-যন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লইলে একদিনেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, 'থিওরি' হিসাবে এ কথা যতই সত্য হোক, কার্য্যতঃ তাহা হইবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা উপজীবিকার জন্য এই শাসনযন্ত্রের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও সব সময় সে সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিবেন না। চাঁদার খাতা খুলিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়, আর বোধ হয় সমীচীনও নয়। শাসনযন্ত্রের একান্ত আবশ্যক অংশগুলি চালাইবার জন্য যত লোকের দরকার, এ দেশের শাসনকর্ত্তারা যে তেত্রিশ কোটির মধ্যে ততগুলি পাইবেন না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং আদালত বা সরকারী চাকরী ছাড়াইয়া শাসনের কল অচল করিয়া দেওয়ার কল্পনা শুধু কল্পনামাত্র হইয়া থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজগুলি খালি করিয়া দিলে ছেলেদের যে একটা সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, বর্ত্তমান জাতীয় বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অবস্থার দিকে তাকাইলে সে কথাও মনে হয় না। আর রায় বাহাদুরের দল যদি নিরুপাধিক হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হয় ত প্রশস্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শাসনযন্ত্র অচল হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। বাকি রহিল বিদেশী পণ্য বর্জ্জন। আমাদের স্বদেশী পণ্য রক্ষার জন্য যে বিদেশী বর্জ্জন আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু স্বাধীনতালাভের জন্য তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। যে রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে ইংরেজ এদেশে আপনার বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছে, সে শক্তি যতদিন তাহার হস্তগত থাকিবে, ততদিন সর্ব্ববিধ উপায়ে সে আপনার বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিবে। ১৯০৫-৬ সালের বয়কট আন্দোলন যে কারণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, আজও সেই কারণ বর্ত্তমান; এবং যে উপায়ে সে আন্দোলন হীনপ্রভ করা হইয়াছিল, সে উপায়ও আজ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। দেশের লোকে সমস্ত বাধা বিপদ তুচ্ছ করিয়া সমস্ত কষ্ট ও

অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে বস্ত্রসমস্যার একটা মীমাংসা হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইতে স্বরাজ কি করিয়া আসিবে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করাই শাসনযন্ত্র অচল করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জমির উপর যে সত্ত্ববোধ থাকিলে প্রজা জমির জন্য লড়িতে পারে, তাহা জন্মাইবার বা পরিস্ফুট করিবার কোন চেষ্টাই কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহের অভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মনে হয় তাহারও কারণ সেইখানে। কৃষকদের মধ্যে যখন স্বরাজের কথা প্রচার করা হইয়াছিল যে, খাজনা ট্যাক্সের বোঝা তাহাদের হাল্কা হইয়া যাইবে, পুলিস বা জমিদারের উৎপীড়নের হাত হইতে তাহারা বাঁচিবে। কিন্তু নেতারা তাহাদিগকে খদ্দর পরিয়া অহিংসা চর্চ্চার কথাই বলিলেন; তাহাদের অন্যান্য দুঃখ কষ্ট নিবারণের কোন ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। হিন্দুস্থান ও রাজপুতানার কৃষকদিগের মধ্যে খাজনা লইয়া অত বড় একটা আন্দোলন হইয়া গেল, কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তালুকদারেরা পুলিসের সাহায্য লইয়া কিরূপে সে আন্দোলন ভাঙ্গিয়া দিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কৃষাণদিগের অভাব অভিযোগের প্রতীকারের জন্য কংগ্রেস যদি কৃষাণদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আর স্বরাজের কথা বুঝাইবার জন্য আজ এতটা বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু কংগ্রেসের ও সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া কৃষাণেরা ঠিক করিল যে, তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার আর আমাদের স্বরাজ ঠিক এক জিনিষ নয়। তাই তাহারা দূরে সরিয়া পড়িল।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাও কংগ্রেস করে নাই। কৃষকেরা স্বহস্তে খদ্দর বুনিয়া পরিলে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু কলের কুলি মজুরদের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহারা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আবার যে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য চরকা কাটিতে বসিবে, তাহা মনে করাই ভুল। সুতরাং খদ্দরের দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ খদ্দর পরিয়া তাহাদের আর্থিক লাভ কিছুই নাই। খদ্দর পরিয়া অহিংসা চর্চ্চা করা যদি স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায়, তাহা হইলে সে স্বরাজ লাভের জন্য কুলি মজুরেরা যে খুব বেশী আগ্রহ দেখাইবে, তাহার সম্ভাবনা বড় অল্প। স্বরাজের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারা যে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইবে, ইহা অসম্ভব কল্পনা। অথচ কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের সহানুভূতি না পাইলে শাসনযন্ত্র অচল করিবার কল্পনা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকিবে।

কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী এরূপভাবে যদি পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় যে, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের অভাব ও অভিযোগের প্রতীকার তাহার দ্বারা হইতে পারে, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়াও অসম্ভব নহে।

পুরাতন কাসুন্দি

দেখিতে দেখিতে গত ছয় বৎসরের ভিতর কিছু হইয়া গেল। ডমরু-ধ্বনি শুনিয়া উকিলেরা ওকালতি ছাড়িলেন, ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়িল, দুই একজন রায়-বাহাদুর-গিরিতেও ইস্তফা দিলেন; কিন্তু ভারতের ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগিবার চিহ্ন দেখা গেল না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা রাগ করিয়া আইন-সভা বর্জ্জন করিলেন; অনেকে চরকা কাটিয়া খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিলেন; সভা-সমিতি ও আর্ত্তনাদে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল; মুসলমান ভ্রাতারা খলিফার দুঃখে কাতর হইয়া চাঁদার খাতা খুলিলেন; বাংলা ভাষায় হরতাল, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অনেক নূতন

কথার আমদানি হইল, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন যে খুব বেশী টলিয়া উঠিল, তাহা মনে করিবার কারণ পাওয়া গেল না। শেষে কথা উঠিল, খুব সন্তর্পণে, বিশুদ্ধ অহিংসভাবে আইন অমান্য কর, আর খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দাও। আধ্যাত্মিক স্বরাজ লাভের কথা যাহাদের কাণে পৌছায় নাই, খাজনা ট্যাক্স বন্ধের কথায় তাহারা কাণ খাড়া করিয়া উঠিল। দিনের পর দিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না, পরের উদরপূর্ত্তি করিতে করিতে যাহাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি অনাহারে মরে, সেই কৃষকের দল খাজানা ট্যাক্স বন্ধের কথায় লাঙ্গল কাঁধে করিয়া দাঁড়াইল। উকিল বাবুদের বক্তৃতায় ও ছেলেদের কোলাহলে যে-সব সরকারী কর্ত্তাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের জল্পনা-কল্পনায় তাঁহারা দুঃস্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-ভাবে সরকারী রসদ বন্ধ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পুর্ব্বেই 'যা দেবী সর্ব্বভুতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' তিনি চৌরিচৌরায় আপনার লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া খানকতক বাড়ী ঘর সমেত গোটাকয়েক পুলিস-কর্ম্মচারী গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। স্বরাজ-সাধনার মধ্যে অসাত্ত্বিকতার গন্ধ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ-কেশরী ও তাঁহার পুলিস-শাবকদিগের তর্জ্জন-গর্জ্জনে মা বসুমতী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। ছেলের দলে সরকারী জেলখানা ভর্ত্তি হইয়া গেল; সাধের চরকায় মাকড়শা সুতা কাটিতে লাগিল; নেতৃবৃন্দ গালে হাত দিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ বলিতে লাগিলেন—'তাই ত! তাই ত!' যে-সব কৃষকেরা অধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া পুলিসের উপর লাঙ্গল চালাইয়া স্বরাজ ফলাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা নেতৃবৃন্দের আধ্যাত্মিকতার ভিতর জমিদারী চালের গন্ধ পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

সাজান বাগান কেন শুকাইয়া গেল, বর্জ্জনের গর্জ্জন কেন মূক হইয়া গেল, সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মীরা নেতাদের ভুল ভ্রান্তি বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নেতারা কর্ম্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই গাহিয়াছেন, আর উভয় দল মিলিয়া দেশের জনসাধারণ যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য অপ্রস্তুত, সেই কথাটাই নিজেদের মনকে বুঝাইয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিবিধ, চতুর্বিধ বা পঞ্চবিধ বর্জ্জনের সব কয়টাই যদি কৃতকার্য্য হইত, তাহা হইলেও যে কেমন করিয়া বিদেশী আমলাতন্ত্র কাবু হইয়া পড়িত, তাহা বুঝা একটু কঠিন।

ছেলেরা সবাই যদি সরকারী স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দেয়, রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ায়, উকিল-ব্যারিষ্টারেরা যদি আদালত ছাড়িয়া চরকা কাটিতে বসেন, রায় বাহাদুরেরা যদি বাহাদুরী ছাড়িয়া সোজাসুজি ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়ান, আইন-সভার মুরুব্বীরা যদি আইন-সভার বদলে মাঠে ঘাটে বক্তৃতা করিয়া জিহ্বার কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করেন, এমন কি দেশশুদ্ধ সকলেই যদি খাদি-প্রতিষ্ঠানের বা অভয়াশ্রমের আনুচর্য্য স্বীকার করিয়া খদ্দরাচার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ইংরেজ যে কেন দিল্লীর রাজপ্রাসাদের চাবী আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বোম্বায়ে গিয়া জাহাজে চড়িয়া বসিবে, সে কথা সহজ বুদ্ধিতে আসে না। অথচ অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় এই কর্ম্মপন্থাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা অনুসরণ করিলে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে দেশের ভদ্র সম্প্রদায়ের মন কতকটা তিক্ত হইয়া উঠে, আর বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের খানিকটা অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয়—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সওদাগরী জাহাজের পিছনে যাহাদের রণতরী বর্ত্তমান, বেয়নেটের উপর সাজ পরাইয়া যাহাদের রাজদণ্ড গঠিত, তাহারা কিঞ্চিৎ অর্থ নষ্ট হইলেই হাল ছাড়িয়া দিবে না। যে ক্ষাত্রশক্তির প্রভাবে তাহারা প্রথমে এদেশে বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছিল, সে শক্তি যতদিন তাহাদের অক্ষুণ্ন থাকিবে, ততদিন যে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেদের অর্থনাশের পথ প্রশস্ত হইতে দিবে না, এ কথা অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। তাহার পর আরও এই, এ দেশের যে ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় এই বর্জ্জন-পন্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই আর্থিক স্বার্থ বর্ত্তমান শিক্ষা ও শাসন-প্রণালীর সহিত বিশেষ-ভাবে জড়িত। যাঁহারা ইংরাজের আইনের কল্যাণে জমির মালিক সাজিয়াছেন, ইংরাজের নিকট ধার করা বিদ্যা বেচিয়া অন্নসংস্থান করেন, ইংরেজের স্থাপিত আদালতে ন্যায়ের লড়াই দেখাইয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, দেশের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সঙ্গে তাঁহাদের নাড়ীর যোগ খুবই

দৃঢ়। ইংরাজের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী দিন ধরিয়া বর্জ্জন করিতে গেলে তাঁহাদিগকে প্রাণে মারা পড়িতে হয়। বড় বড় রুই কাতলা হয়ত মনের দুঃখে কিছুক্ষণ জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় লাফাইয়া আস্ফালন করিতে পারে, সেখানে তাহাদের বাস করা চলে না। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চবিধ বর্জ্জন-নীতি লইয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা অনেকটা খাটে। তাঁহাদের বর্জ্জননীতির ফলে দিল্লীর সিংহাসন টলিল না দেখিয়া, যখন তাঁহারা জনসাধারণকে এই অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিলেন, তখন পাছে ইংরাজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থও মারা পড়ে, এই ভয়ে তাঁহারা কতকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। পাছে জনসাধারণের ভিতর হইতে রুদ্র দেবতা বাহির হইয়া তাঁহাদের সৌখীন, ভদ্র স্বরাজের "জাত" মারিয়া দেয়, এই ভয়ে অসহযোগের নেতৃবৃন্দ দরিদ্র, নির্য্যাতিত কৃষকদের বুকের উপর অহিংসার রক্ষা-কবচ আঁটিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষকের ধর্ম্ম বণিক-নীতির বাঁধ মানিল না। বলরাম যেদিন হল স্কন্ধে করিয়া দাঁড়াইলেন, সেদিন তাঁহার ক্রুদ্ধ নয়ন-কোণ হইতে বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া বণিকের কাল্পনিক স্বরাজ-সৌধ ধ্বংস করিয়া দিল। সেই দিন হইতেই অসহযোগের নেতৃবৃন্দ রটাইতে লাগিলেন —এ পোড়া দেশের লোক তাঁহাদের আধ্যাত্মিক স্বরাজ-সাধনার গূঢ়তত্ত্ব এখনও হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে নাই। আর যতদিন তাহা না পারে, ততদিন শান্ত শিষ্ট ভাবে চরকা চালাইয়া সাত্ত্বিকতা অর্জ্জন করা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

কথাটা সকলের মনঃপূত হইল না। যুদ্ধের ক্ষমতা সংঘর্ষ দ্বারাই সৃষ্টি হয়, এবং কর্ম্ম-পন্থার ভিতর হইতে সংঘর্ষের অংশটুকু বাদ দিলে এই নিদ্রালু জাতি আবার হয়ত ঘুমাইয়া পড়িবে—এইরূপ যাঁহাদের মনোভাব, তাঁহারা দেশবন্ধুর পতাকার নীচে আশ্রয় লইয়া স্বরাজ্যদলের সৃষ্টি করিলেন। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভদ্র-সম্প্রদায় দ্বারা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ সম্ভবপর হইবে না, এবং কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ভিন্ন যে এ ব্রত উদ্যাপনের সম্ভাবনা নাই, সে কথা দেশবন্ধু হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময় স্বরাজ্য-দলের উৎপত্তি হয়, সে সময় তিনি দেখিলেন যে, সংঘর্ষ আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যবস্থাপক-সভাগুলি। সেইখানে বিরোধ আরম্ভ করিলে পরে সেই বিরোধ ক্রমশঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, এ আশা তাঁহার ছিল। তিনি আরও আশা করিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক-সভায় বিরোধ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক-সভা স্থাপন করিয়া তিনি সেইগুলিকে বিরোধের কেন্দ্র করিয়া তুলিবেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মীদের উপর তিনি এই শেষোক্ত কর্ম্মের ভার দিবার সংকল্প করেন, অল্পদিনের মধ্যে সরকার বাহাদুর তাঁহাদের অনেককেই বিপ্লববাদী সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। দেশবন্ধুকে যে ব্যবস্থাপক সভার কাজ লইয়াই আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল, ইহা তাহার অন্যতম কারণ বুলিয়া মনে হয়। তিনি যে কৃষক ও শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার হয়ত আরও একটি কারণ আছে। ব্যবস্থাপক সভার গঠন-প্রণালীই এমন চমৎকার, যে, সেখানে গিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিতে গেলে, জমিদার ও অন্যান্য বিশেষ স্বার্থদুষ্ট শ্রেণীকে হাতে না রাখিলে চলে না। কাজে কাজেই জনসাধারণের সহিত যে-যে বিষয়ে উহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ, সে-সব বিষয়ে চুপ করিয়াই থাকিতে হয়। দেশবন্ধুকেও স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাই করিতে হইয়াছিল। শুধু ব্যবস্থাপক-সভায় সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া খুব বেশী ফল যে পাওয়া যাইবে না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মুখ রক্ষা করিবার মত একটু কিছু না পাইলেও ব্যবস্থাপক-সভা ছাড়িয়া বিরোধের অন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব কার্য্যকৌশল ও অসাধারণ উদ্যম মরুভূমিকে উদ্যানে পরিণত করিবার দুশ্চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়া গেল। তাঁহার পরলোক গমনের পর হইতেই দেশব্যাপী বিরাট বিরোধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার সংকল্প তাঁহার অনুচরগণের মন হইতে অপসারিত হইয়াছে ও তাঁহার গঠিত স্বরাজ্যদল ছিন্নভিন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজনীতির এখন একমাত্র কেন্দ্র ব্যবস্থাপক-সভা। জনসাধারণ সে রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে বহুদূরে আগেও যেমন পড়িয়াছিল, আজও তেমনি পড়িয়া আছে। আজ ব্যবস্থাপক-সভার সিঁড়ি চড়িয়া ধীরে ধীরে গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট মোলায়েম স্বরাজের পথে অগ্রসর হওয়া ও মধ্যে মধ্যে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আইনসঙ্গতভাবে কিঞ্চিত গর্জ্জন করাই স্বরাজ্য-পন্থীদের কর্ত্তব্য

বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কৃষক ও শ্রমিক দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার যে কথা উঠিয়াছে, তাহা তাহার তৃতীয় পর্ব্বের সূচনা।

বর্ত্তমান সমস্যা

দুই বৎসর অসহযোগ-আন্দোলন চালাইবার পর যখন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিয়া মহাত্মা গান্ধী ইংরাজের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন দেখা গেল যে, যে ধনুতে তিনি জ্যা আরোপ করিতেছিলেন, তাহাই ঘুণ ধরা। চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ডে প্রমাণ হইয়া গেল যে, দেশ মহাত্মাজীর আন্দোলনের অসহযোগ অংশটুকু যে পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, নিরুপদ্রব অংশটুকু সে পরিমাণে গ্রহণ করে নাই। শক্তি-পরীক্ষা স্থগিত রহিল। মহাত্মাজী অনুশাসন প্রচার করিলেন যে, দেশের লোককে এখন বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ করিয়া সমাজ-সেবার কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। খদ্দর পরিধান, অন্নবস্ত্র সমস্যার মীমাংসা, পতিত-জাতির উদ্ধার ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সমাজসেবার প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইল। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে একটু নূতন সুর ফুটিয়া উঠিল। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, প্রতিপদে ইংরাজের আইন অমান্য করিয়া ইংরেজকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবেন, এবং এতদিন যাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছিল, তাঁহারা এ অনুশাসনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা নহে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, দুই এক জায়গার হত্যাকাণ্ড ঘটিলেই যদি সব আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই নিরুপদ্রব অসহযোগনীতির সাফল্যলাভ সুদূরপরাহত। পতিতজাতিকে উন্নত করা হোক, দেশের অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার অভাব দূর করা হোক—কিন্তু শুধু এইগুলি হইলেই কি দেশের পরাধীনতা ঘুচিয়া যাইবে? বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের সহিত শক্তি-পরীক্ষার জন্য দেশের মধ্যে সংহত শক্তি সৃষ্টি করাই যদি এ সব আয়োজনের উদ্দেশ্য হয়, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিয়া বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী অচল করিয়া তোলাই যদি অসহযোগের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে নিজেদের অসহিষ্ণুতা বশতঃই হোক, আর পুলিসের অত্যাচারেই হোক —একদিন না একদিন ত আবার চৌরি-চৌরার পুনরভিনয় ঘটিতে পারে। তখন যদি আবার সব আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে সত্যযুগ আবির্ভাবের পূর্ব্বে আর দেশের স্বাধীন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ কথার উত্তরে নিরুপদ্রব-পন্থীরা বলেন—'ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দেশ; আমাদের প্রকৃতিই শান্তিপ্রিয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম নিরুপদ্রব ভাবে চালাইয়া আমরা জগতে একটা নূতন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব।'

অপর পক্ষ বলেন—'তোমাদের নূতন কীর্ত্তি রাখিবার ইচ্ছাটা যত প্রবল, স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাটা তত প্রবল বলিয়া মনে হইতেছে না। আর তা ছাড়া, তোমরা জন্মিবার আগেও দেশে আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু দেশটা ত এমন অহিংসাবায়ুগ্রস্ত ছিল না।'

ভারতের প্রকৃতি কতটুকু সাত্ত্বিক আর কতটুকু রাজসিক, এ প্রশ্নের মীমাংসা তর্কে নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, নিরুপদ্রববাদীরা বলেন—'দেশ অহিংসামন্ত্র বলেই স্বাধীন হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।'

বিশ্বাসের উপর আর কোনও কথা বলা চলে না। কিন্তু সেই বিশ্বাসটা যাঁহাদের তত প্রবল নহে, তাঁহারা অসহযোগনীতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া আবার স্বরাজ্য-লাভের নূতন পন্থা খুঁজিতেছেন; ফলে অনেকেরই মনে একটা দ্বিধার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই দ্বিধাভাব দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষও সুবিধা বুঝিয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অসহযোগ-আন্দোলনের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের

অধিকাংশই আজ কারাগারে। অসহযোগ আন্দোলন দমন করিবার বিরাট আয়োজন চারিদিকেই চলিয়াছে।

অসহযোগ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যাহাই হোক না কেন, ইহাতে অনেক শুভফল ফলিয়াছে। দেশের মন মিথ্যার দিক হইতে ফিরাইয়া ইহা আমাদের সত্যানুসন্ধানস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছে; এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ভেদের রেখা কতকটা মুছিয়া দিয়া ইহা দেশকে একতাসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্বরাজ্যলাভের জন্য যে উত্তেজনাসৃষ্টিই যথেষ্ট নহে, দেশকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইলে যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী আবশ্যক, এ বোধ অনেকেই মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেও গঠনের কার্য্য অবলম্বন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিবার মিশিবার অবসর পাইয়াছে।

কিন্তু নির্ব্বিবাদে এই গঠন কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ প্রতিকূল, তাহাতে গঠনকার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া কঠিন, এবং কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে। সেই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কি করিয়া সমস্ত দেশকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যায়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান সমস্যা।

যে সমস্ত শ্রেণী বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর ফলে সৃষ্ট বা যাহাদের স্বার্থ ইহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত, সে সমস্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে না। তাহাদের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিয়া স্বাধীনতা লাভের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে না যাওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের অস্ত্রবল নাই, অর্থবল নাই, তাহাদের লোকবলের উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দেশের স্বাধীনতা যদি এই সমস্ত শ্রেণীর দুঃখ ঘুচাইতে না পারে, স্বরাজের আদর্শের মধ্যে যদি বিশেষভাবে এই সমস্ত শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ শুধু ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপভোগ্য একটা ফাঁকা আদর্শ মাত্র হইয়া থাকিবে; আর দেশের সমস্ত লোক কখনও প্রাণপণে স্বরাজলাভের চেষ্টা করিবে না। দেশসেবাব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ক্ষিপ্রহস্তে অদৃষ্ট-পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্‌টিয়া চলিয়াছেন। ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার দুই একটী জলন্ত অক্ষর যাহাদের দৃষ্টিতে আসিয়া পড়িয়াছে, শত বাধা ও বিপদের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধার বলে বলীয়ান—আজ তাহাদেরই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার দিন। বর্ত্তমান সমস্যা মীমাংসার ভার তাহাদেরই উপর।

অনন্তানন্দের পত্র

—:•:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তানন্দের পত্র

—:*:—

(১)

ভায়া, সারা ভারতটা ত টো টো করে ঘুরে এলুম, দেখলুম সর্ব্বত্রই সমাজের ঐ এক দশা। বুড়ো কর্ত্তারা প্রাণপণে মড়া আগলে বসে আছেন, আর শাস্ত্রবচন আউড়ে প্রতিপন্ন করছেন যে, এটা যখন তাঁদের প্রপিতামহদের মড়া, তখন সযত্নে রক্ষা করতেই হবে। দুর্গন্ধে যখন দেশ বিদেশ ভরে উঠছে, তখন কর্ত্তারা চারিদিকে একটু করে গঙ্গাজল ছিটাচ্ছেন আর যে সব কুকুর শেয়াল মড়াটার উপর টাঁক করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের বাপান্ত করছেন।

জন কয়েক ছেলে ছোকরা একবার মড়াটাকে টেনে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার ব্যবস্থা করেছিল; কর্ত্তারা যে রকম হাঁ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, তাতে তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পেলে না। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ রাগ করে মেম বিয়ে কোরে সাহেব সাজলে, কেউ কেউ কিন্তু আবার হাত দেড়েক লম্বা টিকি গজিয়ে বুড়োদের দলে ফিরে এসে ঘোরতর সাত্ত্বিক সেজে ঝাড়, ফুঁক, তুক-তাকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যোগ দিলে।

এদিকে দুর্গন্ধে ত রাস্তা চলা দায়। কিন্তু বুড়ো কর্ত্তারা আর ততোধিক ক্ষুদে কর্ত্তারা নাকে কাণে তুলো গুঁজে এমনি নিরেট হয়ে বসে আছেন যে, পচও তাঁহাদের চোখে পড়ছে না, আর গন্ধও তাঁদের নাকে ঢোকবার জো নেই; মড়ার অষ্ট বন্ধন একটু খানি ঢিলে হ'লেই নাকি পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে!

এখন প্রশ্ন এই, মড়ার সদ্‌গতি হবে কি কোরে? মড়া বললেই যে কর্ত্তারা চটে উঠেন।

মড়ার লক্ষণই এই যে, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে নিজেকে পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে না; কোন জিনিষ আত্মসাৎ করে নিজেকে পুষ্ট করবারও তার শক্তি নেই; আত্মরক্ষা কর্‌তেও সে অসমর্থ। সে শুধু যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকতে জানে।

সনাতন সমাজ বলে যিনি আড়ষ্ট হয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে পড়ে আছেন, এই আজ হাজার বছর ধরে তিনি আত্মরক্ষার খাতিরেও আর স্বেচ্ছায় নিজেকে পরিবর্ত্তন করতে পারেন নি। মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে যাঁরা সমাজকে রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তা' কর্‌তে হয়েছে। নানক, কবীর, নিত্যানন্দ, সকলেরই ঐ এক অবস্থা। সমাজ রক্ষণ আর পরিবর্ত্তনের ভার যাঁদের উপর, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এ সব নূতন সম্প্রদায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। অথচ সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুসলমানেরা গ্রাস কর্‌তে লাগল, তাদের রক্ষা কর্‌বারও কোন চেষ্টা করেন নি। মুসলমান যখন বাড়ীর ভিতর এসে পড়্‌ল, তখন কর্ত্তারা অন্দর মহলে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে ব্যবস্থা দিলেন যে, মুসলমানকে ছুঁলে জাত যাবে। কিন্তু ক্রমাগত পিছে হটা আর পালান ভিন্ন যাঁরা আত্মরক্ষার অন্য উপায় খুঁজে না পান, পৃথিবীতে তাঁহাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যে শিখজাতি না জন্মালে পাঞ্জাবে হিন্দুর নাম লোপ পেয়ে যেত, হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা তাঁদের হাত থেকেও জল খেতে সঙ্কুচিত। পাছে জাতটি মারা যায়!

আমাদের বাংলা দেশেই দেখনা, আদিশূর, বল্লালসেন আর রঘুনন্দন সমাজকে যে ছাঁচে ঢেলে গেলেন, আমাদের টোলের পণ্ডিত মশায়েরা প্রাণপণে সেই ছাঁচখানি আঁকড়ে পড়ে আছেন। একটু উনিশ বিশ হলেই তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্মের প্রাণটুকু ফুস্ করে বেরিয়ে যাবে! অথচ যে যুগে সমাজে বাস্তবিকই প্রাণ ছিল, সে যুগে লোকে সমাজে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন করতে অত আঁত্‌কে উঠ্‌ত না। শুধু অতীতের দিকে চেয়েই দিন কাটাত না।

ধর্ম্ম জিনিষটা সনাতন বলে কি সমাজের গড়নটাকেও সনাতন হ'তে হবে? সমাজের পরিবর্ত্তন যদি এত মহাপাতক, ত উনিশ জন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উনিশ খানা ধর্ম্মসংহিতা লিখতে গেছলেন কেন, আর রঘুনন্দনেরই নূতন করে স্মৃতি লেখবার কি দরকার ছিল?

বর্ণাশ্রমের উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী স্বধর্ম্ম পালন করাতে করাতে মানুষের মধ্যে শেষে পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব ফোটান। সকলের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তুলে, মানুষকে তাঁর লীলাকেন্দ্রে পরিণত কোরে, মানুষ-জন্ম সার্থক করানো। জন্মের গুণে যারা ব্রাহ্মণ, আর জন্মের দোষে যারা শূদ্র—তাদের সকলকে পৃথক পৃথক গণ্ডির মধ্যে পুরে রেখে আজ কি উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে?

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল বলে পরশুরাম নূতন ব্রাহ্মণ সমাজের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পুরাতন ক্ষত্রিয় বংশ যখন নির্ব্বীর্য হয়ে পড়েছিল, তখন বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করে সমাজ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সমাজের আদর্শটা বেশ পরিস্ফুট ছিল বলেই, ধর্ম্ম জিনিষটা সমাজ-বন্ধনের চাপে মারা যায় নি বলেই, এটা সম্ভব হয়েছিল। গাছের যতদিন প্রাণশক্তি থাকে, ততদিনই তা'তে নব বসন্তে নূতন নূতন ফল, ফুল, পাতা গজায়, মরা গাছটা শুধু ভূতের ভয় দেখাবার জন্য আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

আমাদের সমাজও আজ বহুকাল ধরে তেমনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার বৎসর আগে যারা শূদ্র ছিল, আজও তারা শূদ্রই রয়ে গেছে। স্বামী রামদাস নির্ব্বাপিতপ্রায় ক্ষাত্রতেজে ফুৎকার দিয়ে যা একটু আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তা' এক ঝটকাতেই নিবে গেল। বৈশ্যরাও যে দেশ বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করবে, পণ্ডিত মশায়েরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিয়ে তার পথও রুদ্ধ করেছেন। আর তাঁরা নিজে, গুরুগিরির ব্যবসা করে দুপয়সা সংগ্রহ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। দলাদলি আর জাত মারামারি কোরে তাঁদের আর ব্রহ্ম-চিন্তার বড় বেশী অবসর থাকে না।

বাঁধনের উপর বাঁধন চড়িয়ে অতীতের গঠনটাকে পুরামাত্রায় বজায় রাখতে পারলেই কি সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? মানুষের মধ্যে যদি তার অন্তরাত্মাই প্রবুদ্ধ হয়ে না উঠল, তা' হলে কতকগুলা ছাই ভস্ম, অর্থহীন আচারের বাঁধনে তাকে বেঁধে রেখে কি শুভফল ফলবে? মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের ভিতরে থেকে যতক্ষণ মানুষের উন্নতি, ততক্ষণই সমাজের সার্থকতা। আর তাই যদি না হয় ত বৃথা মরা সমাজের গোলামি করে কি হবে?

মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের। যাঁরা সমাজকে বহু শৃঙ্খলে বেঁধে মানুষের অন্তরস্থ ভগবানকে খর্ব্ব করেন, তাঁরা মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভগবানকে ভুলে যাঁরা সমাজকেই বড় ক'রে তোলেন—তাঁদের শুধু অপদেবতারই পূজা করা হয়। সেটা কৃত্রিমতার লক্ষণ, ধর্ম্মের বিকৃতি। দাসত্ব যদি করতেই হয়, ত সমাজের নয়, ভগবানের দাসত্ব করাই ভাল। তা'তে মাধুর্য্য আছে, উন্নতিও আছে; আর অবাধ, আনন্দময় স্বাধীনতাই তা'র চরম পরিণতি।

কতকটা স্মৃতি আর কতকটা দেশাচার মিলে যে সামাজিক ব্যবস্থা হয়েছে, তার মূলে আছে মানুষের বুদ্ধি আর খেয়াল। সুতরাং সেই সেই ব্যবস্থাগুলো সাময়িক ও অস্থায়ী; তা'দের টেনে টেনে লম্বা করে চার যুগ জুড়ে রাখলে চলবে কেন?

ভগবানের পথ,—প্রকৃত জীবনের পথ—দেখিয়ে দেন শ্রুতি। সেই সনাতন আর অপৌরুষের শ্রুতিকে অপসারিত করে যাঁরা সামাজিক ব্যবস্থাকেই জীবনের নিয়ন্তা করে ফেলেন, কোন একটা সাময়িক শাস্ত্রকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে স্থির করেন, তাঁদের জড় হযে যেতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না।

আর হয়েছেও তাই। আমাদের অবনতির প্রধান কারণ এই যে, আমরা মানুষকে ছোট করে সমাজকে বড় করে রেখেছি, দেবতার মন্দিরটাকে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধাতে বাঁধাতে পূজার আয়োজন করতে ভুলে গেছি। দেবতাও কোন্ অবসরে মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন; আর সেই মার্বেল পাথরগুলো খসে গিয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে পড়ে আছে।

একদল বলছেন যে, বিলাতী সিমেণ্ট দিয়ে বাহির থেকে একটু জীর্ণসংস্কার করে দিলেই মন্দিরের কাজ চলে যাবে। আমাদের এ কালের 'সমাজ-সংস্কারকেরা আজ ২৫।৩০ বৎসর ধরে সেই চেষ্টাই করছেন। তা' সে বিষয় নিয়ে তাঁরা আমাদের স্মৃতি-পঞ্চাননদের সঙ্গে বিচার করতে থাকুন; আমার কিন্তু মনে হয় মন্দিরের ভিতরে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ধূপ ধূনা জ্বালিয়ে পূজার ব্যবস্থা

না করতে পারলে, চামচিকের দল ভিতরেই বাসা করে থাকবে। আর তা' হলে মন্দিরে ভক্তসমাগমও হবে না, বাহিরের জীর্ণসংস্কার করবার লোকও পাওয়া যাবে না।

শুধু বাহিরের বাঁধন দিয়ে যাঁরা সমাজকে এক করতে গেছেন, তাঁরা কোন কালেই একটা বিরাট, প্রাণহীন, জড়তা ছাড়া আর কিছুই গড়ে তুলতে পারেন নি। সেখানে শেষে ঐক্যও থাকে না, আর অবাধ উন্নতির জন্য যে স্বাধীনতার দরকার, তাও নষ্ট হয়।

যাঁকে আশ্রয় করে পূর্ণ স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, সব মানুষই যাঁর কোলে এক, যাঁকে জগতে অভিব্যক্ত করবার জন্যই সমাজের সৃষ্টি, সেই ভগবানকে ছেড়ে দিলে সব যজ্ঞের আয়োজনই পণ্ড হবে। আদর্শ সমাজ মানুষের অন্তরস্থিত সেই ভগবানেরই বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, ঐক্য — এই রথেরই চারটী চাকা।

আমাদের রথখানি যে চাকা ভেঙ্গে রাস্তা জুড়ে, অচল হয়ে পড়ে আছে, তার কারণ এখানি সমাজের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর অহংকারের বাহন মাত্র। কর্ত্তাদের এমন জ্ঞান নাই যে লোককে বুঝান, এমন শক্তি নাই যে তাদের চালান, এমন প্রেম নাই যে তাদের আপনার করে লন। যাদের "পেরিয়া" বলে, 'নমঃশূদ্র' বলে, কর্ত্তারা আপনাদের শ্রীঅঙ্গের এক শত হাতের মধ্যে ঘেঁসতে দেন না, তাদের উপর গোলামীর ছাপ মানুষ মেরেছে না ভগবান মেরেছেন? আর এই দুষ্কর্ম্মটুকু কোরে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে সেটুকু চাপা দেবার দুশ্চেষ্টা কেন?

ভয় পেও না, ভায়া, এই বুড়ো বয়সে গোলদিঘির ধারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সমাজসংস্কার করবার দুরভিসন্ধি আমার এতটুকুও নেই। ভগবানের নাম কোরে মানুষ মানুষের উপর চিরদিনই অত্যাচার কোরে আসছে, তা' আমি বেশ জানি। ভগবান এতদিন তা দেখে হাসতেন কি কাঁদতেন, তা' জানিনে; কিন্তু এবার মনে হচ্ছে ক্রোধাগ্নি তাঁর চোখের কোণে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-শিখার মত ধ্বক্ ধ্বক্ কোরে জলে উঠছে। মানুষের মনে সে আগুন একদিন লাগ্‌বেই লাগবে। কত Vested interests, কত গুরুঠাকুরের পুঁটলি, কত বুজরুকির ঝুলি, কত ওস্তাদের কত একচেটে সত্ব যে, সে আগুনে ছাই হয়ে যাবে, তাই ভেবে আমি এখন থেকেই শিউরে উঠছি। আর মনে হচ্ছে, আমাদের ঘরের কর্ত্তাদেরও বলি—"ওগো, দিন থাকৃতে তোমরাও আপনার ঘর সামলাও। যিনি দর্পহারী, তিনি হয় ত তোমাদেরও খাতির করবেন না। রঘুনন্দনধৃত শাস্ত্রবচন তিনি হয়ত অকাট্য প্রমাণ বলে গ্রাহ্য নাও করতে পারেন।"

তোমার কি মনে হয়? তুমিত 'নারায়ণ' সেবার ভার নিয়েছ; বলতে পার তিনি কি ক্ষীর-সমুদ্রে পড়ে পড়ে এখনও ঘুমুচ্ছেন, না গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একবার এদিকে আসবার উদ্যোগ করছেন? যদি আসেন ত দোহাই তোমার, বলে দিও যেন গদাটা আন্‌তে না ভোলেন।

(২)

দেখ ভায়া, যে দেশে ধর্ম্ম বল্লেই লোকে গেরুয়া কাপড় আর নাকটেপাটেপি বুঝে, সে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাওয়াও এক বিড়ম্বনা। তুমি বলবে এক, লোকে বুঝবে আর; তুমি গড়তে যাবে শিব, গড়ে উঠবে বানর। শুনবে একটা মজার গল্প?—সে আজ অনেক দিনের কথা। রাজপুতানায় সেবার বড় দুর্ভিক্ষ। তাই বাঙ্গলাদেশ থেকে দু'জন সন্ন্যাসী গিয়ে কিষণগড়ে সাহায্যকেন্দ্র খুলেছিলেন। অনেকগুলি অনাথ ছেলেপিলে আর নিরাশ্রয় বুড়ো তাঁদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। অর্থসাহায্য তখনও বেশী পাওয়া যায় নি, সুতরাং ভিক্ষা শিক্ষা করে সন্ন্যাসীরা যা কিছু পান, তাই স্বহস্তে পাক করে বেচারাদের খেতে দেন। এমন সময় সেখানকার এক নামজাদা পণ্ডিত সন্ন্যাসীদের কাছে এসে উপস্থিত। খুব শাস্ত্রীয় রকমে প্রণাম করে তিনি নিবেদন করলেন—"মহারাজ, আপনারা যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন, তখন আপনাদের আবার এ কর্ম্মপ্রবৃত্তি কেন? এ সব ত সংসারীর কাজ।" যে রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে পণ্ডিতজী প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি বয়সে ছোট তিনি খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা সত্ত্বেও ফিক্ করে হেসে ফেলে উত্তর দিলেন—"কি করি, পণ্ডিতজী, আমাদের ত ইচ্ছে বনে গিয়ে জপ তপ করি, কিন্তু সংসারীর কাজ সংসারীরা করে না, তাই আমাদের আস্‌তে হয়েছে।" পণ্ডিতজীর কিন্তু শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে কথাটা বেশ খাপ খেল না। তিনি সন্ন্যাসীদের পরকালের জন্য মহা চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন —"কিন্তু, মহারাজ, শাস্ত্রে যে বলে কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার পর ফের কর্ম্ম করলে নিরয়গামী

হতে হয়!" সন্ন্যাসী হয়ে ত আর শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করা চলে না, অথচ, সন্ন্যাসী হলে কি হয়, কল্‌কাতার ছেলে ত বটে! আমাদের ছোট সন্ন্যাসী মহারাজ তাই উত্তর দিলেন—"তা হবে বৈকি, পণ্ডিতজী! শাস্ত্র ত আর মিথ্যা হবার নয়। আপনাদের যখন সাহায্য করতে এসেছি, তখন নরকে যাওয়া ভিন্ন আর গতি কি? ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের ছুটো খেতে দিয়েছি বলে ভগবান যদি নরকই ব্যবস্থা করেন, ত যাওয়াই যাবে।"

পণ্ডিতজী কিন্তু কলিকালে শাস্ত্রের অপমান দেখে ক্ষুন্নমনে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন।

আর একবার ঘুরতে ঘুরতে আমার এক ভবঘুরে বন্ধুর সঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত। বংলায় তখন স্বদেশীর খুব ধুম লেগে গেছে। সন্ন্যাসীর কাছে অনেক লোকের সমাগম হয় দেখে আমার বন্ধুটী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সবিনয়ে বল্লেন—"মহারাজ, দেশী কাপড় চোপড় ব্যবহার করার দিকে এ সমস্ত লোককে যদি একটু দৃষ্টি রাখতে বলেন ত সমাজের অনেক মঙ্গল হয়।" সন্ন্যাসীটী পরম বিজ্ঞভাবে মুখখানি খুব গম্ভীর করে বল্লেন—"ও সমস্ত অনিত্য বস্তুর দিকে এদের প্রেরণা দিয়ে কি লাভ?" বন্ধুটী অদূরে পুরী, জেলাপি, রাবড়ী প্রভৃতি ভুরিভোজনের ব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন—"মহারাজ, দেশের সব ব্যবসা বাণিজ্যই যদি বিদেশীর ঠেলায় মাটী হয়, তা' হলে কিছু দিন পরে লোকে আর আপনাদের ও রকম তোফা সেবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারবে না।" বলা বাহুল্য, যুক্তিটা ঠিক শাস্ত্রীয় না হলেও সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণে লেগেছিল।

সেই যে কবে শঙ্করাচার্য্য বলে গেছলেন যে, জ্ঞান আর কর্ম্মের সমন্বয় হবার জো নেই, সেই জের আজ পর্য্যন্ত চল্‌ছে। যুক্তির কস্‌রতে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, জগতটা একদম্ বন্ধ্যাপুত্রের মত সাফ্ মিথ্যা। যেহেতু ব্রহ্মই সত্য, আর একমাত্র সত্য, সেহেতু জগতটা মিথ্যা হতে বাধ্য। পণ্ডিত-সমাজে এ রকম অপমানিত হবার পর জগতটার উচিত ছিল, শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করে একেবারে দেখতে দেখতে চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া, অন্ততঃ লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকা। কিন্তু বেহায়া জগতটার মধ্যে সে রকম শুভবুদ্ধি কিছুই দেখা গেল না। সে চিরদিন অনন্ত মহাকাশ জুড়ে আপনার উন্মত্ত আনন্দে যে রকম নেচে আস্‌ছিল, তেমনিই নাচতে লাগল। পণ্ডিতদের রাশি রাশি পুঁথির দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। পণ্ডিতেরা তখন চোটে গিয়ে ব্যবস্থা দিলেন—'এ সংসার যখন আমাদের শাস্ত্র মানে না, তখন এর আর মুখদর্শন করা হবে না, চল সবাই মিলে বনে যাই।'

কিন্তু হায় রে! বনে গিয়েও কি সুস্থির হয়ে ছু'দণ্ড বৈরাগ্য চর্চ্চা করে জুড়োবার জো আছে? প্রথমতঃ, দিনের বেলা ছু'টী রাঁধা ভাত পাওয়া মুস্কিল, দ্বিতীয়তঃ, রাত্রে মশা কামড়ায়। আর তাও যদি বা বরদাস্ত হয়—ত ঐ যে মিথ্যা আকাশে মিথ্যা চাঁদ মিথ্যা হাসি ছড়াচ্ছে, গাছে গাছে ঐ যে মিথ্যা ফুল ফুটে গায়ে গায়ে ঢলাঢলি করে পড়ছে, পাখীগুলো জোড়ায় জোড়ায় গাছে গাছে যে রকম ডাকাডাকি মাতামাতি করছে, তা'তে কঠোর বৈরাগ্য সাধনার যে ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে, সেটা ত আর মিথ্যা নয়? পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা বড় পণ্ডিত, তাঁরা তাই বন থেকে পালিয়ে পাহাড় পর্ব্বতে গুহার মধ্যে ঢুকে, নাকে কাণে তুলো গুঁজে একেবারে সমাধিস্থ হবার জোগাড় কর্‌লেন! এখনও যদি নর্ম্মদার তীরে ঘুরতে চাও ত তাঁদের ছু'দশ জন বংশধরের সঙ্গে যে দেখা সাক্ষাৎ না হয় তা নয়। তাঁরা ত সমাধিস্থ হলেন, ভাবলেন প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়ে ব্রহ্মপুরুষকে নিয়ে দিন কাটাবেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ছেড়ে তাঁদের যদি বা চলে, ব্রহ্মপুরুষের যে চলে না। জগৎ সৃষ্টি যে তাঁর নিত্যকর্ম্ম। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি।"

আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের যে বিরোধ বাধিয়ে বসে আছেন, তার মূল কথাটা এই যে, ব্রহ্মই নিত্য আর সংসার অনিত্য, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কর্ম্ম খসে পড়বেই। কিন্তু যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হো'ন না কেন, তাঁকে সকাল সন্ধ্যা ছু'টী ডাল ভাত, না হয় 'শুখা চপাটী' খেতেই হবে। তিনি কর্ম্ম ছাড়লে হবে কি, কর্ম্ম ত তাঁকে ছাড়ে না। আর কাজ যখন বাস্তবিক খসে পড়ে না, তখন স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, যেখান থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি, সেই ভগবানের মধ্যেই কর্ম্মের বীজ নিহিত। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" 'যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী'—তাঁকে না ছাড়লে কর্ম্মও ছাড়া যায় না। জ্ঞানের পর যখন জীব মুক্ত হয়, তখন তার স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের কর্ম্ম ঘুচে যায়, কিন্তু ভগবানের শক্তিই তখন তাকে আশ্রয় কোরে

কর্ম্মরূপে বাহিরে ফুটে উঠে। তখনই যথার্থ কর্ম্মের আরম্ভ। অজ্ঞানের কর্ম্ম, বদ্ধ দশার কর্ম্ম—সে ত শুধু অন্ধকারে হাতড়ান। যে প্রবৃত্তির দাস, সে আবার কর্ম্ম করবে কি?

এই ভাবটাই তন্ত্রের ভুক্তিমুক্তিবাদে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সাধুরা এখনও মায়াবাদের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সাধক-সমাজে শঙ্কর-মতের প্রতিষ্ঠা কখনও ভাল করে হয় নি। এমন শস্যশ্যামলা সোণার দেশে প্রকৃতির পূজা না হওয়াই অস্বাভাবিক। ভগবান যে শুধু নির্গুণ আর নিরাকার, একথা স্বীকার করতে বাঙ্গালীর প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম যখন অনেক দিন ধরে বেদান্তের টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভুকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্ম নিরাকার, তখন শ্রীচৈতন্য শুধু জগতের দিকে দেখিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ব্রহ্ম যদি নিরাকার, তবে এ সব আকার কার?" অমূর্ত্তই যে রূপের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠে অনন্তভাবে আপনার লীলাকেন্দ্র গড়ে তুলছেন—এইটাই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। রূপকে সে বাদ দিতে চায় না, ছেঁটে ফেলতে চায় না; প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়তেও তার প্রবৃত্তি নাই। সবটাকেই সে ভগবানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

নিত্যানন্দের পর থেকে বাংলার শাক্ত আর বৈষ্ণব সাধনপ্রণালী সম্মিলিত করে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, তাদের সকলেরই মধ্যে জ্ঞান, প্রেম আর কর্ম্মের বেশ একটা সমন্বয়চেষ্টা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে কিন্তু সাধনপ্রণালীগুলি মেলাবার তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। আমার এক বন্ধু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন—"দেখ, দক্ষিণীরা যেমন তরকারী রাঁধবার সময় আলু, পটোল, বেগুন, সব আলাদা আলাদা রাঁধে, এক সঙ্গে মিশিয়ে একটা তরকারী করতে পারে না, ওদের সাধন প্রণালীও সেই রকম। এক একটী পন্থা যেন এক একটী air-tight compartment। ওদের দ্বারা ধর্ম্মের সমন্বয় হবে না।"

কথাটা ভেবে দেখবার যোগ্য বটে।

প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের, সংসারের সঙ্গে ভগবানের, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে বিচার অনেক দিন থেকেই চলছে। সাংখ্যকার দুটোকে নিত্য বলে স্বীকার করলেও, দুটোকে কেটে ছেঁটে আলাদা করে দেবার ব্যবস্থাই দিয়ে গেছেন; শঙ্করের বেদান্ত প্রকৃতিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত। বাংলার তন্ত্রই শুধু উভয়ের মৌলিক একত্ব স্বীকার ক'রে সংসারের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাংলার সাধকেরা প্রকৃতিকে পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন বলেই ভোগ মোক্ষের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখতে পান নি। তাঁদের চেষ্টাতেই বাংলায় অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাংলায় এসেছিলেন, তখন বোধ হয় একাই এসেছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালী তাঁর পাশে শ্রীরাধাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তবে তাঁকে ঘরে তুলে নিয়েছে। শুধু পাশে দাঁড় করিয়েছে বললে ভুল হবে; বাংলার কবি অরূপকে রূপের কাছে নত করে, কৃষ্ণকে রাধার পায়ে ধরিয়ে তবে ছেড়েছে। শিব ত বাংলায় এসে একেবারে মহাকালীর পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে অতটা করা চলে না, কেন না তাঁর হাতে প'ড়ে জানকীকে অনেক লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়েছে। বাংলায় তাই আজ পর্য্যন্ত রামের পূজা জমে উঠল না। রামকে বাঙ্গালী ভক্তি করলে, প্রণাম করলে, কিন্তু প্রাণ ভরে ভালবাসতে পারলে না।

সেদিন বাংলার একজন প্রসিদ্ধ জননায়কের সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন যে, আজকাল ছেলেদের মধ্যে গোড়ার কথা নিয়ে টানা হেঁচড়া চলছে (Principles are in the melting pot)। মায়াবাদ সত্য কি মিথ্যা, এটা এখন আর শুধু পণ্ডিতি তর্কমাত্র নয়, এসম্বন্ধে একটা স্থির বিশ্বাস না হলে কাজকর্ম্মের গোড়াপত্তনই হ'য়ে উঠছে না। দেশের এবং দশের কাজের প্রণালী নিয়ে তাই ছেলেদের মধ্যে মতভেদ হচ্চে। সংসারটা ধরবে কি ছাড়বে, আর ধরতে হ'লে কেমন করে ধরবে, এ সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত না হ'লে, অন্য দেশের ছেলেদের কথা বলতে পারি না, বাংলার ভাল ভাল ছেলেরা কর্ম্মক্ষেত্রে ষোল আনা প্রাণ দিয়ে নামতে পারবে না। তারা চিরদিনই idealistic।

বাঙ্গালীর ছেলেরা এই গোড়ার কথাটা ভাল করে বুঝলে তবে তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মের ভিত্তি পাকা হবে। প্রকৃতিকে ছেঁটে ফেলে নির্ব্বাণের দিকে ছুটে গেলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করা হবে। আমাদের মুক্ত হ'তে হবে, স্বরাট হ'তে হবে—প্রকৃতির দাসত্ব করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে রফা করে নয়, প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে নয়—সম্পূর্ণ

ভাবে প্রকৃতির অধীশ্বর হয়ে; সংসারে থাকতে হবে সংসারের প্রভু হ'য়ে। অন্তরের সেই মুক্তি তখন আমাদের বাহিরের সকল কাজে ফুটে উঠবে। কর্ম্ম তখন হবে শুধু আনন্দের অভিব্যক্তি, জগতের কোন খণ্ডশক্তিই সে ভগবৎপ্রেরণাকে বাধা দিতে পারবে না। তখন যা' গড়বে তা আর ভাঙ্গবে না।

এটা কিছু নূতন কথা নয়। বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকৃতি ঘোষণা করে দিয়েছেন :—

'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥'

শিশুর জন্য এ সাধনা নয়, পরাশ্রিত দুর্ব্বলের জন্যও নয়। একবার দেখ দেখি, ভায়া, বাঙ্গালীর ছেলে এ বীরসাধনে অগ্রসর হবে কি না?

আমি ত অনেক দিন ধরেই বসে আছি। এবার ইচ্ছা শেষটা দেখে যাব।

(৩)

ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন

সে দিন সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখলাম, আকাশে যেন কালো মেঘের বান ডেকেছে। গগনচারী দেবতারা তাড়াতাড়ি আপনার আপনার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে বসে আছেন; একটা জোনাকির পর্য্যন্ত নামগন্ধ নেই। চারদিক একেবারে নিঝুম-নিস্পন্দ। বুঝলাম আজ দেবলোকে কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আকাশের এই অন্ধকার রূপের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি, এমন সময়ে বেশ বড় এক ফোঁটা জল কোথা থেকে লাফিয়ে এসে আমার নাকে তিলক কেটে দিলে। সে দিন সন্ধ্যার আগেই আফিমের মাত্রাটা বেশ একটু চড়িয়েছিলাম। এ রকম বদ রসিকতায় মৌতাত চোটে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি, এমন সময় প্রথমে টপাটপ পরে ঝমাঝম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

একে হাতে কাজকর্ম্ম নেই, তা'র উপর ব্রাহ্মণীও বাপের বাড়ী! সুতরাং ধর্ম্মচর্চ্চার এই উপযুক্ত অবসর ভেবে আলোটা একটু উসকে দিয়ে মহাভারত খানা কোলের কাছে টেনে নিলাম।

বইখানি খুলেই দেখি, বনপর্ব্বের মাঝখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাবিপদে পড়েছেন। ধর্ম্মরাজ যক্ষরূপ ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। যুধিষ্ঠিরের তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে, শাস্ত্রচর্চ্চার উপযোগী মেজাজ একেবারেই নয়। কিন্তু করেন কি! সরোবরের তীরে যা দেখলেন, তা'তে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যে বৃকোদরের হুঙ্কারে পাহাড় কেঁপে উঠ্‌ত, তাঁর মুখে টুঁ শব্দটি নেই; তিনি প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁপের উপর কাদা লাগিয়ে সরোবরের তীরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব একেবারে ছিটকে পড়েছে, তূণভ্রষ্ট পাশুপত অস্ত্রের উপর একটা কোলা ব্যাঙ বেশ আরামে বসে চক্ষু বুজে সঙ্গীত আলাপ করছে। নকুল সহদেবের অমন ফুটন্ত ফুলের মত মুখ দু'খানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রাণটা ভ্রাতৃস্নেহে কেঁদে উঠলো। ধর্ম্মরাজের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল বলেই কি অমন শূরবীরের মত ভাইগুলোকে প্রাণে মারতে হয়!

সহানুভূতিতে ফুলে উঠে আমার বুকখানা যেমনি ফোঁস কোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটাও নিবে গেল। শূন্য বিছানায় শুতে যাবারও বিশেষ প্রলোভন ছিল না; আর মনটাও ধর্ম্মরাজের অবিচারে একটু খারাপ হয়ে গেছলো; তাই চুপ চাপ করে সেইখানেই বসে রইলুম।

হঠাৎ মনে হ'ল আমার পিঠে যেন ছপাং কোরে একগাছা চাবুক পড়ল, আর কে যেন টিকির গোছা ধরে টানতে টানতে আমার শরীর থেকে মহাপ্রাণীটি বা'র করবার চেষ্টা করছে! আমি চীৎকার করতে গেলুম; কিন্তু মুখে কোন শব্দই হ'ল না। আমার ত' ভয়ে অঙ্গ হিম হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছি—'এ আবার কার পাল্লায় পড়লাম'! এমন সময় শব্দ হ'ল—"ভয় নেই, ভয় নেই, তুমি আমার কথাই ভাবছিলে, তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তুমি যুধিষ্ঠিরের ভাইগুলির জন্য ভেবে কাহিল হচ্ছিলে, কিন্তু ও প্রশ্নগুলি আমি অনেককেই জিজ্ঞাসা করিছি; আর যারা সদুত্তর দিতে পারেনি, তাদের সকলকারই ঐ দশা হয়েছে।"

তখন আমার হুঁস হ'ল; বুঝলাম ইনিই তা'হলে ধর্ম্মরাজ। একটু সাহসে ভর কোরে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু ধর্ম্মরাজ, শাস্ত্রে ত সে কথা লেখে না!" ধর্ম্মরাজ একটু হেসে বল্লেন,—"লেখে বৈকি; তবে সে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা নয় বলে তোমরা মানো না। আমি সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাও যে জানি, এটা স্বীকার করলে যে শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে! আর তা'

ছাড়া আর একটা কথা কি জান, আমি বহুরূপী বলে লোকে আমায় সব সময় চিন্‌তে পারে না।"

"ওঃ! তাই না কি! আমি ত জান্‌তাম আপনি বৃষরূপেই বুড়ো শিবকে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ান। আর কখনো বা বকরূপ ধরে পুকুরের পাড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান করেন।"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে একটা হেঁচকা মেরে বল্লেন—"এত বুদ্ধি না হলে আর তোমরা গোল্লায় যাবে কেন? এই যে সে দিন শূদ্ররূপ ধরে রুসিয়ার জারকে (Czar) ঐ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা বুঝি তোমরা বুঝতে পার নি?"

আমি ত ভয়ে হাঁ করে ফেললুম। ধর্ম্মরাজ যে বুড়ো বয়সে বলসেভিক হয়ে গিয়ে দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে বেড়াবেন, এ কথা আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কি করে বিশ্বাস করি বল! কিন্তু কিছু বলতে সাহস হ'ল না। তখনও আমার টিকিতে হাত যে! ধর্ম্মরাজ কিন্তু অন্তর্য্যামী কি না, টপ করে আমার মনের ভাবটুকু বুঝতে পেরে বললেন—"আমি বলসেভিক টলসেভিক কিছুই হইনি। ওটা আমার ইউরোপে এ যুগের রূপ মাত্র। এমন দিনও আসবে, যখন বল্‌সেভিকদেরই আবার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।"

ধর্ম্মরাজের প্রোগ্রামটা আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। বলসেভিকদের কথা ভেবে আমার পেটের পিলে তখনও চমকে চমকে উঠছিল। শান্ত দান্ত সাত্ত্বিক ভারতে একি কাণ্ড! আমি সবিনয়ে নিবেদন করলুম—"মহারাজ, কিন্তু আপনার পূজোয় এতটা রক্তারক্তি কি ভাল হ'ল?"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে আর একটা পেল্লায় হেঁচকা মেরে বল্লেন—"বাবা, তোমাদের দেশের চাল কলার নৈবিদ্যের উপর নির্ভর করেই যদি আমায় বাঁচতে হ'তো, তা হ'লে ভগবান আমায় অমর করে সৃষ্টি করলেও আমাকে এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতে হ'তো। তোমরা আমার বকরূপটিকেই চিনেছ বলে সবাই বকধার্ম্মিক সেজে আলোচালের উপর দুটো ফুল ফেলে দিয়েই কাজ সারতে চাও। আমি কিন্তু আমার পাওনাগণ্ডা সুদে আসলে আদায় করে নিতে ভুলিনে। তোমরা মরতে ভয় পাও বলে আমি ত আর মারতে ভয় পাই নে। ইনফ্লুয়েনজা, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, এতেই আমার পুষিয়ে যায়।"

আমি একথার ঠিক উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। তাই ধর্ম্মরাজকে একটু শ্লেষ করে বল্লুম—"হাঁ, আমি ভুলে গেছলাম যে, আপনি দেবতার মধ্যে বিচারপতিও বটে, hangsmanও (ফাঁসুড়ে) বটে!"

ধর্ম্মরাজ কিন্তু লজ্জা পাবার ছেলে নন। তিনি অম্লানবদনে বল্লেন—"দেখ, ও ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নয়। তোমাদের দেশে জজসাহেবদেরই যদি hangsman এর কাজ করতে হতো, তা হ'লে এখনকার চেয়ে তারা ঢের বেশী সুবিচার কর্ত্তেন।"

এক্সিকিউটিভ (Executive বা শসনবিভাগ) আর জুডিসিয়াল • (Judicial বা বিচারবিভাগ) এর গোলমালের ভিতর আর বেশী গিয়ে কিছু লাভ নেই দেখে, আমি কথাটা পাল্‌টে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"প্রভুপাদ! যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে দেখা হবার পর আমাদের দেশে আর কি আসেন নি?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"দেখ, কৃষ্ণাবতারে ভগবান যখন ক্ষত্রিয়কুল একেবারে নির্ম্মূল করে গেলেন, তখন এমন কি আমারও মনে একটু দুঃখ হয়েছিল। কুরুকুল আর যদুকুল যতই পাজি হোক, তোমাদের মত এমন অপদার্থ ছিল না। একটু নেশা ভাঙ খেত, তা থাক্; তাদের লিভার টিভার অত শীঘ্র পাকত না। তবে ভগবান তাদের স্বহস্তে যখন মারলেন, তখন তাঁর উপর ত আমাদের কথা কওয়া চলে না।"

এই বলে ধর্ম্মরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্লেন—"দেখ, সেই অবধি অনেক দিন আর মনের দুঃখে ভারতবর্ষে আসিনি। তারপর যখন এলাম, তখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। মহানন্দ নামের একটা বুড়ো মড়াখেকো রাজা মগধের সিংহাসনে বসে আফিম খেয়ে ঝিমুচ্ছে; আর রাজপ্রসাদসেবী ব্রাহ্মণেরা খুব টিকি দুলিয়ে দুলিয়ে যজ্ঞের ভস্মে ঘি ঢালছেন, আর মহারাজের স্তবস্তুতি করছেন। সব কটার টিকি টেনে টেনে দেখলুম—পরচুলোর সাজান টিকি! টান দিতেই খসে এলো! কেবল একগোছা টিকি টানতে গিয়ে দেখলুম, হাঁ, টিকির মত টিকি বটে; একেবারে মগজ থেকে বেরিয়েছে! টিকিধারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"পণ্ডিতজীর নাম?" ব্রাহ্মণ আমার আপাদমস্তক তীব্রদৃষ্টিতে দেখে বল্লেন—"কৌটিল্য"। সে রকম তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর ভারতবর্ষে বড় বেশী দেখিছি বলে মনে হয় না। হাঁ, একট'

মানুষের মত মানুষ বটে। নমস্কার করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি, পণ্ডিতজী, বার্ত্তা কি?"

কৌটিল্য বল্লেন—"যারা ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়েও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়, তারাই এখন ভারতের রাজা।"

আমি বল্‌লাম—'বটে, কি আশ্চর্য্য!'

কৌটিল্য খুব চালাক লোক, আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। বললেন—"আশ্চর্য্য বৈকি! যাদের চারদিকে আগুন জ্বলে উঠছে, সিংহাসন যাদের টলছে, তারাও ভাবছে যে অনন্তকাল ধরে রাজ্য চালাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'তা হ'লে এ রাজ্যে সুখী কে?'

কৌটিল্য একটু হেসে উত্তর ক'রলেন—"যারা পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে, নিজের হাতেই গড়ে তুলতে পারে, তারাই সুখী।"

আমি এবার শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম—"তার পন্থা কি?"

কৌটিল্যও একটু ভাবিত হলেন। শেষে বল্লেন—"দেখুন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। ছোটখাট রাজারাজড়া দিয়ে এ কাজ হবে না। যাদের শূদ্র বলে রাজারা হেয় করে রেখেছে, ব্রাহ্মণেরা যাদের ছায়াও মাড়ায় না, সেই শূদ্রকেই আমি রাজা করে তুলব, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে বসাব। দেশকে তোলবার ঐ এক পন্থা।"

সেদিন দেবতারাও সে কথা শুনে—বলেছিলেন—"ধন্য, কৌটিল্য ধন্য।"

কৌটিল্যকে আশীর্ব্বাদ করে ফিরে এলুম; দেখলুম, তখনও ভারতে ব্রাহ্মণের অভাব হয়নি।

তার বহুকাল পরে আবার যখন পদধূলি দিতে আসি, তখন দেখে এলাম ভারতের দরজায় মহম্মদ ঘোরী দেড় হাত লম্বা দাড়ি নিয়ে উঁকি মারছে। এদিকে এসে দেখি, রাজপুতেরা খুব বড় বড় পাকড়ী বেঁধে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা প'রে, ধুম ধাড়াক্কা করে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবলুম, বুঝি বা যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে। জয়চন্দ্রের রাজসভায় এসে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি মহারাজ, বার্ত্তা কি?"

জয়চন্দ্র বল্‌লেন—'আমার মেয়ে স্বয়ম্বরা হবে।'

আমি বল্লুম—'বেশ, বেশ, তবে আর আপনার মত সুখী কে!'

জয়চন্দ্র বল্‌লেন—'আজ্ঞে হাঁ; বিশেষতঃ, পৃথ্বিরাজকে যে এ রকম আপমান করতে পেরেছি, এতেই আমি সুখী।"

'অপমান করবার পন্থাটা কি?'

"ঐ দেখুন না, পৃথ্বিরাজের একটা মূর্ত্তি গড়ে দরজায় দরোয়ান করে রেখে দিয়েছি।"

বেশ দেখতে পেলুম, ভারতের আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে আসছে। আমায় লোকে বলে নির্ম্মম, কিন্তু এই ভ্রাতৃদ্রোহের ভবিষ্যৎ ফল ভেবে সে দিন আমারও চোখে জল এসেছিল।

ধর্ম্মরাজ এতক্ষণ একটানা বকে যাচ্ছিলেন। এইবার একটু অবসর পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"চতুর্থ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন না যে?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"সে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? ভগবান যাকে মারেন, তা'কে যে কি করে অন্ধ করে দেন, তা' ত বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলুম। এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি?"

"মোগল বাদসাহের আমলে কখনও এসেছিলেন কি?"

"একবার এসেছিলুম। আরঙ্গজেব তখন বুড়ো বাপের মৃত্যু কামনা করতে করতে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্চে। 'হজরৎজী' যে রকম প্রচণ্ড ধার্ম্মিক, তা'তে মোগল বাদ্‌সাহদের তক্তে যে ঘুণ ধরেছে, এটা আর বুঝতে আমার বাকি রইল না। তাঁকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যকতা বোধ করলুম না। তখন মোগল দরবারে একজন মারাঠী যুবকের কথা অল্পবিস্তর শোনা যাচ্ছিল, আমার মনে হল একবার লোকটিকে দেখে আসি। সহ্যাদ্রির পাদদেশে এসে দেখলুম, এক দীর্ঘকায় বীর-লক্ষণ-চিহ্নিত উন্নতললাট, গৌরবর্ণ পুরুষ কল্পনার বলে ভবিষ্য ভারতের সৃষ্টি করছেন, আর মহাশক্তি তাঁকে আশ্রয় করে সমগ্র মহারাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করে তুলছেন। বুঝলাম, এই শিবাজী। অনেক দিন পরে একটা খাটি মানুষ দেখে আমারও আনন্দ হলো। আমি আশীর্ব্বাদ কোরে তাঁকে আমার চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম। শিবাজী বল্লেন, 'মহারাজ, মুষ্টিমেয় তুর্ক এসে ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তিকে পদাবনত করে রেখেছে, এই বার্ত্তা। যাদের জোরে তুর্ক সিংহাসনে বসে আছে, তারা স্বপ্নেও ভাবে না যে, সংঘবদ্ধ হ'লে তারাই দেশের অধীশ্বর হতে পারে—এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি? এ মোহ যে ভেঙ্গে দিতে পারে, সেই সুখী। আমি

মহারাষ্ট্রের শক্তি উদ্বুদ্ধ করে তাকে সমস্ত ভারতের কর্ত্তা করে দিব—এই আমার পন্থা।'

এই কথা বলে ধর্ম্মরাজ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'শিবাজীর সঙ্গে আর কোনও কথা হ'ল না?'

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"না। আমি যা' ভয় করেছিলুম, তাই হলো। পন্থার কথাটা শুনেই আমার মনে খট্‌কা লেগেছিল যে, মারাঠার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু থাকবে না। বর্গীর তরবারি একবার বিদ্যুতের মত সকলকার চোখ ঝলসে দিয়েই আবার অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেখছ না, আজ পর্য্যন্ত সারা ভারতের উপর প্রভুত্ব করবার লোভ মারাঠির মন থেকে ছুটল না?"

"তার পরে আর এ দেশে আসেন নি, বোধ হয়?"

"না। এখনও আসতুম না; তবে চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র দেখে হিসাব করে বল্লে যে, ভারতের প্রায়শ্চিত্তের দিন নাকি শেষ হয়ে এসেছে। তাই একবার তোমাদের দেখে শুনে যেতে এলাম। আচ্ছা, তুমিই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। বল দেখি, এখন বার্ত্তা কি?"

ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে গেল। আমি বল্লাম—"দোহাই ধর্ম্মরাজ; আমি রাজারাজড়া নই; আর রিফর্ম বিলের প্রসাদাৎ আমার রাজ-মন্ত্রী হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। আমি নিতান্তই গরীব ব্রাহ্মণ। শেষে আপনার পরীক্ষায় ফেল হয়ে কি বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণীকে অনাথা করবো?"

ধর্ম্মরাজ হেসে বল্লেন—"তোমরা কি আর বেঁচে আছ যে, তোমাদের মারব?"

তখন আমি সাহস পেয়ে বল্লাম—"হাঁ, তা বটে। আর আপনি যখন নাছোড়বান্দা, তখন আমার বিদ্যেটাই শুনে যান। এ দেশের প্রধান বার্ত্তা হচ্ছে এই, বড় বড় লোকে বল্‌ছেন যে, সভাস্থলে দাঁড়িয়ে ভাল ভাল ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে পারলেই চালের দর আর কাপড়ের দর একদম্ নেমে যাবে, ছেলেদের পেটের পিলে সেরে যাবে, সাদায় কালায় গলা ধরাধরি করে নৃত্য করতে থাকবে; ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি আধিব্যাধি সব দূর হয়ে যাবে; এক কথায়, ভারতে সত্যযুগ উপস্থিত হবে।"

ধর্ম্মরাজ খুব সুখী হয়ে বল্লেন—'বেশ, বেশ; এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও—সুখী কে?'

আমি বল্‌লাম—'মহারাজ, এ কথার খুব সোজা উত্তর। এ দেশে সুখী শুধু মাড়োয়ারী আর মডারেট।'

তখন তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল—"আশ্চর্য্য কি?"

"আমরা যে এই বুদ্ধি নিয়ে এখনো বেঁচে আছি, এইটেই আমার কাছে সব চেয়ে বড় আশ্চর্য্য।"

ধর্ম্মরাজ পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নেড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, এখন পন্থা কি?"

আমি ধর্ম্মরাজের পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বল্লুম—"মহারাজ, ঐটে আমায় মাফ করতে হবে। পন্থা বাৎলে দিতে গিয়ে, কি বলতে কি বলে ফেলবো; আমি আর এ বয়সে ঠ্যাঙ্গানি খেতে পারব না। আমায় রামে মারলেও মেরেছে, রাবণে মারলেও মেরেছে। উত্তর না দিলে আপনার হাতে মারা পড়ব, আর উত্তর দিলে কালই আমায়——"

হোঃ হোঃ হোঃ শব্দে এক বিরাট হাস্য করে ধর্ম্মরাজ আমার টিকিটা ছেড়ে দিলেন। দিতেই ঠক্ করে টেবিলের উপর আমার মাথাটা ঠুকে গেল।

* * * *

হোঃ হোঃ হোঃ!

চেয়ে দেখি, আমার ছেলেটা সুমুখে দাঁড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসচে।

"বাবা, এরই মধ্যে বসে বসে ঘুমুচ্চো? ভাত খাবে না?"

"ভাত কি রে? ধর্ম্মরাজ চলে গেছেন?"

"সে আবার কে?"

"এই যে এতক্ষণ আমার টিকি ধরে বসেছিল"—বলে উঠতে গিয়ে দেখি যে, গৃহিণী যে দড়ি-গাছটায় গামছা ঝুলিয়ে রাখতেন, সে দড়িগাছটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে, আর তার একটা মুখ আমার টিকির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

(৪)

যেবার প্রথম গুজরাতে যাই, তোমার মনে আছে? গাড়ীতে অনেকত গুজরাতী ব্রাহ্মণ, কয়েকজন মারাঠি আর বাকি হিন্দুস্থানী। একা আমিই সবেধন নীলমণি বাঙ্গালী। গাড়ীতে গল্প বেশ জমে এসেছে। একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ মালা জপ করতে করতে শোনাচ্ছিলেন যে, তাঁর ছেলে না ভাইপো গায়কবাড়ের রাজ্যের একজন মস্ত অফিসার। মালার একটা দানা দেখিয়ে বল্লেন যে, সেটা আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ; এক

গির্ণার পাহাড় ছাড়া সে রকমটী আর ভূ-ভারতে অন্ত কোথাও পাবার জো নেই। সেটী ধরে একলক্ষ বার জপ করলেই হয় মহাদেব, না হয় নন্দী, অভাবপক্ষে মহাদেবের ষাঁড়টি এসে হাজির হবেনই হবেন। একজন হিন্দুস্থানী তাঁর কথায় সায় দিয়ে বল্লে যে, অযোধ্যাজীতে ঘেঁটুরাম বাবাজীর আখড়ায় ঠিক ঐ রকম আর একটী রুদ্রাক্ষ আছে। বাবাজী নাকি তীর্থভ্রমণ করতে করতে আবু পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে বাবাজীর সেবায় তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠ ঠাকুরের এক চেলা বাবাজীকে এ রুদ্রাক্ষটী বখ্‌সিস করেন। প্রতি সোমবার আর শুক্রবার পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে রুদ্রাক্ষটীর পূজা করতে হয়; আর তার এমনি মহিমা যে, কোন ছোট জাত যদি সেটীকে চোখে দেখে ত চোদ্দ দিন, না হয় চোদ্দ মাস, না হয় চোদ্দ বৎসরের মধ্যে সে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবেই যাবে।

পাশেই আর এক গুজরাতী উর্দ্ধনেত্র হয়ে গুন্ গুন্ করে ভজন গান করছিলেন। হিন্দুস্থানীর [illegible] হতে না [illegible] তিনি বল্লেন—'দেখ্‌লে! তবু আজকাল লোকে ধর্ম্মকর্ম্মে বিশ্বাস করতে চায় না।'

গাড়ী সেই সময় একটা ষ্টেসনে এসে লাগতেই, জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাপড় পরা একটী লোক গাড়ীতে ঢুকে চুপ করে এক পাশে এসে দাঁড়াল। আমাদের মালাধারী গুজরাতী পুরুষ তাকে নিজের ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝতে পারলুম না। বেচারা উত্তর করলে—"মাড়"। তারপর ভানুমতীর ভোজ-বাজীর মত যে অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটল, তা' না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দু'জন গুজরাতী তড়াং কোরে লাফিয়ে একেবারে গাড়ীর বাহিরে গিয়ে পড়লেন। তাঁদের মাথার পাগড়ীগুলো গড়াতে গড়াতে আরও পাঁচ সাত হাত এগিয়ে গেলো। যিনি ভজন গাচ্ছিলেন, তাঁর ভক্তির উৎস একদম্ বন্ধ হয়ে গেল। "আরে রামঃ" বলে হুঙ্কার করেই তিনি পাশের গাড়ীতে টপ্‌কে পড়লেন; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীর দলও গাড়ী খালি কোরে যে যে দিকে পারলে অন্য গাড়ীতে পালালো।

যে লোকটী গাড়ীর এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপার কি?' লোকটী বললে—'বাবুজী, আমি মাড়্।' তখন মনে পড়ে গেল যে, বোম্বাই অঞ্চলে মাড়েরা অস্পৃশ্য জাতি। তাই বেচারা গাড়িতে উঠতেই সবাই আপনার জাত আর ধর্ম্ম বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল। কোথায় গির্ণার, কোথায় আবু পাহাড় ঘুরে ঘুরে ধর্ম্মিকেরা যা' কিছু পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, আজ একটা 'মাড়ে'র সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তা'ত আর নষ্ট করতে পারেন না! 'মাড়' বেচারাকে টেনে আমার কাছে বসাতে দেখে ধার্ম্মিকেরা আমার দিকে এমনি দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন, যেন আমি এই মাত্র চিড়িয়াখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।

সেদিন আমার চোখের সুমুখ থেকে একখানা পর্দ্দা সরে গেল। ছেলেবেলা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বার সময় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের কাছে এসেই আমার বিধাতার উপর ভারি রাগ হতো। মনে হতো—হায়, হায়! ওদিন পাঠানেরা না জিতে যদি মারাঠারা জিততো! আজ কিন্তু মাড়ের দুর্দ্দশা দেখে মনে হলো পাণিপথে মারাঠারা জিতলে ভারতে বর্গীদের রাজ্য হতো বটে—কিন্তু তা' হলে আজ এই ক'জন ধার্ম্মিক পুরুষ মিলে মাড় বেচারাকে গাড়ী থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতো। ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীও তার সুবিচার করতেন কি না সন্দেহ! নিজের অঙ্গকে পঙ্গু করতে আমাদের জোড়া মেলা ভার!

আর এ রোগ কি শুধু বর্গীদের? বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, হিন্দুস্থান—এক চেয়ে আর সরেশ; এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। আলমোরায় এক সাধুদের মঠে একবার বসে আছি, এমন সময় এক পাদরী সাহেব তাঁর কতকগুলি দেশী শিষ্য সমেত সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে ১৪।১৫ বৎসরের একটা ছেলে ছিল। সে যে কি মোহে পড়ে খৃষ্টান হয়েছে তা' জানবার জন্য আমার ভারি কৌতূহল হ'লো। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"বাবা, তোমার বাড়ীতে কি মা বাপ নেই? তুমি ধর্ম্মের কি বুঝেছ যে, হিন্দু-ধর্ম্মকে মিথ্যা বলে ছাড়তে গেলে?" ছেলেটী একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—"বাবাজী, ধর্ম্মের আমি কিছুই জানিনে। আমার মা বাপই আমাকে খৃষ্টান করে দিয়েছে। প্রায় বছর দুই হ'ল আমি একবার বড়দিনের সময় পাদরী সাহেবদের আড্ডায় বেড়াতে যাই, পাদরী সাহেব আমায় আদর করে খাবার খেতে দেন। খেয়ে দেয়ে আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বললাম—'মা, আমি পাদরী সাহেবদের বাড়ী খানা খেয়ে এসেছি।' মা শুনে কাঁদতে লাগলেন,

বাবা বললেন আমার নাকি ধর্ম্ম চলে গেছে; আমায় আর বাড়ীতে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে আর কোথায় যাই? সেই অবধি পাদরী সাহেবের সঙ্গেই আছি।"

দেশাচারের ভয়ে যে সমাজে মা বাপের মন থেকেও দয়া মায়া স্নেহ মমতা শুকিয়ে গেছে, সে সমাজ সজীব না মরা? মরা বললে আবার বন্ধুরা চটে উঠেন, তাঁরা বলেন যে, সমাজকে অমন ব্যাং খোঁচানি না ক'রে, খুব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল করতে হয়। তাঁরা এ কথা বুঝেন না যে, যাদুর গায়ে হাত বুলাবার সময় আর নেই। এ তো বুদ্ধির অভাব নয়, এ যে প্রাণের অভাব। যারা জ্ঞান-পাপী, তাদের বুঝিয়ে কিছু হবে না। দুঃখ-যন্ত্রণার তাপে গলিয়ে তাদের নূতন ছাঁচে ফেলে ঢালাই করতে হবে। পুরাণ বচনের বনিয়াদ উপড়ে ফেলে সত্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নূতন সমাজ গড়তে হবে। এখন যা' আছে, এ তো ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের ভ্যাংচানি; পারলৌকিক স্বার্থপরতা। নিজেদের ক্ষুদে ক্ষুদে স্বার্থের পুঁটলির উপর বড় বড় নামের ছাপ মেরে ধর্ম্মের বাজারে ভাল মাল বলে চালান করবার চেষ্টা। হায় রে, ভগবান কি এমনই বোকা যে, দু'টো সংস্কৃত বচনে ভুলে গিয়ে আমাদের রেহাই দেবেন? তা' যদি হ'তো, ত এই হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজের পিঠে গুঁতোর উপর গুঁতো বর্ষণ হচ্ছে কেন? শাস্ত্রে লেখে ধর্ম্মের ফল সুখ। আমরা যদি এত বড় ধার্ম্মিক ত আমাদের লাঞ্ছনা আর দুঃখ ভোগের নিবৃত্তি নেই কেন? জগতের সবাই দু'পায়ে হাঁটে, আর আমরাই শুধু কেঁচো, কৃমির মত বুকে হেঁটে মরছি কেন? পরকালের সুখের জন্য? যে ভগবান ইহকালে আমাদের জন্য কেবল ঝাঁটা আর লাথির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যে পরকালে আমাদের জন্য মেঠাই মোণ্ডার বরাদ্দ করে দেবেন, এ কথা সংস্কৃত অক্ষরে ছাপা পুঁথিতে দেখলেও যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

আমাদের দেশের ছেলেরা তাই ধর্ম্ম আর কর্ম্মের দোটানায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। যে সব আচার-অনুষ্ঠান সনাতন ধর্ম্মের মুখোস পরে আমাদের বুকের উপর বসে গলা টিপে দম বন্ধ করবার যোগাড় করে তুলেছে, সেগুলির মধ্যে সনাতনত্বের অভাব, এ কথা স্পষ্ট করে বলবার সময় এসেছে। ধর্ম্ম যে নাক টেপাটিপি বা নাড়ী শোধনের কসরৎ নয়, সাড়ে সতর কাহন কড়ি দিয়ে তা' যে ভট্টাচার্য্য মশায়দের দোকানে কেনা যায় না, ধর্ম্মের চাপে মানুষের আড়ষ্ট বা আধমরা হয়ে উঠা যে একান্ত আবশ্যক নয়, ডিগবাজী খেতে খেতে ভবপারে ছিট্‌কে পড়াই যে ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এ কথা যতদিন লোকে না বুঝবে, ততদিন ধর্ম্মের আর কর্ম্মের সামঞ্জস্য যে কি করে হ'বে তা' ত খুঁজে পাই নে। পদি পিসির ধর্ম্ম দিয়ে যাঁরা ছেলেদের পেট ভরাতে চান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে যাঁরা অসাত্ত্বিকতার গন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠেন, শূদ্রস্পৃষ্ট হলে যাঁরা ভগবানকে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে তবে জাতে তুলে নেন, তাঁরা যে ধর্ম্মমন্দিরের পাহারাওয়ালার ব্যবসা সহজে ছাড়বেন, তা' ত মনে হয় না। তবে আশা এই যে, ভগবানের একটি নাম দর্পহারী। মানুষ আপনার চারিদিকে যে অহঙ্কারের বেড়া দিয়ে রেখেছে—একদিন না একদিন তিনি তা' উপড়ে ভেঙ্গে ফেলে দেবেন। সারা জগৎ জুড়ে ভাঙনের মড়মড়ানি শোনা যাচ্ছে; এ দেশও কি বাদ পড়বে?

পথের সন্ধান

—:*:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের সন্ধান

—:*:—

গোড়ার অভাব

আমরা যে পরাধীন, সে দোষ কার? ইংরেজের ঘাড়ে ষোল আনা দোষ চাপিয়ে দিতে পারলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে গালাগাল দিতে পারি বটে, কিন্তু মন তাতে প্রবোধ মানে না। যখন দেখতে পাই যে, ইংরেজ এদেশে আসবার আগে থাকতেই আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে বসে' আছি, ইংরেজের আগে মোগল-পাঠানের গোলামিও আমাদের করতে হয়েছে, তখন একথা অস্বীকার করবার আর উপায় থাকে না যে, আমাদের মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে, যা দেখলে অপর জাতের আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার বিষম একটা প্রলোভন হয়। যারা লাফিয়ে এসে আমাদের বুকে চড়ে' বসে, তাদের যত খুসি বাপান্ত করতে পার, কিন্তু মনের কোণে এ প্রশ্নটাও দেখা দেয় যে, দুনিয়ায় এত দেশ থাকতে, আমাদের পোড়া কপালই বা বারবার পোড়ে কেন?

মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে পড়লো, তখন ইংরেজ সুধু কুঠিওয়ালা হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্রাট হয়ে মসনদে বসবার কল্পনা তখনও তার মাথায় গজিয়ে ওঠেনি। প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের তখন বাংলায় অভাব ছিল না। স্বাধীন মানুষের চামড়া যদি তাঁদের গায়ে থাকতো, তা'হলে বাংলার ইতিহাস বদলে যেতে পারতো। দেশকে স্বাধীন করা চুলোয় যাক, তাঁরা পাঁচজনে বুদ্ধি এঁটে দেশটাকে ক্লাইভের হাতে তুলে' দিয়ে নিজেরা যে গোলাম সেই গোলামই রয়ে গেলেন। দেশের যারা চাষা-ভুষো, তারা কোনোদিনই এ সব ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতো না; তখনও রাখলে না। দেশের যাঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাঁরা 'তৈলাধার পাত্র' কি 'পাত্রাধার তৈল', এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সব ছোটখাট ব্যাপারে মন দেবার সময় পেলেন না। আর যাঁরা তোমার-আমার মত না-জমিদার, না-চাষা, না-ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তাঁরা মধুর বৈষ্ণব-পদাবলী গান করতে করতে মূর্চ্ছা যাওয়া অভ্যাস করছিলেন; আর নানা তাল-মান-লয় সহকারে ভগবানকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তিনি মাখনের চেয়েও মোলায়েম, আর মধুর চেয়েও মিষ্টি। কিন্তু পোড়া ভগবান এমনি বেরসিক যে, অত আদর অভ্যর্থনা পেয়েও আমাদের বুঝিয়ে দিতে ছাড়লেন না যে, তিনি "ভয়ং ভয়ানকানাম্, ভীষণং ভীষণানাম্।"

দিন কতক না যেতে যেতেই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' আরম্ভ হলো। বাংলার শহর অরণ্য হলো; গ্রামে শেয়াল কুকুর বাস করতে লাগলো। ছেলে-বুড়ো আণ্ডা-বাচ্ছা মেয়ে-মদ্দ সব দলে দলে পেটের জ্বালায় মরে' পচে' ভূত হয়ে গেলো।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, বাংলার তিনভাগের একভাগ লোক তখন মারা পড়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালী তখন থেকেই এমনি অহিংস আর অবলা জাতি যে, তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। দলে দলে মুখ বুজে মারা গেল, কিন্তু কেন যে মরছে, তা কেউ চোখ চেয়ে দেখলে না। বাংলার ইতিহাসে সুধু একজনের নাম পাই—ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় যাঁর মনে স্বাধীনতার কল্পনা জেগেছিল—তিনি মহারাজ নন্দকুমার। কিন্তু ইংরেজের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে তাঁকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

তারপর থেকে এই দেড়শ' বছর ধরে' লাথির উপর লাথি আর ঝাঁটার উপর ঝাঁটা আমাদের পিঠে পড়েছে। আমরা নিতান্ত অসহায়ের মত কেঁদেছি, রাগ করেছি, অভিমান করেছি, কিন্তু খাঁটি মানুষের মত দাঁড়িয়ে উঠে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গোড়ার রোগের প্রতিকার করবার চেষ্টা কখনও করিনি। যাদের মনে সে সঙ্কল্প উঠেছে, তাদের পাগল বলে' উড়িয়ে দিয়েছি, নয়ত ধর্ম্মের ভান করে' তাদের কথা ধামাচাপা দিয়েছি। আজ সমস্ত জাতটা মরবার পথে দাঁড়িয়েছে—পেটে ভাত নেই, কোমরে কাপড় নেই, শরীরে বল নেই, বোধ হয় জোর করে'

কাঁদবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নেই। আজও সুধু কথার প্যাঁচকাটাকাটি চলেছে; আজও থুতু দিয়ে ছাতু গেলবার চেষ্টায় আছি। মনকে চোখ ঠারার আর আমাদের অন্ত নেই।

যে মন সব কাজের গোড়া, সেই মনই আমাদের যেন অসাড়, নির্জ্জীব, পঙ্গু হয়ে রয়েছে। বাইরের উত্তেজনার অভাব হলেই আমাদের সব উৎসাহ জুড়িয়ে যায়। পুলিশে যতক্ষণ ধরপাকড় করে, সভাসমিতি ভাঙ্গে, বক্তৃতা বন্ধ করে' দেয়, লাঠি বা গুলি চালায়, ততক্ষণ আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনটা চলে ভাল, কেননা আমাদের দেশের কাজের ধারণা ততটা সৃষ্টিমূলক নয়, যতটা প্রতিবাদ-মূলক। আমাদের মারতে মারতে স্বরাজ পর্য্যন্ত পৌছে দেবার ভার আমরা যেন ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি পুলিশের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়, তা'হলে বোধ হয় আমাদের রাজনীতি-চর্চ্চার ব্যবসাটাই মারা পড়ে।

কেন এমন হয়? হয় এইজন্যে যে, আমাদের ভিতর অন্তরের স্বাধীনতা এখনও জাগেনি। পরাধীনতার যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়, তখন আমরা খুব খানিকটা চীৎকার করি; আবার পরক্ষণেই সব কথা ভুলে যাই। আর দুর্ব্বলের মত আত্ম-প্রবঞ্চনা করে' নিজেদের মনকে প্রবোধ দিই যে, এই বিস্মৃতির নামই ক্ষমা, আর এই দুর্ব্বলতার নামই অহিংসা। দেশের আত্মা যদি আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতো, তা'হলে তাকে বাইরে একটা রূপ দেবার জন্যে আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠতাম; কিন্তু সে রূপ আমাদের নিজেদের মনেও এখনও ফোটেনি। আমরা দেশসেবার 'নেতি নেতি'র দিকটাই দেখেছি, 'ইতি'র দিকটার সন্ধান এখনও পাইনি। স্বাধীন দেশকে কি রূপ দিতে হবে, তা আমাদের নেতারা এখনও জানেন না। তাই আমাদের স্বাধীনতার চেষ্টার মধ্যে আনন্দের বেগ নেই। আছে সুধু ফাঁকা আওয়াজ আর ব্যর্থ রোদন।

এই অভাবাত্মক স্বদেশ-প্রেম দিয়ে কোনো কাজ হবে না। চাই, স্বাধীন ভারতের একটা ভাবাত্মক রূপ, আর তাকে বাইরে মূর্ত্ত করে' তোলবার আগ্রহ। কি চাই, তার একটা স্পষ্ট ধারণা যতদিন না হবে, ততদিন কংগ্রেসই বলো, আর কাউন্সিলই বলো, সব সুধু কবির লড়ায়ের আড্ডা হয়ে থাকবে।

স্বদেশী স্বরাজ

তোমরা হয়ত আবার জিজ্ঞাসা করবে—"ও আবার কি? সহোদর খুড়োর মত একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার বলে' মনে হচ্ছে যে! স্বরাজ আবার বিদেশী হয় নাকি?" আমি বলি—"হয়, দাদা হয়।" আর সুধু 'হয়' নয়; ডিউক অব কনট থেকে আরম্ভ করে' বড় বড় বাবু-ভায়ারা পর্য্যন্ত যাঁরা মনগড়া স্বরাজের নমুনা বাৎলেছেন, তাঁহাদের সব নমুনাগুলোর মধ্যে আমি একটা বোটকা বিদেশী গন্ধ পেয়েছি। তোমরা যদি না পেয়ে থাক, ত আমি বলবো যে, তোমাদের নাকের জাত গেছে।

খাঁটি সত্যি কথা হচ্ছে এই, দেড়শ' বছর ধরে' বিদেশী ধুলো-কাদা আমাদের মনের উপর এত জমা হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের সত্যিকার রূপটা আমরা এক রকম ভুলেই গেছি। কাজে কাজেই স্বরাজের নাম করে' যত মাল আমদানী করচি, তা একটু নাড়লে চাড়লেই Made in Europe-ছাপটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। শুনতে পাই, স্বাধীনতা ধরবার একটা নাকি কল আছে, যার নাম ডেমক্রাশী, আর সেই কলের মধ্যে কোনো দেশের লোকগুলোকে ফেলতে পারলেই সেই দেশটা রাতারাতি স্বাধীন হয়ে উঠবে। সেই ডেমক্রাশীর ষোড়শোপচারে পূজো দেবার জন্যে চাই একটা পার্লামেণ্ট, আর যদি recall আর referendumএর ব্যবস্থা করতে পার, ত একেবারে সোনায় সোহাগা! আজন্মকাল রাশি রাশি রাজনীতির পুঁথি ঘেঁটে বাবুভায়ারা এই জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করে' আমাদের উপহার দিচ্ছেন।

অথচ ফরাসী-বিপ্লব থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত যদি কোনো জিনিষের ব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে থাকে ত এই ফাঁদ পেতে স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টার। সেকালে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী বলেছিল, "আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে' দিতে পারি চাঁদ।" মালিনী মাসীর অনেক রকম বিদ্যের মধ্যে হয়ত চাঁদধরা বিদ্যেটাও ছিল; কিন্তু ফাঁদ পেতে স্বাধীনতা ধরতে বললে মালিনী মাসীকেও হার মানতে হতো!

দেখনা একবার তামাসা! ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে ঠিক করলেন যে, সবাইকে যদি ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া যায়, তা'হলে সবাই সমান হয়ে যাবে। Vox populi, Vox dei প্রভৃতি গালভরা কথাগুলো বড় বড়

স্বরূপে ছেপে লোকের চোখের সামনে জল্ জল্ করতে লাগল। কিন্তু পোড়া দুঃখ ঘুচ্‌ল না। দেখা গেল যে, সবাইকার ভোট দেওয়া সত্ত্বেও জনকত ওস্তাদ অপরের মাথায় চাঁটি মেরে বেশ দুপয়সা গুছিয়ে নিয়েছে, আর টাকার জোরে যা খুসি তাই করে' বেড়াচ্ছে। যাদের টাকা আছে তারাই স্বাধীন, আর বাকি সবাই তাদের গোলাম। পার্লামেণ্ট ফার্লামেণ্ট যা কিছু বল, সব ঐ টাকার থলির ভেতর। তখন আবার হৈ হৈ পড়ে' গেল। টাকার যাতে সমান সমান ভাগ-বাঁটরা হয় তার ব্যবস্থা কর। এই চেষ্টার ফলে জন্মেছে সমাজতন্ত্র (Socialism)। কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে প্রবল, সেখানে আইন-কানুনের চাপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটা একেবারে মারা যাবার দাখিল হয়েছে। স্বাধীনতা বাঁচাতে গেলে সাম্য থাকে না, আর সাম্য বাঁচাতে গেলে স্বাধীনতা মারা যায়। এই এখন ইউরোপের সমস্যা। রুষিয়ার কম্যুনিষ্টরা বলছে, সবাইকে গায়ে-গতরে সমান খাটাও, আর সমান ভাবে খেতে-পরতে দাও, তা'হলেই সব সমান হয়ে যাবে। মানুষ যদি খাবার আর খাটবার একটা যন্ত্র হতো, তা'হলে এ ব্যবস্থা চলতে পারতো, কিন্তু পেট আর হাত-পা ছাড়া মানুষ তো আরও কিছু? সেটুকুর ব্যবস্থা কি হবে?

এই সব গতিক-গাতাক দেখে একদল বলছে—সব শাসন-যাসন ভেজে ফেলে দাও। আইন-কানুন পুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে অবাধে ছেড়ে দাও—দেখ যদি তা'হলে কিছু হয়!

এই তো ইউরোপের অবস্থা। মোট কথা, মানুষ যে কি জিনিষ, তা তারা জানে না; তাই সেখানে বজ্র আঁটন আর ফস্কা গেরো। স্বাধীনতার নাম দিয়ে যদি এই সব শাসনপ্রণালী আমাদের দেশে আমদানি কর, তা'হলে জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।

তাই আমরা চাই, একেবারে খাঁটি স্বদেশী স্বরাজ—মানুষকে আইনের বাঁধনে বা শাসনের পেষণে এক করা নয়। সবাই যে এক আত্মার বিকাশ, এই সত্যটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করে' সেটাকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—সব নীতিই হবে আত্মনীতি, আমার নিজেকে মানুষের জীবনে প্রকাশ করবার ভঙ্গী। তার গোড়ার কথা সাম্যও নয়, অহঙ্কারের স্বাধীনতাও নয়—গোড়ার কথা হচ্ছে আত্মার একত্ব।

সে একত্বকে পেতে গেলে বাইরের শত প্রলোভন ছেড়ে অন্তরের দিকে মুখ ফেরাতে হবে, Compromise (রফা)-এর কথা ভুলে যেতে হবে, কোন্ লাট সাহেব কি 'দিল্লীকা লাড্ডু' নিয়ে আসছে, তার আলোচনা ছাড়তে হবে।

নিজেকে যদি পাও, ত নিজের শক্তিতে সব গড়ে' উঠবে। বাইরের বাঁধন খুলে' ফেলবার শক্তি ভারতের অন্তরেই আছে। চাই সাধনা, চাই শ্রদ্ধা, চাই আপন-ভোলা পণ।

স্বরাজ সৃষ্টি

এদেশে স্বরাজের রূপটি ঠিক কি হবে বা হওয়া উচিত, তার নিখুঁত বিবরণ এখন থেকে দিয়ে দিতে পারেন, এত বড় দূরদর্শী কেউ আছেন বলে' আমাদের মনে হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রুষিয়া, জাপান—রাষ্ট্র হিসাবে এরা সবাই স্বাধীন। কিন্তু নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে গড়ে' উঠেছে। রাষ্ট্র আর কিছুই নয়—যাঁরা রাষ্ট্র গড়েছেন, তাঁদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি প্রকাশের একটা যন্ত্র মাত্র। কাজে কাজেই রাষ্ট্র যাঁরা গড়েন, তাঁদের প্রকৃতি যেমন, রাষ্ট্রের প্রকৃতিও তেমন।

শাসনযন্ত্র গঠন বা পরিচালনের অধিকার যে সমস্ত দেশে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে ন্যস্ত, সে সব দেশ বিদেশীর অধীনে যদি না-ও হয়, তবু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়। সব রকম পরবশতাই দুঃখের কারণ; দেশের লোকের হাতে যদি গুঁতো খেতে হয়, ত সে গুঁতো যে বিদেশীর গুঁতোর চেয়ে মিষ্টি হবে, তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপ বা আমেরিকায় সেইজন্য দেশের সমস্ত লোকের উপর শাসনযন্ত্র গঠন ও পরিচালনের অধিকার দেবার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলছে।

আমাদের দেশে স্বরাজের রূপ নির্ণয় করবার পূর্ব্বে এই কথাটা স্থির করা দরকার, কাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমরা স্বরাজ চাই। দেশের সর্ব্ব সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তা'হলে জনকতক শিক্ষিত বা উচ্চ বর্ণের লোকের উপর শাসনভার অর্পণ করে' আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়া চলবে না;

কেননা, অতীত অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, দরিদ্রের বা অশিক্ষিতের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খেতে শিক্ষিত বা অভিজাত সম্প্রদায় কোনো দেশেই সঙ্কোচ করেনি। হিন্দু আমলে যখন রাজশক্তি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে, তখন দেশের স্বাধীনতার জন্য শূদ্রদের গৌরব করবার বিশেষ কোনো কারণ ছিল বলে' মনে হয় না। আজও মধ্যভারতের যেসব জায়গায় ক্ষত্রিয় রাজা ভাঙ্গা সিংহাসনে বসে' রাজ্য শাসনের ভাণ করে' থাকেন, সেইসব জায়গায় রাজার কোনো স্বজাতির রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় নিম্নবর্ণের লোককে রাস্তা ছেড়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। দেশ স্বরাজ পাবার পর যদি শাসনের অধিকার ঐ সব উচ্চবর্ণ বা ধনীলোকের হাতে গিয়ে পড়ে ত' দরিদ্র বা নিম্নবর্ণের লোকের সে রকম স্বরাজলাভের ফলে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাত্রা যে খুব বেশী বাড়বে, তা মনে হয় না।

এতদিন পর্য্যন্ত স্বরাজলাভের চেষ্টা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বহু ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তাঁদের এইটুকু জ্ঞান আজ হয়েছে যে, দেশের মধ্যে যারা সংখ্যায় শতকরা আশী জন, তাদের ছেঁটে ফেলে কোনো প্রচেষ্টারই সফল হবার সম্ভাবনা নেই। তাই তাদের সাহায্য লাভ করবার চেষ্টা অল্পবিস্তর আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই সহানুভূতি যদি কার্য্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যেই জন্মে থাকে, এর মূলে যদি গভীর সমবেদনা না থাকে, তা'হলে আমাদের দেশের স্বরাজ সুধু আংশিক হয়েই থাকবে, আর আমাদের হাতের অস্ত্র একদিন ঘুরে এসে আমাদের মাথায় পড়াও বিচিত্র নয়।

কংগ্রেসে স্বরাজের আদর্শ আর স্বরাজ লাভের প্রণালী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ইংরাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কতটুকু থাকা উচিত বা উচিত নয়, অহিংসামন্ত্রে কার্য্যোদ্ধার হবে, না অহিংসা-নীতি ভবিষ্যতে কখনও ত্যাগ করতে হবে—এসব প্রশ্ন মীমাংসা করবার আগে আমাদের মীমাংসা করতে হবে যে, সমগ্র দেশকে আমরা কতটুকু আপনাদের আয়ত্বের মধ্যে আনতে পেরেছি, দেশের জনসাধারণের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ আর স্বাধীনতাস্পৃহা কতটুকু জাগিয়ে তুলতে পেরেছি। স্বরাজ যে সুধু তোমার আমার বা জনকতক ভদ্রলোকের সুবিধার জন্য নয়, ভারতের প্রত্যেক নরনারীর পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে তা একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা যদি আমরা নিজেদের বর্ত্তমান আচরণ দিয়ে বুঝতে দিতে না পারি, তা'হলে স্বরাজ ফাঁকা কথাতেই পর্য্যবসিত হবে।

আজ যাঁরা অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করে' কারাযন্ত্রণা বরণ করে' নিচ্চেন, তাঁরা আমাদের নমস্য, তাঁদের স্বার্থত্যাগ আমাদের অনুকরণীয় —কিন্তু যাঁরা সুধু জেলে গিয়েই তৃপ্ত নন, তাঁদের আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ইংরেজের আইন-কানুনই আমাদের পরাধীনতার মূল কারণ নয়। সেই মূল কারণ যদি অন্বেষণ করতে যাই, ত কোটি কোটি জন-সাধারণ, যারা অসাড়, অজ্ঞ, দুর্ব্বল, দরিদ্র, দায়িত্ববোধহীন হয়ে পড়ে' আছে, এ দেশকে স্বদেশ বলে' বোঝবার অবসর যারা কখনো পায়নি, তাদের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। সেইসব অসাড় প্রাণে আশার সঞ্চার করতে হবে, দুর্ব্বল বাহুতে বলের সঞ্চার করতে হবে, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে' তাদের মনে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে দিতে হবে। সেই লুপ্ত চৈতন্য যদি উদ্ধার করতে পার, তা'হলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ স্বরাজ আপনা আপনিই গড়ে' উঠবে; স্বরাজের রূপ নিয়ে নেতৃবৃন্দের অযথা মাথা ঘামাতে হবে না।

আজ বার বার আমরা এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করতে শিক্ষা করা বা নিজেদের দায়িত্ববোধ নেতা-বিশেষের হাতে তুলে' দিয়ে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হওয়া—এই লুপ্ত চৈতন্য উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না শেখে, বা ষোল আনা দায়িত্ব বুঝে কাজ করতে অগ্রসর না হয়, ত সমগ্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কখনো জাগবে না; জাতির শক্তি কখনো সংহত হয়ে উঠবে না, আর স্বরাজের নামে যা গড়ে' উঠবে, তা সুধু স্বরাজের ভ্যাংচানি মাত্র।

বাংলার ছেলেদের কাছে আজ আমাদের তাই এই অনুরোধ—আদেশের প্রত্যাশায় হাঁ করে' বসে' থেকো না। স্তুতি বা নিন্দার তাড়নায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিও না। বাংলার যা প্রাণের কথা তা যেন অপরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র না হয়। বাংলাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবার কল্পনা করে' যাঁরা সুখ পান, তাঁরা সুখে সে-স্বপ্ন দেখতে থাকুন। কিন্তু তোমরা, বাংলার মাটিতে যাদের জন্ম, বাংলার

অন্নে যারা পুষ্ট, বাংলার রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি যাদের নিশার স্বপ্ন আর দিবসের ধ্যান—তোমরা বাংলার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছুটে গিয়ে বাংলার মাটিকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধর; তোমাদের প্রাণে যে বিদ্যুৎশক্তি জ্বলছে, তা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে' দাও। তোমাদের কেন্দ্র করে' বাংলার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাহস, সুখ, দুঃখ, বীর্য্য, সমস্তই মূর্ত্ত হয়ে উঠুক। নামের কাঙাল তোমরা নও, যশের কাঙাল তোমরা নও—তোমরা তোমাদের সর্ব্বস্ব বাংলার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্বরাজ-প্রসবিনী মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির উদ্বোধন কর। তোমাদের অন্তরের সৃষ্টির আনন্দ, বাহিরে স্বরাজের শতদল হয়ে ফুটে উঠুক।

গোঁজামিল

দেশসুদ্ধ লোক স্বাধীনতা চায়, তবু দেশ স্বাধীন হয় না, এও কি আবার একটা কথা? আমাদের সব কাজ যে অর্দ্ধেক রাস্তায় ভেঙ্গে পড়ে, তার মূল কারণ হচ্চে এই যে; আমাদের মন আর মুখ এক নয়; নিজেদের সঙ্গে আমাদের একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া হয়নি; আমরা ভাজি ঝিঙে আর বলি পটোল। আমাদের মনগুলো একেবারে স্বদেশী ফণ্ডের মতো—কোথাও তার হিসাব নিকাশ নেই, সবটাই জোড়াতাড়া আর গোঁজামিল।

যে দিকে দেখ, সেই দিকেই ফাঁকিবাজী। আমরা বাইরে শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে' বেড়াই কিন্তু বাড়ীর উড়ে' মালীটা ভাত খাচ্চে কি শুকিয়ে মরছে, তার খোঁজ রাখিনে। স্ত্রী-স্বাধীনতার বক্তৃতা দেবার সময় আমাদের মুখে খৈ ফোটে, অথচ ঘরে আমাদের মেয়েগুলি একেবারে জুজুবুড়ি। আমরা বাইরে কলেজী-বিদ্যার বাপান্ত করে' এসে, ঘরে দোর দিয়ে টেক্সট বুকের নোট লিখতে বসি। আমরা গোলদীঘিতে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের লেকচার দিয়ে এসে, ছেলেটির ডেপুটিগিরির দরখাস্ত নিয়ে লাট সাহেবের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটি। আমরা জেলাবোর্ড আর মিউনিসিপ্যালিটি বয়কট করার উপদেশ দিয়ে এসে, ভাইসচেয়ারম্যান হবার লোভে মন্ত্রী বাহাদুরের দরজায় গিয়ে ধরণা দিই। আমরা কল-কারখানার ঘোরতর বিরোধী, তবু মিলের ডিরেক্টর হতে পারলে ছাড়িনে। আমরা দেশের জন্য কাঁচা মাথা পণ করে' বসি, কিন্তু পুলিসে ধরলেই আমাদের কাঁচা মাথায় পাকা বুদ্ধি গজিয়ে ওঠে। আমরা খবরের কাগজে খদ্দর প্রচার করি; কিন্তু আমাদের শ্রীঅঙ্গে মিহি ধুতি ছাড়া ওঠে না। আমরা চরকা কিনি, কিন্তু কাটিনে। আমরা সালিসী আদালতের পাণ্ডা, কিন্তু ইংরেজের আদালতে এটর্ণিগিরি করবার লোভ ছাড়তে পারিনে।

কেন এমন হয়? এইজন্যে যে, আমাদের বাইরে খদ্দর থাকলেও আমাদের মনগুলি একেবারে রেলির উনপঞ্চাশী দিয়ে মোড়া। আমরা নিজেদের যে কতখানি ঠকাচ্চি, তা ধরতে চাইও না, ধরতে পারিও না। আর কেউ যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে আসে, ত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা চোখে কাপড় বেঁধে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ি।

কিন্তু এতো ধ্যান নয়, এ যে আফিমখোরের ঝিমুনি! এ সুধু বচনের জোরে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা; মাঝিকে ফাঁকি দিয়ে ফুটো নৌকায় চড়ে' নদী পার হবার আয়োজন। এ ন্যাকামি আর ভণ্ডামি সুধু সেইদিনই সারবে, যেদিন স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আগুনের মত দাউ দাউ করে' আমাদের মনে জ্বলে উঠবে। কিন্তু আজও তা হয়নি, আজও আমাদের থিয়েটারি ঢঙ সারেনি, আজও আমরা লোকের কাছে স্বদেশ-প্রেমিক সেজে হাততালি নিতে যতটা ব্যস্ত, নিজের কাছে খাঁটি হতে ততটা ব্যস্ত নই।

অন্তরাত্মা যার জ্বলে উঠে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে' দিয়েছে, সে কি আর পরের মুখ চেয়ে গোলে হরিবোল দিয়ে দিন কাটাতে পারে? নিজের ভিতর যে স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে, সে কি আর এই অষ্টবন্ধনের মাঝখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারে? বাইরের বন্ধন সে ছিঁড়ে ফেলবেই ফেলবে; আর যতদিন তা না পারে, ততদিন তার মুখের ভাত তিক্ত হয়ে উঠবে, তিন হাত পুরু গদীতে তার শয্যাকণ্টকী ধরবে, আরাম তার অঙ্গে বিষ ছড়িয়ে দেবে। রুদ্রের তেজ তার চোখে ফুটে উঠবে, ভয় তাকে দেখে ভয় পাবে, সব মিথ্যা তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

দেশের বড় বড় হোমরা-চোমরা রাজনৈতিক পাণ্ডারা যে গান্ধী মহারাজের কাছে কেঁচোর মত হয়ে গেল, তার মূল কারণটি ঐখানে। তাঁর কার্য্য-প্রণালী সফল হবে কি নিষ্ফল হবে, এ ভাবনাটা লোকের কাছে বড় বলে' মনে হয়নি।

লোকে শুধু হাড়ে হাড়ে এই কথাটা বুঝেছে যে, দেশের ব্যথা এঁর প্রাণে যেমন তীব্রভাবে বেজেছে, এমন আর কারও প্রাণে বাজেনি; স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা এঁর মনে যেমন করে' জেগেছে, এমন আর কোথাও জাগেনি। আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজ গান্ধী মহারাজের কার্য্য-প্রণালীর শত শত ত্রুটি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে-সব কথা ভাল করে' লোকের কানে পৌছোয়নি। পণ্ডিতেরা চটে' গিয়ে ঠিক করেছেন যে, দেশসুদ্ধ লোক বোকা। কিন্তু দশহাজার নির্জীব পণ্ডিতের চেয়ে একজন সজীব মানুষ যে ঢের বেশী শক্তিমান, এ কথা ইতিহাসে অনেকবার প্রমাণ হয়ে গেছে।

আমাদের চাই সেই সজীবতা, সেই স্বাধীনতার তীব্র অনুভূতি। সেইটুকুর অভাবেই আমরা গরুর গাড়ীর গরুর মতো চোখ বুজে জাবর কাটতে কাটতে হ্যাঁকচ-প্যাঁকচ করে' ঢিমে তেতালায় চলেছি। যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জোরে পাহাড় ধ্বসে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়, আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, অসম্ভব সম্ভব হয়—সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই।

রাস্তায় ছেলেদের দিকে চেয়ে দেখ, কেউ সজীব মানুষের মত সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে চলে না। কারও চোখে দীপ্তি নেই, শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই, প্রাণে বিশ্বাস নেই। স্বাধীন মানুষের রক্ত তাদের শরীরে নেই। তারা কথা কয় ফিস্‌ফিস্ করে', চলে সুড়্ সুড়্ করে', আর মরে প্রেগের ইঁদুরের মতো। মা ধরিত্রীর সঙ্গে তাদের নাড়ীর টান যেন একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

কিন্তু তা'হলে ত চলবে না। স্বাধীন দেশ গড়ে' তুলতে গেলে তার গোড়ায় চাই স্বাধীনতার একটা তীব্র অনুভূতি, যা সমস্ত মিথ্যার রঙীন খোলস ছাড়িয়ে চোখের সামনে তার নগ্ন বীভৎসতা ধরিয়ে দেবে; কোনো রকম গোঁজামিল দিতে গেলেই যা ভিতর থেকে প্রতিবাদ করবে, যা গোলামের সুখশয্যা কণ্টকময় করে' তুলবে, যা কথায় বার্ত্তায়, চলনে ভঙ্গীতে, বিশ্রামে কর্ম্মে নিজেকে মূর্ত্ত করে' ধরবে। সেই স্বাধীনতার অনুভূতি যখন আসবে, তখন কর্ম্মপন্থার জন্য বেশী মাথা ঘামাতে হবে না। কর্ম্মপন্থায় মানুষ গড়ে না, মানুষে কর্ম্মপন্থা গড়ে।

একতার মূল

আজকাল 'একতা'র নাম করে' যে-জিনিষটাকে প্রচার করা হচ্চে, সেটাকে ঠাট্টা করতে গিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছি। বন্ধু-বান্ধবেরা চারদিক থেকে একেবারে 'গেল গেল' রবে চীৎকার করে' উঠেছেন। কেউ বলছেন—অসহযোগ আন্দোলনটা আমি মোটেই কিছু বুঝিনি; অপরে বলছেন যে, যদিও বা বুঝে' থাকি, তবুও যে-জিনিষটাকে সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে, সেটাকে নিয়ে ঠাট্টা করা ভাল হয়নি। তাতে নাকি কাজের ব্যাঘাত হবে। ছেলেবেলায় যখন রঙ্গলালের কবিতা পড়েছিলুম,—

> 'একতায় হিন্দু রাজগণ,
> সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন,
> সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধুনদী,
> আসিতে কি পারিত যবন?
> —ইত্যাদি

সেই সময় থেকেই আমার মনে এই প্রশ্ন উঠতো যে, কোন হিন্দু রাজারই সৈন্যসংখ্যা কি পাঠান বা মোগলদের সৈন্য-সংখ্যার চেয়ে বেশী ছিল না? ১০০৮ খৃষ্টাব্দে যখন সুলতান মামুদের সঙ্গে জয়পালের ছেলে অনঙ্গপালের যুদ্ধ হয়, তখন ত উত্তর ভারতের সব রাজাই অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অনঙ্গপালের সাহায্য করেছিলেন। একতার কোনো অভাব হয়নি; হিন্দুদের সৈন্য-সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশী ছিল, তবু হিন্দুরা হেরে গেল কেন? রাজপুতেরা তখন একজোট হয়ে প্রাণপণে লড়েছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কেউ প্রাণের ভয়ে পালায়নি। কিন্তু তাদের একতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হয়নি।

তারপর ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। ইউরোপ তখন ঠিক ভারতবর্ষেরই মত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সুবিধা পেলেই তারা পরস্পরের সঙ্গে লাঠালাঠি করতো। ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী একতা তাদের ছিল না। কিন্তু একদিকে স্পেন, আর একদিকে ভিয়েনা পর্য্যন্ত গিয়েই তুর্ক সৈন্যকে থেমে যেতে হয়েছিল। কেন?—একতার অভাব ত ইউরোপে যথেষ্টই ছিল; তবু ইউরোপ পরাধীন হলো না কেন?

এই 'কেন'র উত্তর যে কি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববার অনেক অবসর এ জীবনে পেয়েছি। আমার মনে হয় যে, আমাদের জাতটার প্রাণশ

অভাব হয়েছে, অন্তরের আনন্দ আমাদের শুকিয়ে গেছে; রকম-বেরকম বিধি-নিষেধের চাপে এই শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরার সঙ্গে নাড়ীর যোগ আমাদের ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। মোগল, পাঠান বা ইংরেজের কাছে গোটাকতক লড়ায়ে হেরে গিয়েছি বলেই যে আমরা পরাধীন, তা নয়—আমাদের অন্তরের পরাধীনতাই মোগল, পাঠান, ইংরেজকে ডেকে এনে আমাদের ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিয়েছে। পলাসীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ বাংলার মসনদে উঠে বসেনি। আমাদের মনগুলো নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল বলেই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি দেশের সেকালের রাজনৈতিক পাণ্ডারা 'একতাবদ্ধ' হয়ে ক্লাইবের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সুধু কুচকাওয়াজ বা ড্রিলের জোরে এ পরাধীনতা সারবে না। রোগের মূল যেখানে, সেইখানে আমাদের ওষুধ লাগাতে হবে। যাঁরা কর্মী তাঁরা বাইরের কাজের মধ্যে একতা আনবার জন্যে স্বভাবতই ব্যস্ত। কিন্তু সে একতাকে স্থায়ী করতে গেলে এ জাতের মনের গোড়ায় কাজের গোড়াপত্তন করতে হবে; এ জাত যেখানে সত্য সত্যই এক, সেইখানে কাজের বনিয়াদ গাঁথতে হবে।

আমাদের পুঁথিতে বলে যে, শক্তির তিন রূপ—ইচ্ছা, জ্ঞান, আর ক্রিয়া। কোনো কাজ করতে গেলে একটা অভাব বোধ আর সেই অভাব ঘোচাবার তীব্র ইচ্ছা থাকা চাই। তারপর কি করে' সে-কাজটা করতে হবে, সে-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। এই ইচ্ছা আর জ্ঞানের মধ্যে যদি কোনো রকম গোঁজামিল থাকে, তা'হলে বাইরের কাজের মধ্যে সে গোলমাল ফুটে বার হবে। একটা যা তা কাজ অবলম্বন করে' একতা গড়া চলে না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যখন সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়, তখন এদেশের মডারেটেরা 'একতা চাই, একতা চাই' বলে' চীৎকার করে' উঠেছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের Bengalee কাগজখানা পড়ে' দেখো, একতার গুণ-কীর্ত্তনে একেবারে ভরা। কিন্তু তখন যদি দেশের লোক একতার খাতিরে মডারেটদের কথায় সায় দিয়ে যেত, তা'হলে কি দেশের বিশেষ কিছু লাভ হতো? মডারেটদের স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছাও ছিল না, আর কি করে' সে স্বাধীনতা পেতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞানও ছিল না। সুতরাং একতার খাতিরেও দেশ যে তাদের কাজে সায় দিতে পারেনি, তাতে দেশের লোকের লাভ বই লোকসান হয়নি।

আজ 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনও দেশের কাছ থেকে একতার দাবী করছে। এ আন্দোলনের আদর্শ কি?—ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে বা তার বাইরে স্বরাজ পাওয়া। আমার বিশ্বাস, আদর্শের মধ্যে যেখানে অনিশ্চয়তা থেকে যায়, কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যেও তা ফুটে বেরিয়ে পড়ে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে'থেকে স্বরাজ পাওয়ার মানে যে কি, তা আমি বুঝিনে। আমার মনে হয়, ও একটা অর্থহীন, অসম্ভব ব্যাপার। আমি দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। তার মধ্যে কোনো গোঁজামিলের জায়গা রাখতে চাইনে। আর কি করে' যে সেই স্বরাজ পেতে হবে, সে-সম্বন্ধেও আমি ষোল আনা ওঁদের কথা মানিনে। যেখানে কাম্যবস্তু লাভের ইচ্ছা, আর কি করে' লাভ করতে হবে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান—এই দুই বিষয়েই মিল নেই, সেখানে বাইরের কাজে মিল কোথা হতে আসবে?

যাঁরা মনে করেন যে, একসঙ্গে কাজ করতে করতেই একতা আসবে, আর সেই বাইরের মিলন থেকে ভিতরের মিলন শেষে গড়ে' উঠবে, আমি তাঁদের আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলি। যেখানে মিলনের মূলে সত্য নেই, সেখানে উৎসাহ ফিকে হয়ে যাবে, কাজে শ্রদ্ধা থাকবে না, বাইরের সাফল্যের জন্য মন লোলুপ হয়ে উঠবে। আর তার অভাবে সব কাজ ভেঙ্গে পড়বে। আমি ভিতর থেকে গড়তে চাই—এমন জিনিষ যা নিজের বেগে নিজের পথ সৃষ্টি করে' নেবে; যা ভিতরের, গোড়ার একতাকে বাইরে টেনে মূর্ত্ত করে' ধরবে।

রাজনৈতিক অধিকার ভেদ

ধর্ম্ম-সাধনায় যেমন অধিকার-ভেদ স্বীকার করি, রাজনীতি-চর্চ্চায় সেই রকম অধিকার-ভেদ স্বীকার করিলে দোষ কি?

ধর্ম্মের ব্যাপারে কোনো হিন্দুই বলে না যে, তার নিজের মত ও পথই একমাত্র সত্য। এক রকম আচার যে সকলকে মানতেই হবে, সে রকম কোনো জবরদস্তি নেই। ধর্ম্মের চরম আদর্শ এক হলেও, যার যেমন প্রকৃতি, যার যেমন জ্ঞান, তার তেমনি পথ চলবার অধিকার হিন্দুরা

বরাবরই স্বীকার করে' এসেছে। আমার পথ তুমি ধরছ না বলে' তুমি যে ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হবে, একথা হিন্দু কখনও বলেনি। তোমার আমার গন্তব্যস্থান এক হতে পারে, কিন্তু তাই বলে' তোমার আর আমার চলনের ভঙ্গী ঠিক যে একই রকম হতে হবে, এর কোনো মানে নেই।

এই অধিকারভেদটুকু স্বীকার করা হয়েছে বলেই, মতামতের গোঁড়ামিকে হিন্দু কখনও আমল দেয়নি। সব হিন্দুরই জীবনের আদর্শ হচ্ছে মুক্তি; কিন্তু কে কি পথ ধরে' সেই মুক্তির দিকে চলবে, সে বিচার নিয়ে হিন্দুরা লাঠালাঠি করেনি। যার যেমন প্রকৃতি, যার যেমন সামর্থ্য তার তেমনি অধিকার, তার তেমনি পথ।

রাজনীতির সাধনায় সেই অধিকারভেদটুকু মেনে নিলে অনেক গোলমাল চুকে যায়। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনায় এই অধিকারভেদ একেবারে গোড়ার কথা। যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে' তুলতে চান, তাঁদেব এই অধিকারভেদ স্বীকার করতেই হবে।

আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ যেমন মুক্তি, রাজনৈতিক সাধনার আদর্শ তেমনি স্বরাজ। যারা সেই স্বরাজেব আদর্শ মানে না, তারা ভারতে জন্মালেও ভারত তাদের নিজের দেশ নয়। রাজনৈতিক সাধনার মধ্যে তাদের কথা না ধরলেও চলে। কিন্তু স্বরাজ যাদের আদর্শ, তারা যে সবাই এক রাস্তা ধরে' চলবে, সেটা আশা করাই ভুল। প্রকৃতি আর বুদ্ধি অনুসারে লোক ভিন্ন পথ ধরে' চলবেই।

আমাদের মনে হয় যে, এই স্বরাজের আদর্শ স্বীকার করা ছাড়া কংগ্রেসেব আর কোনা creed থাকা উচিত নয়; কর্ম্মপন্থা নিয়ে মতভেদ আছে বলে' লোকে যে কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে না, এটা দেশের লোকের উপর অত্যাচার। যে স্বরাজের আদর্শ স্বীকার করে, সেই কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে, এই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কর্ম্মপন্থা নিয়ে মতভেদ চিরদিনই থাকবে—কেননা বুদ্ধিও সকলের এক রকম নয়। এত বড় একটা দেশে সব রকম কর্ম্মপ্রণালীরই স্থান আছে। তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে' কোনো লাভ নেই।

সেদিন চট্টগ্রামের প্রাদেশিক বৈঠকে সভানেত্রী বলেছিলেন যে, হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় ঢোকবার দরকার হতে পারে। একজন মস্তবড় নেতা অমনি রায় দিলেন যে, ঐ কথাটি বলায় বাঙ্গলা দেশের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেল। কেন বাপু? রাজনৈতিক বুদ্ধিটা কি তোমাদেরই একচেটে সম্পত্তি? না, যাঁরা কাউন্সিলে যাবার কথা তুলিয়াছিলেন, তাঁরা ত্যাগে, চরিত্রবলে, স্বদেশ-প্রেমে তোমাদের চেয়ে কিছু কম? কেউ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে, কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করে' তিনি স্বরাজের রাস্তা পরিষ্কার করতে পারবেন, ত পাঁচজন মিলে তাঁর মুখ টিপে ধরলেই কি খুব বাহাদুরী হবে?

সত্যকথা বলতে গেলে স্বীকার করতেই হবে, অহিংস অসহযোগের ফলে ভারত স্বরাজ পাবে কি না, এ বিষয়ে অসহযোগীদের মধ্যেও সন্দেহ এসেছে। তাই মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে ও বংলায় কাজের পন্থা বদলাবার কথা উঠছে। একদল বলেন, গবর্ণমেণ্টের ভালমন্দ সব প্রস্তাবেই বাধা দিয়ে গবর্ণমেণ্টকে অতিষ্ঠ করে' তোল; আর-একদল বলেন তা নয়; শুধু দেশের অহিতকর প্রস্তাবগুলোকেই বাধা দাও। আগামী কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এইসব মতবাদেব আলোচনা হবে।

আমাদের মনে হয় না যে, কাউন্সিলে গেলে বিশেষ কিছু লাভ হবে। তবে এখন যাঁরা দেশের প্রতিনিধি সেজে লোক হাসাচ্ছেন, তাঁদের পথ যে বন্ধ হবে, এটাও একটা মন্দ কথা নয়। আর তা ছাড়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় দেশের মধ্যে স্বরাজের অদর্শ প্রচার করবার যে একটা যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাবে—সেইটুকুই লাভ।

দেশের আসল কাজ কাউন্সিলে নয়, দেশের জনসাধারণের মধ্যে। অহিংস অসযোগীরা দেশের মধ্যে যে প্রবল ভাবের বন্যা এনেছেন, তাতে তাঁদের কৃতিত্ব অক্ষয় হয়েই থাকবে; দেশকে সংঘবদ্ধ করবার জন্যে তাঁরা যত ' পরিশ্রম করেছেন, এত আর কেউ করেনি। কিন্তু তবুও মনে হয় যে, তাঁদের শিক্ষা দেশ ষোল আনা মেনে নিতে পারবে না। মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন তার আত্মরক্ষার জন্যে বৈধ হিংসার প্রয়োজনও থাকবে। তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা

চিরদিনই ব্যর্থ হবে।. অহিংস অসহযোগীরা নিজেদের অধিকার লঙ্ঘন করেছিলেন বলেই বাংলা দেশের ছেলেরা আর তাঁদের কথায় তেমন সাড়া দিতে চাচ্ছে না। দোষ ছেলেদের নয়।

আমাদের শেষ কথা এই যে, এত বড় দেশে সব রকম অধিকারীই আছে; সব রকম লোকেরই কাজ করবার জায়গা আছে। সকলকে এক জালে বাঁধবার চেষ্টা কোরো না—জাল ছিঁড়ে যাবে। তুমি তোমার রাস্তা ধরে' চল; আমি আমার রাস্তা ধরে' চলি। কেউ বক্তৃতা দাও, কেউ গান শোনাও, কেউ চরকা কাট, কেউবা অন্যকিছু করো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকলকেই এই পূজায় যোগ দিতে হবে। ক্ষত্রিয়কে বাদ দিয়ে সুধু ব্রাহ্মণে বা সুধু বৈশ্যে এ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারবে না। নিজের নিজের রাস্তা ধরে' সকলে চল। পথের শেষে গিয়ে সবাই একসঙ্গে মিলবই মিলব।

ভাবের ঘরে চুরি

সেদিন একখানা খাঁটি অসহযোগী ইংরেজি কাগজে পড়ছিলুম—আমরা দেশসুদ্ধ লোক যদি বিশুদ্ধ খদ্দর পরি, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়ে সনাতন সভ্যতা বজায় রাখি, আর বিদ্বেষ, ঘৃণা ভুলে গিয়ে দেশের লোককে কোলে টেনে নিই, তা'হলেই স্বরাজ হয়ে গেল—ব্যস্, আবার কি চাই?

খরগোসকে কুকুরে তাড়া করলে সেটা যেমন ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে শেষে একটা ছোটখাট গর্ত্তে মুখ লুকিয়ে ফেলে, কিম্বা চোখ বুজে বসে' থাকে আর ভাবে যে, কুকুর তাকে দেখতে পাচ্ছে না —আমাদেরও তেমনি দশা হয়েছে। বেগতিক দেখলেই আমরা চোখ বুজে মনকে বোঝাতে চাই যে, সস্তা দরে কাজ সেরে দেব। এ কথা ভুলে যাই যে খদ্দর পরে কোলাকুলি করে' জাতীয় বিদ্যালয়ে গেলেও আবার জালিয়ান-ওয়ালাবাগ্ ঘটতে পারে। ঘরের ভিতর চোর ঢুকিয়ে চৌমাথার মোড়ে গিয়ে পাহারা দিলে কি হবে?

সেকালে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় একদল লোক স্বদেশী-আন্দোলনটাকে প্রধানতঃ নুণ, চিনি আর কাপড়ের বস্তার মধ্যে পুরে' রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভাবতেন ঐটুকুর জোরেই স্বরাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু তা হয়নি; নুণ-চিনি-কাপড়ের বস্তা ফুঁড়ে স্বরাজ-আন্দোলনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখা দিয়েছিল।

বারদোলির অনুশাসনের পর থেকে স্বরাজ-আন্দোলনটা ক্রমে স্বদেশী-আন্দোলন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'চুপ চাপ করে' চরকা কাট, খদ্দর পর, মদবিক্রী বন্ধ কর, ছুঁৎ-মার্গ ত্যাগ কর, তা'হলেই সব দুঃখ ঘুচে' যাবে।' এতে যে দেশের খানিকটা আর্থিক আর নৈতিক উন্নতি হবে, তাতে কোনো ভুল নেই; কিন্তু বুকের উপর যে জগদ্দল পাথর চাপান রয়েছে, তার ব্যবস্থা কি করবে? ল্যাঙ্কাশায়ারের পেটে খুব জোরে এক ঘা দিতে পারলে কর্ত্তারা খানিকটা খোঁচাখুঁচি করে' শেষে হয়ত একটু রফা করতে পারেন; কিন্তু সে রফায় ত আমাদের পেট ভরবে না। আমরা ত তা চাই না; আমরা যে একেবারে ষোল আনা স্বাধীনতা চাই। তার আয়োজন ত কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

জানি, এসব কথা শুনলে তোমাদের রাগ হয়; কিন্তু সত্যি সত্যি একবার মনটাকে খুঁজে দেখ দেখি, ভাবের ঘরে কোথাও লুকোচুরি আছে কি না। দেশের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর, স্বাস্থ্যের উন্নতি কর, শিক্ষার ব্যবস্থা কর—এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু এগুলো আগে সেরে নিয়ে তারপর 'রণং দেহি' বলে' তাল ঠুকে দাঁড়াবে, এ ব্যবস্থার মানে কি? যে সমস্ত স্বাধীন দেশে রাজশক্তি প্রজাদের সহায়, সেখানকার লোকেও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে; আর আমাদের এই পরাধীন দেশে যেখানে অর্থবলের একান্ত অভাব, যেখানে রাজশক্তি প্রজাদের প্রতিকূল, সেখানে তোমরা এসব কাজ সেরে নিয়ে তারপর যদি আইনভঙ্গ আরম্ভ করতে চাও, তা'হলে এ যাত্রায় আর তোমাদের আইনভঙ্গ আরম্ভ করা হবে না। অন্নবস্ত্রের চিন্তা, শিক্ষার ব্যবস্থা আর সমাজ-সংস্কার—এসব তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জিনিষ নয়; দেশ স্বাধীন হবার পরেও এ সমস্ত কাজে লেগে থাকতে হবে।

এ সমস্ত কাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ মুখ্য নয়, গৌণ। রাজনীতির সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ হচ্ছে আইনভঙ্গের। এই আইনভঙ্গটাকে স্থগিত রাখা হয়েছিল রক্তারক্তির ভয়ে। দেশকে শিক্ষা দিয়ে বা খদ্দর পরিয়ে একেবারে অহিংস করে' তুলতে পারা যাবে, একথা মনে করবার যে বিশেষ কারণ আছে, তা'ত দেখতে পাচ্ছিনে। সেদিন 'ইয়ং

ইণ্ডিয়া' কাগজে দেখেছিলাম, মহাত্মাজীর এক শিষ্য লিখছেন যে, এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে রাগ আর হিংসা ঢুকে' পড়েই সব মাটী করে' দিয়েছে। যতক্ষণ আমাদের মন থেকে রাগ-দ্বেষ না যাবে, ততক্ষণ আমাদের এই সব কষ্ট সহ্য করা বৃথা হয়ে যাবে। বিনা ক্রোধে কষ্ট সহ্য করতে পারলে যে আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্টি হবে, সেই শক্তির কাছে নাকি অত্যাচারীর শক্তি পরাভব মানবে।

সাধুরা যখন তুরীয় তত্ত্বের কথা বলেন, তখন অনেক অসহযোগীকে তাই শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে দেখেছি, কিন্তু অসহযোগীদের এই ক্রোধ-নিরশন ব্যাপারটা তার চেয়ে কম হাস্যকর বলে' ত মনে বোধ হয় না। দেশসুদ্ধ লোক আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করে' তারপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করবে—এটা যদি অসম্ভব ব্যাপার হয়, তা'হলে দেশসুদ্ধ লোক ক্রোধ জয় করে' তারপর স্বাধীনতার জন্যে অহিংস লড়াই করতে নামবে, এটাই বা অসম্ভব ব্যাপার হবে না কেন? অহিংসা পরমধর্ম্ম কি না জানিনে, কিন্তু সেই নীতি আশ্রয় করে' যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আনতে চান, তাঁদের রাজনীতির ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করাই ভাল।

অনেক গোঁড়া অসহযোগীর সঙ্গে কথা কয়েছি, কিন্তু অহিংসা নীতিটাকে সত্য সত্যই মানেন, এমন লোক খুব কমই দেখেছি। কিন্তু কাগজে লেখবার সময় যে-কথাটাতে তাঁদের বিশ্বাস নেই, সে কথাও খুব ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে তাঁরা ছাড়েন না। এটি ভাবের ঘরে চুরি নয় কি? সোজাসুজি বললেই ত হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র নেই তাই নিরস্ত্র লড়াই করতে যাচ্ছি, তার মধ্যে অত তত্ত্বকথা আমদানী করবার দরকার কি?

এ সমস্ত গোঁজামিল ছেঁটে ফেলে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া ভাল। অন্নবস্ত্র বা শিক্ষা বিষয়ে দেশের স্বাধীনতা যেমন দরকার, শাসন বিষয়েও ঠিক তেমনি দরকার; সুতরাং কংগ্রেসের তরফ থেকে সব কাজেরই আয়োজন হওয়া চাই। এক রকম কর্ম্মী সব কাজে হাত দিতে পারে না; তাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের কর্ম্মীকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ দেওয়া চাই। যাঁরা খদ্দর নিয়ে থাকতে চান, তাঁরা তাই নিয়ে থাকুন; যাঁরা শিক্ষা নিয়ে থাকতে চান, তাঁরা শিক্ষার ব্যবস্থা করুন; আর যাঁরা আইন ভঙ্গ অভ্যাস করে' দেশটাকে গরম রাখতে চান, তাঁরাও বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাতে থাকুন। এ বিরাট কর্ম্মে সবাইকারই দরকার; কাউকে ফেললে চলবে না। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেস থেকে কাজকর্ম্মের ভাগাভাগির এই রকম একটা ব্যবস্থা হলে অনেক বাজে গোলমাল চুকে যায়।

দোষ কার?

অনেক উকিল-ব্যারিষ্টার অসহযোগ আন্দোলনের ধুমধামের সময় আদালত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার তাঁদের মধ্যে দুচার জন আস্তে আস্তে আদালতে ফিরে যাচ্ছেন দেখে কংগ্রেস মহলে বেশ হৈ চৈ পড়ে' গেছে। আমাদের মনে হয়, এতটা হৈ চৈ নিরর্থক। বেচারারা ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজলাভের আশায় দলে ভিড়েছিলেন; এখন দেখছেন যে, স্বরাজ পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এদিকে দুপয়সা রোজগার না করলে কাচ্ছাবাচ্ছাগুলো খায় কি? কংগ্রেসের মাসহারার উপর নির্ভর করে' ত আর চিরদিন চলে না!

আমাদের অনেক দিনের একটা পুরাণো ঘটনা মনে পড়ে' গেল। একজন মহা বৈরাগ্যবান জটাজুটধারী পরম সাধুর সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, নির্ব্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘণ্টাকতক সদালাপ হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"বাবাজী, আপনার বাড়ীতে কে আছে? আপনার বৈরাগ্য জন্মাল কোথা থেকে?" সাধুজী বললেন—"বাড়ীতে জমিজমা আছে, দু বছর ধানচাল বেচে শ দু-তিন টাকা হাতেও পেয়েছিলুম; কিন্তু বিয়ে করতেই সে টাকা খরচ হয়ে গেল। মেয়েটিও বয়সে ছোট। তাই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল; সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়লুম—তা দেখি দু-চার বছর ঘুরে-ফিরে। ব্রহ্মলাভ হলো ত হলো; নয়ত ঘরবাড়ী ত আর কেউ মারেনি!"

আমাদের উকিল বাবুদেরও সেই অবস্থা। ৩১এ তারিখের মধ্যে স্বরাজ মিললো ত ভালো কথা, নয়ত আদালত ত আর কেউ মারেনি! এই রকম যাঁদের মনের ভাব, তাঁদের নিয়ে বেশী টানাটানি করে' কোনো লাভ নেই।

তা ছাড়া আরও একটা কথা। জনকতক উকিল দলে রইলো কি আদালতে ফিরে' গেল, তাতে এমন কি আসে যায়? দেশে যখন কর্ম্মীর অভাব

ছিল, তখন আদালত ভেঙে উকিল আর কলেজ ভেঙে ছেলে জোটাবার দরকার হয়েছিল। কিন্তু আজ আর ঠিক সেদিন নেই। কাজের মত কাজ দিতে পারলে কর্ম্মীর অভাব আজকাল আর হয় না।

দেশের মধ্যে যে কতকটা নিরুৎসাহের ভাব এসে পড়েছে, তার জন্যে কর্ম্মীরা যতটা দায়ী, কংগ্রেসের কর্ত্তারা তার চেয়ে ঢের বেশী দায়ী বলে' মনে হয়। কথাটা একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলা দরকার।

ধরুন, অসহযোগের গোড়াকার কার্য্যপ্রণালী। উপাধিওয়ালাদের উপাধি ছাড়তে হবে, উকিল-ব্যারিষ্টারদের আদালত ছাড়তে হবে, ছেলেদের কলেজ ছাড়তে হবে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভা ছাড়তে হবে। কিন্তু এই উপাধিওয়ালা উকিল, ব্যারিষ্টার, কলেজের ছেলে আর ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মিলে দেশে কতজন হয়? তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে লাখখানেক লোকের জন্যে ব্যবস্থা দেওয়া হলো। বাকি সবাই কি হাঁ করে' বসে' থাকবে? এঁরাই দেশের সর্ব্বস্ব, আর বাকি সবাই কেউ কিছু নয়? এঁরা কজনে মিলেই কি দেশ উদ্ধার করে' ফেলবেন?

একটা জিনিষ আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবে। দেশের চাষা-ভূষো কুলি-মজুরদের যদি আমরা নিজেদের দলে টেনে নিতে না পারি, তা'হলে কস্মিনকালেও কিছু করে' উঠতে পারবো না। খুব জোর খানিকটা হল্লাগুল্লা করে' আর-এক-কিস্তি রিফর্ম আদায় করতে পারি, কিন্তু তা থেকে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। সে স্বাধীনতা পেতে গেলে স্মুধু জনকতক ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে কাজ করলে চলবে না, দেশের কুলি-মজুর চাষা-ভূষোদেরও চাই।

এই চাষা-ভূষোদের মধ্যে দিনকতক বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেটা কমে' গেল কেন, তা কি ভেবে দেখেছ? আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরাজের জন্যে তাদের প্রাণ কেঁদে ওঠেনি। স্বরাজ মানে তারা স্মুধু এইটুকু বুঝত যে, তাদের খাজনা-ট্যাক্সের জ্বালা কমে' যাবে; জমিদার, পুলিসের হাত থেকে তারা বাঁচবে, আর পেট ভরে' খেতে পাবে। সেই আশাতেই তারা আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছিল। কিন্তু আমরা তাদের দুঃখটাকে নিজেদের করে' নিতে পারিনি।

বারদোলির অনুশাসনে কতকটা ওদিকে নজর দেওয়া হয়েছে; কিন্তু গৌণভাবে, মুখ্যভাবে নয়। খদ্দর নিজেদের হাতে তৈরী করে' নিতে পারলে চাষাদের দুঃখ কতকটা ঘুচবে, মদ খাওয়া ছাড়লে কুলি-মজুরদের অবস্থা একটু ভালো হবে; অনাচরণীয় জাতকে আচরণীয় করে' নিতে পারলে তাদের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। ঠিক কথা; কিন্তু স্মুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। চাষা-ভূষোদের আর কুলি-মজুরদের প্রাণের কথা যে কি, তা তারা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছে, কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিইনি। পাড়াগাঁয়ে গেলেই লোকে আগে জিজ্ঞেস করে—"বাবু, চৌকীদারী টেক্সটা উঠিয়ে দিতে পার? নুণের টেক্সটা উঠাতে পার?" কিন্তু তাদের সে কথাগুলো ধামাচাপা পড়ে' গেছে। সারা হিন্দুস্থান আর রাজপুতানা জুড়ে' গ্রামে গ্রামে কৃষাণ-সভার সৃষ্টি হলো; লোকেরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করলে। কিন্তু কংগ্রেস তাদের পরকালের দিক চেয়ে শান্তশিষ্টভাবে কষ্ট সহ্য করবার উপদেশ দিয়েই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করলেন। তাদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টাটা কংগ্রেসের কাজের অঙ্গীভূত হলো না। দেশের এক কোণ থেকে আরম্ভ করে' আর-এক কোণ পর্য্যন্ত কলের মজুরদের ধর্ম্মঘটে ছেয়ে গেল। কিন্তু তাদের জন্যে লড়াই করা কংগ্রেসের কাজ বলে' গণ্য হলো না। ফলে তালুক-দারদের হাতে আর সরকারী সেপাই বাহাদুরদের হাতে মার খেয়ে তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো।

আজ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শোনান বা উকিল-ব্যারিষ্টারদের পিছু পিছু তাড়া করে' যাওয়া কংগ্রেসের বড় কাজ নয়; বড় কাজ হচ্চে দেশের ঐ অসহায় চাষা-ভূষো আর কুলি-মজুরদের সংঘবদ্ধ করে' খাড়া করে' তোলা। ওদের যা-কিছু অভাব অভিযোগ তা দূর করবার চেষ্টা কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর অঙ্গ করে' নিতে হবে; ওদের দুঃখকে আমাদের দুঃখ করে' নিতে হবে; ওদের সঙ্গে সমানে খাটতে হবে, লড়তে হবে। জমিদার বা কলওয়ালাদের মুখের দিকে চেয়ে বা বাজে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে যদি সে কাজ থেকে হটে আসি, তা'হলে এরা সহজেই হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর কংগ্রেসের বিরাট আয়োজন শেষে জনকতক বাবুভায়ার কাঁদুনিতে পরিণত হবে।

কেন এমন হলো ?

যাঁরা পল্লীগ্রাম থেকে ঘুরে ফিরে আসছেন, তাঁরাই জিজ্ঞেস করছেন—কেন এমন হলো? লোকের আর তেমন উৎসাহ নেই, আশা নেই; সবাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। চরকাগুলো পড়ে' আছে, লোকে আর তেমন মন দিয়ে কাটে না; মন তাদের মুসড়ে গেছে।

পুলিশের ঠ্যাঙানি এর কতকটা কারণ, কিন্তু পুরো কারণ বলে' আমাদের মনে হয় না। দাউ দাউ করে' যদি আগুন জ্বলে' উঠতো, তা'হলে সে-আগুনকে কম্বল চাপা দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া যেত না, কম্বলেও আগুন লেগে যেত। আমাদের মনে হয় যে, দেশের জনসাধারণকে আমরা এখনও নিজেদের দলে টানতে পারিনি। আমাদের স্বরাজের আদর্শে তাদের মন ঠিক মেতে উঠছে না।

আমাদের এক বন্ধু স্বরাজের আদর্শ প্রচার করবার জন্য গ্রামে গ্রামে দিন কতক ঘুরে' বেড়িয়েছিলেন। একজন বুড়ো নমঃশূদ্র জাতের চাষাকে তিনি আধঘণ্টা ধরে' বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্বরাজ না পেলে আর দেশের কোনো গতি হবে না। বুড়ো বক্তৃতা শোনবার পর জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা ঠাকুর, তোমারা'ত স্বরাজ পাবে, কিন্তু আমাদের কি লাভ হবে? আমাদের সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত লাঙল কাঁধে করে' ঘুরতে হবে; আর খাজনা-টেক্স দিতে না পারলেই জমিদারের নায়েব-গোমস্তার হাতে ঠ্যাঙানি খেতে হবে। তার উপর দারোগাবাবুর নজর ত আছেই। তোমরা রাজ্য চালালেই আমাদের এ সব দুঃখ ত ঘুচবে না।" বন্ধু বললে—"না হে কর্ত্তা, তোমাদের এ সব দুঃখ আর থাকবে না।" বুড়ো উত্তর দিলে—"ঠাকুর, লক্ষণ ত কিছু দেখিনে। জমিদারও তোমরা, দারোগাও তোমরা; আমাদের জন্যে এ পর্য্যন্ত ত তোমাদের কখনো মাথা ঘামাতে দেখিনি। স্বরাজ পেলেই যে তোমরা বদলে যাবে, তার মানে কি?"

ভাববার কথা বটে। আমরাই জমিদার হয়ে রকম-বেরকমে তাদের চুষে খেয়েছি। আমরাই দারোগা হয়ে তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছি, আমরাই সমাজের মাতব্বর হয়ে ব্যবস্থা দিয়েছি যে, বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়ে তাদের স্পর্শ করলেও গঙ্গাজলে তিন শ তেত্রিশটা ডুব দিয়ে, তবে শুদ্ধ হতে হবে। আজ হঠাৎ তাদের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিক স্বরাজের মহিমা ঘোষণা করতে গেলে তারা আমাদের কথা শুনবে কেন?

এ যাবৎকাল কংগ্রেসের তরফ থেকে দশ-বিশ হাজার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, তার মধ্যে এই গরীবদের কথা বড় একটা নেই। তার কারণ শুধু এই যে, এতদিন যাঁরা কংগ্রেস চালিয়ে এসেছেন, তাঁরা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাঁরা নিজেদের সুখ-দুঃখের ভাবনাতেই মস্‌গুল। কোনোরকম করে, ইংরেজকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিতে পারলেই দেশের একটা গতি হয়ে যাবে, এই তাঁদের অন্তরের বিশ্বাস। কুলি মজুর চাষীদের দিকে চাইবার তাঁদের সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

জমিদারের কথা ছেড়েই দি, কেননা ইংরাজের আইনের গুণেই তাঁদের লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে, তাঁরা ইংরেজেরই হাতে-গড়া জীব। লাট কর্ণওয়ালীস জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে' গেলে আজ জমিদার বাবুদের বংশধরদের ট্রামগাড়ির কনডাক্টারি করে' খেতে হতো। এখনও পর্য্যন্ত অনেক জমিদার প্রজাদের লেখাপড়া শেখবার নাম শুনলে ভয় পান—পাছে প্রজারা একটু সেয়ানা হয়ে উঠলে তাদের জব্দ করবার সুবিধা না হয়।

জমিদার ছাড়া যাঁরা কংগ্রেস করে' দেশ উদ্ধার করতে গিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উকিল ব্যারিষ্টার আর জনতক বড় বড় ব্যবসাদার। অবাধবাণিজ্য হলে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, তাই তাঁরা বিদেশী-পণ্যের উপর মাশুল বসাতে চেয়েছিলেন। বিদেশী এসে এদেশের বড় বড় সরকারী চাকরী পাচ্ছে, তাই তাঁরা সমস্ত সরকারী চাকরীতে দেশের বড় বড় লোক ভর্ত্তি করতে চাইতেন। এ খুব ভাল কথা; কিন্তু তাঁরা দেশের স্বায়ত্ত-শাসন বলতে নিজেদের অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সুবিধার জন্যে যা-কিছু করা দরকার তা ছাড়া আর বড় বেশী কিছু বুঝতেন না।

দেশের যারা জনসাধারণ, যারা চাষ করে আর পেটে হাত দিয়ে শুকিয়ে মরে, তারা তখন কংগ্রেসের বড় একটা ধার ধারতো না। তারা দূর থেকে দেখতো যে, বাবুরা হাত-পা ছুঁড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর তাঁদের মুখে ফড়্ ফড়্ করে' ইংরেজীতে খই ফুটছে। তারা ভাবতো কংগ্রেসটা বাবুদের একটা আড্ডা দেবার জায়গা।

আজকাল হাওয়া বদলেছে। পেটের জ্বালায় দেশের চাষা-ভুষো কুলি-মজুর সবাই বুঝেছে যে, দেশের এ রকম অবস্থা থাকলে আর চলবে না; একটা কিছু ওলট-পালট না হয়ে গেলে আর এদেশ বাঁচবে না। তারা যখন স্বরাজের কথা শুনে আমাদের দলে এসে জুটেছিল, তখন ভেবেছিল যে, তাদের অন্নবস্ত্রের দুঃখটা ঘোচাবার ব্যবস্থা আগে করব।

তারা যে 'গান্ধী মহারাজের জয়' চীৎকার করেছিল, সেটা শুধু স্বরাজের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নয়; তার ভেতর পেটের জ্বালাও অনেকখানি ছিল। তারা ভেবেছিল আমরা তাদেব খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা একটু হাল্‌কা করে' দিতে পারবো, তাদের অত্যাচার অবিচারের হাত থেকে বাঁচাবো। যাঁরা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে মেশবার সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করে' দেখ, তাঁরা ঐ কথাই বলবেন। ঐ এক আশায় সাঁওতালেরা মদ ছেড়েছিল, কুলি-মজুরেরা জেলে ছুটেছিল, চাষা-ভুষোরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

আর আমরা কি করলুম? তারা যখন কাপড়ের অভাব জানালে তখন আমরা বললুম—তুলোব চাষ কর, চরকা কাট, খদ্দর পর। বেশ কথা, তারা তাই আরম্ভ করে' দিলে। তারপর যখন তারা জিজ্ঞেস করলে—'নায়েব মশায় আর দারোগা বাবুর হাত থেকে বাঁচাবার কি করলেন?' তখন আমরা বললুম—'ওসব কথা এখন বোলো না, এখন মন দিয়ে চরকা কাট।' শেষে যখন বললে—'বাবু, দারোগার জ্বালায় যে আর বাঁচিনে।' তখন আমরা গম্ভীর ভাবে বললুম—'পড়ে' পড়ে' মার খাও। আধ্যাত্মিক স্বরাজ পাবার ঐ রাস্তা।

তারা চুপ করে' রইলো বটে, কেননা ভদ্রলোকের মুখের উপর কথা কওয়ার অভ্যাসটা তাদের এখনো হযনি। কিন্তু বোধ হয় তারা মনে মনে ভেবেছিল—'ও রাস্তায় যদি স্বরাজ পাওয়া যায়, তা'হলে ত আমাদের অনেক দিক আগেই তা পাওয়া উচিত ছিল। চুপ করে' মার খাওয়া ত আমাদের চিরকেলে অভ্যেস। এটা শেখবার জন্তে এত ঢাক-ঢোল পেটাবার দরকার কি? যা নিয়ে আমরা জ্বলে মরছি, তাই যদি ঘোচাতে না পার ত ঐ রইল তোমার চরকা।'

তাই আজ মনে হয়, কংগ্রেসের কাজের ধারাটা একটু বদলাতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরাজকে তুরীয়লোক থেকে টেনে এনে আধিভৌতিক কাঠামোর উপর বসাতে হবে। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে নতুন নতুন পরীক্ষা করে' দুনিয়াটাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করবার দরকার হয়, তা কোরো—অনন্তকাল সুমুখে পড়ে' আছে। কিন্তু দোহাই তোমাদের—ঐ পরীক্ষাটা শুধু কুলি-মজুর বেচারীদের ঘাড়ের উপর দিয়ে কোরো না। তোমাদের পরীক্ষা শেষ হতে হতে তারা যে মরে' ভূত হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার রকমারি

সেদিন মির্জ্জাপুর পার্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাটা শুনে অনেকে নাকি ভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বলেছেন—'এ আবার কি? এ যে একেবারে নির্জলা ধর্ম্মতত্ত্ব। দেশবন্ধু যখন বলেছেন যে তিনি রাজনীতি চান না, অর্থনীতি চান না, তখন আমরা সবাই কি হাত-পা গুটিয়ে পড়ে' পড়ে' হাই তুলতে থাকব?'

যাঁরা একথা বলেছেন, তাঁরা দেশবন্ধুর কথার মর্ম্ম ঠিক বোঝেননি। তিনি এদেশে ইউরোপীয় রাজনীতি বা অর্থনীতি আমদানী করতে চান না। তিনি চান যে, এদেশ স্বধর্ম্মের উপর নির্ভর করে' নিজের ভাবে গড়ে' উঠুক। পরের কাছে ধারকরা আদর্শে এ দেশকে গড়তে গেলে জাতও যাবে পেটও ভরবে না।

এ দেশের আদর্শ যাকে বলছি, সেটা ফাঁকা কথা নয়, আধ্যাত্মিক ধোঁযা নয়, খুব খাঁটি জিনিষ। ধর্ম্ম কথাটা কতকগুলো ধোঁয়াটে রকমের উপধর্ম্মের ঠেলায় শুধু ভাববিলাসিতা হযে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আসলে ধর্ম্ম জিনিষটা মোটেই তা নয়। প্রত্যেকের যা স্বভাব, সেইটাই তার স্বধর্ম্ম; আর সেই অনুসারে তাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত কাজ।

আমরা মুখে বলি স্বরাজ চাই; কিন্তু স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভারি অস্পষ্ট। ইউরোপের দেশগুলোর উপর অপর কোন জাত কর্ত্তৃত্ব করে না, তাই আমরা তাদের বলি স্বাধীন। কিন্তু একটু খোঁজ করলেই বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে, সে-স্বাধীনতা কাগজে-কলমে যতখানি, কাজের বেলায় ততখানি নয়। দেশের যারা চালাক লোক বা টাকাওয়ালা লোক, তারাই শাসন-যন্ত্রটাকে নিজেদের সুবিধা মত চালাচ্ছে; সাধারণ লোকের বড় বিশেষ

কোনো ক্ষমতা নেই। যারা বড় বড় সওদাগর তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্যে রকম-বেরকমের ওস্তাদী চাল চালা হচ্ছে; জাল, জুয়াচুরি, লাঠিবাজি সবই বেমালুম চলে' যাচ্ছে। কিন্তু ভুগছে কে? মরছে কে? দেশের গরীব লোকগুলো। ও-সব দেশে বিদেশী রাজা নেই বটে, কিন্তু স্বদেশী মোড়লদের জ্বালাতেই তারা অস্থির। দেশসুদ্ধ লোক যেখানে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে' পার্লামেণ্ট গড়েছে, সেখানেও দেশের লোকে পার্লামেণ্ট-সভ্যদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট যে কি চাল চালেন, তা পার্লামেণ্টের সভ্যরাও অনেক সময় জানতে পারেন না। সকলকেই এক একটা ভোট দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সমান ভোটের ফলে আর্থিক বা রাজনৈতিক অবস্থা কারও সমান হয়ে দাঁড়ায়নি। স্বাধীনতার ফলে সাম্য আসেনি, মৈত্রীও আসেনি।

ইউরোপে বড় বড় কল-কারখানা বসেছে। কোটি কোটি টাকার জিনিষ রোজ রোজ তৈরী হচ্ছে। মারামারি কাটাকাটি করে' দেশ-বিদেশে সে-সব জিনিষ বিক্রীর ব্যবস্থা হচ্ছে। দেশে ধামা ধামা টাকা আসছে। কিন্তু সে সব টাকা যাচ্ছে কাদের ঘরে? যারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খেটে খেটে আধমরা হয়ে যাচ্ছে, তারা সে টাকার সিকির সিকিও পাচ্ছে না। দেশের স্বাধীনতা অর্থ-বৈষম্য বা সামাজিক-বৈষম্য ঘোচাতে পারেনি।

তাই দেশবন্ধু বলেছেন যে, আমরা এমন স্বাধীনতা চাই, যা সুধু বিদেশীর হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবে না, স্বদেশীর হাত থেকেও উদ্ধার করবে। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রত্যেক লোককে মানসিক, আর্থিক, রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন করতে চাই। ইউরোপের লোকেরা আজ স্বাধীনতার নামে কল-কারখানার দাস হয়ে পড়েছে, পার্লামেণ্টের দাস হয়ে পড়েছে। আমরা কিন্তু এমন স্বাধীনতা চাই যা প্রত্যেক মানুষকে ষোল আনা মানুষ হবার অবসর দেবে; তাকে দাবিয়ে ছোট করে' রাখবে না; সম্প্রদায়ের নামে বা দেশের নামে বা সমাজের নামে তার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করবে না। যে সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে না, আর তাকে স্বধর্ম্ম ফুটিয়ে তোলবার অবসর দেয়, আমরা সেই রকম স্বাধীনতা চাই। স্বাধীন হওয়া আর স্বধর্ম্ম পালন করা একই কথা।

ইউরোপের যা আদর্শ, ইউরোপে সেই রকম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়ে' তুলেছে। সে-সবের ভিতর দিয়ে তার নিজের ভাব নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু আমাদের আদর্শ যখন ভিন্ন, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন ভিন্ন, তখন ইউরোপের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ আমাদের দেশে খাড়া করে' তুললে তা দিয়ে আমাদের আদর্শ ফুটে উঠবে না। আমাদের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজেদের ভাবের উপযোগী হওয়া চাই।

তোমরা হয়ত বলবে, আগে দেশটা ত স্বাধীন হোক্, তারপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা ভাবা যাবে। কথাটা শুনতে বেশ, কিন্তু ওটা ফাঁকা কথা। আমরা ভদ্রলোকের দল আমাদের সমাজের ঘাড়ে এমনি জোরসে চেপে বসে' আছি যে, সমাজ প্রায় নিস্পন্দ হয়ে পড়েছে। এখন যদি কোনো গতিকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা পাই, তা'হলে স্বেচ্ছায় সে নিজেদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দেশের কুলি-মজুর চাষা-ভুষোদের দুঃখ দূর করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগবো, তা মনে করবার ত কারণ দেখি না। আমরাই না জমিদার? আমরাই না পুলিশের দারোগা? শেষে হয়ত একদিন ঐ চাষা-ভুষোদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

আর তা ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন সামর্থ্য নেই যে, জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া দেশকে স্বাধীন করে। আমরা যদি আজ স্বাধীন হতে চাই ত সকলকে আমাদের সমান স্বাধীনতা দিতে হবে। সকলে যদি স্বাধীনতার আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে না ওঠে, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা না করি, তা'হলে দেশের পরাধীনতা ঘুচবে না।

দেশবন্ধু সেই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের দিকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন,—"আমি ইউরোপীয় রাজনীতি চাই না, ইউরোপীয় অর্থনীতি চাই না।" তিনি কোনো দলের নন্, তিনি সারা দেশের। আর এই দেশ কোনো সম্প্রদায়বিশেষের নয়, শ্রেণীবিশেষের নয়, শাসনকর্ত্তাবিশেষের নয়, এ দেশ ভগবানের।

তিনি এই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে, সেই দেশই যথার্থ স্বাধীন, যে দেশে সবাই রাজা, সবাই ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ।

চাই নূতন দল

অসহযোগ আন্দোলন চুপচাপ হয়ে গেছে। বুড়োরা যা ভাবেন তা মুখ ফুটে বলেন না; বড় বড় কথা দিয়ে আসল কথাকে চাপা দেন। ছেলেদের মনে ক্রমশঃ অন্য আশা অন্য আদর্শ জাগছে।

খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করা যায় কি না, এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করবার জন্যে যাঁরা দেশময় ঘুরে' বেড়ালেন, তাঁরা কি যে স্থির করেছেন তা তাঁরাই জানেন অথবা তাঁরাও ঠিক জানেন না। কোনো রকমে ও-ব্যাপারটা কিছু দিনের জন্যে চাপা দিয়ে রাখাই যেন তাঁদের মনের কথা বলে' বোধ হয়। মোট কথা, এর পরে যে কি করলে ভালো হয়, তা তাঁরাও ঠিক করতে পারছেন না। অথচ সে-কথা স্পষ্ট করে' বললে বিস্তে ফাঁক হয়ে যায়। তাই তা-না-না-না করে' কোনো রকমে গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। কর্ত্তাদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন—'ওহে বাপু, গান্ধী মহারাজ যা হুকুম দিয়ে গেছেন, তাই মক্স কর।' অর্থাৎ চরকা চালাও আর বোঝ-আর-না বোঝ, অন্ততঃ মুখে বল যে, আমরা ঘোরতর আধ্যাত্মিক আর অহিংস।

মজার কথা এই, কামাল পাশা যখন গ্রীক বাহাদুরদের ধরে' আচ্ছা করে' ঠুকে দিলেন, তখন মহা মহা অহিংস পুরুষেরা এক গাল হেসে ফেললেন। যাঁরা অহিংস ধর্ম্ম প্রচার করে' জগতে সত্যযুগ আনবার খেয়ালে বুঁদ হয়েছিলেন, তাঁরাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন,—"বাঃ কি ঠ্যাঙানিটাই দিয়েছে!" কেউ বললেন—"কামালকে উড়ো জাহাজ বকসিস দাও।" কেউ বললেন—"একখানা তলোয়ার পাঠিয়ে দাও।" ভারতবর্ষ থেকে আঙোরায় লোক পাঠিয়ে কামালের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবার কথাও উঠেছে। এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজ অহিংস অসহযোগীদের কাগজ। তাতেও লোককে যুদ্ধে পাঠাবার কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

এর সঙ্গে আমাদের যে গভীর সহানুভূতি আছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অহিংসা প্রচার আর যুদ্ধে যাওয়া এক সঙ্গে কি করে' চলে, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অহিংসাটা কি সুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই ভাল, আর অন্য সব দেশের পক্ষে খারাপ? এ গোঁজামিল কেন? এ ভণ্ডামি কেন? সোজা কথা বলার সাহস না থাকে, চুপ করে থাকলেই ত হয়।

এক দলের ত এই অবস্থা। আর এক দল, যাঁরা ঝোঁকের মাথায় আদালত ছেড়ে, কাউন্সিল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা আবার লোলুপ দৃষ্টিতে ঐ দিকে চাইতে আরম্ভ করেছেন। খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে একটা পাকাপাকি করে' তোলবার জন্যে যে সাহস, ত্যাগ আর কর্ম্মকুশলতা দরকার, তা তাঁদের নেই; অথচ চরকা হাতে করে' বসে' থাকাও পোষায় না। কাউন্সিলে গিয়ে বেশ ভালো করে' ইংরেজীতে গালাগাল দিতে পারলে তবু গায়ের ঝাল একটুখানি মরে। দেখে-শুনে যতদূর মনে হয় যে, এই কাউন্সিলে গিয়ে ঝগড়াকরার দল গয়ার কংগ্রেসে বেশ প্রবল হবে। মহারাষ্ট্রে, বাংলায়, মান্দ্রাজে এ দলের লোকসংখ্যা যথেষ্ট। তাঁরা সবাই মিলে আদি ও অকৃত্রিম অসহযোগীদের হারিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এঁদের অধিকাংশই উকিল, ব্যারিষ্টার আর পয়সাওয়ালা লোক। গোলমালের মধ্যে এঁরা যাবেন না। কাউন্সিলে চেঁচামেচি করে' বেড়ালের ভাগ্যে সিকে যদি ছেঁড়ে, অর্থাৎ ইংরেজ বাহাদুর আর-এক-কিস্তি রিফর্ম ঝেড়ে দেন, তা'হলেই এঁরা মডারেটদের মত সুশীল ও সুবোধ বালক হয়ে যাবেন। যে-সব লোক সত্যি সত্যিই ষোল আনা স্বাধীনতা চান, তাঁরা এ দল থেকে ক্রমশই বাতিল হয়ে পড়বেন।

সুখের কথা, দেশে আর-একটা দল গড়ে' উঠেছে —সেটা শ্রমিকের দল; কুলি-মজুর চাষা-ভূষোর দল। আজ তারা নিরন্ন, অসহায়, অজ্ঞান; কিন্তু তাদেরও চোখ খুলছে, তাদের মুখেও বুলি ফুটছে, তারাও শত্রু-মিত্র চিনছে, তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ স্বাধীনতার সংগ্রামে সবাই হয়ত নিজের নিজের পুঁটুলি বাগাবার চেষ্টা করবে। যাঁর জমিদারী আছে, তিনি প্রজাদের উপর মোড়লী করবার অধিকার পেলেই হয়ত ভুলে যাবেন; যাঁর কল-কারখানা আছে, তিনি Fiscal autonomy পেলেই খুসী হবেন; যাঁর ঘরে পাসকরা ছেলে আছে, তিনি Indianisation of Services, বড় বড় চাকরী পেলেই দল থেকে সরে' পড়বেন। কিন্তু এই কুলি মজুর চাষার দলের পুঁটুলি নেই। লড়বার মত একটা আদর্শ আর একজোট হয়ে কাজ করবার শক্তি যদি এরা পায়, তা'হলে এরা অসাধ্য সাধন করবে; এরাই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকবে।

যাঁরা সত্যি সত্যিই দেশের স্বাধীনতা চান, তাঁদের কাজ বড় বড় পাণ্ডাদের দিকে চেয়ে থাকা

নয়, কাউন্সিলে বক্তৃতা শুনে হাততালি দেওয়া নয়; সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির মীমাংসার জন্যে হাঁ করে' বসে' থাকাও নয়; তাঁদের কাজ এই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে' তোলা। তাদের পরিশ্রমের উপর সবাকারই অন্ন, বস্ত্র, আরাম নির্ভর করছে—এই কথা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া; আর তারা যাতে এই অন্ন, বস্ত্র আর আরামের যথেষ্ট ভাগ পায়, তার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আপনিই এসে পড়বে। কেননা, তখন একদিকে দাঁড়াবে বিদেশী আর স্বদেশী মোড়লের দল, আর অপরদিকে দাঁড়াবে নিঃসম্বল বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিকের দল। এই শেষের দল গড়ে তোলার উপরই দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করছে।

পার ত, এস

যাদের কাজকর্ম্ম বিশেষ-কিছু নেই, তারা বসে' বসে' খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে। আমাদের খবরের কাগজওয়ালাদের হয়েছে তাই। এতদিন যা হবার তা'ত হলো; কিন্তু এর পরে যে কি করতে হবে, সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা কারোর নেই। কেউ বলছেন—"কিছু করতে হবে না, কর্ত্তা যে রাস্তা বাৎলে দিয়ে গেলেন, সেইখানে চুপটি করে' বসে' থাকো; দেখবে স্বরাজের রথ এসে একেবারে গড় গড় করে' দেশকে স্বর্গে তুলে' নিয়ে যাবে। সুধু চাই একান্ত শ্রদ্ধা; আর চুপ করে, থাকবার অসীম ধৈর্য্য।" আর-একদল বলছেন—"ভাল রে ভাল! তোমরা যা করছ তা করো না। কিন্তু কতকগুলো গবারাম যে দেশের প্রতিনিধি সেজে কাউন্সিলে গিয়ে লোক হাসাচ্ছে, এটা ত আর সহ্য করা যায় না। কাউন্সিলে ঢুকে আর-কিছু করতে না পারা যায়, হৈ চৈ করে' ওটা ভেঙ্গে ত দেওয়া যায়—তাই বা কোন্ কম লাভ?" প্রথম দল বলছেন—"এখন ভেঙ্গে দেবার নাম করে' ঢুকতে যাচ্ছ, কিন্তু ওখানে গেলেই তোমাদের জাত যাবে; হাতে একটু ক্ষমতা পেলেই সবাই নিজের কোলে ঝোল টানতে আরম্ভ করবে; আর কর্ত্তারা আর-এক-কিস্তি রিফর্ম্ম দিলেই সবাই মডারেটদের মত পান্তাভাত হয়ে যাবে।"

সারা দেশময় খবরের কাগজে ঐ এক সুর উঠেছে—"কাউন্সিলে যাবো না।" আমরা বলি—"বাপু সকল, যাবে কি যাবে না—মিছে এ ভাবনা, বৃথা মর লোকলাজে।—তোমরা যাবেই।"

এ ঝগড়া আজকের নয়, বহুদিনের। মহাত্মা গান্ধী যতদিন বাইরে ছিলেন, দেশে যখন নিত্য-নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন মহাত্মার প্রভাবে এ-কথাটা চাপা পড়েছিল মাত্র। যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মতের লোককে তিনি এক জায়গায় আটকে রেখেছিলেন, আজ তাঁর অভাবে তারা যে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছুটকে পড়বে, এ ত জানা কথা! বেশ লক্ষ্য করে' দেখবার জিনিষ যে, যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে ভারত-উদ্ধার করতে চান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উকিল, ব্যারিষ্টার, না-হয় পয়সাওয়ালা লোক। মুখে তাঁরা যাই বলুন না কেন, ইংরেজের বদলে তাঁরা যদি দেশকে শাসন করবার ক্ষমতা পান, তা'হলে তাঁরা (Dominion Self Government) উপনিবেশের মত স্বায়ত্ত-শাসন বা ঐ রকমের একটা-কিছু নিয়েই তুষ্ট হয়ে থাকবেন। দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে গেলে যত কাঠ-খড় পোড়াবার দরকার তা ভাবলেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন। সুতরাং ইংরেজের সঙ্গে তাঁদের আপাততঃ যে বিরোধ, সেটা প্রণয়ের বিরোধ। দুদিন পরেই মিলন হয়ে যাবে। আজ না-হয় কাল, তাঁরা দড়ি ছিঁড়ে পালাবেন।

যাঁরা খাঁটি অসহযোগী, তাঁরা প্রধানতঃ গরীব আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সুধু তত্ত্বকথা আর চরকা আশ্রয় করে' তাঁরা যদি এখনকার মত বসে' থাকতে চান, তা'হলে তাঁদের লোপ পেয়ে যাওয়া অনিবার্য্য। জনসাধারণের ক্রুদ্ধ নয়ন দেখে তাঁরা যদি সুধু মালা জপবার ব্যবস্থা দেন, তা'হলে একুল-ওকুল দুকুল নষ্ট হবে। এইটুকু তাঁদের আজ বেশ করে' বোঝা দরকার যে, দেশকে স্বাধীন করতে গেলে যে-শক্তির প্রয়োজন তা তাঁদের আপাততঃ নেই, আর সুধু বচনের দ্বারা সে-শক্তি সংগ্রহ করা যায় না। দেশের জনসাধারণ তাঁদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল, কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল, কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির দোষে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজের নিজের খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত, দেশের লোকের মনের ভাব বোঝবার তাঁদের সময় হয়নি।

কিন্তু আজ অসযোগ আন্দোলনকে যদি যথার্থ-ই স্বাধীনতার আন্দোলন করে' তুলতে হয়, তা'হলে আর কুলি-মজুর চাষা-ভুষোকে বাদ দিলে চলবে না। যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করতে চান,

তাঁরা যান; যতদিন তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেন, তা থাকুন। তাঁদের উপর বেশী ভরসা করলে চলবে না। আসল কাজ কাউন্সিলের বাইরে; কুলি-মজুর চাষা-ভুষোর মধ্যে।

তাদের বোঝাতে হবে যে, তারাই দেশের প্রাণ; তাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, সংঘবদ্ধ হলে তারা সব করতে পারে। তারা যে সমস্ত দিন খেটে অনাহারে মরবে, এটা বিধির বিধান নয়; এটা একেবারেই মানুষের বিধান। আর তারা সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করলেই এ বিধান উল্টে দিতে পারে। তাদের মধ্যে আশা গজিয়ে দিতে হবে; তাদের শক্তির আস্বাদ দিতে হবে। তাদের মাথার উপর যে যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীকৃত অত্যাচার চেপে রয়েছে, অসহযোগীদের কাজ সেইটে সরিয়ে দেওয়া। ভদ্রতার মোহ ভুলে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারবে? তাদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারবে? ভারতকে স্বাধীন করবার ঐ একমাত্র রাস্তা। কাউন্সিল-ফাউন্সিল ও-সব বাজে কথা।

আমাদের কাঁঠাল, তোমাদের মাথা

কাউন্সিলে যাওয়া-না-যাওয়া ব্যাপারটাকে এত বড় করে' দেখা হচ্চে যে, গোড়ার কথাটা চাপা পড়ে' যাবার যোগাড় হয়েছে। প্যাটেল প্রভৃতি যাঁরা কাউন্সিলে যাবার পক্ষপাতী, তাঁরা বলছেন যে, কাউন্সিলে যদি এখন ঢুকে ওটার দফারফা না করা যায়, তা'হলে ওটা ক্রমে এত প্রবল হয়ে উঠবে যে, দেশের লোকের মন ঐদিকে যাবে। দেশকে স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে চরকা ছাড়া যদি আর-কিছুর ব্যবস্থা না করা হয়, তা'হলে ক্রমশঃ কাউন্সিল যে প্রবল হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। লোকে মুখে যতই হুঁ দিক, মনে মনে ঠিক বোঝে যে, সুধু চরকা কেটে খদ্দর হতে পারে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। অথচ কাউন্সিলে গিয়েও যে বিশেষ একটা হাতী-ঘোড়া লাভ হবে, সে আশাও তাদের নেই। কাউন্সিলে গিয়ে কাউন্সিল ভাঙ্গা যেতে পারে কি না, সেটাও সন্দেহের বিষয়। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে কাউন্সিল ভেঙ্গে গেল—তারপর করবে কি? কাউন্সিল ভেঙ্গে দেবার 'পরই যে সরকার বাহাদুর জোড়-হস্ত হয়ে বলবে—'বাপু, তোমাদের দেশ তোমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি'—তার কোনো আশা নেই। সেদিন দেশের একজন নামজাদা নেতা আমাদের বোঝাচ্ছিলেন যে, দেশ-বিদেশে দেশকাল যে-রকম পড়েছে, তাতে প্রজার মতের বিরুদ্ধে কর্ত্তারা আর রাজ্য চালাতে সাহস করবেন না। আমাদের নেতাদের মনের কোণে যে কর্ত্তাদের উপর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা এখনও গজ্‌গজ্‌ করছে, তা বেশ বুঝতে পারলুম। কিন্তু ইংরেজ অত কাঁচা ছেলে নয়। ফাঁকা আওয়াজে সে ভয় পায় না। আর দেশ-বিদেশের লোক আমাদের দুঃখের কথা বেশ জানতে পারলেই যে তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে, তা মনে করবার কোনো কারণ ত দেখিনে। আয়র্লণ্ডের দুঃখের কথা ত সবাই জানে। কে তার জন্যে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ছুটে এসেছে? মিশরের কথা জানতে ত কারো বাকি নেই। তার জন্যে কে মাথা ঘামাচ্ছে? পরের সাহায্যের আশায় যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে ফাঁকা তোপ দাগতে থাকবেন, ভবিষ্যতে তাঁদের হয় মডারেটদের দলে ভিড়ে যেতে হবে, নয়ত চুপ করে' পড়ে' থাকতে হবে।

যাঁরা কাউন্সিলে যাবার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ করছেন, তাঁরাও ত আসল কাজের দিকে মন দিচ্ছেন না। তাঁদের কথা শুনলে মনে হয় যেন কাউন্সিলে যাওয়াটা বন্ধ করতে পারলেই দেশের যা-হোক একটা সদ্গতি হয়ে যাবে। কিন্তু এতদিন তাঁরা থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় করে' কাটালেন কেন? তাঁরা যদি দেশের লোককে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের জন্যে প্রস্তুত করতে চান, তা'হলে তার আয়োজন কি করেছেন? তাঁরা বলছেন—"দেশের লোককে ত এত করে' খদ্দর বুনতে বলছি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের জন্যে এত সদুপদেশ শোনাচ্ছি—আবার কি করবো। দেশের লোক যদি আমাদের কথা না শোনে ত আমাদের দোষ কি?"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স করবার এটাই প্রকৃষ্ট রাস্তা, এ কথাটা মেনে নেবার আগে একটু ভেবেছ কি? দেশের লোক যে তোমাদের কথা শুনছে না, এটা কি সত্যিই দেশের লোকের দোষ? তোমরা যখন চৌকিদারী ট্যাক্স, নুণের ট্যাক্স বন্ধ করে' দেবার কথা বলেছিলে, তখন ত দেশের লোক তোমাদের কথা বেশ শুনেছিল। তারপর তোমরা যেদিন চৌরিচৌরার দৃশ্য দেখে

চিৎপাত হয়ে পড়লে, সেদিন দেশের লোক বুঝলে যে, তোমরা সুধু বচনের বাঘ, কাজের কেউ নও। তোমরা বললে—'দেশের লোক মানুক আর নাই মানুক, আমরা যে দাওয়াই বাৎলে দিচ্ছি, তাই শাস্ত্রসম্মত, তাইতেই রোগ সারা উচিত।' কিন্তু শাস্ত্রসম্মতিক্রমে বললেও চলবে না, বা, রোগ সারা উচিত বললেও চলবে না। রোগ যে সারল না, তা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আসল কথা তোমরা রোগ ঠিক করতেই পারনি।

সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেদের যত বড় করে' দেখচ, তোমরা তত বড় নও। তোমরা ঠিক করেছিলে যে কলেজ, আদালত, উপাধি আর কাউন্সিল—এই চারটে হচ্ছে ইংরেজ রাজত্বের খুঁটো; আর এই চারটে সরিয়ে নিতে পারলেই ইংরেজ রাজত্ব হুড়মুড় করে পড়ে' যাবে। কিন্তু একটু চক্ষু চেয়ে যদি দেখ ত দেখতে পাবে যে, ইংরেজ রাজত্বের শিকড় আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত গজিয়েছে। ইংরেজ এদেশে ব্যবসা করতে এসেছিল, আর ব্যবসার বিস্তারের জন্যেই রাজ্য গড়ে' তুলেছে। এদেশে কল-কারখানা বানিয়ে, ব্যবসায় চালিয়ে যতদিন ইংরেজের লাভের সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন ইংরেজের প্রভুত্বও বজায় থাকবে। সেই লাভের টাকা সৃষ্টি করে কে? যারা মাঠে চাষ করে' ইংরেজের জন্যে কাঁচামাল তৈরী করে, যারা কুলি-মজুর হয়ে ইংরেজের কলে খাটে, তারাই ইংরেজের রাজত্বের ভিত্তি। তাদের খাটিয়ে টাকা করবার জন্যেই ইংরেজের এদেশে রাজত্ব করা।

আর তোমরা? তোমরা যারা ইংরেজী শিখে মনে করেছ তোমরাই দেশের সর্ব্বস্ব, যারা উপাধি নিয়ে রায় বাহাদুর হয়েছ, যারা আদালতে গিয়ে ওকালতি করছ, যারা কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতা করছ, যারা কলেজে পড়ে' চাকরীর জন্যে দরখাস্ত হাতে করে' অফিসের দরজার কাছে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্ছ, তোমরা ইংরেজকে টাকা রোজকার করবার জন্যে একটু সাহায্য কর মাত্র। তোমরা দেশের অর্থ সৃষ্টি কর না; ইংরেজের সাহায্য করে' সুধু খানিকটা অর্থের উপর ভাগ বসাও মাত্র। ইংরেজ তোমাদের একটু সাহায্য নিয়ে রাজ্য চালায়; কেননা তাতে খরচ একটু কম্ পড়ে। কিন্তু তা বলে' ভেবো না যে, তোমরা সরে' দাঁড়ালে এ রাজ্য ভেঙ্গে পড়বে। তোমাদের বয়কটের গোড়ায় গলদ ঐখানে।

যারা সত্যি সত্যি অসহযোগ করলে ইংরেজের রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, তারা মাঠের চাষা, কলের মজুর। তোমাদের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যেদিন নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে পাবার জন্যে রুখে দাঁড়াল, সেদিন তোমরাও নিজেদের সর্ব্বনাশ হবে ভেবে ভয়ে আঁতকে উঠলে। তাড়াতাড়ি বলে' পাঠালে—'জমিদারের খাজনা এখনি দিয়ে দাও, চৌকিদারী ট্যাক্স, নুণের ট্যাক্স এখনি দাও।' তোমাদের সঙ্গে কুলি মজুর চাষার স্বার্থ যে এক নয়, সে কথা তারা সেইদিন বুঝতে পেরেছে, সেইদিন তারা টের পেয়েছে যে, তোমরা ইংরেজের ছোট ভাই। তোমাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথার দর যে কি, তা বুঝতে তাদের আর বাকি নেই। আজ তোমরা প্রজার রক্ত চুষে জমিদার হয়েছ, মক্কেলের প্রাণবধ করে' ব্যারিষ্টার হয়েছ, কলেজে এম্‌-এ পাশ করে' বিয়ের বাজার গরম করে' তুলেছ, আর টাকার থলি আঁকড়ে বক্তৃতা দিয়ে বলছ—"হে দেশবাসিগণ, ইংরেজকে তাড়িয়ে, আমাদের সিংহাসনে বসিয়ে দাও। তারি নাম স্বরাজ। এই স্বরাজ হলে দেশের দুঃখ আর থাকবে না।" কিন্তু দেশের নিরন্ন, অস্পৃশ্য, রুগ্ন লোকগুলো যখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করে—'বাবুরা, তোমাদের টাকার থলির কতখানি আমাদের জন্যে খালি করবে, তোমাদের স্বরাজে আমাদের ব্যবস্থা কি রকম হবে?'—তখন তোমরা পরম ধার্ম্মিক সেজে বলো—'বাপু সকল, টাকার থলির দিকে দৃষ্টি কোরো না, লোভ বড় খারাপ জিনিষ। তোমরা নিষ্কামভাবে স্বার্থত্যাগ করতে শেখ, ষড় রিপু দমন করো। আমাদের কথামত পড়ে' পড়ে' মার খাও, আর অহিংস অভ্যাস করো। আমাদের কাঁঠাল আর তোমাদের মাথা, এ দুটো মিশিয়ে, এসো অপার্থিব স্বরাজের সৃষ্টি করি।'

কিন্তু দাদাসকল, এ চালাকি চলবে না। যদি সত্যি সত্যিই দেশের স্বাধীনতা চাও, তা'হলে এই কথাটি আগে বোঝ যে, দুচারজন ভদ্রলোক মিলে তা নিতে পারবে না—তা কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতাই দাও, আর ঘরে বসে' চরকাই কাট। দেশের লোকের সঙ্গে সমান হয়ে যদি মিশতে পার, তাদের সঙ্গে সমান অধিকারে যদি তুষ্ট হও, ত কোমর বেঁধে দাঁড়াও। দেখবে, দেশ তোমার আগেই প্রস্তুত হয়ে আছে। দেশ প্রস্তুত নয়, এটা মিছে কথা, প্রস্তুত নও সুধু তোমরা—কেননা, তোমরা নিজের নিজের পুঁটুলির মায়া আজও কাটাতে পারনি।

কেন হয় না ?

নাগপুরের কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল যে, সারা দেশময় শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে' তুলতে হবে। কিন্তু পাশ হবার পরেই প্রস্তাবটা সেই যে পাশ হয়ে শুয়েছিল, এতদিন পর্য্যন্ত আর নড়ে চড়ে নি। এইবার আবার সেইটাকে টেনে খাড়া করা হয়েছে; সেইমত নাকি কাজ আরম্ভ করা হবে।

হয়নি কেন? তার সোজা উত্তর এই যে, কুলি মজুরদের দুঃখ আমাদের গায়ে লাগে না। ওরা না জানে দুটো ইংরেজীতে কথা বলতে, না জানে দাঁড়িয়ে দুটো বক্তৃতা করতে। সুতরাং ওদের আমরা মানুষের মধ্যেই গণ্য করিনে, নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে ওদের কাছে ঘেঁষিনে।

কৃষকদের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। ছেলেবেলা থেকে যে শুনে আসছি—'ও বেটা চাষা'—সেই কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনের মধ্যে এ কথাটা একেবারে গেঁথে গেছে যে, চাষাগুলো একদম বাজে মাল। ওরা রাজনীতির বোঝেই বা কি, আর আমাদের বড় বড় আন্দোলনে ওরা সহায় হবেই বা কেমন করে'? ওরা না পড়েছে বার্ক, না পড়েছে মর্লি! ওদের নিয়ে কি আর কাজ করা চলে?

ঐখানেই আমাদের সব আন্দোলনের সর্ব্বনাশ হয়েছে। মুখে যতই বকি না কেন, কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয় যে, এবিষয়ে মডারেট আর অসহযোগীতে খুব বেশী তফাৎ নেই। মডারেটরা দেশের নাম করে' যখন বড় বড় বক্তৃতা দিতেন, তখন দেশ বলতে তাঁরা নিজেদের মত জনকয়েককে ছাড়া আর বেশী কিছু বুঝতেন না। সে কথা তাঁদের আমলের কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো পড়লেই বেশ বুঝতে পারা যায়। রিফর্ম্ম বিলের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁদের পেটে ছিটেফোঁটা কিঞ্চিৎ গিয়ে পড়লো, তখন তাঁরা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। পেটভরার সঙ্গে সঙ্গে মুখও বন্ধ হয়ে এল।

মডারেটদের ঠিক পরে আসরে নেমেছিলেন বিপ্লবপন্থীরা। ঠিক আসরে নেমেছিলেন বললে ভুল হবে—তাঁরা ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়াল থেকেই বাণবর্ষণ করতেন। তাঁদের বিপ্লবের চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল, তার কারণ এই যে, সে বিপ্লব-চেষ্টার পিছনে জনকতক ভদ্রলোকের ছেলে ছাড়া আর-কেউ ছিল না। মডারেটরা ভাবতেন,—'ছোঁড়াগুলো লাঠালাঠি করে' মরুক; যদি কিঞ্চিৎ লাভ হয় ত সেটা আমাদের ভাগ্যেই এসে পড়বে।' আজকাল যাঁরা মডারেটদের পাণ্ডা, তাঁরাও তখন এই বিপ্লবপন্থীদের দূর থেকে টাকাটা-সিকেটা দিয়ে সাহায্য করতেন; মনে মনে ভাবতেন—'দেখাই যাক না, ছোঁড়ারা কত দূর কি করতে পারে!' দেশের সাধারণ লোকে ব্যাপারটা বিশেষ কিছু বুঝতো না। তারা হাঁ করে ভাবতো—'এ আবার কি উৎপাত।' আর বিপ্লবপন্থীরা সুধু মরতেই শিখেছিল; দেশের লোককে কি করে' দলে আনতে হয়, তা আর শেখেনি। তাই দেশের লোক জাগবার আগেই তারা মরে' গেল।

তারপর অসহযোগীদের পালা। এঁরা যাকে কাজের প্রোগ্রাম বলে খাড়া করেছেন, তার মধ্যে ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের স্থান যতখানি, দেশের সাধারণ লোকের স্থান ততখানি নেই। গোড়ায় দেখ বয়কটের কথা। উপাধি ত্যাগ কর, কাউন্সিল ত্যাগ কর, স্কুল-কলেজ ত্যাগ কর, আইন-আদালত ত্যাগ কর। তাতেই নাকি বিদেশীর রাজ্য টলে' যাবে! ভাল; দেশের শতকরা আশীজন যে গরীব দুঃখী, যারা চাস করে বা মজুরী করে' খায়, তাদের এ প্রোগ্রামে স্থান কোথায়? তাদের ত উপাধির ব্যাধিও নেই, তারা স্কুল-কলেজেও পড়ে না, সামলা মাথায় দিয়ে আদালতে ওকালতি করতেও যায় না, বা কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতাও করে না। তারা দেশের জন্যে কি করবে? তাদের কথা আমাদের মনেই আসেনি। মডারেট আর বিপ্লবপন্থীদের মত অসহযোগীরাও ভেবেছিলেন যে, দেশের অন্ততঃ বার আনা লোককে বাদ দিয়ে তাঁরা ইংরেজ রাজত্বের চারটে খুঁটো সরিয়ে নিয়ে কাজ হাসিল করবেন।

কিন্তু তা হলো না। যারা পেটের জ্বালায় ক্ষেপে উঠেছিল, তারা চৌরিচৌরায় আগুনের অক্ষরে অসহযোগের উপরে লিখে দিলে—'আমরা এখনও বেঁচে আছি; আমাদের বাদ দিয়ে চলবে না।'

Constructive Programme আরম্ভ হলো। দেশকে অহিংস করে' তুলতে হবে! অতএব তাদের প্রেমতত্ত্ব বোঝাও, আধ্যাত্মিক উপদেশ দাও, খদ্দর পরাও। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি নিয়ে এস; ছুঁৎমার্গ তুলে' দাও; তাদের লেখাপড়া

শেখাও। খুব ভালো কথা। কিন্তু ঐ গোড়ার কথাটা যে চাপা পড়ে' গেল। তারা সমস্ত দিন লাঙ্গল চষে' যে ধান-চাল জন্মায়, তার ভাগ যে তারা নিজে পায় না, সবই যে জমিদার রাজা আর মহাজনে ভাগ করে' নেয়। তারা দিনে দশ-বার ঘণ্টা মজুরী করে' যে পয়সা পায়, তাতে যে তাদের কুঁড়েঘরের মটকা ছাওয়া চলে না, শীতের সময় যে তাদের হি হি করে' কাঁপতে হয়। তাদের বাচ্ছা-কাচ্চা যে না খেতে পেয়ে তাদের চোখের সামনে মরে' যায়। খদ্দর খুব ভালো কথা, কিন্তু শুধু খদ্দরে কি সে-দুঃখ ঘুচবে?

ত্যাগ স্বীকার করতে হবে? হায়রে ত্যাগ! সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত যে তারা সুধু ত্যাগ করেই এসেছে। কই তাদের দুঃখ ত ঘোচেনি; কি আছে তাদের যে ত্যাগ করবে? মোটরে চড়ে' ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করে' বেড়ান তোমাদের সাজে, কিন্তু গরীবের তাতে পেট ভরে না। পেটের জ্বালা যে কি, তা তোমরা জান না; তাই তোমাদের প্রেমতত্ত্ব অতি ঠুনকো জিনিষ। তোমাদের আধ্যাত্মিকতা সুধু বৈঠকী ব্যাপার। আর সেইজন্যেই আজ পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণ তোমাদের দলে এসে যোগ দেয়নি। তাদের অভাবে আজ তোমাদের সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের আশা ছেড়ে দিয়ে আবার কাউন্সিলের কথা তুলতে হচ্ছে। অথবা মহাত্মা গান্ধীর ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মালাজপ করবার প্রস্তাব হচ্ছে।

আজ যে আর হালে পানি পাচ্ছ না, তার মানে সুধু এই যে, কেবল ভদ্রলোকের দল নিয়ে দেশ-উদ্ধার করা চলে না। যতই বড় বড় তত্ত্বকথা শোনাও, আর যতই লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়, যত দিন কংগ্রেস সুধু আড়াইজন ভদ্রলোকের কাকসভা হয়ে থাকবে, ততদিন কংগ্রেস ঘুরে-ফিরে ঐ কাউন্সিলে গিয়ে বচনের স্বরাজ গড়তে চাইবে। দেশের লোকের শক্তির উপর নির্ভর করে' যদি স্বরাজ গড়তে চাও, তা'হলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। দেশের চাষা-ভুষো, কুলি-মজুর, দীন-দুঃখীর নেতা হয়ে যদি দাঁড়াতে পার—তা'হলে আর বারদোলী অনুশাসনের মাপকাটি দিয়ে দেশের উন্নতির মাত্রা মেপে মেপে দিন গুণতে হবে না। অষ্টবজ্র বজ্র হয়ে তোমার পথের বাধা জ্বালিয়ে দেবে। মহাকালীর পূজা না দিয়ে যদি সুধু ব্যোম থেকে আলোচাল আর কাঁচকলা দিয়ে ভোলাতে চাও, তা'হলে তোমাদের অদৃষ্টেও ঐ কাঁচকলা।

একমাত্র উপায়

সার' দেশে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে, সব আইন ভঙ্গ করে' স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করাই যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়, তা'হলে এখন যে ভাবে কাজ চলছে, তা করলে হবে না। Constructive programmeটা খুব ভালো জিনিষ। চরকা কাট, খদ্দর পর, সালিসী আদালত বসিয়ে মামলা-মোকদ্দমা মেটাও, অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করে' জাতে তোল, হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপন কর—এ তো বেশ কথা, এতে তো কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু কথা হচ্ছে এ সবের সঙ্গে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের ঠিক সম্বন্ধটা কি? এ ব্যাপারের ত সবটাই সিভিল; কিন্তু এর সঙ্গে ডিসোবিডিয়েন্সের যে কোনো সম্পর্ক আছে, তা ত নজরে পড়ে না। তাই সেকালের স্বদেশী-যুগে যা হয়েছিল, এবারেও ঠিক তাই হচ্ছে। অর্থাৎ পুলিশের গুঁতোয় চরকা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খদ্দরের উপর কর্ত্তাদের যে বেশ সুদৃষ্টি নেই, তা যাঁরা পাড়াগাঁয়ে চরকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই জানেন। দশ বছর কি বিশ বছর পরে এই চরকা থেকে স্বরাজ বেরিয়ে আসবে, এই আশায় লোকে চুপ করে' সব অত্যাচার সইতে পারে না। তাই তারা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে' বসে' পড়ে।

একদল বলছেন এই সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। সেইখানে গিয়ে হট্টগোল বাধাতে পারলে কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গে একটা রফা করতে বাধ্য হবে, আর রফা যদি না-ও করে, আমরা সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স লাগিয়ে দেবো। কিন্তু আমরা লাগিয়ে দেবো বললেই কি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স লেগে যাবে? আমরা নাকি কাউন্সিলে গিয়ে বলবো—খেলাফতের একটা ব্যবস্থা করো, পাঞ্জাবের ডায়ারী আমলের অত্যাচারের একটা সুবিচার করো, আর আমাদের স্বরাজ দাও। খেলাফতের ব্যবস্থার জন্যে কাউন্সিলে যাবার বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে বলে' মনে হয় না, আর তা ছাড়া কামাল পাশা লাঠির চোটে তার যা হয় একটা ব্যবস্থা করে' নিচ্ছে। কামাল পাশাকে সাহায্য করতে

পারলেই খেলাফতের সাহায্য করা হয়। 'ডায়ারী' আমলের পাঞ্জাবী দুঃখ নিয়ে এখনও নাড়াচাড়া করা সুধু একটা বাঁধা বুলি আওড়ান। তারপরে অনেক দুঃখ পাঞ্জাবের উপর দিয়ে আর দেশের অন্যান্য জায়গার উপর দিয়ে চলে' গেছে। দেশ স্বাধীন না হলেও সমস্ত দুঃখের শান্তি হয় না। সুতরাং আসল কথা হচ্চে স্বরাজ পাওয়া, আর আপাততঃ ঠিক হয়েছে যে, সমস্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে শাসনযন্ত্র অচল করে' দেওয়া স্বরাজ পাবার উপায়।

কিন্তু দু-দশজন লেখাপড়াজানা ভদ্রলোক মিলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করলে ত রাজ্য অচল হয়ে পড়বে না; দেশের সকলকে মিলে, অন্ততঃ অধিকাংশকে মিলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে মরিয়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। 'স্বরাজ' ব্যাপারটা যে কি, তা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কর্ত্তারা স্পষ্ট করে' বলেননি। এ রকম একটা অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট ব্যাপারের জন্যে জনসাধারণ যে বড় বেশী কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হবে, তা মনে হয় না। তারা জানতে চাইবে যে, স্বরাজ পেলে তাদের দুঃখ ঘুচবে কি না। তাদের পেটের ভাত আর কোমরে যাতে কাপড় জোটে, তার কোনো ব্যবস্থা হবে কি না। তা যদি হয় ত তারা লড়ায়ের দুঃখ-কষ্ট মাথায় করে' নিতে রাজী হবে। আর তা যদি না হয় ত বাবুভায়ারা স্বরাজ পেলেন কি না-পেলেন তা তাদের বয়ে গেল।

সারা ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিয়ে সুধু বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। এখানকার শতকরা পঁচাত্তর জন চাষী; সুতরাং এখানে দেশজোড়া সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করতে গেলে সুধু স্বরাজের বাঁধা বুলি আওড়ালে চলবে না; দেখতে হবে এই চাষীদের যথার্থ দুঃখ কি, আর কোন্ দুঃখ ঘোচাবার আশায় তারা প্রাণপণে লড়বে।

সোজাসুজি দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জমীদার আর পুলিশের অত্যাচারে তারা দিনে দিনে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'বিজলী'তে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "বাংলা দেশের যা-কিছু ধন, তা মাটী চষে বাংলার চাষী প্রতি বৎসর উৎপন্ন করে। আমরা আর-সবাই কিছু বদল দিয়ে বা না-দিয়ে তার ভাগ নিই। ভাগ-বাটোয়ারার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাতে চাষী দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না। এ অবস্থায় চাষের জমিতে চাষীর স্বত্বই যে আর-সবার স্বত্বের চেয়ে বাড়ানো দরকার, তা চোখে স্বার্থের ছানি না থাকলে দেখতে কিছুই কষ্ট হয় না।"

চাষের জমির উপর চাষীদের স্বত্ব যদি স্বরাজের অঙ্গীভূত হয়, তা'হলে চাষীরা সবাই স্বরাজ পাবার জন্যে লড়তে রাজী হবে; আর স্বরাজ যদি সুধু একটা ফাঁকা আওয়াজ হয়, তা'হলে তার জন্যে এদেশে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কস্মিনকালেও হবে না।

যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করতে চান, তাঁরা এই চাষীদের হয়ে লড়াই করতে রাজী আছেন? তাঁরা কি এ কথা বলতে রাজী আছেন যে, চাষের জমি চাষীর সম্পত্তি বলে' স্থির করা হোক্? জমিদার সুধু উড়ে' এসে জুড়ে' বসেছে, তারা জমির কেউ নয়? তা বলতে যদি রাজী থাকেন, ত সমস্ত প্রজা তাদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে; সবাই তাঁদের কথামত কাজ করতে প্রস্তুত হবে।

এখনকার কাউন্সিল জমিদার আর মহাজনে ভরা তা জানি; আর কাউন্সিলে গিয়ে আপাততঃ ও-রকম আইন পাশ করাও যে অসম্ভব, তা জানি। কিন্তু দেশকে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের জন্যে প্রস্তুত করবার জন্যে যাঁরা কাউন্সিলে যেতে চান, তাঁদের সুধু মুখের কথায় নয়, সত্যি সত্যিই এই প্রজাদের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াতে হবে। কাউন্সিলে গিয়ে প্রজার হয়ে তাঁদের বলতে হবে যে প্রজারা জমির উপর পূর্ণ স্বত্ব চায়; আর যখন কর্ত্তারা তাঁদের সে প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন কাউন্সিলের বাইরে এসে প্রজাদের বলতে হবে—'এরা তোমাদের কথা শুনছে না, অতএব খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে একবার আচ্ছা করে' লেগে যাও।' হাওয়া খাবার জন্যে কাউন্সিলে গেলেও কিছু হবে না, আর ঘরে বসে' চরকা কাটলেও কিছু হবে না। প্রজাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান চাই, আর তাদের এমন আদর্শ দেখান চাই যা তারা সোজাসুজি বুঝতে পারে। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের ঐ এক রাস্তা।

খোল্-নলচে বদলাও

গয়ার কংগ্রেস দলাদলিটা মিটে' যাবে কি পেকে উঠবে, তাই নিয়ে চারিদিকে গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে। যা নিয়ে দলাদলি দেখা দিয়েছে,

সেটা খুব বড় কথা নয়। কাউন্সিলে গিয়েই যে চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে, তার কোনো মানে নেই; আর না গেলেই যে দেশের একটা গতি হয়ে যাবে, তারও কোনো লক্ষণ দেখিনে। কংগ্রেসের যেটা গোড়ার কথা—দেশকে স্বাধীন করা—সেটা ক্রমশই চাপা পড়ে' যাচ্ছে; আর অসহযোগ আন্দোলনের ছাপান্ন রকম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ব্যাখ্যা নিয়েই সবাই ব্যস্ত। যাঁরা কাউন্সিলে যাবার বিরোধী, তাঁরা বলছেন, ওখানে গেলে অসহযোগ আন্দোলনের ধর্ম্ম নষ্ট নয়ে যাবে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ধর্ম্ম বজায় রেখেও যে কেমন 'করে' স্বাধীনতা পাওয়া যাবে, সে-সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। চরকা চালাও, খদ্দর পর, আর জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে কাগজে দু-একটা লিখো, না-হয় দু-একটা বক্তৃতা দিও; তারপর স্বরাজ হওয়া ভগবানের হাত —এইটাই যেন তাঁদের মনোগত ভাব। কোন রকম গোলমাল বা লড়ালড়ির দিকে তাঁরা যেতে চান না—ও-রকম করলে নাকি ভারতের সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে যাবে! সনাতন ধর্ম্মটা যে এ রকম ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ, তা ত জানা ছিল না!

যাঁরা কাউন্সিল দখল করতে চাইছেন, তাঁদের কাউন্সিল ভাঙ্গবার দিকে যেমন দৃষ্টি, অন্য কোনো কাজের দিকে তেমন দৃষ্টি নেই। না-হয় ধরেই নেওয়া গেল যে, কাউন্সিলে গিয়ে তাঁরা সরকার বাহাদুরের রসদ বন্ধ করবায় যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন; তখন কর্ত্তারা হয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাউন্সিলওয়ালাদের সঙ্গে যা-হোক একটা রফা করে' ফেলবেন, না-হয় কাউন্সিল তুলে' দেবেন। রফাই যদি হয়, তা'হলে এখন থেকে বুঝে রাখা ভালো যে, রফার নাম স্বাধীনতা নয়। সে-রফার মানে রিফর্মের আর-এক-কিস্তি। এখনকার মডারেটেরা যেমন রিফর্ম পেয়ে সরকারী দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় কিস্তি রিফর্ম পেয়ে আবার একদল নূতন মডারেটের সৃষ্টি হবে। কিন্তু রফা হওয়া সম্বন্ধেও অনেক গোলমাল। গতবার যখন রিফর্ম বিলের খসড়া তৈরী হয়, তখন সরকার বাহাদুর ঘরে-বাইরে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন; রিফর্ম দেওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। সুধু আইনের প্যাঁচে ফেলে কর্ত্তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে' নেবে, এমন ছেলে এখনও জন্মায়নি।

তারপর যদি কর্ত্তারা কাউন্সিল তুলে' দিয়ে মুখোস খুলে' ফেলে একেবারে দন্তবিচ্ছেদ করে' দাঁড়ান—তখনকার জন্যে কি ব্যবস্থা করছ? তখন কি দেশের লোকের কাছে গিয়ে বলবে—'ভাই সকল, কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গে রফা করলে না, অতএব তোমরা খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দাও।' যাদের খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করবার জন্যে বলবে, তারা কি আশায় তোমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে? কি তোমরা দেবে তাদের?

যাঁরা আধ্যাত্মিক অসহযোগী, তাঁরা দেশের জনসাধারণকে খদ্দর পরবার উপদেশ দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু খদ্দর পরলেই কি তাদের দুঃখ ঘুচবে? জমিদার, পুলিশ, মহাজনদের হাতে পড়ে' যারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে ও হচ্ছে, খদ্দর পরলেই কি তাদের পেটের আর প্রাণের জ্বালা মিটবে?

যাঁরা কাউন্সিল ধ্বংস করতে চান, তাঁদের মধ্যে এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়া আর-কাউকে কৃষকদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে শুনিনে। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রস্তাব নাগপুর কংগ্রেসে পাশ হয়েছিল, কিন্তু তা ধামাচাপা পড়ে' আছে। কংগ্রেস ও-সম্বন্ধে কোনো চেষ্টা করেনি। কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রস্তাব দেশবন্ধুর কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে 'বাঙলার কথা'য় দেখেছিলাম; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে কৃষকদের বা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করা হবে, তা 'বাঙলার কথা'য় দেখিনি, অথচ আমাদের মনে হয় যে, সঙ্ঘ গড়া বড় কথা নয়; আসল কথা হচ্ছে—কি উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে।

কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালী দেখলে মনে হয় ওটা সুধু সওদাগর, মহাজন, উকিল, ব্যারিষ্টার, প্রোফেসার আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-ছোকরাদের যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়, তাই নিয়ে ব্যস্ত। দেশের শাসনপ্রণালী যে রকম ভাবে বদলালে ঐ সব শ্রেণীর কতকটা আর্থিক লাভ হয় বা প্রভুত্ব বাড়ে, সেইটাই যেন কংগ্রেসের আদর্শ। দেশের শতকরা আশীজন লোক যে এ সমস্ত শ্রেণীর বাইরের, সেটা কংগ্রেস দেখেও দেখেন না। দেশের পুরো স্বাধীনতা পেতে গেলে যে দেশের অধিকাংশ লোকের শক্তির প্রভাবে তা পেতে হবে, আর দেশের অধিকাংশ লোককে স্বাধীনতার জন্যে শক্তির প্রয়োগ করাতে হলে যে দেশের অধিকাংশ লোকের স্বার্থের দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে—এ কথাটা কংগ্রেসের কর্ত্তারা বুঝেও

বোঝেন না। দেশে কলওয়ালার সঙ্গে মজুরের এখন যা সম্বন্ধ, তাই থাক, কংগ্রেসের কর্ত্তারা যে সব শ্রেণীভুক্ত, সে সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ ষোল আনা বজায় থাক—কেবল মাঝ থেকে দেশের জনসাধারণ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করে' স্বদেশী পাণ্ডাদের হাতে তুলে' দিক। ওহে, তা হবে না—হবে না। কংগ্রেসের নলচে, খোল—দুই বদলাতে হবে; তা যদি না কর, ত দেশকে স্বাধীন করা কংগ্রেসের কর্ম্ম নয়। কংগ্রেস চিরদিন 'ঘটত্ব' আর 'পটত্ব' নিয়েই মজে' থাকবে।

কংগ্রেসের কচকচি

কংগ্রেসে যে দুটি দল দেখা দিয়েছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে মতের অমিল যতই থাকুক, এক জায়গায় বেশ পাকা মিল আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, দুটি দলই দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল।

পুরোনো দলের আশা ছিল যে, কোর্ট, কাউন্সিল, উপাধি আর ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দিলেই ইংরেজ রাজত্ব ভেঙ্গে পড়বে। না পড়ে, তখন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করবার আয়োজন করা যাবে। কিন্তু যে কারণেই হোক, কোর্টও খালি হয়নি, কাউন্সিলও খালি হয়নি, কলেজও খালি হয়নি; আর উপাধিধারীর দলও বেঁচে আছে। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করবার আয়োজন বারদোলিতে হয়েছিল; কিন্তু বোধন আরম্ভ হবার আগেই ঘট ফেঁসে গেল। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করা চাপা পড়ে' গেল; আর শীঘ্র যে কোথাও আরম্ভ হবে, সে-রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এবারকার কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ঐ সমস্ত মামুলি কোর্ট, কাউন্সিল, কলেজ বয়কট করার প্রস্তাব ত আছেই, অধিকন্তু আছে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করার প্রস্তাব। কোর্ট, কাউন্সিল, কলেজ বয়কট করা কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি, আর ভবিষ্যতে হবার সম্ভবনাও যে খুব কম, এ কথা কংগ্রেসের কর্ত্তরা খুব ভালো করেই জানেন। তবু ও-গুলো যে পাশ করা হয়েছে, তা শুধু নিজেদের মনকে চোখ ঠারবার জন্যে। একটা-কিছু করতে হবে ত। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করবার কথা শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল যে, কর্ত্তারা বুঝি সত্যি সত্যিই একটা-কিছু করতে চান। তারপর তাঁদের লেখা পড়ে' আর বক্তৃতা শুনে' সে ভ্রম আমাদের কেটে গেছে। খাঁটি অসহযোগের প্রধান পাণ্ডা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী বেশ ব্যাখ্যা করে, বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করা হবে শুধু গ্রামে গিয়ে চরকা প্রচলন আর সালিশী আদালত স্থাপন করবার জন্যে। সরকার বাহাদুর ত আর ছেলেদের নিশ্চিন্ত হয়ে এ সমস্ত কাজ করতে দেবেন না। বাস, তা'হলেই ত সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের পালা সাজ হয়ে গেল—আবার কি চাই? আর ঐ যে পঁচিশ লক্ষ টাকা তোলা হবে, তা খরচ হবে রেলভাড়ার জন্যে, টেলিগ্রাম করবার জন্যে, আর কাগজপত্র কিনতে। আইন-ভঙ্গ যদিও করা হয়, সেটা হবে ব্যক্তিগত ভাবে।

এঁদের কথা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এদের ধারণা এই যে, আপাততঃ গ্রামে গ্রামে গিয়ে খদ্দর প্রচার করা যাক, আর অন্যান্য ভাবে দেশের লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা যাক; গোটাকতক ন্যাশনাল স্কুল, পাঠশালা আর সালিশী আদালত বসাবার চেষ্টা করা যাক; এর জন্যে পুলিশে ধ'রে জেলে দেয়, ত কি আর করবো, জেলে যেতেই হবে। কিন্তু আপাততঃ এ সবের বাইরে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।' খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে এঁরা যাবেন না।

নূতন দলও খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দেশজোড়া সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করবার জন্যে বিশষ চেষ্টা করবেন বলে' মনে হয় না। নূতন দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলে' দিয়েছেন যে, general mass civil disobedience—দেশব্যাপী আইন ভঙ্গ করা—ব্যাপারটার ওপর তাঁর তেমন শ্রদ্ধা নেই। ওটা যে সম্ভবপর, তা তিনি মনে করেন না। এইখানে দেখছি দু'দলেরই কার্য্যতঃ মিল রয়েছে। তবে, তফাৎ এইখানে যে, পুরাতন দল চান যথাসম্ভব গোলমাল বাঁচিয়ে দেশের সেবা করতে, আর নূতন দল চান কাউন্সিলে ঢুকে স্থানে স্থানে ছোটখাট আইন ভঙ্গ করে' আমলাতন্ত্রকে অস্থির করে' তুলতে। পুরাণো দল 'সিভিল', আর নূতন দল 'মিলিটারী'। পুরাতন দল যে রাস্তা ধরে' চলেছেন, তাতে দেশের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদলে যাবার কোনো

সম্ভাবনা নেই, দেশ স্বাধীন হওয়া ত দূরের কথা; নূতন দল যে রাস্তা ধরে' চলতে চাইছেন, তাতে দেশে খানিকটা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একটা রফা পর্য্যন্ত হতে পারে; কিন্তু দেশ স্বাধীন করার আয়োজন এ নয়।

আসল কথা হচ্চে এই, যে কার্য্যপ্রণালী তাঁরা ধরছেন, তাতে সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত তাঁরা পৌছুতে পারবেন না; সুতরাং বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনও হবে না।

কংগ্রেসে কৃষক-সভা আর শ্রমজীবী-সভা গড়বার জন্যে একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু পুরাণো দলের সবাই ও-কাজটাকে বাদ দিয়ে চলেছেন; বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও ও-কাজে হাত দেবার কোনো চেষ্টা করেননি। নূতন দলের লোকেরাও কাউন্সিলের কথা নিয়েই ব্যস্ত। দু দলের লোকেরাই চান যে দেশে একটা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয়ে যাক্। আর তার জন্যে দেশের জনসাধারণের সাহায্যও তাঁরা চান। কিন্তু সেই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে একটা সামাজিক আর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনও যে আসা চাই, সে-কথাটা তাঁরা ভালো করে' ভাবেন না। আমাদের মনে হয় যে, এদেশে একটা সামাজিক আর অর্থ নৈতিক ওলট-পালট না হলে রাজনৈতিক ওলট-পালট হবে না। কংগ্রেসে দু দলই যতটা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন চান, ততটা সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন চান না।

দেশের জনসাধারণ যে-পরিবর্ত্তন চায়, কংগ্রেস তা চান না—সেইখানেই হয়েছে গোলমাল। অথচ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের যে বিরোধ আছে, সেইটুকু তাঁরা চাপা দিয়ে চলতে চান। এরই ফলে আজ দেশব্যাপী নির্জ্জীবতা এসেছে; এরই ফলে কংগ্রেসের সব কথাই সুধু ফাঁকা আওয়াজ হয়ে যাচ্চে।

জনসাধারণ যেদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, সেদিন তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার জন্যে দাঁড়াবে না, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই দাঁড়াবে, যাঁরা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে চেষ্টা করতে চান, তাঁদের কংগ্রেস-কচ্‌কচি ছেড়ে দিয়ে ঐ জনসাধারণের মাঝখানে গিয়েই ডুব দিতে হবে। ঐখানেই শক্তির কেন্দ্র।

সামঞ্জস্য

কংগ্রেসে পুরাণো দল যত নির্জ্জীব হয়ে পড়ছেন, সেখানে তত নূতন দল দেখা দিচ্চে। সেই-সমস্ত নূতন দলের আদর্শ দেখলেই বুঝতে পারা যায় দেশের লোকের মন কোন্ দিকে যাচ্চে। পুরাণো দলের দেশ স্বাধীন করবার কার্য্যপ্রণালীর সার কথা—দেশব্যাপী আইন-ভঙ্গ করা, কিন্তু সে আয়োজন যে রকম ধীরে ধীরে চলেছে, আর তাঁদের আইন-ভঙ্গ করার ধারণা যে রকম, তাতে যে কস্মিন্‌কালেও আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করাই হবে—তা আশা করাই শক্ত। তাঁরা গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে খদ্দর প্রচার করে' আর নিজেদের পঞ্চায়েত সৃষ্টি করে' গ্রাম্য-সমিতিগুলি গড়ে' তুলবেন; সঙ্গে সঙ্গে অল্প-বিস্তর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে। তারপর গ্রাম্য-সমিতিগুলি গড়ে' উঠলে, দেশ শান্ত, সংযত, সংঘবদ্ধ হলে তাঁরা একসাথে দেশময় আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করবেন—অন্ততঃ এইটাই তাঁদের বর্ত্তমান সঙ্কল্প।

বারদোলির অনুশাসনের পর থেকেই এই রকম কথা চলছে। এই রকম কার্য্যপ্রণালীর উপর কংগ্রেসের কর্ম্মীদের যে শ্রদ্ধা আছে, একথা তাঁদের অধিকাংশ লোক গয়ার কংগ্রেসে বলেছেন। কিন্তু মজার কথা এই, বারদোলির অনুশাসন প্রচার হবার পর প্রায় এক বৎসর কেটে গেছে, তবু দেশকে সংঘবদ্ধ করবার আয়োজন যে এক পা-ও এগিয়েছে, তার প্রমাণ নেই। অনেকে বলেন কর্ম্মীদের মধ্যে উৎসাহের অভাবই তার প্রধান কারণ। কিন্তু উৎসাহের অভাবেরও ত কারণ আছে।—সেটা কি?

স্বরাজ বলতে যে কি বোঝায়, তা কংগ্রেস এখনও স্পষ্ট করে' বলেননি। বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধই বা কি রকম থাকবে, আর দেশের জনসাধারণের অবস্থাই বা তখন কি হবে, বা হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধেও কংগ্রেস কোনো স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেননি। চরকা কেটে নিজের হাতে খদ্দর তৈরী করে' পরলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের যে সমস্ত বড় দুঃখ-কষ্ট, তার অনেকটাই ঘুচবে না। জমিদার, মহাজন, হয়ত সমানভাবেই তাদের রক্ত যচুতে থাকবে; আর স্বদেশী পুলিশ যে বিদেশী পুলিশের চেয়ে কতখানি ভালো হবে, তা'ও এখনও জানা নেই।

সুতরাং কংগ্রেস এখন যে-পথ ধরে' গ্রাম্য-সমিতিগুলি গড়তে চাইছেন, সে-পথ ধরে' চললে আইন-ভঙ্গ যে কেমন করে' আরম্ভ হবে, তা বোঝা কঠিন। সাধারণ লোকে স্বরাজের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বোঝে না, তাদের মোটা মোটা দুঃখ-কষ্টগুলো বোঝে। সেগুলো দূর করবার জন্যে আইন-ভঙ্গ করতে রাজী হবে। সেই অভাবগুলো দূর করবার জন্যে যদি তাদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা হয়, তা'হলে সে-চেষ্টা সফল হতে পারে, আর তাই থেকে আইন-ভঙ্গও আরম্ভ হতে পারে। কিন্তু যে-আদর্শ নিয়ে কংগ্রেস গ্রামে গ্রামে খদ্দর-সমিতি স্থাপন করচেন, তা থেকে আইন-ভঙ্গ হবে কি করে', তা বোঝা যায় না। কংগ্রেসের নেতাদের কথামত দেশের লোক কি চক্ষু বুজে ঝুলে' পড়বে?

দেখে-শুনে মনে হয়, দেশের আইন অমান্য আরম্ভ করা পুরাণো দলের কর্ম্ম নয়। তাঁরা আরও কিছুদিন গ্রাম্য-সমিতি গঠন করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে' শেষে নির্জ্জীব হয়ে পড়বেন।

তারপর নূতন দলের কথা। নূতন দলের কার্য্য-প্রণালী এখনও সমস্ত জানা যায়নি। তবে যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয়, তাঁরা কাউন্সিলে আর কাউন্সিলের বাইরে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে নানারকম ছোটখাট সংঘর্ষ বাধিয়ে তা থেকে ক্রমে ক্রমে একটা দেশব্যাপী সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে চান। আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করবার এই যে প্রকৃষ্ট পন্থা, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আইন-ভঙ্গ ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই যদি দেশব্যাপী করতে হয়, তা'হলে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের নিয়ে তা করলে চলবে না; সমস্ত দেশবাসীর তাদের সঙ্গে থাকা চাই। তার আয়োজন কি করে' হবে? শোনা যাচ্ছে এই উদ্দেশ্যে নূতন দলের নেতারা কৃষক সঙ্ঘ আর শ্রমজীবী সঙ্ঘ গড়বার চেষ্টা করবেন। নাগপুরের কংগ্রেসে শ্রমজীবী সঙ্ঘ গড়বার একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু তা এখনও কার্য্যে পরিণত হয়নি। এবারেও কংগ্রেসে কৃষক আর শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, কিন্তু পুরাণো দল সেই মত কাজ করবার কোনো চেষ্টা করছেন বলে' আমরা জানিনে। নূতন দল হয়ত সত্যি সত্যিই সে-কাজটা হাতে নিতে পারেন; কেননা শোনা যাচ্ছে যে, তাঁদের স্বরাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর, আর হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির কি রকম অধিকার থাকবে, তা এখন থেকেই ঠিক করে' দেবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা করছেন। স্বরাজের আদর্শটা ঠিক কি রকম হবে, তা আমরা জানিনে; তবে শোনা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য যাতে থাকে, সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু খবরের কাগজে তাঁদের কার্য্য-প্রণালী যতটুকু প্রকাশ হয়েছে, তা থেকে এই সামঞ্জস্যটা কি রকম হবে তা বোঝা যায় না। একটা কথা তাঁরা বলেছেন যে, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার যাতে বজায় থাকে, সেদিকে তাঁরা নজর দেবেন; অধিকন্তু ও-বিষয়ে লোককে উৎসাহিত করবেন। কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পাছে লোকে তাঁদের "বলশেভিক" বলে' বদনাম দেয়, এই ভয়েই নাকি তাঁরা ব্যক্তিগত অধিকারের ওকালতি করেছেন। এ কথা যদি ঠিক হয়, তা'হলে জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে রায়তদের স্বার্থের সামঞ্জস্য, বা কলওয়ালাদের স্বার্থের সঙ্গে মজুরদের স্বার্থের সামঞ্জস্যটা যে নিতান্ত একপেশে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

আরও একটা কথা এই যে, যাঁরা এই সামঞ্জস্য বিধান করবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কৃষক বা মজুরদের প্রতিনিধি কেউ নেই। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ যাতে না বাধে—সেইজন্য এই সামঞ্জস্যের চেষ্টা হয়ত করছেন; কিন্তু তাঁদের কথা-মত জমিদার বা কলওয়ালারা নিজেদের স্বার্থ কি ছাড়বে? আর কৃষক বা মজুরেরাই যে তাদের কথা মেনে নেবে, তার প্রমাণ কি? সুতরাং একটা মনগড়া সামঞ্জস্য সৃষ্টি করলেই যে বিরোধ দূর করা যাবে, তা ত মনে হয় না।

প্রকৃত সামঞ্জস্য তখনই হবে, যখন কৃষক আর শ্রমজীবীরা নিজেদের সঙ্ঘ সৃষ্টি করে' স্বরাজ পাবার জন্যে ধনীদের সঙ্গে একটা রফা করবে। এখন আমাদের কাজ সেই কৃষক আর শ্রমজীবী সঙ্ঘ গড়ে' তাদের শক্তিমান করে' তোলা।

শ্রমিকেরা স্বতন্ত্র দল গড়বে বা আপাততঃ নূতন দলের সঙ্গেই কাজ করবে, সেটা নূতন দলের কার্য্য-প্রণালী বের হবার পর স্থির হতে পারে।

আমাদের পথ

একজন বিশিষ্ট বন্ধু "ধনী আর দরিদ্রের বোঝা-পড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, "ধনী আর

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলে দেশের এখন ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।" ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে স্বার্থের যে বিরোধ আছে, সে-কথাটা এখন উঠিয়ে কাজ নেই। কৃষিকার্য্যে যৌথপ্রণালী অবলম্বন করে' বা অন্যান্য উপায়ে প্রজাদের মঙ্গল-সাধন করা যেতে পারে; আপাততঃ তাই করা যাক। তাতে যদি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হয়, তখন অন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হচ্চে এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা ধনীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে' অন্নের সংস্থান করে' নেওয়া খুব সোজা কথা নয়। কেননা, "শ্রমজীবীদের শক্তি ইংলণ্ডে যত বেশী, এত আর কোথাও দেখি না।" তবু তারা নিজেদের সুবিধে করে' নিতে পাচ্ছে না কেন? ইতালীতেও ফ্যাসিষ্টরা কম্যুনিষ্টদের হারিয়ে দিলে কেন? সুধু জনবলে যে কাজ হয় না, তার প্রমাণ ত আমাদের নিজেদেরই দেশ! এত লোক, অথচ স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেবার বেলা ক'জন আসে?

তাঁর তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে এই যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলটা এখনও পাকা হয়নি। এখন যদি জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজারা ক্ষেপে উঠে, তা'হলে এদেশে যখন প্রজাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, আর জমিদারদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, তখন জমিদার আর প্রজার ঝগড়াটা হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া হয়ে দাঁড়াবে। সে একটা বিষম বিপদ।

চতুর্থ যুক্তি এই যে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলেই যে ধনী আর মধ্যবিত্তদের ধ্বংস করতে হবে, এরই বা মানে কি? দেশের স্বাধী তার জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে যত লোক পাওয়া গেছে, তত আর-কোন শ্রেণী থেকে পাওয়া যায়নি, সুতরাং কৃষক আর শ্রমজীবীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যদি যায়, ত তার ফলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে মাত্র। ফরাসী-বিপ্লবের সময় যে অরাজকতা এসেছিল, তার ফল তো হোলো প্রায় শূন্য!

প্রায় এই রকম কথা আমরা আরও অনেক বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনতে পাই। তাঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে, সমস্ত দেশটাকে এক সূত্রে বেঁধে বিদেশীর ঘাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাক। তারপর নিজেদের হাতে যখন রাজ্যটা আসবে তখন ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত লোককে একত্র করবার আশায় যাঁরা বসে' থাকবেন, তাঁদের চিরকালই বসে' থাকতে হবে। যাদের স্বার্থ বিদেশী আমলাতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে যতটা মাথা ঘামাবে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে ততটা মাথা ঘামাবে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী লোকেরা এই কারণেই মডারেট। তাঁরা বিদেশী শাসনপ্রণালীটাকে একটু গা-সওয়া গোছের করে' নিতে চান; স্বাধীনতা চান না। তাঁদের খাতিরে দেশের জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে যাবে কেন? সরকারী যে-সমস্ত খাজনা-ট্যাক্সের ফলে জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে, জনসাধারণ সেগুলো ত উঠিয়ে দিতে চায়-ই; সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে-সমস্ত অন্যায় স্বার্থরক্ষার ফলে তাদের কষ্ট হচ্চে, সেগুলোও উঠিয়ে দিতে চায়। প্রমাণ বাঙ্গলা দেশে রায়ত-সভা, বেহারে হিন্দুস্থান, রাজপুতানায় কৃষাণ সভা, আর মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ। সরকারের অত্যাচারই কি সুধু অত্যাচার, দেশের লোকের অত্যাচার কি অত্যাচার নয়? যারা জমিদারের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে, তাদের কাছে গিয়ে কি বলা হবে, যে হেতু জমিদার দেশী লোক, অতএব তাদের দেওয়া কষ্ট নির্ব্বিবাদে সহ্য কর, আর সরকারী খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ কর? স্বাধীনতার চেষ্টা অমন সুবিধামত ভাগাভাগি করে' আসে না। যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ধনী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যায় স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে' প্রজাসাধারণের জয়ের সম্ভাবনা থাক আর নাই থাক, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ওটাও একটা অঙ্গ। ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশের স্বাধীনতার জন্যে যদি সত্যিই প্রাণ কেঁদে থাকে, তা'হলে দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে তাঁরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থগুলি ছাড়তে রাজী হবেন না কেন? এর দ্বারা সুধু এইটুকু কি বোঝা যায় না যে, তাঁদের কাছে দেশের স্বাধীনতা মানে সুধু নিজেদের স্বার্থ? তা ছাড়া, ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদের শক্তি অন্যান্য দেশের শ্রম-জীবীদের শক্তির চেয়ে কম বই বেশী নয়; যাঁরা ইউরোপের শ্রমিক সঙ্ঘের খবর রাখেন, তাঁরাই একথা জানেন। ইতালীতে ফ্যাসিষ্টি আন্দোলন প্রবল হয়েছে, কিন্তু ইতালীর ইতিহাস এখনও শেষ হয়নি। "জনবলে কাজ হয় না, তার প্রমাণ আমাদের দেশ"—এ কথাটাও ভুল। বিদেশী-স্বদেশী সবাই মিলে তাদের দাবিয়ে রেখেছে। সত্যি

সত্যি কেউ তাদের স্বাধীনতার নামে ডাক দেয়নি। যেদিন তা দেবে, সেদিন এক মুহূর্ত্তে সব বন্ধন তারা ছিঁড়ে ফেলবে। তার নিদর্শন অতীতেও দু-একবার পাওয়া গেছে।

তারপর হিন্দু-মুসলমানের কথা। গোঁজামিল দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিল হবে না। হিন্দু-মুসলমানের মিল হতে পারে তখন, যখন তারা বুঝবে যে হিন্দুও মানুষ আর মুসলমানও মানুষ। হিন্দু জমিদারের অধীনে মুসলমান প্রজাকে দাবিয়ে রাখা হিন্দু-মুসলমান মিলন ঘটাবার প্রকৃষ্ট পথ নয়। যে অন্যায় অত্যাচার করবে, সে মারা যাবে, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। মুসলমান প্রজাকে খলিফতের নামে ডাক দেওয়ার চেয়ে তার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নামে ডাক দিলে ঢের বেশী ফল পাওয়া যাবে।

তারপর দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে ধনী আর মধ্যবিত্তদের যে ধ্বংস করতে হবে, এ কথা আমরা বলি না। তবে এই কথা বলি—ধনী আর মধ্যবিত্তদের যে সমস্ত অন্যায় স্বার্থ আছে, যার ফলে দরিদ্রেরা মারা পড়ছে, সেগুলি ছাড়তে হবে। তা যদি তাঁরা না ছাড়তে চান, তা'হলে বুঝতে হবে যে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা চান না, স্বাধীনতার নাম করে' নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে চান। "স্বাধীনতার জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে অনেক ত্যাগী লোক পাওয়া গেছে"—এ কথা ষোল আনা সত্যি নয়। একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে, যে-আদর্শের জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বীর-পুরুষেরা লড়েছেন, সেটাকে দেশের স্বাধীনতা নাম দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব দেশের ইতিহাসে এ কথা বার বার প্রমাণ হয়েছে। আইরিশ স্বদেশ-প্রেমিক O' Conollyর Labour in Ireland বইখানি আমরা বন্ধুকে পড়তে অনুরোধ করি। আর তিনি যে লিখেছেন যে ফরাসী-বিপ্লবের ফল হয়েছে শূন্য—এটা একটা প্রকাণ্ড ভুল। সস্তায় কিস্তি মারবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের দেশে যদি সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করতে হয়, তা'হলে এমন লোককে ডাক দিতে হবে, যাদের নিজেদের স্বার্থ স্বাধীনতা না পেলে বজায় থাকে না। তারা কারা? ধনীও নয়, মধ্যবিত্তও নয়—এ গরীব কাঙ্গালের দল।

ষোল আনা স্বাধীনতা

এই জিনিষটা আজ আমাদের ভালো করে' বুঝতে হবে যে, আমাদের পরাধীনতা শুধু রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়। রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর করবার এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত চেষ্টা হয়েছে, সেগুলি যে ব্যর্থ হয়ে গেছে, তার কারণ এই যে, এদেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে যে-সমস্ত কারণ রয়েছে, সেগুলি আমরা দূর করতে চাই না। মুখে যাই বলি, দেশের লোকের ষোল আনা স্বাধীনতা আমরা চাই না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।

এই বাঙ্গলা দেশের কথাই ধরা যাক্। এখানে শতকরা অন্ততঃ পঁচাত্তর জন লোক চাষ করে' খায়, আর বাকি লোকদের মধ্যে দু-পাঁচজন জমিদার বা বড় উকিল, ব্যারিষ্টার আর ব্যবসাদার। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ হয় ছোটখাট ব্যবসাদার, না-হয় চাকরে বা ইস্কুল মাষ্টার। শতকরা পঁচাত্তর জন যারা চাষ করে বা মজুরি করে' খায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই দেশী জমিদারের প্রজা, সামাজিক হিসাবে তারা আমাদের কাছে "ছোটলোক"।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি? দেশে এই যে স্বাধীনতার আন্দোলন, ধনী, মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র, এই তিন শ্রেণীর কাছে এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

দেশের মধ্যে যারা ধনী লোক, যেমন জমিদার আর বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার বা সওদাগর—দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় তাঁদের ক্ষতি হয়েছে কি? ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণেই তাঁরা ফেঁপে-ফুলে উঠেছেন, ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গেই তাঁদের প্রতিপত্তি জড়িত। ইংরেজ তাঁদের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করে না, বা ইংরেজ এদেশে থাকার দরুণ তাঁদের প্রভুত্ব যতখানি হতে পারতো ততখানি হয় না, এইটাই তাঁদের দুঃখ। তাঁরা যখন দেশের স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা নিজেদের দুঃখই দূর করতে চান। তাঁদের যে দেশপ্রীতি তার মূল হচ্ছে নিজেদের আরও একটু প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। এদেশে যদি উপনিবেশগুলোর মত স্বায়ত্ত-শাসনের কাছাকাছি একটা-কিছু পাওয়া যায়, আর দেশের শাসনভার যদি এই শ্রেণীর হাতে পড়ে, তা'হলে আর স্বাধীনতার জন্যে এঁরা

কেউ টুঁ শব্দটি করবেন না। এঁদের স্বাধীনতার ক্ষুধা মিটে যাবে।

তারপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা ধরা যাক। ইংরেজ রাজত্বে দেশের বড় বড় চাকরী পরহস্তগত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা নেই; সুতরাং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। ইংরেজী শিখে, চাকরী করে' যতদিন এদের পেট ভরতো, ততদিন এরা রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব বেশী যোগ দেয়নি। এরাই দেশের শিক্ষিত লোক; আত্মসম্মানবোধ এদের অনেকটা আছে। সুতরাং বিদেশের লোকের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে' যখন এদের মন চঞ্চল হয়ে উঠতো, তখন স্বাধীনতার সুখস্বপ্ন এরা দেখতো বটে, কিন্তু সেই প্রাণের জ্বালার সঙ্গে যখন পেটের জ্বালা এসে যোগ দিলে, তখন তারা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর দেশে যে বিপ্লবপন্থীর দল দেখা দিয়েছিল, তারা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বিপ্লবপন্থীদের নামের তালিকা দেখলে দেখা যায় যে, তারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ না-হয় বৈদ্য। অন্য শ্রেণীর লোকও ছিল; কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। বিপ্লবপন্থীরা দেশের স্বাধীনতা চাইতো বটে, কিন্তু সে-স্বাধীনতার মানে ইংরেজের বদলে দেশের উপর নিজেদের শ্রেণীর প্রভুত্ব।

বিপ্লবযুগের পর কংগ্রেসের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেছে। আগে যারা বিপ্লবপন্থী ছিল, মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে তারা অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান; তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তরূপ। কিন্তু কংগ্রেস কি চায়? মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, তিনি উপনিবেশগুলোর মত স্বায়ত্ত-শাসন পেলেই সন্তুষ্ট। অসহযোগীদের একখানা প্রধান কাগজ, মাদ্রাজের "স্বরাজ্য" সেদিন বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছে যে, অসহযোগীরা ইংরেজী শাসন-প্রণালীর কাঠামটা বদলাতে চায় না। ওটা এখন ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে; তা না হয়ে যদি দেশীলোকের স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হয়, তা'হলেই অসহযোগীরা তুষ্ট হবে। কিন্তু এই দেশীলোক কারা? বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র দেশীলোকের হস্তগত হলে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করা হবে? দেশে উপনিবেশের মত স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারী চাকরী-গুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তগত হবে; আইনকানুন করবার ক্ষমতা দেশের ধনী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসবে; দেশে কল-কারখানা আর ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থবলও বাড়বে। কিন্তু প্রশ্ন এই দেশের কতজন লোক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত? দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধীনতা লাভ মানে কি সারা দেশের স্বাধীনতা লাভ?

তোমরা হয়ত বলবে—"কেন? যাদের হাতে প্রভুত্ব এসে পড়বে, তারা সকলকে সেই স্বাধীনতার, সেই প্রভুত্বের, সেই অর্থের ভাগ দেবে।" আমরা বলি—"তা যে দেবে, তার প্রমাণ কই? আজকাল যখন স্বাধীনতার কথা ওঠে, তখন স্বাধীনতার খাতিরে জমিদার কি নিজেদের জমিদারী ছাড়তে চায়? দেশে যে-সমস্ত বড় বড় কলওয়ালা আছে, তারা কি স্বাধীনতার খাতিরে নিজেদের কুলি মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দিতে চায়? দেশের যত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জোতদার বা পত্তনিদার কি নিরন্ন প্রজার খাতিরে নিজেদের স্বার্থ ছাড়তে চায়? এখন চায় না; তা আবার নিজেদের হাতে প্রভুত্ব এলে, ত আরও চাইবে না।

ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে যা চায়, তা হচ্চে এই যে, তাদের নিজেদের রাজনৈতিক পরাধীনতা ঘুচে' যাক; কিন্তু দেশের জন-সাধারণের উপর তাদের যে আর্থিক বা সামাজিক প্রতিপত্তি আছে, তা ষোল আনা বজায় থাক। আজও কংগ্রেসের কর্ত্তারা যখন দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে যাচ্চেন, তখন বলছেন,—'তোমরা সরকারী খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ কর; কিন্তু দেখো, যেন জমিদারের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত না লাগে। বিদেশী কলওয়ালা যেন এদেশের টাকা লুঠতে না পারে; কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলওয়ালার যেন ক্ষতি না হয়।'

তা ত হবেই! দেশী কলওয়ালা যে কংগ্রেস-ফণ্ডে চাঁদা দেয়; আবার তাদের টাকা নিয়েই নাকি কংগ্রেস শ্রমিকসংঘ গড়বে!

এ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলন যে সফল হয়নি, তার কারণ হচ্চে এই যে, সে-স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু শ্রেণীবিশেষের আন্দোলন; আর সে-স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতার ভ্যাংচানি মাত্র; দেশের অধিকাংশ লোকের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক মুক্তির বার্ত্তা তার মধ্যে নেই।

দেশের যারা জনসাধারণ, বিদেশী ও স্বদেশীর পায়ের তলায় যারা সমানভাবে দলিত—তারা ষোল

আনা স্বাধীনতা চায়; এক সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক আর আর্থিক মুক্তিই তাদের কাম্য। স্বাধীনতার নাম করে' যে তাদের ডাক দেবে, তার শুধু আংশিক স্বাধীনতার কথা বললে চলবে না; ষোল আনা স্বাধীনতা দেবার জন্যে তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

অসহযোগ মরছে কেন?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পর তিন বৎসর হয়ে গেছে; আজ তার ফলাফল বিচার করবার সময় এসেছে।

এ আন্দোলনের গোড়ার কথা এই—মানসিক দাসত্ব থেকেই আমাদের বাইরের দাসত্ব এসেছে; অতএব মানসিক দাসত্ব দূর করবার জন্যে আগে বিদেশী আমলাতন্ত্রের সব সংস্রব ত্যাগ কর; তাদের স্কুল-কলেজে পোড়ো না, তাদের আদালতে মামলা-মোকদ্দমা কোরো না, তাদের দেওয়া উপাধি নিও না, তাদের আইন-কানুন তৈরী করার ভেতর থেকো না; যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হও, আর তারপর যদি দরকার হয় ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দাও, আর সব আইন অমান্য করতে সুরু করো। তা'হলেই বিদেশী আমলাতন্ত্র ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে।

কিন্তু আমলাতন্ত্র এই তিন বৎসর পরেও ভেঙ্গে পড়েনি; আর প্রত্যক্ষ যদি প্রমাণ হয় তা'হলে এ কথা অস্বীকার করে' কোনো লাভ নেই যে, বরং অসহযোগ আন্দোলনটাই ভেঙ্গে পড়বার জোগাড় হয়েছে। দেশের লোকের মনে প্রথমে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, আজ তার একেবারেই অভাব; আর যে-সমস্ত কর্ম্মী অসহযোগ-পন্থা অবলম্বন করে' দেশ-উদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, আজ তাঁদেরও মন সন্দেহে ভরে' গেছে। কংগ্রেস অফিসগুলি এক কোণে টিম্ টিম্ করছে; দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সেগুলির নাড়ীর যোগ যেন ছিঁড়ে গেছে। লোকে আর কংগ্রেস-কর্ম্মীদের কথায় বড় একটা কান দেয় না। অসহযোগের যাঁরা নেতা, কর্ম্মপন্থা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ দেখা দিয়েছে; যাঁরা সাবেক পন্থা পুরোপুরি বজায় রেখে খাঁটি অসহযোগী থাকতে চান, তাঁরাও এখন আর জোর করে' বলতে চান না যে, এই পন্থাতেই দেশের মুক্তি আসবে। কোন্ পন্থা খাঁটি অসহযোগ, আর কোন্‌টা তা নয়—এই কথাই এখন নেতাদের কাছে বিচার্য্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার কথাটা ক্রমেই চাপা পড়ে' আসছে।

এ সব মতভেদ আর মনোমালিন্য যে অকৃতকার্য্যতার ফল, তা বলাই বাহুল্য। যতদিন লোকের মনে কৃতকার্য্য হবার আশা ছিল, ততদিন এ সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়নি।

এখন প্রশ্ন এই—কেন এমন হলো, আর এই নৈরাশ্য দূর করবার কোনো উপায় আছে কি না?

দেশের তেত্রিশ কোটী লোক যদি বিদেশী আমলাতন্ত্রের সংস্রব ছেড়ে দেয়, আর খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দেয়, তা'হলে এই আমলাতন্ত্র যে কাজের বার হয়ে পড়বে আর ক্রমশঃ শুকিয়ে মারা যাবে, এ কথাটা বুঝতে বেশী দেরী লাগে না। কিন্তু তাই যদি হয়, তা'হলে দেশের লোক সে-কাজটা করে না কেন? সে প্রশ্নের উত্তর এই যে, কথায় কথায় আমরা যে-তেত্রিশ কোটীর দোহাই দি, সে-তেত্রিশ কোটীর স্বার্থ এক রকম নয়। দেশে এমন অনেক শ্রেণীর লোক আছে, যারা এই বিদেশী আমলাতন্ত্রের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে, যাদের আর্থিক স্বার্থ এই বিদেশী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তারা যে দেশের বাকি লোকের স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে, সে আশা করাই ভুল। তারপর দেশে এমন লোকেরও অভাব নেই, যারা ইচ্ছাসত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাতে পারে না। সুতরাং শাসনযন্ত্র চালাবার জন্যে যত লোকের দরকার, ততজন লোকের অভাব এদেশে কখনো হবে না। দেশের সমস্ত লোকের সরকারী সম্পর্ক ত্যাগ করার উপর যে-কর্ম্মপন্থার সাফল্য নির্ভর করে, সে-কর্ম্মপন্থা ব্যর্থ হবেই।

যাদের স্বার্থ আমলাতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয়, তারাই অসহযোগনীতি গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু তাদের যদি অসহযোগ-নীতি সফল করতে হয়, তা'হলে সুধু স্কুল-কলেজ, আদালত বা ব্যবস্থাপক-সভা বর্জ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখলেই চলবে না। এগুলোর উপর নির্ভর করে' আমলাতন্ত্র বেঁচে নেই, এগুলো যদি ষোল আনা বর্জ্জন করা যায়, তা'হলেও আমলাতন্ত্র ভেঙ্গে পড়বে না। এই অসহযোগনীতির মধ্যে একমাত্র জিনিষ যা আমলাতন্ত্রকে ভাঙতে পারে, তা খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে-শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা করে' থাকেন, তাঁরা সবাই

যদি খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করেন, তা'হলেও আমলাতন্ত্রের বিশাল পকেট শূন্য হবে না। দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ যদি কোনো দিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে, তা'হলেই অসহযোগনীতি সফল হতে পারে।

কিন্তু জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা সফল হয়নি, জনসাধারণের দোষে নয়, অসহযোগী নেতাদের দোষে। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণকে তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামত কাজে লাগাতে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ সত্যি সত্যি কি চায়, তা নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করেননি। কংগ্রেস অফিসের কোণে বসে' তাঁরা ঠিক করলেন যে, দেশ চায় আধ্যাত্মিক স্বরাজ আর উপায় হচ্চে অহিংস অসহযোগ। কিন্তু পোড়া দেশের লোক আধ্যাত্মিক স্বরাজ চায় কি আধিভৌতিক স্বরাজ চায়, তা কেউ মাঠে গিয়ে চাষাদের কাছে কিম্বা কল-কারখানায় গিয়ে মজুরদের কাছে জিজ্ঞেস করেননি। অথচ এই মেঠো চাষা আর মজুরই দেশের তেত্রিশ কোটির ভেতর বত্রিশ কোটি। কোন্ দুঃখ প্রতিদিন তাদের মুখের গ্রাস তিক্ত করে' তুলছে, কোন্ অত্যাচারে তাদের মনুষ্যত্ব প্রতিদিন পরের পায়ে দলিত হচ্চে, কেমন করে' সেই দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচারের প্রতিকার হবে —সে-সব কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর কেউ দিলেন না; মাঝে থেকে কতকটা আধ্যাত্মিক কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে' নিজেদের বুদ্ধি ও দেশের লোকের বুদ্ধি ধোঁয়াটে করে' তুললেন। দেশের চাষারা যখন নিজেদের বুদ্ধি আর শক্তি মত সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের দুঃখ দূর করবার জন্যে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করলে, তখন অসহযোগ নেতারা 'ভালো করতে পারিনে মন্দ করতে পারি' এই নীতির অনুসরণ করে' হুকুম দিলেন—

"Complaints having been brought to the notice of the Working Committee that ryots are not paying taxes to the Zeminders, the Working Committee advises Congress workers and organisations to inform the ryots that such withholding of rents is contrary to the resolutions of the Congress and that it is injurious to the best interests of the country."

এ হুকুম যে শুধু জমিদারের খাজনার ব্যাপারে হয়েছিল তা নয়, সরকারী ট্যাক্স সম্বন্ধেও হয়েছিল।

এর ফলে দেশের চাষা-ভুষো লোকে বুঝলে যে বাবুরা যে-স্বরাজ চান, তার সঙ্গে জনসাধারণের প্রতিদিনের দুঃখ ঘোচাবার কোনো সম্বন্ধ নেই। নেতারা যখন তাদের বল্লেন—"তোমরা ঘরে গিয়ে চরকা কাট আর জমিদারের দরোয়ানের আর সরকারী পুলিসের গুঁতো নির্ব্বিবাদে হজম করে' তিতিক্ষাসাধন করো"—তখন তারা অবিশ্বাসের ম্লান হাসি হেসে চুপ করে' বসে' রইলো। এ কথা তারা কিছুতেই বুঝতে পারলে না যে, পেটের জ্বালায় আর অত্যাচারের তাড়নায় তারা যা করছে তা কেমন করে' হয়ে দাঁড়াল injurious to the best interests of the country! তা'হলে country মানে কি শুধু কংগ্রেসী নেতার দল?

আজ যদি জনসাধারণের ভাঙ্গা মন আবার জোড়া দিতে হয়, তা'হলে সমস্ত ধোঁয়াটে কথা ছেড়ে দিয়ে, সব রকম আধ্যাত্মিক ন্যাকামী দূর করে' খুব স্পষ্ট ভাষায় দেশের লোককে বুঝিয়ে দিতে হবে—স্বরাজ মানে কি। আর স্বরাজ হলে তারা এখন যেমন কলুর বলদ হয়ে আছে তাই থাকবে, না মানুষের মত ব্যবহার পাবে। যে-জমি তারা চাষ করে, সে-জমির মালিক কি তারা হবে? যে-কারখানায় খেটে তারা প্রাণপাত করে, সে-কারখানার লভ্যাংশ কি তারা পাবে? রোগে তাদের চিকিৎসা হবে? তাদের ছেলেপিলের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে? আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক—সব বিষয়ে তারা সমানাধিকার পাবে ত?

অসহযোগের নেতারা যদি দেশকে জাগাতে চান, তা'হলে এই সব কথার সদুত্তর দিতে হবে, আর হিংসা শ্রেয়ঃ কি অহিংসা শ্রেয়ঃ, এ কথার মীমাংসার ভার নিজেদের হাতে না নিয়ে দেশের বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিতে হবে। এ কথা তাঁদের বুঝতে হবে যে, দেশ তাঁদের নয়, তাঁরাই দেশের; দেশ তাঁদের খেয়ালমত চলবার জন্যে জন্মায়নি, তাঁরাই দেশের সেবা করতে জন্মেছেন। সেবার নামে যদি তাঁরা দেশের উপর আধিপত্য করতে চান, তা'হলে দেশ নিজের রাস্তা নিজে বেছে নেবে—তাঁরাই ঘরের কোণে পড়ে' পড়ে' আর্ত্তনাদ করতে থাকবেন।

—

প্রোলিটারিয়েট বনাম বুর্জোয়া

দেশের কংগ্রেসী-কাগজওয়ালাদের একটি বাঁধা সুর হচ্চে এই—"দেশকে জাগাবার জন্যে আর যা-কিছু পারো তা করো, কেবল জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলো না।" এই শ্রেণীর একখানি খবরের কাগজে সেদিন লেখা হয়েছে :—

"দেশের কৃষকদের প্রতি যে অবিচার হইতেছে, মিল-ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের মনুষ্যত্ব যেমন নির্ম্মম-ভাবে নষ্ট করা হইতেছে, তাহাতে এদেশের লোকের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু ইহাও মিথ্যা নয় যে, সমাজের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সুরু হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।······

"এ কথার উত্তরে অবশ্য এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে কি আমাদের শ্রমিক, আমাদের কৃষকেরা যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন অত্যাচার সহিয়াই যাইবে, মানুষের জন্মগত অধিকার কি কখনো তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না?······

"প্রোলিটারিয়েটকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এমন দাওয়াই আবিষ্কার করিতে হইবে যা ব্যাধি দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে বিষাক্ত করিয়া না রাখে।······

"প্রোলিটারিয়েটের কাছে পরাজিত হইলেও বুর্জোয়া যে সে পরাজয়ের গ্লানি বুকে জমা করিয়া রাখিবে না এবং সেই দিনের প্রত্যাশা করিবে না, যেদিন সে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পারে, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।······

"বুর্জোয়ার প্রভুত্ব কমাইতে হইবে, তার স্বার্থভরা মনে যাহাতে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জাগিয়া উঠে, তাহাই করিতে হইবে।······

"প্রোলিটারিয়েটকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে, যাহাতে বুর্জোয়া আপনি তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থ প্রোলিটারিয়েটকে অনেকটা ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ প্রোলিটারিয়েটদের মাথায় যাহাতে খুন না চাপে, তাহার দিকেই নজর দিতে হইবে।"

প্রবন্ধটির যে যে অংশ উদ্ধৃত করা গেল, মোট কথায় তার সার অর্থ হচ্চে এই—"জমিদার আর কলওয়ালার হাতে পড়ে' চাষার আর মজুরের অনন্ত দুর্গতি হয়েছে, তা ঠিক; আর এ রকম অবস্থায় বেশীদিন থাকলে তারা যে মরে' ভূত হয়ে যাবে, এও ঠিক। কিন্তু দোহাই তোমাদের, জমিদার আর কলওয়ালা বাবুদের যতদিন না সুবুদ্ধি হয়, তাঁরা নিজের স্বার্থ ভুলে' গিয়ে যতদিন না চাষা আর মজুরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার জন্যে প্রেরণা পান, ততদিন চাষা আর মজুরদের একটু ধৈর্য্য ধরে' তিতিক্ষাসাধন করতে বলো। কেননা চাষারা জোর করে, যদি জমিদারদের হারিয়ে দেয়, বা মজুরেরা কলওয়ালাদের হারিয়ে দেয়, তা'হলে জমিদার ও কলওয়ালা বাবুরা বা তাঁদের বংশধরেরা মনে মনে ভারী চটে' থাকবেন; আর সেই চটাচটির ফলে দেশের একতা নষ্ট হবে; আর সে-একতা নষ্ট হলেই অহিংসভাবে স্বরাজ স্থাপনের experimentটা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে যে-দেশে ত্রিশ কোটি লোক চাষা আর মজুর, সেখানকার স্বদেশ-প্রেমিক বীরেরা দেশের লোককে উপদেশ দিচ্ছেন—'আগে জমিদার আর কলওয়ালারা শ্রদ্ধা আর সমবেদনা সম্পন্ন হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়ুন, তারপর তোমরা নিজেদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করো, ঐ সমস্ত গুণ তাঁদের মধ্যে আসবার আগে যদি তোমরা মরে' পচে' যাও, তা আর করবে কি! কিন্তু খুব হুঁসিয়ার। দেখো যেন পেটের জ্বালায় বা অপমান অত্যাচারে তোমাদের মাথায় খুন না চাপে; তা'হলে দেশের এত সাধের আধ্যাত্মিকতা একদম নষ্ট হয়ে যাবে।"

দেশের আড়াইজন জমিদার বা কলওয়ালার মনে পাছে বিদ্বেষের বীজ থেকে যায়, এই ভয়ে যাঁরা লক্ষলক্ষ লোকের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে বজায় রাখতে চান, তাঁদের আধ্যাত্মিকতা আর প্রেমের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়। তাঁদের প্রেম জিনিষটা এত এক-তরফা হচ্ছে কেন, তা তাঁরা কখনও ভেবে দেখেছেন কি? যে মনোবৃত্তির ফলে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় Law আর Order-এর দোহাই দেন, যার ফলে মাঝে মাঝে বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতের জন্যে পঙ্গু Sympathyর ফোয়ারা ছোটে, আধ্যাত্মিকতার মুখস পরে' সেই জিনিষই যে তোমাদের স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ করে' দিচ্ছে, এ সন্দেহ কি কখনও তোমাদের মনে আসেনি? দেশে গোলমাল হলে পাছে তোমাদের নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ নষ্ট হয়, এই ভয়ই তোমাদের আড়ষ্ট করে' রেখেছে। দেশের স্বাধীনতার চেয়ে নিজেদের স্বার্থের দিকেই

তোমাদের ঝোঁক বেশী; তাই প্রাণ ভরে' তোমরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করো না—দেশের সমস্ত শক্তিকে ভাক্ত আধ্যাত্মিকতার চাপে পঙ্গু করে' দিতে চাও। কিন্তু এ কথা ভুলো না যে, ধ্বংস সৃষ্টিরই পূর্ব্বাভাষ, রুদ্র শিবেরই আর-এক রূপ, আর বিপ্লব সেই রুদ্রের নয়ন-নিঃসৃত ক্রোধাগ্নি।

ভগবান সুধু 'নাড়ু-গোপাল' নন্, কখন কখন তিনি 'লোকক্ষয়কৃৎ কাল'।

আন্দোলন ভাঙ্গে কেন ?

'বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাসের' এক অধ্যায় লেখবার সময় ভূতপূর্ব্ব "যুগান্তর"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,—"গণসঙ্ঘ কখনও বৈপ্লবিকদের হাতে আসে নাই। তাহাদের কি উপায়ে হাতে লইতে হইবে, তাহা আমরা জানিতাম না, পরবর্ত্তীরাও জানিতেন না এবং বোধ হয় এখনও নেতারা জানেন না।"

কথাগুলো খুবই সত্যি; আর সত্যি বলেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমাগতই মাঝপথে ভেঙ্গে পড়েছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তাঁরা violent আর non-violent দু রকম পথ ধরেই দেখেছেন। তার ফলে কিছু যে লাভ হয়নি তা নয়, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের যেটা মূল লক্ষ্য—জাতীয় স্বাধীনতা লাভ—সেটা দূরেই পড়ে' আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগের পর যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তার পিছনে ছিলেন প্রধানতঃ কয়েকজন ধনবান হিন্দু জমিদার আর বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মুসলমানদের মধ্যে ইতর-ভদ্র প্রায় সবাই সে-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, আর হিন্দু জনসাধারণ বঙ্গ-বিভাগের ফলে কি ক্ষতি হল তা ভালো করে' বুঝতেই পারেনি। এই আন্দোলনের খানিকটা আঁচ যে জনসাধারণের গায়ে লেগেছিল, তার কারণ হচ্ছে এই যে, বিদেশী-পণ্যবর্জ্জন চেষ্টার ফলে অনেক দেশী শিল্পী লাভবান হতে আরম্ভ করেছিল। আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সহানুভূতির সেইটাই ছিল মূল কারণ।

সরকার বাহাদুরের গুর্ঝার গুঁতোয় যখন বিদেশী-পণ্যবর্জ্জন কঠিন হয়ে পড়লো, তখন জনসাধারণের উৎসাহ কাজে কাজেই কমে' গেল। বোমা-রিভলভারের সাহায্যে যাঁরা বিদেশী আমলাতন্ত্র উড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প করে' কার্য্যক্ষেত্রে নামলেন, তাঁরা প্রধানতঃ ভদ্রশ্রেণীর লোক। বিদেশীর শাসনে বাস করে' তাঁদের আত্মসম্মানবোধ প্রতি-পদেই ক্ষুণ্ণ হতো, আর সেই অপমানবোধই তাঁদের রাজনৈতিক বিপ্লব-চেষ্টার গোড়ার কথা। কিন্তু বিদেশী-শাসনের যে অপমান, জনসাধারণের সে অনুভূতি প্রবল নয়। আমরা নিজেরাই জন-সাধারণকে সামাজিক আর আর্থিক হিসাবে এমনি দাবিয়ে রেখেছি যে, তাদের আত্মসম্মানবোধ কখনও প্রবল হতে পায়নি, কাজে কাজেই এই বিপ্লব-চেষ্টায় জনসাধারণ যোগ দেয়নি।

তারপর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু আর মুসলমান বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে, সত্যই বুঝি এটা ভবিষ্যৎ ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাষ। অনেকেই ঠিক করেছিলেন যে, পাঞ্জাবের অপমান আর খেলাফতের লাঞ্ছনা হিন্দু-মুসলমান ইতর-ভদ্র সকলের হাড়ে হাড়ে বিঁধেছে, আর এই দুটোর প্রতিকার চেষ্টা করতে করতেই মহাত্মার নেতৃত্বে ভারতে স্বরাজ এসে পড়বে। অশিক্ষিত জনসাধারণ যখন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের অর্দ্ধস্ফুট গর্জ্জন শুনে অনেকেই আশায় নেচে উঠেছিলেন, অনেকেই ভেবেছিলেন—এটা নেতৃত্বের মাহাত্ম্য, অহিংস আন্দোলনের অলৌকিকত্ব।

নেতৃত্বের মাহাত্ম্য যে এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকখানি ছিল, তাতে কারো সন্দেহ নেই; কিন্তু এর মূলে যে তা ছাড়া আরও অনেক কারণ বর্ত্তমান ছিল, তা প্রমাণিত হতে বেশী দিন লাগেনি। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে এ দেশের অন্ধ জনসাধারণেরও চোখ ফুটতে আরম্ভ করেছিল, তাদের মূক মুখেও ভাষা ফুটেছিল। চারিদিকের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তাই যখন দীনহীন শীর্ণ তপঃক্লিষ্ট মহাপুরুষের মুখ থেকে তেজোগর্ভ আশার বাণী বেরিয়েছিল, যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যেই তাদের দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হয়ে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট, মহামারী-পীড়িত, অত্যাচারিত জনসাধারণ উন্মত্ত হয়ে তাঁকে

ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল —"গান্ধী মহারাজ কী জয়।"

তারপর এমন একদিন এলো, যখন এই স্বরাজ কথাটা জনসাধারণের কাছে একটা অর্থশূন্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল। যে-জমিদারের জ্বালায় প্রজারা অস্থির হয়ে উঠেছিল, স্বরাজ হলেও নাকি তাদের এই জমিদারের প্রজা হয়েই থাকতে হবে, জমিদারের খাজনা বন্ধ করলে নাকি স্বরাজলাভের পথে কাঁটা পড়বে—ইত্যাদি অনেক রকম কথাই তারা শুনলে। প্রথমেই তারা বলে' উঠলে—'এ সব কথা গান্ধী মহারাজের নয়। এ সব দুষ্ট লোকের বানানো কথা।' তারপর যখন বড় বড় অহিংস অসহযোগীরা তাদের জানিয়ে দিলে যে—'হাঁ, গান্ধী মহারাজের বাণী' তখন তারা বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে ম্লান মুখে ঘরে ফিরে গেল। তাদের অন্তরের কথা অন্তর্য্যামীই বলতে পারেন, কিন্তু সেই দিন থেকে আর তারা এই আন্দোলনের দিকে চায় নি। আমাদের স্বরাজের আদর্শে যে জনসাধারণের মন ভরে না, এতে এই কথাটাই প্রতিপন্ন হলো।

তারপর ঐ ভাঙ্গা মন জোড়া দেবার চেষ্টায় অনেকে রকম-বেরকমের দেশ-সেবার আয়োজন করেছেন। কেউবা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, কেউবা তাদের ভাঙ্গা লাউ-মাচার বাঁশের খুঁটি জুগিয়ে দিয়ে তাদের মন কেড়ে নেবার চেষ্টায় আছেন, কেউবা ভাগবতের তত্ত্বকথা শুনিয়ে তাদের তাপিত প্রাণ শীতল করবার জোগাড় করছেন। কিন্তু গোড়ার কথার দিকে কেউ বড় একটা ঘেঁষতে চান না। সে গোড়ার কথা শোনাতে গেলে রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নাকি সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিপ্লব সুরু হয়ে যাবে, আর তাতে নাকি ঢাক, ঢাকী, মনসা, সবই বিসর্জ্জন হয়ে যাবে! আমাদের স্বদেশ-সেবকদের রাজনৈতিক বিপ্লবে আপত্তি নেই, কিন্তু সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিপ্লব (যাতে তাঁদের নিজেদের পুঁটুলিতে হাত পড়বে) তার নাম শুনলেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন।

এই মনস্তত্ত্বই স্বদেশ-সেবার অন্তরায়; এরই ফলে অতীতের যত আন্দোলন সব মাঝপথে ভেঙ্গে পড়েছে; আর এখনও যদি আমাদের আক্কেল না-হয় ত', বলতে হবে যে, ভবিষ্যতের ব্যর্থতার বীজও ঐখানে নিহিত রয়েছে।

ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম

—:•:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পড়িয়া মরিল—ইহার একটা প্রকাণ্ড তালিকা না হয় নাই প্রস্তুত করিলে? আর জাতীয় উন্নতির কথা যদি বল—এ জগতে কত জাতি উঠিল, কত জাতি পড়িল, কত জাতির বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গেল—কে কাহার সংবাদ রাখে? মানুষের জীবনই যখন এত ক্ষণভঙ্গুর, তখন কে ক'দিনের জন্য কাহার রাজ্য কাড়িয়া লইল, তাহার হিসাব রাখিয়াই বা কি লাভ? সংসারটাই যখন দু'দিনের তখন এ সব বাজে কাজ ছাড়িয়া দিয়া যাহা চির দিনের তাহাই সম্বল কর। নশ্বর জীবন লইয়া বৃথা টানাটানি করিয়া কি হইবে?"

কথাটা ত ঠিক। মৃত্যুর মত অত বড় সত্য জীবনের মাঝখানে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না—শ্মশানের দুই মুঠা ছাই-ই যদি ইহ-লীলার পরিণাম হয়, তাহা হইলে এ কর্ম্মভোগ ত না করাই ভাল। যথাসাধ্য পরকালের সম্বল করিয়া এ কুস্থান ত্যাগ করিতে পারিলেই ত সুবিধা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে আসিয়া উপস্থিত হয়—জীবন ছাড়িয়া পলায়নই যদি জীবনের সারসত্য, তবে ইহা আসিল কোথা হইতে? যাহা চিরন্তন সত্য, তাহার মধ্যে মনুষ্যজীবনের কি কোনও স্থান নাই? পলায়নের রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করাই কি মনুষ্য-বুদ্ধির চরম কাজ? মানুষের যে প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা—এগুলা কি সমস্তই বাজে? সবটাই শুধু 'মিছে কথা, ছলনা?' মানুষ মরে—বেশ কথা। কিন্তু সংসার ত মরে না। তুমি আমি মরিয়া ভূতই হই বা ভগবানই হই, তাহাতে কি আসিয়া যায়? আমাদের মরণের বা মুক্তির পরদিনও আবার সহস্র কোটী নরনারী স্নেহমমতাভরা প্রাণ লইয়া নিরাশার অশ্রু মুছিয়া আনন্দের সংসার পাতিবার চেষ্টা করিবে। তুমি বলিবে সে বৃথা চেষ্টা—সংসার শুধু দুঃখময়। কিন্তু সে পণ্ডিতি কথায় ষোল আনা সায় দেওয়া ত চলে না। সুখ দুঃখের জমাখরচের হিসাব দেওয়া সহজ নহে; কিন্তু মোটের উপর যদি দুঃখের অপেক্ষা সুখের মাত্রা বেশী না হইত, তাহা হইলে কে-ই বা এ সংসারের বোঝা পিঠে করিয়া ফিরিত; কে-ই বা সংসারের চাকায় তেল লাগাইতে যাইত? মানুষ সংসারের মধ্যেই আপনার সমস্ত অভাব পুরণ করিতে চায়; ইহাই তাহার স্বাভাবিক প্রেরণা। মানুষের জ্ঞানের অভাব, তাই সে আরও জ্ঞান চায়; শক্তির অভাব, তাই সে শক্তিমান হইতে চায়; জীবনে অনেক দুঃখ, তাই সে দুঃখ দূর করিয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। জীবনের মধ্যে থাকিয়া সে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির অধিকারী হইতে চায়; জীবন ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে নাই। মৃত্যু দুঃখময়—বেশ কথা, মৃত্যুকে জয় কর; জীবন সহস্র অভাবে ভরা,—সে অভাব দূর করিবার জন্য শক্তি অর্জ্জন কর। কিন্তু মৃত্যু ও অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সারা জীবনটাকে ত্যাগ করিবার সার্থকতা কি?

প্রাচীনের দল এখানে হাসিয়া বলিবেন—'আরে বাতুল! তা'ও কি হয়? পূর্ণ আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তির অভিব্যক্তি এ সংসারের মধ্যে হইবার উপায় নাই; এ সংসারটা এমনি মাটিতে গড়া যে, তাহাতে শিব গড়িতে গেলেই তাহা বানর হইয়া দাঁড়াইবে। বিশ্বাস না হয়, ত দু' চারখানা সংস্কৃত পুঁথি খুলিয়া দেখ। তাহার উপর ত আর কথা করিবার জো নাই!"

কিন্তু মানুষের কেমন কু-অভ্যাস, শারীরক ভাষ্যের বাঁধনেও সে বাঁধা পড়িতে চায় না। সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াও তাহার উপর তর্ক চালাইতে চায়। তাহার অন্তরের মধ্যে যে অশরীরী ভাষ্য ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে না মিলিলে শারীরক ভাষ্যকেও নাকচ করিয়া দেয়।

আজ আমি অপূর্ণ, আজ আমি দুর্ব্বল, আজ আমার জীবন নিরানন্দময়, সব কথাই স্বীকার করিয়া লইলাম—কি করিয়া যে এ সমস্ত অভাব দূর করিব, সে পথও হয় ত আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু পথ যে নাই, তাহা স্বীকার করিব কেন? সমস্ত প্রাকৃতিকে জয় করিবার যে অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সহস্র পরাজয়েও যে জয়ের আকাঙ্ক্ষা মরিতে চাহে না—কোন্ শাস্ত্র আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিবে যে তাহা মিথ্যা? ইহা ত বুদ্ধির বিচারের কথা নহে; এ অনুভূতি যে আমাদের অন্তরের গূঢ়তম সত্ত্বার সহিত একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দুইটা শ্লোকের খাতিরে আমি ইহা পরিত্যাগ করিব কেমন করিয়া?

প্রাচীন এ কথার উত্তরে বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া বলেন—"ইহারই নাম ত মায়া; কর্ম্মভোগ না কাটিলে আর ইহার হাত হইতে রক্ষা নাই। এই বকাণ্ড-প্রত্যাশা যদি কখনও ত্যাগ কর ত দেখিতে পাইবে যে, যিনি আনন্দময় ব্রহ্মপুরুষ, তিনি একেবারে এ মায়া-সম্বন্ধ-রহিত। সেই ব্রহ্মস্বরূপ্যলাভ করিলে এই সংসার একেবারে

নির্ব্বীজরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; সংসারের দুঃখ-জ্বালাও জুড়াইয়া যায়। আর তোমাদের রাজ-নৈতিক সমাজ-নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গবেষণাও চিরদিনের মত শান্ত হইয়া যায়।"

ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করিলে যে দুঃখ যায়, তাহা না হয় বুঝিলাম; কিন্তু কর্ম্মভোগও যদি সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া যাইত, তাহা হইলে এ শুভসংবাদ সংসারে প্রচার করিবার জন্য কেহ ফিরিয়া আসিত কি? সংসারের বীজ পর্য্যন্ত যে একেবারে ধ্বংস হয় না, তাহার প্রমাণ যাঁহারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা নিজেই। বীজ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া গেলে সংসারে ব্রহ্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার কেহ থাকিত না। আরও এক কথা এই যে, ব্রহ্ম যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিত? জীবকে যে শক্তি আপনার ব্রহ্মস্বারূপ্য দেখাইয়া দেয়, তাহা প্রাকৃতিক শক্তি। সে শক্তি অর্জ্জিত হইবার পর জীবনের মধ্যে কার্য্যকরী না হইবে কেন? প্রকৃতির শান্ত অবস্থার মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতির চঞ্চল অবস্থার মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, পূর্ণজ্ঞান ও শক্তি লইয়া মনুষ্যজীবনকে রূপান্তরিত করা চলে কি না, মায়াবাদী বৈদান্তিক সমাজে সে পরীক্ষা আদৌ হয় নাই; বাংলাদেশের তান্ত্রিক সমাজে সে চেষ্টা কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। মনের অতীত সত্ত্বায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া মন ও শরীরকে পূর্ণজ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি প্রকাশের যন্ত্ররূপে যে রূপান্তরিত করা যায়—এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তুতঃ তাহা করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, আর তাহা না হইলে ব্রহ্মের জীবরূপ ধারণ নিতান্ত খামখেয়ালি ব্যাপার হইয়া পড়ে।

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রহ্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া দাঁড়ায়। তখনই সে প্রকৃত স্বরাট। আধি, ব্যাধি, অভাব, মৃত্যু, শোক, দুর্ব্বলতা জয় করিবার ঐ একমাত্র পন্থা। জীবন ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়া একটা গোঁজামিল মাত্র।

অনেক দেশ উঠিয়াছে, অনেক দেশ পড়িয়াছে। সাগর-বক্ষে বুদ্বুদের মত প্রকৃতির কোলে অসংখ্য জীব জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে। মনুষ্য-বুদ্ধি তাহার হিসাব করিতে গেলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতির এই লীলা একটা উদ্দেশ্যহীন বাতুলতা নহে; ইহার মধ্যে ক্রমবিকাশের একটা ধারা রহিয়া গিয়াছে। পঞ্চভূত রূপান্তরিত হইয়া বৃক্ষলতার মধ্যে প্রাণের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; প্রাণ জীবশরীরে রূপান্তরিত হইয়া মনের আসনে পরিণত হইয়াছে; মনুষ্য-শরীরে মন ও বুদ্ধির মধ্যে অহংসত্ত্বা স্ফূর্ত্ত। অহংসত্ত্বা হইতেই ভেদের উৎপত্তি বলিয়া মানুষ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া নিরানন্দময় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-লীলা শেষ হইয়া যায় নাই। ভেদ-বুদ্ধি-জর্জ্জরিত জীব আজ আপনার ক্ষুদ্রতায় পীড়িত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। প্রকৃতির ইহা প্রসব বেদনা। অহং যে মনোতীত সত্ত্বার খণ্ডিত বহিঃরূপ মাত্র, মনুষ্য-প্রকৃতির মধ্যে সেই সত্ত্বার আত্মপ্রকাশের সময় আসিয়াছে। নর এবার আপনার খণ্ডরূপ অতিক্রম করিয়া নারায়ণকে আপনার মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। সেইখানেই মানুষের একতা, সেইখানেই মানুষের স্বাধীনতা। সেই অবস্থা লাভ করার চেষ্টার নামই ধর্ম্মসাধনা। মানুষের উন্নতির ইহাই ভিত্তি।

নবীন দলের যাঁহারা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় ত এই সময় বলিয়া উঠিবেন—"তুমি না হয় শরীরের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনন্দময় হইয়া বসিয়া রহিলে, কিন্তু সমাজের দুঃখ, জ্বালা ত ঘুচিল না।" এ কথার উত্তরে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, "জীবনের" মধ্যে জীবের পূর্ণরূপের প্রতিষ্ঠাই যখন ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য এবং জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য যখন সমাজ একান্তই আবশ্যক, তখন সমষ্টিগত জীবন বা সমাজের সৃষ্টি ও রক্ষার উপযোগী সমস্ত কাজ-কর্ম্মই এই ধর্ম্মসাধনার অন্তর্ভুক্ত। রাজনীতিই বল, অর্থনীতিই বল, আর গার্হস্থ্যনীতিই বল, সমস্তই এই ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত। ভারতবর্ষীয় সমাজের মনে এই সাধনের ছাপ অনেক দিন হইতে পড়িয়া গিয়াছে; ইহা আমাদের অস্থি-মজ্জার সহিত জড়িত। আর প্রকৃত পক্ষে ইহাই মানুষের জীবনের গোড়ার কথা। খণ্ড মানুষকে লইয়া কখনও মুক্ত সমাজ গড়িয়া উঠিবে না। মানুষকে আপনার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও; স্বাধীন ও আনন্দময় সমাজ আপনিই গড়িয়া উঠিবে। যাহারা অহঙ্কারের দাস, তাহারা মোহান্ধ হইয়া তোমার পথে বাধা দিতে আসিলে আপনিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

সংসার ও ভগবান

কবি যখন গরম গরম চায়ের পোয়ালা নিঃশেষ করিতে করিতে লিখিয়া ফেলিলেন—God's in His heaven; all's right with the world, তখন নিশ্চয়ই দৈনিক সংবাদপত্রখানার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। বিজলীশোভিত নৃত্যগীতমুখরিত লর্ডলেডীর প্রাসাদের পার্শ্বেই যে কত দীন হীন দরিদ্রকে শীত, রোগ ও অনাহারের তাড়নায় ভগবানের এ সুখের সংসার হইতে তাড়াতাড়ি নোটিশ দিয়া ছুটিয়া পড়িতে হইতেছে, সে তালিকাটী চক্ষের সম্মুখে পড়িলে কবিহৃদয়েও একটা সন্দেহ উঠিতে পারিত, যে, জগতের কোথাও বুঝিবা একটা গোলমাল রহিয়া গিয়াছে; স্বর্গের ভগবান স্বর্গে থাকিয়া এ মর্ত্ত্যলোক পরিচালনের একটা সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যাহারা এই সংসার-চক্রের চাপে পড়িয়া দলিত, মথিত, পিষ্ট হইয়া যাইতেছে, ক্ষীরসমুদ্রশায়ী সুপ্ত ভগবানের অস্তিত্ব তাহাদের হৃদয়ে যে কতখানি শান্তির ধারা ঢালিয়া দিতেছে, তাহা আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ক্ষীর-সমুদ্রের এক বিন্দু ক্ষীরও যাহাদের অদৃষ্টে জুটিল না, ভগবানের ভাণ্ডারে ক্ষীরের পরিমাণ কত, সে হিসাব তাহারা না হয় নাই লইল!

ইউরোপ তাই মোটামুটি ঠিক করিয়া বসিয়াছে যে, সংসারের কাজে আর ভগবানকে লইয়া টানাটানি করিয়া কাজ নাই। যে ভগবান অব্যবহার্য্য, সংসারের কোনও কাজেই যাঁহার একটু সাহায্য পাইবার আশা নাই, তাঁহার থাকা না থাকায় লাভ ক্ষতিই বা কি? সংসারের এ বোঝা যখন আমাদের নিজের বলেই বহিতে হইবে, তখন ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া না থাকিয়া নিজের কাঁধে যাহাতে একটু বল সঞ্চার হয়, সেই চেষ্টা করাই ভাল, সে কালের ভগবান এক আধ বার একটু আধটু miracle দেখাইয়া তবু তাপিত প্রাণে আশার বারি সিঞ্চন করিতেন; একালে যখন তিনি সেটুকুও করিতে কুণ্ঠিত, তখন দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিজের কাজে লাগিয়া যাওয়াই ভাল। ভগবানকে ছাড়িয়া সংসার করা চলে, কিন্তু সংসার ছাড়িয়া ভগবানের আশায় বসিয়া থাকা চলে কি? পেটের জালা যে বড় জালা!

ধার্ম্মিক পুরুষেরা হয়ত এ কথার উত্তরে বলিলেন—তা' চলে বৈ কি। পেটের জালা বড় হইলেও প্রাণের জালাও ত নেহাৎ ছোট নয়। এই যে তোমার এত সাধের সংসার, যাহা না হইলে তোমার চলে না,—ইহারও ত যেদিকে চাও, শুধু একটা মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। আজ যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তরুণীর বিলোল কটাক্ষ তোমার শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ ছুটাইতেছে, প্রাণে কত কবিতার উৎস খুলিয়া দিতেছে, কাল হয় ত তাহা রোগে শোকে দীপ্তিহীন হইবে; আজ যে ফুটন্ত মল্লিকার মত সুকুমার শিশুকে কোলে লইয়া তোমার বুক পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে, আজ যাহার অর্দ্ধস্ফুট কাকলী তোমার কাণে মধু ঢালিয়া দিতেছে—কাল হয় ত তাহার প্রাণহীন দেহ গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। তুমি যাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছ, হাতে ধরিয়া ক, খ, শিখাইয়াছ, সে হয়ত বিলাতী বিদ্যার বুকনী শিখিয়া মুখ বাঁকাইয়া তোমাকে বলিবে—old fool! সংসার কি সত্যই এত মিঠা যে, ইহা আঁকড়াইয়া পড়িয়া না থাকিলে চলিবে না? আর ঐশ্বর্য্য!—হায় রে, তুমি ত তুমি! কোথায় গেল রাবণ রাজার সোণার লঙ্কা—যদুপতেঃ কঃ গতা মথুরাপুরী, ইত্যাদি।

বিষম সমস্যা। শ্যামের মন রাখিতে গেলে কুল থাকে না, আর কুল মানের দিকে চাহিতে গেলে শ্যামের বাঁশী শোনা চলে না; এ দোটানায় পড়িয়া ব্রজের কুলবালারা দাঁড়ায় কোথায়?

চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি—সংসারে ও ভগবানে নাকি সনাতন বিরোধ, যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি, যাঁহা কাম তাঁহা রাম নেহি। মানুষ কি সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই ভগবানকে খোঁজে, না ভগবানের সঙ্গে তাহার আরও কিছু অন্তরের টান আছে?

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ কিসের টানে ছুটিয়া বেড়াইত জানি না; হয় ত শুধু পেটের জালায়। কিন্তু বহু দিন হইতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ ভিন্ন আরও কিছু টান যে সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পেট ভরিলেও তাহার মনটা ভরে না। অরণ্য কাটিয়া সে যে নগর বসাইয়াছে, পর্ণকুটীর ছাড়িয়া সে যে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে, বল্কল ছাড়িয়া সে যে বেনারসী সিল্ক ধরিয়াছে, ভেলা ছাড়িয়া সে যে আকাশপোতে দিগ্‌বিদিকে ছুটিতেছে, নভোমণ্ডলের তারা গণনা শেষ করিয়া সে যে আজ মঙ্গলগ্রহের ঘরের সংবাদ লইতে সচেষ্ট,

সে যে আজ আপনার সভ্যতা, নীতি, সাহিত্য, ললিত শিল্প বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত—সেটা নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই নহে।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষাও এমনি ভাবে জড়িত, যে, মানুষ কোন্ কাজটা যে কাহার টানে করিয়া বসে, তাহা সে সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রাণের বেগ সামলাইতে না সামলাইতেই তাহাকে মনের বেগ সামলাইতে হয়; আর মনের টানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবার সময় কোথা হইতে এক একটা তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে যে কোন্ অজানা কূলের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার হিসাব বেচারা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দিতে পারে নাই।

সে কূলের সন্ধান পাইতে মানুষের অনেক দিন লাগিয়াছে। কোন্ নির্ভীক কর্ণধার প্রথমে সে পারের সংবাদ আনিয়া দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার নামধামের উল্লেখ নাই। কিন্তু সংসার-সমুদ্রের যে একটা কূল কিনারা আছে, সংসারের ওপারে যে একটা জুড়াইবার স্থান আছে, একথা ব্যাধিজরামৃত্যু-প্রপীড়িত মানুষের বিশ্বাস করিতে বিলম্ব হয় নাই। যাঁহারা পরাধামের সংবাদ আনিয়া হাজির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গন্তব্যস্থানের পথনির্দ্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, উহার অস্তিত্ব লইয়া কোনও মারাত্মক মতভেদ দেখা গেল না। অন্ততঃ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা যে সেখানে নাই, একথা সকলেই তারস্বরে প্রচার করিলেন। সাধারণ লোকে মোটামুটী কথাটা একরূপ মানিয়া লইলেও, দুই একজন বুদ্ধিজীবী পুরুষ (যাঁহারা একালে জন্মিলে নিশ্চয় উকীল হইতেন) ব্যাপারটাকে জেরা না করিয়া ছাড়েন নাই। মনের পরপারে যদি এমন একটা কিছু থাকে—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তাহা হইলে, তাহা আসিল কোথা হইতে, তাহার সহিত এ সংসারের সম্বন্ধ কি, তাহার জ্ঞান যদি অনুভূতিলব্ধ, ত তাহার সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতে এত নানা কথা কয় কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। যাহা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়, তাহাকে বুদ্ধির রাজ্যে টানিয়া আনিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধের মধ্যে ফেলিয়া সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা হইল। কিন্তু "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব।" সুতরাং সাংখ্যকারের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সে পণ্ডিতি বিচারের নিবৃত্তি হয় নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

বিচার ত চলিতে লাগিল; কিন্তু দুই একজন ওস্তাদ গোড়া হইতেই বাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন—'ও সব বাজে কথা। স্বর্গ, অপবর্গ, আত্মা, পরলোক, এ সব গাঁজাখোরের খেয়াল। বেশ করিয়া খাও দাও। একবার মরিয়া গেলে, ল্যাংড়া আমও মিলিবে না, বাগবাজেরর রসগোল্লাও মিলিবে না; সুতরাং যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।'

কিন্তু হায়! ল্যাংড়া আমের অপ্রাচুর্য্য বশতঃই হোক, অথবা সে কালেও দুর্ভিক্ষের অভাব ছিল না বলিয়াই হোক, লোকে প্রাণ ভরিয়া কথাটায় সায় দিতে পারিল না। শুধু সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের শান্তি মিলিল না। জগৎটা যে বেশ সুবিধার জায়গা নয়, একথা সকলেই মোটামুটী একরূপ মানিয়া লইল। সাংখ্যকার কপিল ত ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পুরুষকে কৈবল্য সাধনের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মহলেই তাঁহার ব্যবস্থা আদৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জনসাধারণ তখনও সংসারের টান একেবারে কাটাইতে পারে নাই। তাহার পর রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ তরুণী ভার্য্যা, নবজাত শিশু, অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সংসারের দুঃখনাশের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে চারটী আর্য্যসত্য প্রচার করিলেন, তাহার সার কথা এই:—"এই দুঃখময় সংসারের বাসনা হইতেই উৎপত্তি, বাসনাকে নাশ করিলেই সংসারের নিবৃত্তি। যত শীঘ্র পার, বাসনাকে সমূলে বিনাশ করিয়া এ কুস্থান হইতে সরিয়া পড়।" দুই একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! সংসার ছাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইব কোথায়? নির্ব্বাণ লাভ করিয়া আমরা পাইব কি?' বুদ্ধদেব বলিলেন—"বাপু, ওসব কথায় কাজ নাই; বুদ্ধি দ্বারা সে কথা বুঝা যায় না। সংসার-নিবৃত্তিই পরম লাভ বলিয়া ধরিয়া রাখ।"

লোকে কি বুঝিল, তাহা তাহারাই জানে; কিন্তু সেইদিন হইতে আমাদের দেশে বৈরাগ্যের একটা মহাধুম পড়িয়া গেল। দীন দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই সুর ধরিলেন—

মন, চল নিজ নিকেতনে,
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।

বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা বলেন যে, সিদ্ধার্থ যেদিন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেদিন দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলেন, দেবকন্যারাও পুষ্পবৃষ্টি করিতে ভুলেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর যে বৈদিক দেবতাদের নির্ব্বাণের পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; কিন্তু দেবলোকের সে নির্ব্বাণ-আকাঙ্ক্ষা মর্ত্ত্যধামেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কৃষক লাঙ্গল ছাড়িল, নাপিত ক্ষুর ছাড়িল, যোদ্ধা অস্ত্র ছাড়িল, রাজাও অভিধম্ম পিটক পাঠ করিতে বসিয়া গেলেন। বৈরাগ্য স্রোত ক্রমে অন্দর মহলেও প্রবেশ করিল। মেয়েরাও হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া ভিক্ষুণী সাজিয়া বিহার আশ্রয় করিলেন। মেয়েদের মধ্যেও যখন সংসার ত্যাগের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সমাজের হাড়ে হাড়ে বৈরাগ্য ঢুকিয়াছে, জাতিটা যথার্থই নির্ব্বাণের পথের যাত্রী হইয়াছে।

বুদ্ধদেব ত মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন, কিন্তু জরা, মৃত্যু, ব্যাধি ত ঘুচিল না। একজনের নির্ব্বাণে সংসারও লুপ্ত হইল না। নির্ব্বাণ লাভই যদি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, তাহা ত কৈ বুদ্ধের আবির্ভাবে সফল হইল না। ধর্ম্মের প্রথম উৎসাহটা একটু কমিয়া গেলে দেখা গেল যে, মানুষের হাসি কান্না সুখ দুঃখ সমান ভাবেই রহিয়াছে, সংসারচক্র বুদ্ধদেবের খাতিরে আপনার গতি তিল পরিমাণও পরিবর্ত্তন করে নাই, অধিকন্তু সংসারকে আপনার মনোগত করিয়া গড়িয়া লইবার শক্তি মানুষের যেন কতকটা কমিয়া গিয়াছে। হাসি যেন কতকটা ম্লান, কান্নার মধ্যেও যেন তীব্রতা নাই। যাঁহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, মায়ামোহ কাটাইয়া নির্ব্বাণের লোভে বিহার আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও দিনকত পরে সংসারের পরপারে যাইবার বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধ!

বুদ্ধের ত তিরোভাব হইল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপটা সমাজের মন হইতে সহজে মুছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরসন করিয়া সমাজে যিনি বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রখ্যাত, সেই শঙ্করের ধর্ম্মের অন্ততঃ বার আনা বৌধধর্ম্মেরই রূপান্তর। মতবাদের যা' কিছু পরিবর্ত্তন, তা শুধু পণ্ডিতদেরই উপভোগ্য, সমাজ সম্বন্ধে যা' কিছু ব্যবস্থা, তাহাতে বুদ্ধ আর শঙ্করে বড় বেশী প্রভেদ নাই। বিহারের পরিবর্ত্তে মঠ, ভিক্ষুর পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী, আর শূন্যবাদের পরিবর্ত্তে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বসাইয়া দিলে, বাহির হইতে উভয় ধর্ম্মকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না। শঙ্করকে বিজ্ঞানভিক্ষু যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তাহা একেবারে অমূলক নহে। কোন কোন বিষয়ে শঙ্কর আবার বুদ্ধেরও উপরে যান। বুদ্ধ তবু নারীকে ভিক্ষুণী হইবার অধিকারটুকু দিয়াছিলেন, শঙ্কর একেবারে সাফ বলিলেন—"উহারা 'নরকস্য দ্বারং'।" তাহাদের রক্তমাংসবসাদিবিকারসম্ভূত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একেবারে মুক্তির সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নারীর দশ ক্রোশের মধ্যে পরব্রহ্মের তিষ্ঠিবার জো নাই।

দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বুদ্ধের সহিত শঙ্করের প্রধান পার্থক্য এই, যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ-তত্ত্ব একান্ত বাক্যমনের অগোচর; তাহার সম্বন্ধে অস্তি বা নাস্তি কোন কথাই জোর করিয়া বলা যায় না; শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম অভাবাত্মক নহে, তাহা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। শঙ্কর জীবকে একেবারে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখেন নাই, দাঁড়াইবার একটা আশ্রয় দিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম; কেবল মায়ার ফাঁদে পা দিয়াই আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে; আপনার নিত্যমুক্ত স্বভাব ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে। আপনার স্বরূপ জানিতে পারিলেই তাহার ভববন্ধন হইতে মুক্তি। সংসারের পরমার্থতঃ কোনই সার্থকতা নাই; সংসারের যা' কিছু কর্ম্ম তা' শুধু অজ্ঞানেরই ফল। মুক্ত পুরুষের ভিক্ষাটন ভিন্ন কোন কর্ম্মই নাই।

হায় রে নলিনীদলগতজলমিব চপল মানবের জীবন! তোমার সবটাই যখন ভ্রম তখন আর এ পাপের বোঝা বহিয়া মরা কেন? কৌপীন কম্বল সম্বল করিয়া তাই মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর দল জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ভুল, এই কথা দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। বৈদিক কাল হইতে যে কর্ম্মবাদী গৃহস্থের দল কোনও রূপে এতদিন টিকিয়া ছিলেন, তাহারাও এইবার শঙ্করের চাপে পড়িয়া মারা পড়িলেন। মণ্ডন মিশ্রকে যে দিন শঙ্করাচার্য্য একরূপ জোর করিয়াই উভয়ভারতীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গৃহছাড়া করিলেন, সে দিন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন, কে জানে?

পুরাকালের ভাগবত-সম্প্রদায়ও মুখে মায়াবাদ অস্বীকার করিলেও, বুদ্ধ ও শঙ্করের প্রভাব হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিই সেই পুরাতন ভাগবত সম্প্রদায়ের বংশধর। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচার লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ প্রচলিত আছে; কিন্তু কর্ম্মের সাধনা কোথাও নাই। শঙ্করের মতবাদে যেরূপ জ্ঞানের প্রাধান্য, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সেইরূপ ভক্তির প্রাদুর্ভাব। তবে শঙ্কর যেমন ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে একান্ত বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া খাড়া করিয়াছেন, ইঁহারা সেরূপ করেন নাই। সংসারকে একেবারে কাটিয়া ছাটিয়া মিথ্যার ভস্মস্তূপে ফেলিয়া দিতে ইঁহারা স্বীকৃত নহেন। ইঁহাদের মতে সংসার অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানেরই বিকাশ; ঘটে ঘটে সেই অনন্তরসাধার ভগবানেরই স্ফুর্ত্তি, কিন্তু জীবের মধ্যে তিনি যে মূর্ত্ত, তাহা স্বধু আপনার লীলামাধুরী আস্বাদন করিবার জন্যই। সংসার মায়া নয়, মিথ্যা নয়; ভগবানের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু সে লীলা প্রধানতঃ প্রেমেরই লীলা; কর্ম্মের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই। লীলাময়ের নিত্যলীলার রসসম্ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য; উহাই সৃষ্টির লক্ষ্য।

শঙ্করের মতে যেমন চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম, জ্ঞানের পর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই; বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে সেইরূপ যা' কিছু কর্ম্মের ব্যবস্থা তা' ভগবৎ প্রেম-স্ফুরণের জন্য। সৃষ্টির অন্য কোনও লক্ষ্য নাই। জগতের দিক হইতে ভগবানের দিকে যাওয়াই জীবের গতি ও পরিণতি; ভগবানকে পাইয়া জগতের দিকে ফিরিবার কোনও সার্থকতা নাই। সংসার হইতে নির্গমনের জন্যই সংসার সৃষ্টি। এ বিষয়ে কার্য্যতঃ শঙ্করপন্থীদিগের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে লয় তাঁহারা কামনা করেন না, সংসারের বাহিরে গিয়া ভগবৎসাজুয্যলাভই তাঁহাদের মতে বাঞ্ছনীয়। সংসারভোগ স্বধু বদ্ধ অবস্থাতেই সম্ভব, মুক্তপুরুষের সংসার ভোগ নাই।

ভগবদ্‌জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভই যে জীবের উদ্দেশ্য, ত্যাগই যে তাহার একমাত্র পন্থা, এ কথা প্রায় সকল দেশের সাধু-সমাজেই প্রচলিত। আমাদের দেশে যেখানে সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্ত্তারই মত অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সেইখানেই যখন এই কথা তখন সাদিবাদী খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় সমাজে যে এই ভাব আরও প্রবল হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আমাদের তবু জন্ম জন্ম এই সংসারে আসিতে হয়, তাঁহাদের স্বধু এক জন্ম লইয়াই সংসারের সহিত সম্বন্ধ। কিয়ামতের দিন যাহার আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না, সে সংসারের জন্য বেশী ভাবিয়াই বা ফল কি? ভক্ত খ্রীষ্টান বা মুসলমানের চক্ষে এ সংসার স্বধু কয়েদখানা, না হয় পরীক্ষার স্থল। কেন যে ভগবান মানুষকে এই সংসারের কারাগারে পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন; তবে এখানের যা কিছু দুঃখ কষ্ট, অবিচার, অত্যাচার, পরলোকে ভগবৎসন্নিধানে তাহার লেশমাত্র থাকিবে না। তাহাদের যা কিছু আশা তা মৃত্যুর পরপারে।

সংসার ও ভগবান সম্বন্ধে তবে কি ইহাই চরমসিদ্ধান্ত? সংসার অতিক্রম না করিলে কি পূর্ণশান্তির সম্ভাবনা নাই? জগৎ কি বাস্তবিকই এমনি উপাদানে গঠিত যে, দুঃখ, অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা ইহার সহিত চিরদিনই জড়িত হইয়া থাকিবে? জীবন কি দুঃখের নামান্তর? অতীতের দিকে চাহিয়া যদি এ কথার উত্তর দিতে হয় ত বলিতে হয়—হাঁ, তা' বৈকি। দেশে বিদেশে যে সমস্ত ভগবৎ জ্ঞানদীপ্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, সকলেই ত বলিয়াছেন—প্রকৃতি ভগবানকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে; এ মায়ার রাজ্যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির পূর্ণপ্রকাশ অসম্ভব। সংসারকে আমূল্য পরিবর্ত্তিত করিয়া ভগবৎসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা কেহই ত দেখান নাই। অনেকেই বলিয়াছেন—"এ সংসার কুকুরের ল্যাজের মত বাঁকা; এখনি টানিয়া সোজা কর, পরক্ষণেই আবার বাঁকিয়া যাইবে।" তাঁহারা যে অল্পবিস্তর কর্ম্মের প্রেরণা দিয়াছেন, তাহা সংসারকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য নহে, জীবেরই চিত্তশুদ্ধির জন্য।

মহাপুরুষদের কথা শিরোধার্য্য; কিন্তু মানুষ আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারবিমুখ হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রকৃতি স্বয়ং তাহার অন্তরে যে গূঢ়তম প্রেরণা দিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহারই বলে সে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহির্জগৎ জয় করিতে ছুটিয়াছে। পাশ কাটাইয়া, প্রকৃতির পরপারে গিয়া শান্তিলাভ করিতে সে যেন মনে মনে সঙ্কুচিত; প্রকৃতির নিকট সে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না।

বর্ত্তমান ইউরোপ এ ধারণার বশেই চলিয়াছে। অতিপ্রাকৃতে তাহার বড় একটা বিশ্বাস নাই।

আপনার মধ্যে যে শক্তি পরিস্ফুট, তাহারই বলে সে বহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়া জগতে শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে চায়। ইউরোপে মানুষ আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া জগৎকে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেছে। ইহাই সেখানকার বর্ত্তমান চিন্তাধারা। আমাদের দেশে যাহারা ইউরোপীয় চাকচিক্যে মুগ্ধ, আমাদের বর্ত্তমান শক্তিহীনতায় যাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত, তাঁহাদের অনেকেই বলিতেছেন—এস, আমরাও ইউরোপের অনুসরণ করি। সংসার বিলুপ্ত হইবার ত কোনও সম্ভাবনা দেখি না, তখন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া থাকায় ফল কি?

কোন্ কথাটা তবে সত্য? ইহ ও অমুত্রের মধ্যে কি মিলনের কোনও সম্ভাবনা নাই? একদিকে যেমন অতীত যুগের আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুধু গায়ের জোরে উড়াইয়া দিলে চলিবে না; অপর দিকে প্রকৃতি জয়ের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত যে গূঢ়তম প্রেরণা—তাহাও ত ভগবদ্দত্ত; তাহাকেই বা বুদ্ধির কৌশলে ভ্রমাত্মক বলিয়া উড়াইয়া দিব কেন?

ঠিক কথা। মহাপুরুষদের অপরোক্ষ অনুভূতি-লব্ধ সমস্ত সত্য মানিয়া লইলাম; কিন্তু জগতের সহিত সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সম্বন্ধ লইয়া তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেগুলি ত বুদ্ধির মীমাংসা মাত্র। অনুভূত তত্ত্বকে তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধির ছাঁচে ঢালাই করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। কে বলিবে সে বুদ্ধির গঠনটুকুর মধ্যে অসত্যের বীজ নিহিত নাই? সমাধি অবস্থায় সকলে একই সত্য উপলব্ধি করিয়া তাহা প্রকাশের সময় আপনাপন সংস্কার ও বুদ্ধির অনুযায়ী প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ স্থাপিত হইত না।

আরও এক কথা। অনুভূতিরও ত তারতম্য আছে। অনন্তকে উপলব্ধি করিয়া কেহই শেষ করিয়া দেন নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলিতেন "ভগবানের ইতি করিতে নাই", "এখানকার উপলব্ধি বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে" তা অতি খাঁটি কথা বলিয়াই মনে হয়। যাঁহার অনুভূতি যত গভীর, সত্য তাঁহার নিকট ততই পূর্ণভাবে প্রকাশিত। অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ সত্য বুদ্ধির বিচারের বিষয় নহে, গভীরতার তারতম্য লইয়া অনুভূতির পূর্ণতা বা আংশিকতা স্থির করিতে হয়। যাঁহারা মানসিক বৃত্তিবিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হন, তাঁহারা আংশিক ভাবেই ভগবৎসত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জ্ঞানীর নিকট তাই ভগবানের চিৎস্বরূপই প্রকাশিত; ভক্ত তাই ভগবানের আনন্দময়রূপ উপলব্ধি করিয়াই কৃতার্থ। কিন্তু তা' বলিয়া ভগবানের স্বরূপ যে জ্ঞান ও আনন্দেই পর্য্যবসিত, এ কথা বলা চলে না। জ্ঞানমার্গের সাধকেরা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় প্রকৃতির কোনও কার্য্য দেখিতে পান না বলিয়া, প্রকৃতিকে পরমার্থতঃ অসত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থার মধ্যেও যদি প্রকৃতির বীজ গূঢ়ভাবে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে সাধককে আর অবস্থান্তরে ফিরিয়া আসিতে হইত না। ব্রহ্ম আর প্রকৃতি সমাধির অবস্থায় অভেদরূপ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। জ্ঞান বিচারে 'নেতি' 'নেতি' করিতে করিতে ভগবৎ উপলব্ধি পথে অগ্রসর হইবার সময় সাধকদিগকে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া যাইতে হয়, সেই জন্যই তাঁহারা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের উপর আবরণ স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিতে যাহা আবরণস্বরূপ, ভগবানের কাছে যে তাহা আবরণ, একথা মনে করিবার কারণ নাই। প্রকৃতি যে মায়া মাত্র বা পরমার্থতঃ অসত্য, উপরোক্ত অনুভূতির দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না।

আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধিই যে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা চরম উপলব্ধি, তাহাও মনে হয় না। গীতায় যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যিনি নির্গুণ ও গুণভোক্তা, যিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, নির্গুণ ব্রহ্ম ও গুণময়ী প্রকৃতির বিপরীত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য তাঁহাতেই সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা আপনার শক্তিতে ভগবানকে ধরিতে না গিয়া ভগবানের কাছে ধরা দেন, যাঁহারা আপনার বুদ্ধি বলে ভগবানকে বুঝিতে না গিয়া বুদ্ধিকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করেন, যাঁহারা চিত্তবৃত্তির উচ্ছেদ বা নিরোধ না করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহার নিকট উৎসর্গ করেন—তাঁহাদের নিকট প্রকৃতি শুধু মায়া বা আবরণ রূপে প্রকটিত না হইয়া, ভগবৎশক্তি-রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান ও সংসারে তখন আর বিরোধ থাকে না। ভগবান তখন আর প্রকৃতির পরপারে আত্মগোপন না করিয়া, প্রকৃতির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হন। জীবকে তখন তিনি আপনার জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির লীলাকেন্দ্রে পরিণত করিয়া

আপনার সংসার আপনিই চালান। দুর্ব্বলতা, নিরানন্দ ও অজ্ঞানের তখনই উপশম। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির তখনই পূর্ণ মিলন। স্বর্গের দেবতা তখন নরলোকে মূর্ত্ত বলিয়াই মানুষ বলিতে পারে—"God is in this world; all is therefore right with it". মর্ত্তে এই অমর ধাম প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধনা।

ত্যাগ ও ভোগ

আমাদের একটা কলঙ্ক রটিয়াছে যে, আমরা নাকি ভোগবাদ প্রচার করিয়া ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বসিয়াছি। ত্যাগধর্ম্মী সাধুপুরুষেরা অনুমান করেন যে, ভগবৎকৃপায় রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিলেও, আমরা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য মোহ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি নাই বলিয়া, ধর্ম্মের মহান্ ও বিশুদ্ধ আদর্শটীর সন্ধান এখনও পাই-নাই।

না পাইবারই কথা। ধর্ম্ম যে রাজনীতির ভয়ে মঠের মধ্যে ঢুকিয়া গেরুয়ার আড়ালে লুকাইয়া আছেন, এ সংবাদ ত আমরা জানিতাম না।

ত্যাগ আর ভোগ—এই দুইটা কথা লইয়া লাঠালাঠি করিলে ত সে বিবাদ কোন কালে মিটিবে না, সুতরাং এই দুইটা কথার মূলে কি ভাবটা আছে, তাহা একটু বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। যাঁহারা তথাকথিত ত্যাগবাদী, তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদটা আচার্য্য শঙ্কর বেশ স্পষ্ট করিয়া অর্দ্ধশ্লোকেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।" জগৎটা শুধু অজ্ঞানেরই নামান্তর; ইহার কোন পারমার্থিক সার্থকতা নাই। জগতের সম্বন্ধে ইহার মিথ্যাত্ব জ্ঞানই চরম জ্ঞান; জগতে মানুষের কর্ম্মের সার্থকতা ঐ জ্ঞানটুকু লইয়া, ঐ জ্ঞানটুকু হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। জগৎ যখন মিথ্যা এবং ব্রহ্ম যখন সত্যস্বরূপ, তখন জগতের সহিত সর্ব্ব সম্বন্ধ ত্যাগ না করিলে যে ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ অসম্ভব—ইহাই মায়াবাদের সিদ্ধান্ত। তবে ত্যাগপন্থীদের শাস্ত্রে যে কর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়, সে শুধু নিম্ন অধিকারীর চিত্তশুদ্ধির জন্য। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা কাটিয়া গিয়া চিত্তশুদ্ধ হইবে এবং চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মলাভ হইয়া যাইবে,—এই আশায় কর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু উচ্চ অধিকারীদের পক্ষে বিষয়সঙ্গ ত্যাগই ব্রহ্মলাভের প্রকৃত পন্থা। বৈরাগ্যই মুমুক্ষুর লক্ষণ।

এ মতবাদে 'জগতের উন্নতি' বলিয়া কোনও জিনিসের স্থান নাই। জগৎটা চিরদিনই টঁ্যাড়া বাঁকা ভ্রমসঙ্কুল রহিয়া যাইবে। কুকুরের ল্যাজের মত একবার টানিয়া সোজা করিয়া দিলেও, পরক্ষণেই স্বভাবগত ধর্ম্মে উহা আবার বাঁকিয়া যাইবে। গোঁড়া খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদেরও জগৎ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ ধারণা; আর আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে সোপেনহরও জগৎকে এই চক্ষে দেখেন।

এই ত গেল ত্যাগধর্ম্মীদের কথা। এখন যাহাদের নামে এই ত্যাগী পুরুষেরা নাক সিঁটকাইয়া উঠেন, তাহারা কি বলে দেখা যাক্। সকল দেশেই প্রাকৃত লোকে জিহ্বোপস্থ-পরায়ণ। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইলেই তাহারা আর বড় একটা কিছু চায় না। ইন্দ্রিয়ের সুখ-ভোগই ইহাদের পক্ষে প্রধান ভোগ। কিন্তু প্রশ্ন এই, ভোগ বলিলে কি ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ মাত্র বুঝিতে হইবে? সুখ কি শুধু ইন্দ্রিয়গত? সুখের জন্য ত সকলেই লালায়িত। ত্যাগের খাতিরে ত্যাগ ত কাহাকেও করিতে দেখি না। যে বিষয়ে জীব সুখ পায় না, সে বিষয় ত্যাগ করিয়া সে অন্যত্র সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। যে আপনার শরীরকে কষ্ট দিয়া স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দিনরাত খাটিয়া মরে, আপনার শরীর লালন পালন অপেক্ষা স্ত্রী-পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানেই তাহার সুখ। স্ত্রী-পুত্র, ঘর সংসার ছাড়িয়া দেশের জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কাঁচা মাথা বলি দেয়, দেশের সহিত একাত্ম-বোধেই তাহার সুখ। বাস্তবিকই যাহার যেখানে একাত্ম-বোধ, সেইখানেই তাহার সুখভোগের কেন্দ্র। যাঁহারা ঘর বাড়ী, মা বাপ ছাড়িয়া, নিজের শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া, মঠে বাস করিয়া মনে করেন—'সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি',—তাঁহাদের পক্ষেও ঐ এক কথা। ভগবানকে লাভ করিবার সুখ বা সুখের আশা যদি তাঁহাদের না থাকিত, তাহা হইলে মঠভানী সৌধগুলি বনজঙ্গলে পরিণত হইয়া শিয়াল কুকুরের আড্ডা হইয়া উঠিত। ব্রহ্মপুরুষ যদি আনন্দময় না হইতেন, সুখভোগ-বাসনা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যদি তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা তাঁহার জন্য নাক টিপিয়া

বসিত? কেই বা মায়া কাটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত? ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধজনিত আনন্দ, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ভোগ নহে, আত্মার ভোগ। মায়াবাদীরা নিজেও তাহা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—'ত্যাগমার্গ আর কিছুই নহে—উহা ক্ষুদ্রতম ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তম ভোগ্যবস্তু পাইবার উপায় মাত্র।'

কিন্তু বৃহত্তম ভোগ্যবস্তু কি? মায়াবাদী আচার্য্য শঙ্করের নজীর দেখাইয়া বলিবেন "নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহাই মানুষের চরম অনুভূতি।" কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। শাস্ত্র, মহাপুরুষের বাক্য, এমন কি ঠাকুর রামকৃষ্ণের নজীর দেখাইয়া আমরা বলিতে পারি—"ব্রহ্মের ইতি করা যায় না।" ঠাকুরের নিজের অনুভূতিই ত বেদ বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধিই অনুভূতির চরম কথা নহে। "নেতি, নেতি" করিয়া অদ্বৈত উপলব্ধিই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নহে। তাহার পরেও একটা "ইতি, ইতি" অবস্থা আছে। উহাকে নির্দ্দেশ করিয়াই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—'বেলের বিচি, খোলা ফেলিয়া শুধু শাঁসটুকুর হিসাব রাখিলে ওজনে কম পড়ে।'

ব্রহ্ম যে জন্য জগৎরূপে বিবর্ত্তিত, তাহা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন, খামখেয়ালি ব্যাপার নহে। জীব আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিলেই জগৎটা উড়িয়া যায় না। ব্রহ্ম উপলব্ধির পর জীব বস্তুতঃ ভগবানের লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ব্রহ্মের শক্তি জীবের মধ্যে তখনই ফুটিয়া উঠে। মন, বুদ্ধি, এমন কি শরীর তখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্রহ্মানন্দে ভরিয়া যায়। মুক্ত ভাবে কর্ম্মের তখনই যথার্থ আরম্ভ। উহাই একাধারে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ। ঐ অবস্থাকেই আমরা যথার্থ ভোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। ক্ষুদ্রতর ভোগের সহিত ত্যাগ ও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা জড়িত। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা হইতেও নিম্নভূমিতে আসিয়া ত্যাগ বা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা পাইতে হয়। কেবল, ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ যে অবস্থায় একীভূত, তাহার আর বিরাম নাই। ঐ চরমভোগকেই আমরা ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ বলিয়া মনে করি। ত্যাগ-পন্থীদের আদর্শ আংশিক ও অঙ্গহীন।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ব্রহ্ম উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে সাধনের অবস্থায় কি ত্যাগের আবশ্যকতা নাই? মনকে ব্রহ্মমুখী করিবার পথে বিষয়সঙ্গ কি বাধা নহে? এ কথার উত্তরে আমরা বলি যে, সৃষ্টি যদি ব্রহ্মের আত্মবিস্তারের ফল হয়, ত ব্রহ্মের সহিত বিষয়ের এরূপ একান্ত বিরোধী সম্বন্ধ স্থির করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি এক, তাঁহার বহু হইবার প্রয়াসেই যদি সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে, ত বহুর মধ্যে একের অনুভূতি সম্ভবপর হইবে না কেন? সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে এ সাপত্ন্য সম্বন্ধ কোথা হইতে আসিবে? প্রকৃতপক্ষে আমরা বিষয়ের স্বরূপ ও যথাযথ ব্যবহার জানিনা বলিয়াই বিষয়কে আমরা বাধা বলিয়া মনে করি। বিষয় আমাদের কর্ম্মের উপাদান। আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ যেখানে উহা আমাদের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে তাহার একমাত্র প্রতিকার আমাদের জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি করা; আপনাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া সে বাধা অতিক্রম করা। বিষয়কে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিয়াই ব্রহ্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে হয়; বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া নহে। বিষয়ের মধ্য দিয়া বিষয়াতীতকে পাইয়া মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগই প্রকৃত পন্থা। বিষয়কে যাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সংসারে বিষ ও অমৃত বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছুই নাই। এক অবস্থায় যাহা বিষ, অবস্থান্তরে তাহাই অমৃত। যাঁহারা সাধন-পথে অগ্রসর হইবার সময় বিষয় বর্জ্জন করিয়া চলেন, বিষয়ের প্রকৃতরূপ তাঁহাদের নিকট কখনও আত্মপ্রকাশ করে না; ব্রহ্মের পূর্ণরূপও তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ভগবানের জগৎ-লীলার শক্তি-কেন্দ্র হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, ক্ষুদ্র ভোগের মধ্য দিয়াই মহত্তর ভোগের অধিকারী হইতে হয় এবং সর্ব্ব বিষয় ভগবানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের লীলাকেন্দ্ররূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের চরম ভোগ।

এই ত ভোগের আদর্শ। আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; যাঁহারা কথায় কথায় ত্যাগধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিয়া তথাকথিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের আস্ফালন করেন, তাঁহাদের মুখের কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া আমাদের পক্ষে ভোগ ও ত্যাগের অর্থবোধ করাই দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। সাদা কাপড় ছেঁড়া হইলেও তাহার নাম ভোগ, আর গেরুয়া বেনারসী সিল্কের হইলেও তাহার নাম ত্যাগ! যে দেশে পর্ণ-

কুটীরের মধ্যে শাকান্নের নাম ভোগ, সে দেশে মঠ-নামধারী প্রাসাদের মধ্যে লুচি, মোহনভোগ, চা, বিস্কুট ও সিগারেটের নাম ত্যাগ! বৃদ্ধ মা বাপ, স্ত্রীপুত্র, অথবা ভগ্নী বা বৃদ্ধা পিসি খুড়ীর জন্য দিন রাত শত লাঞ্ছনা সহিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের নাম ভোগ, আর নিদ্রালস চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঐ ঘৃণ্য ভোগ-পন্থীদিগের প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ অর্থে সখের দরিদ্রনারায়ণ সেবার নাম ত্যাগ! ভোগের চিত্র অপেক্ষা ত্যাগের চিত্রটা যে আমাদের দেশে বিশেষ ভাবেই উজ্জ্বল—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে! হায়রে—

"কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস, গেরুয়ার বিলাসিতা।"

যাহারা সংসারের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, শীর্ণ ক্লিষ্ট বুভুক্ষিতের উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য হাসিমুখে দেহপাত করিতেছে, আর যাহারা সে বোঝা পরের ঘাড়ে নামাইয়া দিয়া, পরান্নে উদর পুর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়া সংস্কৃত শ্লোক বানাইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, যতি সূর্য্যসমপ্রভ ও গৃহস্থ তাহার নিকট খদ্যোৎ তুল্য—এ উভয়ের মধ্যে কে বেশী ধর্ম্মাত্মা? সমষ্টিকে ত্যাগ করিয়া ব্যষ্টির নির্ব্বাণ মোক্ষলাভ যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও উহা পারলৌকিক স্বার্থপরতার চূড়ান্ত সীমা।

প্রতিপক্ষ হয় ত বলিবেন—"জীবন-সংগ্রামে ভীত বা ঐহিক স্বার্থসাধনেচ্ছু ব্যক্তিও যদি ত্যাগ-মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজকে ও নিজেকে প্রবঞ্চনা করে, তবে ঐ প্রবঞ্চকের উপর দোষারোপ না করিয়া ত্যাগের মহান্ আদর্শের উপর কলঙ্ক-ক্ষেপন করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?" আমরাও ত প্রতিপক্ষের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে পারি —"কেহ যদি রাজর্ষি জনক হইবার পূর্ব্বে মুখের কথায় ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে প্রতারিত করে, ত তাহার জন্য কি জ্ঞান ও কর্ম্মের, ভোগ ও মোক্ষের সামঞ্জস্যের কথা মিথ্যা হইয়া যায়? দুই এক জনের দুর্ব্বলতার জন্য কি ভুক্তিমুক্তির মহান্ আদর্শে কলঙ্ক ক্ষেপন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য? রাজর্ষি জনককে যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যের জন্য ত্যাগমার্গ অবলম্বন করিয়া হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হইয়া তপস্যা করিতে হইয়াছিল, এ কথা কোন্ সৎশাস্ত্রে লেখে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য অতখানি উপদেশ দিলেন, তাহার মধ্যে এ কথা ত কোথাও বলেন নাই যে, সে উপদেশ সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য তাহাকে পায়ে শিকল বাঁধিয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া কিছুদিন ঝুলিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়া কথাটা চাপা দিলে ত চলিবে না; পূর্ব্বজন্মে তিনি ত্যাগপন্থী মোহান্ত ছিলেন, এ কথা যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, ত এ জন্মে সে ত্রুটি শুধরাইয়া লইবার জন্য তিনি যে কয় গণ্ডা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গীতাতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিযাছিল, এমন ত মনে হয় না। ঋষিদের মধ্যে দেখিতে পাই—অধিকাংশই বিবাহিত। যাজ্ঞবল্ক্যের একটা নয়, দুইটা বিবাহ। বেদব্যাস বিবাহিত; অধিকন্তু রাজবংশ লোপ পাইবার আশঙ্কা হইলে নিয়োগের জন্যও তাঁহার ডাক পড়িত। অথচ তিনি বেদবিভাগকর্ত্তা এবং পুরাণ ও মহাভারতের রচয়িতা। বশিষ্ঠের মা-ষষ্ঠীর কৃপায় একটি শত সন্তান। তবুও রামকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি মঠ হইতে সন্ন্যাসী আমদানি করেন নাই। মোট কথা, বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে "ত্যাগ পিশাচিকা" এ দেশের ঘাড়ে এত জোর করিয়া চাপিয়া বসে নাই।

আরও মজার কথা এই যে, বুদ্ধদেব ত ছেলেবুড়া সকলকে দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া নির্ব্বাণে লয় পাইবার ব্যবস্থা দিয়া গেলেন। আর আজ তাঁর জন্য যাঁহারা ওকালতি করিতে নামিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধদেবের শিক্ষার ফলেই নাকি ভারতবর্ষ ধনধান্যে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে, জ্ঞান গরিমায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিযাছিল। বটে!

সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রগুপ্তের সময় দেশ সনাতন আদর্শ ভ্রষ্ট হয় নাই; চাণক্যের উপর বুদ্ধদেবের ছায়া আসিয়া পড়ে নাই। সেই জন্যই গ্রীকদের হাত হইতে সে যাত্রা লোকে রক্ষা পাইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা অশোকের বৈরাগ্য অবলম্বনের সঙ্গে দেশের পরাধীনতার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না—এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক পুস্তিকায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, স্বামীজীর চটিজুতা পূজার পরিবর্ত্তে সেই কথাগুলি ফ্রেমে বাঁধাইয়া দেশের মঠে মঠে টাঙ্গাইয়া রাখিলে বোধ হয় স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি অধিক সম্মান দেখান হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে সময় হইতে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে বসিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া শক ও হুন জাতি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরে নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল দেখিয়াই ঋষিরা নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করেন। যে আদর্শ লইয়া এই নূতন অগ্নিকুল

ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করা হয়, তাহার সহিত যে বুদ্ধ-প্রচারিত বৈরাগ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ মাত্র নাই, একথা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। ঐ ক্ষত্রিয়কুল যদি ত্যাগপন্থী সংসারবিরাগী হইত, তাহা হইলে এতদিন হিন্দুজাতি যে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ত্যাগপন্থীরা অনেকে বলেন—"কাল প্রভাবে ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে।" কাল বেচারা কি করিবে? আমরা আজ যে বীজ বপন' করি, কাল তাহারই ফল দেয় মাত্র। কাল ত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

ফল দেখিয়াই বৃক্ষের গুণাগুণ নির্ণয় করা প্রশস্ত। আমাদের কথা যদি শুধু মতবাদ মাত্র না হইয়া অনুভূতিলব্ধ সত্য হয়, তাহা হইলে অচিরেই সমাজ ইহার ফলাফল দেখিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। এখন শুধু এইটুকুই আমাদের বক্তব্য যে, ব্রহ্ম শুধু গুণাতীত তুরীয় সত্ত্বা নহেন, তিনি যে গুণময় ও গুণভোক্তৃ, সব জীবই যে তাঁহার লীলাকেন্দ্র—এ সত্য উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এই সত্য প্রতিফলিত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে।

জাতের বিড়ম্বনা

—:•:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতের বিড়ম্বনা

—:*:—

১

মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষি পুরুষসূক্ত রচনা করিতে করিতে যখন বলিলেন—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত:"—তখন তিনি অজ্ঞাতসারে আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের হস্তে শূদ্রজাতি-নিপীড়নের জন্য যে কি ভীষণ অস্ত্র দান করিয়া গিয়াছিলেন, দিব্যদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পাইলে তিনিও ভয়ে চমকিয়া উঠিতেন। ঐ সূত্রটী প্রাচীনই হোক, আর অর্ব্বাচীনই হোক, মহাভারতে ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে উহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ মনু ১।১৩

'লোকসমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।' বেশ কথা। কিন্তু তিনি লোকহিতকামনায় যে কার্য্যটুকু করিয়াছিলেন, শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের হাতে পড়িয়া তাহা যে আজ অতি বীভৎস রূপ ধারণ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকহিত হওয়া ত দূরের কথা, এখন লোক সকলের প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই দায়।

সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক জীবসমষ্টিরূপ ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-সম্ভূত বা অঙ্গস্বরূপ, এ তো অতি সোজা কথা। ইহার সন্দর্ভটুকু বুঝিবার জন্য আমাদের কোন কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নাই। ইহাতে গুণগত জাতির ইঙ্গিত দেখিতে পাই, জন্মগত জাতিভেদের নাম-গন্ধও ত নাই। গীতায়ও ঐ কথা বেশ স্পষ্টই লেখা আছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ভগবান বলিতেছেন—"গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী আমি চার বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, সংসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্মী চার শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। ভগবান যে শুধু ভারতবর্ষের লোককে সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, আর অপর দেশের লোককে সৃষ্টি করিবার ভার কোন একটা দৈত্য-দানবের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিলেন, একথা বোধ হয় আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজও বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। যদি তাহা হয়, ত স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই চারি প্রকৃতির লোক সকল দেশেই বর্ত্তমান। আমাদের দেশে আজ জাতিভেদ জন্মগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই যে, ওরূপ জাতিভেদ বিধিসৃষ্ট, একথা শত শাস্ত্রবচন আওড়াইলেও প্রমাণিত হয় না।

শাস্ত্র ঘাঁটিলে বরং তাহার উল্টা কথাই দেখিতে পাই। পুরাকালে প্রকৃতিগত জাতিভেদ বলিলে যে সামাজিক পার্থক্য বুঝাইত না, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মদ্ভাগবতে বলে—

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণোনান্য একাগ্নির্বর্ণ এব চ॥"

পূর্ব্বে এক বেদ, সর্ব্ববাঙ্ময় এক প্রণব, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও এক বর্ণ ছিল।

তবে বহু জাতির সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? শাস্ত্র ইহার উত্তরে বলেন—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ॥
ব্রহ্মণো পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের প্রভেদ নাই। সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়; মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা

কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ রজোগুণ-প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধী, সাহসী, হঠকারী, রক্তবর্ণ, তাহারা স্বধর্মত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো-পালনরত, কৃষ্যুপজীবী, পীতবর্ণ, তাহারা বৈশ্যত্ব ও যাহারা হিংসাপরতন্ত্র, মিথ্যাবাদী, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ ও শৌচভ্রষ্ট, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফলতঃ এক বর্ণ হইতেই অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি হউক, অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে বর্ণপার্থক্য প্রথম হইতেই বিদ্যমান থাকুক, জাতিভেদ যে জন্মগত ছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। লোকের প্রকৃতি ও বৃত্তি দেখিয়াই তাহার জাতি নির্দ্দিষ্ট হইত। ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই ব্রাহ্মণ, আর শূদ্রের ছেলে হইলেই যে শূদ্র হইবে, এমন কোনও কথা ছিল না। গুণের ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত—আপনিই উদয় হয়। গুণের ব্যাখ্যায় মনু বলিয়াছেন—

> হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্ম-ধর্ম্মাবৃতানৃতে।
> যদ্‌যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥
> যথার্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তু পর্য্যয়ে।
> স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥

"হিংসা অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা—যাহার যে গুণ তিনি সৃষ্টি-কালে বিধান করিলেন, সৃষ্ট্যন্তরকালেও সেই সেই গুণ তাহাতে স্বয়ং প্রবেশ করিতে লাগিল। ঋতু সমাগমে ঋতুচিহ্ন সকল যেমন আপনা আপনিই দেখা দেয়, কর্ম্ম বা গুণ সকলও সেইরূপ আপনা আপনিই মানুষের প্রকৃতিতে উদয় হয়।" সংসারে আমরা দেখিও তাহাই,—সাধুর সন্তান দুর্ব্বৃত্ত হইতেছে, আবার রাবণের কুলে বিভীষণ জন্ম লইতেছে। ভারতে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়াও যাহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার শূদ্রের মত, তাহারা শূদ্র বলিয়াই গণ্য হইত; আর শূদ্রবংশে জন্মিলেও কাহারও গুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবার বাধা ছিল না।

> যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
> যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
> (শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ।)

লক্ষণ দেখিয়া যে জাতি নির্দ্দিষ্ট হইত, এ সম্বন্ধে ইহাই প্রমাণ। ভগবান গৌতমও বলিয়াছেন—"বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং।" উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হেতু এক বর্ণের লোক বর্ণান্তরে পরিণত হয়।

ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সকল দেশে সকল সমাজেই এই গুণমূলক জাতিভেদ প্রচলিত। ইহাতে কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার নাই। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, পুরাণাদি হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

> যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
> তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥
> (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১২৫ অধ্যায়।)

যে শূদ্র দম, সত্য ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিবেচনা করি, কারণ বৃত্তিদ্বারাই লোকে ব্রাহ্মণ হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৪শ অধ্যায়েও একথা বেশ স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা উচিত। সদাচার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।

বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক একই সমাজ-শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গস্বরূপ। যত দিন তাহারা অবাধে আপন আপন প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে পারে, ততদিন সমাজের অবনতি হয় না। মানুষকে জোর করিয়া বড় বা ছোট করিয়া রাখিলে, প্রকৃতি বিচার না করিয়া বাহির হইতে তাহার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, সমাজের এই অবাধগতি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশে হইয়াছেও তাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান যে দিন প্রপিতামহের নামের জোরে তিন গ্রন্থি পৈতা নাড়িয়া শূদ্রসন্তানের নিকট হইতে জবরদস্তি পূজা আদায়ের জন্য শ্লোক রচনা করিতে লাগিয়া গেলেন, সেই দিন হইতেই অলক্ষ্যে সমাজের মধ্যে মরণের বীজ প্রবেশ করিল। আজ সমাজ অসাড়, নিস্পন্দ, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে রক্তের টানও নাই, প্রাণের টানও নাই। সমাজ যে সতী অঙ্গের মত খান খান হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ব্রাহ্মণ্যস্পর্দ্ধী দক্ষ কর্ত্তৃক মহাদেবের অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইয়া সতীদেহ যেরূপ বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল, অভিজাতবর্গ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সমাজকে অমঙ্গলের পথে টানিয়া আনিয়া

তাহার সেই দুর্দ্দশা করিয়াছে। সতীকে আবার পরম-শিবের সহিত মিলিত হইবার জন্য নবকলেবর পরিগ্রহ করিয়া তপঃশুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। সমাজকেও ভগবৎস্পর্শলাভে পুনর্জীবিত হইবার জন্য নবরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। আভিজাত্য-স্পর্দ্ধী দক্ষের ছাগমুণ্ডপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।

২

যে আদর্শ লইয়া আমাদের সমাজের সৃষ্টি, সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিলে গুণগত জাতিভেদের পরিবর্ত্তে জন্মগত জাতিভেদ প্রশ্রয় পাইত না; কিন্তু জাতিভেদ জন্মগত হইবার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত চারিবর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং আহার ব্যবহার সম্বন্ধেও কোন কঠোর নিয়মও ছিল না। বিষ্ণু সংহিতায় চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে আছে—

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ॥১॥
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ॥২॥ দ্বে বৈশ্যস্য ॥৩॥ এক শূদ্রস্য ॥৪॥

ব্রাহ্মণ স্ববর্ণ ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে; বৈশ্যেরও শূদ্রা বিবাহে কোন আপত্তি নাই। কেবল শূদ্রেরই কপাল পুড়িল, সে শূদ্রা ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না।

মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাতা কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ-সংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাতপুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে ঐ বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তেমনি ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

বীজের প্রভাবের দিকেই তখন পণ্ডিতদের দৃষ্টি; তপস্যা ও শিক্ষা প্রভাবেও যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, তাঁহারা সে কথা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। পরাশরের পুত্র ব্যাস ধীবর-কন্যার গর্ভে জন্মিয়াও যে সপ্তম পুরুষের বহুপূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ-শিরোমণি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একথা সমাজ তখন বিস্মৃত হইয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে শূদ্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ রহিত হইল। তখন শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিলেন—

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; বৈশ্য বৈশ্যা বিবাহ করিতে পারিবে। শূদ্র সমাজ-শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তাহার আর বর্ণান্তর প্রাপ্তির আশা রহিল না।

বিবাহের ক্ষেত্রেও যেরূপ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, আহার সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥

"যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, গোপালক, দাস, নাপিত ও আত্মনিবেদিত শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়।" ক্রমে শূদ্র বাদ পড়িয়া গেল। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত সদাচারযুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ন নিষিদ্ধ হয় নাই। পরাশর স্মৃতিতে লিখিত আছে—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ ॥

"যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং শুচিব্রতধারী, তাহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা হব্যে কব্যে ভোজন করিবে।"

বিবাহ ও আহার-ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের ত এই ব্যবস্থা। এখন আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অসবর্ণ বিবাহের নামে সে দিন যেরূপ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া উঠিলেন, তাহাতে মনে হইল যেন পাটেল-বিল পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশটা একেবারে ভারত-মহাসাগরের অতল গর্ভে গিয়া লুকাইবে। ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্মিলেন বেদব্যাস; আর সেই বেদব্যাসের রচিত পুঁথি পড়িয়া যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত গুরুগিরির ব্যবসা চালাইতেছেন, তাঁহারা "বাপ চেয়ে কুলীন দড়" (পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুলীন) হইয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, অসবর্ণ-বিবাহ করিলে সমাজ রসাতলে যাইবে। যে পরশুরামের কুঠারের জোরে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার মা ও পিতামহী উভয়েই ক্ষত্রিয়া। পরশুরাম অসবর্ণ-বিবাহ-সম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণ হইলেন কিরূপে? সেই সময়ের সমাজ ত কৈ রসাতলে যায় নাই।

তাহার পর আহার লইয়া বিচার। এ বিষয়ে আমাদের সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারা যত মাথা ঘামাইয়াছেন, এত আর কিছুতে নহে। স্মৃতিশাস্ত্রকে এখন রান্নাঘরের হাঁড়িকুঁড়ির শাস্ত্র বলিলেই চলে। রন্ধনটা যে ব্রাহ্মণের একটা বিশেষ কার্য্য, একথা সে কালের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের এ কালের পণ্ডিত মহাশয়েরা সে ভুলটা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। এখন 'বামুন ঠাকুর' অর্থে রাঁধুনি। আজ কাল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতের ভাত খাইলে আমাদের ঠাকুর মহাশয়দের এক তাল গোবর খাইয়া সে ভাত হজম করিতে হয়। কিন্তু সে কালে ব্রাহ্মণদের এতটা অজীর্ণ হয় নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের অন্নের ত কথাই নাই; অনেক শূদ্রের হাতের ভাতও তাঁহারা নির্ব্বিবাদে হজম করিতেন। তাঁহাদের জাতটি যে তাহাতে মারা যাইত, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজ কাল আহার বিষয়ে যিনি যত বড় "ছুঁৎমার্গী", তিনি তত বড় পণ্ডিত।

৩

আজ কাল যাহারা শাস্ত্রগুলিকে চুণকাম করিয়া বাহিরের লোকের কাছে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা বলেন, যে, শূদ্রকে শিক্ষাদ্বারা ক্রমোন্নত করাই আমাদের সমাজের লক্ষ্য। এক আধটা শ্লোক দেখিয়া মনে হয় যে, সমাজের মনে এক দিন হয় ত সে আদর্শ ছিল; কিন্তু সে আদর্শ ভুলিয়া যাইতে যে বড় বেশী বিলম্ব হয় নাই, তাহার প্রমাণ পদে পদেই পাওয়া যায়। ব্যাস-সংহিতায় ব্যবস্থা আছে—

> ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
> শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে॥
> শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
> বেদমন্ত্রস্বধা-স্বাহা-বষট্‌কারাদিভির্বিনা॥

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতি দ্বিজশব্দ-বাচ্য। ইহারাই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী। অপর জাতি নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থবর্ণ বলিয়া ধর্ম্মে অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বষটকারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।"

জাতিভেদের যাঁহারা আধ্যাত্মিক মর্ম্মোদ্ঘাটন-প্রয়াসী, তাঁহারা এ কথায় কি বলেন? স্বাহা, স্বধা উচ্চারণ করিলে বোধ হয় শূদ্রের জিহ্বায় ফোস্কা পড়িত?

শুধু ধর্ম্ম বিষয়ে নয়—লৌকিক বিষয়েও শূদ্রকে কোনও উপদেশ দিতে মনু মহারাজ নিষেধ করিয়াছেন,—"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।"

শূদ্র অপরাধ করিলে তাহার বিচারের ব্যবস্থাও বেশ চমৎকার। ব্রাহ্মণের সত্যদ্বারা শপথ করিলেই চলিত; ক্ষত্রিয় অশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা এবং বৈশ্য গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা শপথ করিত। কিন্তু শূদ্রের বেলা ব্যবস্থা অন্তরূপ।

> অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ।
> পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক॥
> যমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
> ন চার্ত্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ॥
> (মনু ৮ম অধ্যায়)

"শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে যাহার শীঘ্র কোনরূপ পীড়া না জন্মে, শপথ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে।"

যাঁহারা সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথায় কথায় মনুস্মৃতির দোহাই দেন, তাঁহারা আজ কাল মনুর এ ব্যবস্থাগুলি মানিয়া চলিতে রাজী আছেন কি? আগুনে পোড়াইয়া এবং জলে ডুবাইয়া মহামহিম শাস্ত্রকারক শূদ্রকে নিষ্কৃতি দেন নাই। টুঁ শব্দটি করিলেই তাহার হাত পা কাটিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। শূদ্র যদি দ্বিজদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; কেন না শূদ্র জঘন্য স্থান হইতে উৎপন্ন। নাম ও জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজদিগের উপর আক্রোশ করে, তবে একটা জলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু নিক্ষেপ করা উচিত। (মনু ৮ম অধ্যায়) অর্থাৎ শূদ্র যদি দূর হইতে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলে—"ওরে ও বামনা ও বিটকেল", তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিতে পারিলে তাহার জিভ কাটিয়া লইবেন, আর ধরিতে না পারিলে জলন্ত লোহার ডাণ্ডস ছুঁড়িয়া মারিবেন। যদি ইহাতেও শূদ্রের কঠিন প্রাণ বাহির হইয়া না যায়, ত মনু মহারাজ দয়াপরবশ হইয়া তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

> ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ
> তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শোত্রে চ পার্থিব॥২৭২

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছে্রষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্ ॥ ২৭৯
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি ॥ ২৮০
সহাসনমভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্য স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥
অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌচ্ছেদয়েন্নৃপ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্ ॥ ২৮২
কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌচ্ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ ॥ ২৮৩
(মনু ৮ম তধ্যায়)

"শূদ্র যদি দর্পিতভাবে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন। অন্ত্যজ যে অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন—ইহাই মনুর আদেশ। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন। আর রুষ্ট হইয়া পদ দ্বারা প্রহার করিলে, পা কাটিয়া দিবেন। শূদ্র যদি উচ্চ বর্ণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশালকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিড করিবেন, অথবা যেন না মরে এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। শূদ্র যদি অহঙ্কার করিয়া ব্রাহ্মণের গায়ে থুথু দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার ঠোঁট দু'খানি কাটিয়া দিবেন। প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদন করিবেন এবং বায়ু নিঃসরণ করিলে গুহ্যদেশ কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের চুলের মুঠি ধরে কিংবা হিংসা করিয়া যদি পা, গলা, অণ্ডকোষ ধরে, অথবা দাড়ী ধরিয়া টানে, তাহা হইলে রাজা বিনা বিচারে উহার হাত দু'খানি কাটিয়া দিবেন।

ইহার উপর টীকাটিপ্পনি বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ শুধু শূদ্রকে হাতে মারিয়াই তুষ্ট নহেন, বেচারাকে ভাতে মারিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন—

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদানমাচাদৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ ॥
(৪১৭ মনু ৮ম অধ্যায়)

"ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধ চিত্তে শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন; যে হেতু শূদ্রের নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।"

শক্তেনাপি হি শূদ্রেন ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ ১২৯
(মনু ১০ম অধ্যায়)

পাছে শূদ্র ধনী হইলে অহঙ্কারী হইয়া ব্রাহ্মণের অপমান করে, সেই জন্য শাস্ত্র আগে হইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, ধনসঞ্চয় করিতে পারিলেও শূদ্রের তাহা করা উচিত নয়।

• শুধু যে মনুই এই ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা নহে। মনুর শিষ্যবর্গের দয়াও মনু অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। গৌতমসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধ্যায়াভিহত্য চ বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদর্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোহধিকোহথাহাস্য বেদমুপশৃণুতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসনশয়নবাক্‌পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতম্।

শূদ্র যদি কোন উচ্চবর্ণের প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কঠোর ভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গদ্বারা আঘাত করিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। * * * শূদ্র যদি দ্বিজদিগের ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড অবধি হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সীসা ঢালাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্র বুজাইয়া দিবেন, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এবং বেদমন্ত্র অঙ্গে ধারণ করিলে যে অঙ্গে ধারণ করিবে সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। আসন, শয়ন, বাক্য বা পথে যদি শূদ্র কোন দ্বিজের সহিত সমান ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে রাজা তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবেন।"

বিষ্ণুসংহিতা আবার ইহারও উপরে যান। সর্ব্বলোকহিতৈষী ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, অস্পৃশ্যজাতি যদি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে বধ্য হইবে।

"কামকারণোস্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকংশন্ স্পবধ্য ॥ ১০২
(বিষ্ণুসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়)

শূদ্র যে সদাচার অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইবে, আমাদের ব্যবস্থাপকেরা সে পথও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে আছে—

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥ ৯৬

"যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি লোভ বশতঃ উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাকে নির্ধন করিয়া শীঘ্র দেশ হইতে বিদূরিত করিবে।"

ঘরে বাহিরে প্রহার খাইয়া ও কথায় কথায় নাক কাণ কাটা গেলেও যদি শূদ্র প্রাণে না মরে, তাহা হইলে ভূভারহারী ব্রাহ্মণ অনায়াসে তাহার গলাটা টিপিয়া ধরিয়া তাহার ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। শাস্ত্রকারের তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যদের আদি পুরুষ মনু লিখিয়া গিয়াছেন—

মার্জ্জার-নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেবচ।
শ্ব-গোধালুক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ ॥ ১৩২

"বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক, ইহাদের একটীকে হত্যা করিলে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"—একটা শূদ্রকে মারা আর একটা বিড়াল, কুকুর, ব্যাঙকে মারা একই কথা। এমন না হইলে আর শাস্ত্র! ছেলেবেলায় যে মগের মুলুকের অত্যাচারের কথা শুনিতাম—সে মগের মুলুকও বোধ হয় ইহার তুলনায় স্বর্গ।

৪

এ সব ত সেকালের কথা। এইবার আজকালের কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। রঘুনন্দনের ব্যবস্থা মতে বাঙ্গলা দেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের অস্তিত্ব নাই। কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হাড়ি বাগ্‌দী পর্য্যন্ত সকলেই শূদ্র। এই অন্ত্যজসমুদ্রে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ তৈলবিন্দুর মত ভাসিতেছেন।

হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ৬ জন ব্রাহ্মণ, ৫ জন কায়স্থ; বৈদ্য ও ক্ষত্রিয় মিলিয়া হিন্দুসংখ্যায় একশতাংশ; ইঁহারাই বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণী। ইঁহাদের পর নবশাক ও অন্যান্য জল-আচরণীয় সৎশূদ্র। বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তাম্বুলী, তন্তবায়, তিলি প্রভৃতি ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের সংখ্যা শতকরা সাড়ে ষোল। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, তবে ইঁহাদের পুরোহিতেরা সমাজে অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া গণ্য হন। মাহিষ্য, গোয়ালা প্রভৃতি জাতি ইঁহাদের নীচে। সংখ্যায় ইঁহারা শতকরা সাড়ে তের জন। ইঁহাদের অধিকাংশই জলচল, তবে ইঁহাদের পুরোহিতেরা স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণের বৈবাহিক আদান প্রদান হয় না; বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণবণিক, সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি জাতের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৯ জন। ইঁহাদের জল অব্যবহার্য্য। বৈষ্ণব ও যোগীর ব্রাহ্মণ নাই; অন্যান্য জাতের ব্রাহ্মণেরা 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত এবং ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহারা হীন বলিয়া গণ্য। চাষাতী, ধোবা, কলু, কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পাটনী, পোদ, শুরী, টিপরা, তেওর, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতি প্রায় শতকরা ৪০ জন হইবে। ইহাদের কোন জাতিই জলচল নহে। ইহাদের কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে; কিন্তু সে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য। বাউরি, চামার, ডোম, মুচি, হাড়ি, ভুঁইমালী, কেওরা, কোরা প্রভৃতি জাতি সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে অবস্থিত। ইহাদের স্পৃষ্ট জল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অব্যবহার্য্য; উচ্চশ্রেণীর ঘরেও ইহারা প্রবেশ করিতে পায় না। ইহাদের কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে, তবে বলা বাহুল্য যে তাহারা সমাজে পতিত। সংখ্যায় ইহারা শতকরা ৯ জন।

মোটামুটি হিসাব ধরিলে, বাঙ্গলার প্রায় ২ কোটী হিন্দুর মধ্যে শতকরা ১২ জন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু; ৩০ জন জল-আচরণীয়; বাকি ৫৮ জন জলচল নহে এবং এই ৫৮ জনের মধ্যে প্রায় ৫০ জন অস্পৃশ্য।

বাঙ্গলার অর্দ্ধেক হিন্দু অপরার্দ্ধকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না! এই ত সমাজের অবস্থা! যাহারা অস্পৃশ্য, খুব সম্ভবতঃ তাহাদের অধিকাংশ প্রাচীন-কালের শূদ্রদিগের বংশধর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের মাথায় যে বোঝা চাপাইয়া গিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহারা সেই বোঝা বহিয়া মরিতেছে। বাঙ্গলার অধিকাংশ মুসলমান এই শ্রেণীসম্ভূত। পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহাদের ঘরের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; আর এই অত্যাচারের বোঝা মাথা হইতে ফেলিয়া দিয়া আল্লা ভজিয়া তাহাদেরও হাড় জুড়াইয়াছে।

জল-অনাচরণীয় এমন অনেক জাতি আছেন, যাহারা প্রাচীন শূদ্রসম্ভূত নহেন। বৌদ্ধযুগে বেদাচার ত্যাগ করিয়া অনেক জাতিই ব্রাত্য মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, অনেকে আবার হিন্দুরাজাদিগের কোপে পড়িয়া পতিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালীর ধমনীতে কয়ফোঁটা আর্য্য রক্ত আর কয়ফোঁটা অনার্য্যরক্ত, সে বিচার লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মাথা ফাটাফাটি চলিতেছে, সুতরাং সে বিষয় মীমাংসায় ভার লওয়া আমাদের ন্যায় অপণ্ডিতের শোভা পায় না; তবে বাহিরের আকৃতি দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাক, মাহিষ্য, সাহা, সুবর্ণবণিক, যোগী, তাঁতি, তিলি প্রভৃতি বাঙ্গলার উচ্চশ্রেণী, জল-আচরণীয় শ্রেণী ও অনেক জল-অনাচরণীয় শ্রেণীকে একবংশসম্ভূত বলিয়া মনে হয়—তা সে বংশকে আপনারা আর্য্যই বলুন, আর অনার্য্যই বলুন বা বর্ণসঙ্করই বলুন। কিন্তু বংশগত আর্য্যত্ব ছাড়া আর্য্য সভ্যতা বলিয়া একটা জিনিস আছে। প্রাচীন কালে যখন কোন শূদ্র আচার ও শিক্ষার উৎকর্ষ হিসাবে উচ্চবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইতেন, তখন এই আর্য্যসভ্যতা ও সদাচারের মাপকাটি দিয়াই তাঁহাকে মাপা হইত। সেই হিসাব ধরিলে অস্পৃশ্যদিগের মধ্যে হাড়ি, কেওরা, ডোম, মুচি প্রভৃতি দুই চারিটী জাতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও বর্ত্তমানে শূদ্র বলা চলে না।

যাহারা পরের দাস্যবৃত্তি করে, যাহারা অপবিত্র, অশুচি, যাহাদের বৃত্তির স্থিরতা নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, ও যাহারা অজ্ঞান—শাস্ত্রকারেরা তাহাদের শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৃত্তির আজ কাল কাহারও স্থিরতা নাই। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলেও আজ কাল কলে মজুরী করিতেছে। নবশাক ও অন্যান্য সৎশূদ্র, মাহিষ্য, সাহা, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিদিগের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অপেক্ষা বৃত্তির স্থিরতা আছে। ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার আজ কাল ইহাদের মধ্যে যতটা আছে, ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যে ততটা নাই। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য যদি বৈশ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এ সমস্ত জাতি বৈশ্য নয় কেন?

আদমসুমারি হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গলায় একশত ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪৮ জন কৃষিজীবি, ৩৪ জন বিদ্যাচর্চ্চা অথবা শিল্পবাণিজ্য ও ১৮ জন অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, বৃত্তি হিসাবে ধরিলে এ সমস্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা কি জাত? শাস্ত্রে আছে যে, অপকৃষ্ট বৃত্তি অনুসরণ করিলে উচ্চবর্ণের বর্ণান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া অন্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্তবর্ণ মধ্যে গণ্য হইবেন না কেন? আর এ ম্লেচ্ছদেশ বাঙ্গালায় বাস করিয়াও ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন কিরূপে? বাঙ্গালাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিলাম বলিয়া কেহ লাফাইয়া উঠিবেন না। শাস্ত্রমতে—

> চাতুর্ব্বর্ণ্যং ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
> স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ॥
> (বিষ্ণুসংহিতা, ৮৪ম অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক।)

যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে; তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত। পণ্ডিত মহাশয়দের মতে যখন বাঙ্গালায় চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ নাই এবং এরূপ দেশে যখন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপ নিষ্পন্ন করা অনুচিত, তখন তাঁহারা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া শাস্ত্র-বাক্য পালন করেন না কেন? তাহা হইলে সব ল্যাঠাই চুকিয়া যায়। তাঁহাদেরও ধর্ম্ম বাঁচে, আর এদেশের শূদ্র বেচারাদেরও প্রাণটা বাঁচে।

আমাদের দেশে বাগ্দী, বাউরি, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের চক্ষে হীন জাতি বলিয়া গণ্য। কিন্তু বৃত্তি হিসাবে ইহাদিগকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিশেষ হীন মনে করিবার কারণ নাই। বাগ্দীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন কৃষিকার্য্য, ২০ জন খাদ্যাদি বিক্রয়, ১৮জন মজুরী করে। বাউরিদের মধ্যে ৬৩ জন কৃষিজীবী, ৪৩ জন দৈনিক শ্রমজীবী, ৭ জন গো-মেষপালক ও বাকী অনুরূপ ব্যবসায়ী। নমঃশূদ্রের মধ্যে শতকরা ৮২ জন চাষী ও অবশিষ্ট অন্যান্য কাজ করে। যাহারা উচ্চজাতি বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদেরও ত ঐ এক দশা। ব্রাহ্মণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কায়স্থদের মধ্যেও শতকরা ৬৬ জন চাষী, ৮ জন লেখাপড়া জানা কাজ বা শিল্পাদিতে নিযুক্ত।

যাঁহারা আকৃতি, প্রকৃতি, বৃত্তি ও খাদ্যাখাদ্য-বিচারে সমভাবাপন্ন, তাহাদিগকে একজাতি বলিয়া গণ্য করিলে মহাভারত কি একেবারেই অশুদ্ধ হইয়া যাইবে?

বর্ত্তমান সামাজিক ভেদে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহই যে বিশেষ তুষ্ট নহেন, আজকালকার আন্দোলনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেখানে ১০০ জনের মধ্যে ছয় জন দেবশর্ম্মা, আর বাকি ৯৬ জন তাঁহাদের দাস, সেখানে অশান্তি না হওয়াই আশ্চর্য্য। কায়স্থ, বৈদ্য, রাজবংশীয়, নমঃশূদ্র, বারুই, সদ্গোপ, তিলি, কৈবর্ত্ত, ঝালমাল, সুবর্ণবণিক, সাহা, সূত্রধর,

মাহিষ্য প্রভৃতি অনেক জাতিই প্রাচীন নজির দেখাইয়া আপনাদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। সমাজ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা যদি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য হয়, তাহা হইলে আপনাদের দেশে ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা বহুদিন হইতে মাটী হইয়াছে বলিতে হইবে। শুধু পুরাতন পাঁজিপুথির জোরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া কোনও লাভ নাই। যে সমস্ত জাতি বৈশ্যত্ব দাবী করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে বৈশ্যত্বের সার্টিফিকেট লইবার চেষ্টা করার কোনও সার্থকতা দেখি না। তাঁহারা প্রায় সকলেই জল-আচরণীয়; সুতরাং যদি তাঁহারা শূদ্র হন, ত তাঁহাদের হাতের জল গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা ত শাস্ত্রমতে পতিত হইয়াছেন। পতিত ব্রাহ্মণের সার্টিফিকেটের মূল্য কি?

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি॥
২৪৮ অত্রিসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ অজ্ঞান পূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান করিলে, স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবেন।" ব্রাহ্মণেরা বেশ জ্ঞান-পূর্ব্বক এই সমস্ত জাতির হাত হইতে জলপান করেন এবং সেজন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত করাও আবশ্যক মনে করেন না। সুতরাং হয় তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, জল-আচরণীয় জাতিগুলি শূদ্র নহে, নয় তাঁহারা নিজে পতিত। ব্রাহ্মণেরা এই দুইটা কথার মধ্যে কোন্‌টা স্বীকার করিতে চান? শাস্ত্রে শূদ্রদিগের কোনরূপ সংস্কারের বিধি নাই, কিন্তু এ সমস্ত জাতির উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন ব্যতীত সমস্ত সংস্কারই আছে। ইঁহাদিগকে বৈশ্য মধ্যে গণ্য করিবার ইহাও অন্যতম যুক্তি।

ইঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া গণনা করিলে ব্রাহ্মণদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কেননা শাস্ত্রমতে তাঁহারা বৈশ্যের গৃহে হব্যকব্যে ভোজন করিতে পারেন। এ দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন লাভের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় আপত্তি কি?

অনেক জাতিই যে আজ কাল আপনাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অপ্রিয় সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোন কোন স্থলে এই বর্ণান্তর লাভের আন্দোলন বেশ একটু 'আর্য্যামি' গন্ধদুষ্ট। কায়স্থ ক্ষত্রিয় ধরিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত; কিন্তু রাজবংশীরা যে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন, কায়স্থেরা তাহা গ্রাহ্য করিয়া রাজবংশীদের সহিত একত্র পান ভোজন ও বৈবাহিক আদান প্রদান করিতে কি সম্মত? ব্রাহ্মণেরা কায়স্থ সম্বন্ধে যেরূপ সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট, কায়স্থেরাও কি অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপই নহেন? যাঁহারা নিজেরা বড় হইতে চান, অপরকে দাবাইয়া রাখিতে তাঁহাদের আগ্রহ কেন? আর্য্যত্বরূপ মাকাল-ফল কি এতই মিষ্ট যে, অপরকে তাহার একটুও ভাগ দেওয়া চলে না? নমঃশূদ্রের উপর যে সামাজিক অত্যাচার করা হয়, সে সম্বন্ধে কি কায়স্থ, বৈশ্য বা নবশাক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কম দোষী? শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে, আর্দ্ধিক, (যাহার সহিত আধা-আধি ভাগ করিয়া জমি চাষ করা হয়) কুলমিত্র, নাপিত, গোপাল, ভৃত্য প্রভৃতি শূদ্রের অন্নভোজন করিতে পারা যায়। যাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের দাবী করেন, তাঁহারা এই শাস্ত্র-ব্যবস্থার জোরে নমঃশূদ্রের সহিত পান ভোজন করিতে পারেন না কেন? নমঃশূদ্র যদি তাঁহাদের মতে শূদ্রই হয়, তবু ত সে আর্দ্ধিক বটে। শাস্ত্র-ব্যবস্থাগুলা কি নিজেদের সুবিধার সময়ই মানিতে হয়? কলিতে শূদ্রের অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা আদিপুরাণের শ্লোক আওড়ান, তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান, যে, স্মৃতির সহিত পুরাণের বিরোধ ঘটিলে স্মৃতির ব্যবস্থাই মান্য।

বস্তুতঃ আজ কাল জাতিভেদ নামে যাহা প্রচলিত, তাহার মূলে শাস্ত্রীয় বিধিও নাই, লৌকিক যুক্তিও নাই। তাহা শুধু অহঙ্কার-প্রসূত দেশাচার মাত্র। মাছ মারে বলিয়া ধীবর ও কৈবর্ত্তের জল অস্পৃশ্য; কিন্তু তাহাদের হাতের জলটুকু খাইলে যাঁহাদের জাতি মারা যায়, মাছ তাঁহাদের নিকট পরম উপাদেয় আহার! শুঁড়ির হাতের মদ খাইলে জাতি যায় না, জল খাইলে জাতি যায়! হাড়ি শূকর পালন করে বলিয়া অস্পৃশ্য, কিন্তু রাজপুতেরা অনেক স্থলে শূকর খাইয়াও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। নমঃশূদ্রের হাতের জল অচল, কিন্তু মুসলমানের বরফ বেশ সচল। চৌকার মধ্যে নিশ্বাসটুকু পড়িলে হিন্দুস্থানে যাহাদের জাত যায়, পাঞ্জাবে দোকান হইতে ডালরুটি কিনিয়া খাইলেও তাদের জাত অটুট থাকে। নমঃশূদ্রের দাড়ী কামাইলে নাপিতদের এক-ঘরে হইতে হয়, কিন্তু মুসলমানের গোঁফ ছাটিলে তাহার জাত বজায় থাকে!

কিন্তু এ অপূর্ব্ব বিধানগুলি যে আর বেশী দিন

থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত। শূদ্র রেলগাড়ীতে ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসে বলিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে তাহাকে ষাঁড়-দাগা করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, সে উপায় নাই, বেদমন্ত্র শুনিয়াছে বলিয়া তাহার কাণে সীসা ঢালিয়া দিবারও সুবিধা হইবে না। শূদ্র তপস্যা করিতে বসিলে কোন ধার্ম্মিক রাজা যে টক্ করিয়া তাহার মাথাটা কাটিয়া লইবেন, সে সম্ভাবনাও নাই। পণ্ডিত মহাশয়দের ছেলেরাই এখন টোল ছাড়িয়া আফিষের কেরাণী-বাবু হইয়াছেন; কলিকাতায় আসিয়া অন্নবিক্রয়ের হোটেল খুলিয়াছেন; হাড়ী, বাগ্দী, মুসলমানের সহিত কলে মজুরীও করিতেছেন এবং বাড়ী ফিরিয়া গেলে যে তাঁহারা এক-ঘরে হয়ে থাকেন, এরূপ প্রমাণ নাই। কীটদষ্ট, জীর্ণ পুথির বিধান অপেক্ষা যে বিধির বিধান প্রবল, একথা এখন মানিতেই হইবে। ভগবান যাহাকে মানুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে প্রাণে মারিয়া কুকুর, ব্যাঙ্ বা ইন্দুর মারার প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্রের চক্ষে নিষ্পাপ হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগবানের কাছে যে অত সহজে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, সেই কথাই আজ ভগবান চোখে আঙ্গুল দিয়া শাস্ত্রকারের বংশধরদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন।

সেকালের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেখিলাম, একালের বর্ত্তমান অবস্থাও দেখিলাম, এখন ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য কি? যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যাহারা ব্রাহ্মণের শ্রীচরণের পদধূলি ও লাথি খাইয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহারা আর কথায় ভুলিতে রাজী নহে। পরের পদলেহন করিয়াই যে তাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল, এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে। মুসলমান আসিয়া যে দিন ভারতবর্ষের বাদশাহ হইয়া বসিল, হিন্দুরাজার বেদমন্ত্রপূত মাথার মুকুট যেদিন ধুলায় লুটাইল, মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া যেদিন ভাঙ্গিল, ব্রাহ্মণের শালগ্রাম-শিলা যেদিন রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল, সেই দিন হইতে শূদ্রের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ আপনাকে যতটা প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, বুঝি বাস্তবিক সে তাহা নহে। ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা যাহারা না লয়, তাহাদের ত ঐহিক সুখসাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না; বুঝি বা স্বর্গের পথও রুদ্ধ হয় না। শতধাবিভক্ত হিন্দুসমাজ স্বজাতিবৎসল মুসলমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহে, এ কথা যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টায় হিন্দু একবার আপনার ঘর গুছাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা হইতেই শিখ, সৎনামী, কবীরপন্থী ও নিত্যানন্দী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। কিন্তু স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজের তাহাতেও চক্ষু ফুটে নাই। তাহার পর সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে সেই শিক্ষা দিবার জন্য বিধাতা ইংরেজকে এদেশে টানিয়া আনিলেন। শিক্ষা, শাসন, ব্যবসা, বাণিজ্য সবই ইংরাজের হাতে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই মিলিয়া আমরা ইংরাজের নিকট চাকরীর উমেদার। সব জাতেরই সমান অবস্থা; সুখদুঃখে সকলেরই সমান অধিকার। স্কুল কলেজে ব্রাহ্মণ শূদ্র একই আসনে বসিয়া একই শিক্ষা পায়; রেলে ট্রামে একই বেঞ্চে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হাড়ি, মুচি সবাই গিয়া বসে; আদালতে একই আইনের বিচারফলে ব্রাহ্মণ শূদ্র একই শিকলে বাঁধা পড়িয়া দীপান্তরে প্রেরিত হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের মত ত আর প্রমাণ নাই। চোখের সম্মুখের এত বড় শিক্ষাটা ব্যর্থ হওয়াই অস্বাভাবিক। তাহার পর রেল, তার ও বিদেশে গমনাগমনের ফলে কূপমণ্ডূকতা ঘুচিয়া গেল। লোকে স্বদেশের সমাজ-বন্ধনের সহিত অন্যদেশের সমাজ-বন্ধনের তুলনা করিতে শিখিল। ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যে শূদ্রধর্ম্মী ব্রাহ্মণের দাসত্ব একান্ত আবশ্যক নহে, ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র না বলিয়া দিলেও যে দেবতার পূজা বাধে না—একথা বুঝিতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। অজ্ঞানের উপর যাহার ভিত্তি, তাহা ত একদিন না একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবেই।

বর্ত্তমান আন্দোলনগুলির এটা শুধু ভাঙ্গনের দিক। এগুলির একটা গড়নের দিকও আছে। প্রত্যেক জাতি মানবজীবনের একটা বিশেষ আদর্শ ও ধারণা লইয়া আপন আপন সমাজ গঠন করে। পরিস্ফুট বা অপরিস্ফুটভাবে সেই আদর্শ জাতীয়-সম্বিৎকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়াই, প্রত্যেক সমাজের বৈশিষ্ট্যও আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ও সভ্যতার মূলে ঐরূপ একটা আদর্শ বর্ত্তমান। আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহারা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মানুষের জীবনের সেইটুকুই ফুটাইবার জন্যই তাঁহাদের সমাজগঠন। সে সত্য সনাতন হইলেও মানবজীবনে তাহার বিকাশের তারতম্য অনুসারে সমাজের বাহ্যগঠন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। জগতের মূলে যে সত্য বিদ্যমান, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আপন জীবনে যিনি তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ। জাতি-বিশেষের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে সকলকে ক্রমশঃ সেই সত্য উপলব্ধির অধিকারী করিয়া তোলাই ব্রাহ্মণের কার্য্য। সেই জন্যই তিনি সমাজের শিক্ষাগুরু। ভেদমূলক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য নহে; সকলেরই মধ্যে ভগবানকে মূর্ত্ত করিয়া সকলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতকে সেই ভূমানন্দের অধিকারী করাই ব্রাহ্মণের লক্ষ্য। যাঁহারা এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গীকৃতজীবন, যাঁহারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; যাঁহারা এই আদর্শ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া লোকস্থিতির জন্য সমাজের পুষ্টিসাধনে তৎপর, তাঁহারাই বৈশ্য। যাঁহারা এই ভূমানন্দের অধিকারী হইবার জন্য ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবাধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত, তাঁহারাই শূদ্র। এ জাতিবিভাগের সহিত মানবসৃষ্ট জন্মগত পার্থক্য কোনরূপে জড়িত নহে। যাহার যেরূপ যোগ্যতা, যাহার যেরূপ অধিকার, সে সেই জাতিভুক্ত; যে দিন জগতের সকলকেই সেই সনাতন সত্য উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে, সেই দিনই জগতে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে।

এই সত্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবস্থার তারতম্য অনুসারে আংশিকভাবে সমাজে প্রকটিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। জন্মগত জাতিভেদ সেই চেষ্টার একটি রূপ মাত্র, সনাতন ধর্ম্মের সহিত ইহার কোনও নিত্য সম্বন্ধ নাই। আভিজাত্যস্পর্দ্ধী তথা-কথিত ব্রাহ্মণসমাজ যদি সনাতন আদর্শ ভুলিয়া গিয়া অপর কাহাকেও নির্য্যাতিত করিয়া আপনাদের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদেরই সনাতন ধর্ম্মের প্রতিভূ হইবার অক্ষমতা প্রকাশ পায় মাত্র, আদর্শের কোনও ত্রুটি প্রমাণিত হয় না। অতীত যুগে সমাজে পূর্ণ ভাবে এই আদর্শ পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া আজও যে হইবে না, এ কথা কে বলিল? একাত্মবোধ নানা কারণে সকল দেশের মানুষের মনেই ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্য্য আদর্শ জগতে প্রচারিত করিবার এই যুগই প্রশস্ত সময়। যে আধ্যাত্মিক সত্যের উপর এই আর্য্য-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, ভারতেই তাহা আবিষ্কৃত, ভারতেই তাহা পুষ্ট। ভারতে আজও সে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভারত হইতেই তাহা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবে। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে ভারতীয়-সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া যুগোপযোগী রূপ দিতে হইবে। সে নূতন সমাজে জন্মগত জাতিভেদের স্থান নাই। পূর্ব্বপুরুষের নামে আত্মপরিচয় দিয়া কেহ সেখানে উচ্চাসন পাইবে না। কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, তাহা টিকি পৈতারগোছা দেখিয়া নির্ণীত হইবে না। যাহাকে শূদ্র ভাবিয়া সমাজের এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছ, 'চলমান শ্মশান' মনে করিয়া ঘৃণার ভরে যাহার দিকে ফিরিয়াও চাও নাই, যাহাকে সেবার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা, শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ করিয়া আপনার প্রাধান্য প্রচার করিয়া আসিয়াছ, জানিও, সেও ভগবানের সজীব মূর্ত্তি। তাহাকে দূরে ঠেলিতে গিয়া তুমি ভগবানের নিকট হইতেই সরিয়া আসিয়াছ। তোমার প্রত্যেক আঘাত সর্ব্বান্তর-বিহারী ভগবানের অঙ্গেই বাজিয়াছে। অন্ধ তুমি। ব্রাহ্মণত্বের স্পর্দ্ধা কর—মূর্ত্ত ব্রহ্মকে চিনিলে না?

এই ভাগবৎসমাজ প্রতিষ্ঠার সাধনা অন্তর্জগতে বহুদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। জগৎ জুড়িয়া আজ যে সামাজিক আন্দোলন ধরিত্রীর বক্ষ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা তাহারই আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভগবচ্চরণ-নিঃসৃত জাহ্নবীর পূতধারা এবার শতমুখী হইয়া ছুটিবে। হে টিকিদাস ভট্টাচার্য্য! পুঁথির বাঁধ-দিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

স্বাধীন মানুষ

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীন মানুষ

—:•:—

আজ এ কথা বোঝবার ও বোঝাবার দিন এসেছে যে, আমরা যে স্বাধীনতা চাই, তা রাজনৈতিক হিসাবে বিদেশের পীড়ন থেকে উদ্ধার নয়—সর্ববন্ধন থেকেই মুক্তি।

মুক্ত সেই, যে নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে—যার আত্মপ্রকাশের পথে জগতে কোনই বাধা নেই।

স্বাধীন জাত, স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন সমাজ—এ সমস্তই বাজে কথা, যদি এই জাত, রাষ্ট্র বা সমাজের ব্যষ্টিগুলি স্বাধীন না হয়। দেশময় যখন স্বাধীনতার সুর বেজে উঠেছে, তখন আমরা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হতে চাই, ত এই কথাটাই আমাদের ভাল করে' মনে রাখতে হবে।

রাষ্ট্রের উপাসক ইউরোপ—অর্থ-পিশাচ, নর-শোণিত-পিপাসু দানবের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। সমাজের উপাসক আমরা—হীন, ভীরু, কপট, কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়িয়েছি। ব্যষ্টিকে তুচ্ছ করে', স্বাধীনতার স্বরূপ না জেনে যারা রাষ্ট্র বা সমাজকে উপাস্য দেবতা করে' তুলতে চায়, ঐ তাদের পরিণাম।

মানুষে মানুষে আজ সব সম্বন্ধ ঘুচে গেছে—স্বধু আছে প্রভু আর দাস, প্রবঞ্চক আর প্রবঞ্চিত। তাই আজ সর্ব্বত্রই আকাশভরা আর্ত্তনাদ, জগৎ-জোড়া বিপ্লব।

কিন্তু ভগবান যাকে মানুষ করে' গড়েছেন, কোনো মানুষের সাধ্য নেই তাকে চিরদিন দাস করে' রাখে। অন্তরের দেবতা যেদিন তার অজ্ঞানের বন্ধন খসিয়ে দেবেন, সে দিন মানুষ তাকে বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারবে না।

সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, সঙ্ঘ—সব নামের আবরণ ভেদ করে' মানুষ একদিন নিজেকে চিনবেই চিনবে, আপনাকে ভগবানের মূর্ত্তপ্রকাশ বলে' জানবেই জানবে। সেইদিন হবে তার যথার্থ মুক্তির দিন, যথার্থ ই মিলনের দিন।

তখন এ কথা সে বুঝবে যে, গোড়ার কথা মানুষ—সমাজ, রাষ্ট্র, সঙ্ঘ, সবই সেই মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি, অভিব্যক্তির জন্যে সৃষ্ট। সেই উদ্দেশ্য যেখানে যতটুকু সফল হয়েছে, সমাজ বা রাষ্ট্রের সেইখানে ততটুকু সার্থকতা।

মানুষ নিজের সমাজের চেয়ে বড়, ধর্ম্মের চেয়ে বড়, দেশের চেয়ে বড়। মানুষকে ছোট করে', খর্ব্ব করে', পঙ্গু করে' সমাজ বা রাষ্ট্র কোনো দিনই বড় হয়নি, হবেও না। সেই সমাজ বা রাষ্ট্র যথার্থ বড়,—যেখানে প্রত্যেক ব্যষ্টিটি আপনার মহিমায় মহীয়ান।

ব্যষ্টি ছাড়া সমষ্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথাও নেই। ব্যষ্টি যেখানে হীনবল, সমাজ সেখানে মুমূর্ষু, রাষ্ট্র সেখানে পরাধীন।

সমষ্টির আত্মচৈতন্য ব্যষ্টির মধ্যেই জাগ্রত। ব্যষ্টি যেখানে অজ্ঞান, সমষ্টি সেখানে জড়, শিথিল, মৃতপ্রায়।

সমগ্র সমাজকে যদি তুলতে চাও, ত প্রত্যেক মানুষকে মানুষ হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরো না। অপরের গলায় পা না দিলে যদি নিজের শক্তি অনুভব করতে না পার, তা'হলে জেনো যে তোমার পতনের আর বড় বিলম্ব নেই।

ব্যষ্টির মধ্যেই আত্মপ্রসারের বীজ, প্রেমের বীজ, সমাজ-গঠনের বীজ নিহিত। ব্যষ্টি যেখানে আপন ভাবে গড়ে' উঠতে পায়, সমাজও সেইখানে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আর শক্তিমান। ব্যক্তিত্ব যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সমাজও সেইখানে জীবনের স্বচ্ছন্দগতিতে উন্নতিশীল।

আদর্শ সমাজ গড়ে' ওঠা সম্ভব, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মধ্যে সমাজকে অনুভব করতে পারে।

মিথ্যার আশায় বা উদ্যত দণ্ডের ভয়ে মানুষ যেখানে একত্র হয়, সেখানে একতার অর্থ মিলন নয়, বন্ধন।

যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই, সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বধু ধূর্ত্তের ছল, নয়ত পাগলের প্রলাপ। যেখানে অন্তরের দেবতা প্রত্যেক ব্যষ্টির নামরূপের

মধ্যে জাগ্রত নয়, সেখানে সঙ্ঘ শুধু ক্রীতদাসের সমবায়।

তাই সর্ব্বান্তঃকরণে আজ যেন আমরা এই কথা বলতে পারি যে, আমরা দাস হতেও চাই না, প্রভু হতেও চাই না; লোককে বাঁধতেও চাই না, লোকের পায়ের তলায় বাঁধা পড়তেও চাই না; চাই শুধু অনন্তের মধ্যে নিজেকে পেতে, আর সেই অনন্ত ইচ্ছাশক্তির ধারারূপে জগতে ফুটে উঠতে। জগত যেন আমাদের ভয়ে ভীত হয়ে না ওঠে, আমরাও যেন জগতের মধ্যে ভয়ের কারণ না পাই। চাই নির্ভয় হতে, নির্বৈর হতে।

সমাজের দাসত্ব, রাষ্ট্রের দাসত্ব, নেতার দাসত্ব, পুঁথির দাসত্ব, সংস্কারের দাসত্ব, সম্প্রদায়ের দাসত্ব, নামের দাসত্ব, ভয়ের দাসত্ব—সব দাসত্বই যেন আজ আমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা যেন আমাদের অন্তরের স্বাধীনতারই বহিঃ-প্রকাশ।

সনাতন নাবালক

হিন্দুসমাজের একটা জাতি-বিশেষের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তারা আশী বৎসর বয়সে সাবালক হয়। তার আগে তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ভাবতে পারে না, নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বুঝতে পারে না।

ও-কথাটা ও-জাতি-বিশেষের সম্বন্ধে ঠিক খাটে কি না জানিনে; কিন্তু সারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে খুব বেশী করে' খাটে, তাতে আর ভুল নেই। আমরা জাতি হিসাবে একেবারে সনাতন নাবালক। নিজের মাথা ঘামিয়ে ভাবতে হলে আমাদের মাথা ঘুরে' যায়, নিজের হাত-পা বার করে' কাজ করতে হলে আমাদের হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায়। সব কাজেই ওস্তাদ, গুরু বা নেতা না ধরলে আর আমাদের চলে না। ছেলেবেলায় সেই যে গুরুমশাই আমাদের মাথার উপর বেত ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করতে হুকুম দেন, সে হুকুম আমরা আজীবন তামিল করতে থাকি। চিরকালই আমাদের মাথার উপর সামাজিক, না-হয় পারিবারিক, না হয় রাজনৈতিক, না-হয় আধ্যাত্মিক গুরুমশাই বেত ঘোরাতে থাকেন আর আমরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাঁদের শেখান পড়া মুখস্থ করে' যাই। নিজের চোখ-কান দিয়ে দেখতে শুনতে আমাদের ভয় হয়, পাছে গুরুমশায়েরা যা বলে' দিয়েছেন, তার উল্টো কিছু দেখতে শুনতে পাই, বাঁধা রাস্তা ছেড়ে আমরা একপা-ও চলিনে, পাছে ওস্তাদের কথা না শুনে জঙ্গলে হারিয়ে যাই।

আমাদের এ কর্ত্তাভজার দেশে কর্ত্তা ছাড়া আমাদের একদিনও কাটে না। সব কাজেই কর্ত্তার কাছা ধরে' গুটি গুটি চলতে পারলেই আমাদের মনটা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে, পরের কাঁধে ভর দিতে পারিলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো তাঁর নাতনীর বয়সী একটি মেয়ের পাণিগ্রহণ করে' ঘরে নিয়ে এলেন—তাঁর বুড়ী মায়ের হুকুম। বিদেশে গেলে জাত যাবে—সমাজের হুকুম। খেতে পাও না-পাও, জমীদারের ছেলে এসেছেন, নজর দাও—জমীদারের হুকুম। চোদ্দ-পুরুষে তোমার সঙ্গে যার কোনো বিরোধ নেই, লাঠি ঘাড়ে করে' তাকে মারতে ছোট—রাজার হুকুম। গুরুপত্নীকে একখানা বেনারসী সাড়ী কিনে দিয়ে পরকালের একটা ব্যবস্থা কর—খোদ গুরুদেবের হুকুম। চারিদিকে শুধু হুকুম আর হুকুম।

অপর দেশের লোকে হুকুম পেলেই আগে জিজ্ঞাসা করে—কেন? কিন্তু আমাদের দেশে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া ভীষণ বেয়াদবি। মুখটি খুলেছ কি তোমার জন্যে হয় ঐহিক না-হয় পারত্রিক নরকের বন্দোবস্ত। সমাজপতির কথার উপর কথা কইবার দুঃসাহস যদি কারো হয়, ত তার ধোপা-নাপিত বন্ধ, রাজার কথার উপর কথা কইলে পুলিশের ডাণ্ডা, আর গুরুজীর উপর কথা কইলে রৌরব নরক। কাজেকাজেই ছেলেবেলা থেকেই ভয়ে ডরে আমাদের আত্মাপুরুষ দেহ-পিঞ্জরে নিতান্ত আড়ষ্ট হয়েই দিন কাটান, কবে এই ভব-কারাগার থেকে তাঁর ছুটি হবে, এই ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন। সংসারটা যে দুঃখময়, এ তত্ত্বকথা তাই সব দেশের লোকের চেয়ে আমাদের দেশের লোকই এত ভাল করে' বুঝেছে। আর ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনও আমাদের অন্তরের ভাবের দিকে চেয়ে আমাদের ঘাড়ে দুঃখের উপর দুঃখ চাপাচ্ছেন।

আমাদের লেখাপড়া শেখা মানে কতকগুলো পরের ভাবা কথা মুখস্থ করা, আমাদের সামাজিক হওয়া মানে কতকগুলো বাঁধাধরা বিধিনিষেধ মানা, আমাদের ধার্ম্মিক হওয়া মানে পরের ভিতর

ভগবানকে খোঁজা, আমাদের দেশ-হিতৈষিতার মানে পরের কথামত চোখবুজে চেঁচান। সন্ন্যাসীর কর্ম্মত্যাগ উচিত কেন?—শঙ্করাচার্য্য বলে' গেছেন বলে'। কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নয় কেন?—বিবেকানন্দ বলে' গেছেন বলে'। মা-বাপের শ্রাদ্ধ করতে হবে কেন?—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য বলে' গেছেন বলে'। আর করতে হবে না কেন?—মিল, বেন্থাম বলেননি বলে'। ইংরেজী শিক্ষা ভাল—যেহেতু রবিঠাকুর তা বলেছেন; আর ইংরেজী শিক্ষা মন্দ—যেহেতু গান্ধী মহারাজ তা বলেছেন।

এই যে পরমুখাপেক্ষিতা, এই যে নিজের উপর অবিশ্বাস, এ একেবারে আমাদের হাড়মাসের সঙ্গে জড়ান। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলে আমাদের যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এ যে সুধু সাধারণ লোকের মনোভাব তা নয়, যাঁরা দেশের স্বাধীনতা চান, তাঁদেরও অবস্থা এর চেয়ে বড় বেশী আশাপ্রদ নয়। গত দু' মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক শ' কলেজের ছেলেকে বলতে শুনেছি যে, ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের স্বরাজ হবে, কেননা দেশের নেতারা তা বলেছেন। যাঁরা আত্মাকে নিত্যমুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান বলে' বিশ্বাস করেন, তাঁরাও ঐ পরের মুখের দিকে চেয়ে বসে' আছেন। আজ যদি কোনো জটাজুটধারী মহাপুরুষ হিমালয় থেকে নেমে এসে বলেন যে, তিনমাস উর্দ্ধমুখ হয়ে হাঁ করে' এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে, তা'হলে এই কলকাতার মধ্যে তাঁর দশ হাজার চেলা জুটতে তিন দিনও দেরী হবে না।

আসল কথা হচ্ছে চারিদিকের পেষণে আমাদের মনগুলো একেবারে অসাড়, পঙ্গু হয়ে গেছে। মনকে সতেজ করে' এই চিরকেলে নাবালকত্ব না ঘোচাতে পারলে আমাদের ইহকালেও মুক্তি নেই, পরকালেও মুক্তি নেই। সব কথা ছেড়ে এই কথাটা আমাদের আজ শিখতে হবে যে, দাস হয়ে যে থাকতে চায়, ভগবানও তাকে মুক্ত করতে পারেন না।

প্রাণের কথা

একবার এক হাল-ফ্যাসানের নামজাদা স্বদেশী বড় লোকের বাড়ী একটা কাজের খাতিরে গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে সাহেব বলে' না ডাকলে তাঁর দরোয়ান, বেহারা, কথার উত্তরই দেয় না—সবাই এমনি কেতা-দোরস্ত। তাঁর স্ত্রীকে বলতে হয় মেম-সাহেব, তাঁর মেয়েটি হলেন মিসি-বাবা। শুনলাম বাবুটিও এমনি পুরোদস্তুর সাহেব যে, পাইখানায় গিয়ে কাগজেই কাজ সারেন। অথচ তিনি একজন মস্তবড় হোমরুলের পাণ্ডা।

'হল'-ঘরে তাঁর পূর্ব্বপুরুষের অনেকের ছবি টাঙান রয়েছে। শুনলাম তাঁদের মধ্যে অনেকে নবাবী-আমলে নবাব-সরকারে বড় বড় চাকরী করতেন। তাঁদের পোষাকের সব মোগলাই ঢঙ। আর তাঁদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরিকাটা চুল। দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, স্বদেশী সাহেবটিও যেমন বক্তৃতার সময় মিল, বেন্থাম আওড়ান, তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরাও তেমনি মজলিসে বসে' হাফেজ আওড়াতেন, আর নবাবী-কায়দা মক্স করতেন।

যাঁরা একবার করে' আমাদের দেশে পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন, আমরা যথাসাধ্য তাঁদের সেই ধুলো গায়ে মেখে তাঁদের কায়দা-কারণ রং-ঢং মেরে নেবার চেষ্টায় ফিরেছি। আর মজা এই, আমরা বলি—এ সব আমাদের স্বাধীন-চিন্তার ফল। এই স্বাধীন-চিন্তাটা যে পরের লেজ ধরে' কেন ঘুরে' বেড়ায়, তা ভেবে দেখার আমাদের অবসর হয় না।

আমাদের দেশের ধাতটা একটু বেশী বেশী ভাবপ্রবণ বলে' এই ভাবের ঝড়গুলো আমাদের মনের উপর দিয়ে একটু জোর করে' বয়ে যায়। আমাদের যা কিছু কর্ম্ম, তা পট্‌ পট্‌ করে' গড়ে, আর তার চেয়েও পট্‌ পট্‌ করে' মরে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, এ সমস্ত কর্ম্মের ভিত্তি ভাবের উপর যতটা, জ্ঞানের উপর ততটা নয়।

নিজের দেশের বন্ধন ঘোচাবে—বেশ কথা; কিন্তু যে মন নিয়ে সেই বাঁধন খুলতে যাচ্ছ, সেটা যদি নিজে মুক্ত না হয়, ত তাতে পরের বন্ধন ঘুচবে না। এ কথাটা ভুলো না যে, সব বিষয়েই মুক্তির প্রথম কথা হচ্ছে—আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জান। নিজেকে জানলে বাইরের বাঁধন আপনা হতে খসে' পড়ে; কিম্বা সে বাঁধন খসাবার শক্তি কোথায় সংগ্রহ করতে হবে, তার সন্ধান পাওয়া যায়।

"বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়ত দুয়ার খুলবে না"—এই কথা বলে' গান গেয়ে বেড়ালে ত চলবে না;' দুয়ার কেন যে খুলচে না, তার কলকব্জা,

হুড়কো কেমন করে' আঁটা, তা যদি না জানি, ত ঐ গান গাওয়াই সার হবে।

এই গৌরচন্দ্রিকার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের কাজ করতে গেলে আগে দেশকে জানতে হবে। এই হাজার বছরের হাজার লাঞ্ছনা ভোগ করেও দেশের প্রাণ এখনও কোন্ আশায় ধুক্ ধুক্ করছে তা বুঝতে হবে। সে খবর সেন্সাস রিপোর্টে পাবে না; যাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে' এসেছ, বা যাদের উপর রাগ করে' আজ আবেদন নিবেদন বন্ধ করে' দিয়ে "জাতীয়" হয়ে উঠবার চেষ্টা করছ—তারা এর ধারও ধারে না। তাদের কাছে কান্নাও যেমন নিরর্থক, তাদের উপর রাগ করাও তেমনি নিরর্থক।

আমরা কাজ কাজ করে' ছুটে বেড়াই, কিন্তু ভুলে যাই যে, অন্ধের কাজ সুধু খানায় পড়া। কাজ করবার আগে একবার চোখটা খুলে' নিজের মূর্ত্তি দেখে নাও; যে ভারত তোমার-আমার মত এই তেত্রিশ কোটী জীবের মধ্যে মূর্ত্ত, এই তেত্রিশ কোটী রূপের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফোটাবার চেষ্টা করছে, তার অন্তরের কথাটা একবার বোঝবার চেষ্টা কর।

"Withdraw yourselves. Realise your own innerselves and get into the heart of your country and understand what she stands for. Strive for it, work for it unceasingly, strong in your faith in that, and all outer things will follow...... or you will lose your souls, and your country will never rise."

"বাইরের বাজে কাজ ছেড়ে দিয়ে, নিজের সত্তাকে চেন। দেশের প্রাণের মধ্যে ঢুকে', দেশ যে কি, তা বোঝ; তারপর বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে' যেয়ো; বাইরের সব জিনিষই গড়ে' উঠবে।......আর তা যদি না কর, তোমরাও অষ্মভ্রষ্ট হয়ে পড়বে; আর দেশও উঠবে না।"

অরবিন্দের এই কথাগুলি তোমরা একটু বোঝবার চেষ্টা করবে কি?

স্বাধীনতার ভ্যাংচানি

একটি ছোট ছেলে মহা ভাবিত হয়ে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—"হাঁ মশায়, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে' এত বকাবকি হচ্ছে, এতে কি দেশ স্বাধীন হবে?" আমরা বললাম—"তা বলতে পারিনে, দাদা, তবে এটা না হলে যে হবে না, তা ঠিক।"

আমাদের ছেলেদের একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, দেশ বলতে তাদের মত জনকত কলেজে-পড়া ভদ্রলোক; আর তারা খানিকটা গোলাগুলি কামান-বারুদ দিয়ে একবার তাল ঠুকে ইংরেজকে কোণঠেসা করতে পারলেই দেশটা স্বাধীন হয়ে উঠবে। তারা নিজে যেন স্বাধীনতার অবতার. আর ইংরেজই তাদের বেঁধে রেখেছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমাদের হয়ে লড়বে কে?"

"কেন, দেশের সব লোক।"

"চাষাভূষো, কামার, কুমার, মুচি, মেথর?"

"হাঁ, সবাই।"

"তাদের কি বলে' ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে ডাকবে?"

"বলব যে ইংরেজ তোমাদের পরাধীন করে' রেখেছে; তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তোমরা স্বাধীন হও।"

কথাটা শুনে হাসিও পেল, দুঃখও হল। জিজ্ঞাসা করলাম—"তারা যদি বলে—'বাবা ঠাকুর, ইংরেজ থাক্ আর না থাক্, আমাদের ত তোমাদের পায়ের নীচেই থাকতে হবে। তোমরা জমিদারী করবে, আমরা ভিটে বিক্রী করে' খাজনা দেব; আর না দিতে পারলে তোমাদের নায়েব-গোমস্তা আমাদের পিঠের ছাল তুলে' দেবে। তোমরা কলকারখানা করে' মোটর-গাড়ী চড়ে' বেড়াবে; আমরা কুলিগিরি করে' দিনান্তে আধপেটা খেয়ে বালবাচ্ছা নিয়ে শুকিয়ে মরব; আমাদের পা দিয়ে ছুঁলেও তোমাদের নাইতে হবে; আমাদের হাতের জলটুকু খেলেও তোমাদের গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে, ভগবানের পুজো করতে গেলেও তোমাদের খোসামোদ ছাড়া আমাদের উপায় নেই; তোমাদের নৈবেদ্যের মাথায় সন্দেশটুকু একটু বাঁকা হয়ে বসলেই আমাদের মরে' ভূত হতে হবে। এই ত আমাদের অবস্থা। তা আমরা সুধু সুধু তোমাদের জন্যে কাঁচামাথাটা গড়াগড়ি দিতে যাব কেন?'—এ কথার কি উত্তর দেবে?"

ছেলেটি বল্লে—"বলব, দেশ স্বাধীন হলে তোমাদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব।"

"আর সে যদি বলে—'বাবা ঠাকুর, আজ দায়ে পড়ে আমাদের কাছে এসেছ; এ দায় থেকে উদ্ধার

পেলে আবার যে আমাদের কথা ভুলে যাবে না, তার প্রমাণ কি? ইংরেজ ত এদেশে সেদিন এসেছে; তার আগেও ত আমাদের এই দশা ছিল।'—তখন কি বলবে?"

"তা'হলে বলব যে, 'আমার ঘাট হয়েছে, আমার চোদ্দ পুরুষের ঘাট হয়েছে। তোমাদের দাবাতে গিয়ে আমরা নিজেরাই দেবে গেছি। আজ থেকেই তোমাদের ব্যবস্থা করতে লেগে যাবো।' পরের পিঠে চড়ে' বেড়াতে গেলে যে নিজের পা-ই ক্রমে পঙ্গু হয়ে আসে, এ কথা আজ বুঝেছি।"

"সেই কথাই ত বলছি, দাদা; পতিত দেশের উদ্ধার, দেশের পতিতদের উদ্ধার না হলে হয় না। দেশের লোককে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখে তাদের কাঁধের উপর একটা জাতীয় পতাকা পত্‌পত্‌ করে' উড়িয়ে দিলে দেখতে শুনতে হয় ভাল, কিন্তু তার নাম কি স্বাধীনতা? দেশের মধ্যে জনকতক স্বাধীন মানুষ, আর বাকি সব তাদের গোলাম হলে সে দেশকে স্বাধীন বলা চলে না। ইংরেজের ব্যুরোক্রাসীর বদলে ভদ্দরলোকের ব্যুরোক্রাসীতে দেশ স্বাধীন হবে না, কোনো-না-কোনো মুখস পরে' ত্রিশ কোটির মর্ম্মান্তিক ঐ গোলামী আবার দেখা দেবে। তেমন করে' দেশ স্বাধীন যদি হতো তা'হলে আজ রুষিয়ায় এই রক্তগঙ্গা বইত না। বাদসার মাথার মুকুট নিয়ে বলসেবীদের ফুটবল খেলে বেড়াবার দরকার হতো না। সেটা তো তাদের স্বাধীন দেশই, সেখানে ত আর ইংরেজ নেই।"

ছেলেটি খানিকক্ষণ ভেবে ভেবে বল্লে—"তা'হলে, আমাদের দেশেও স্বাধীনতার শ্রাদ্ধ অতদুর গড়াবে না কি?"

আমি বললাম—"পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যদি পেট ভরাতে যাও, তা'হলে কাঁঠালটা লাফিয়ে তোমাদের ঘাড়ে পড়াও আশ্চর্য্য নয়। আর যদি বোঝ যে সবাই ভগবানের হাতে-গড়া মানুষ, তোমার মধ্যে যিনি আছেন, সকলকার মধ্যেই তিনি—তাঁর মুক্ত রূপকে যদি চিনতে পার, ত যিনি তোমাদের বেঁধেছেন, তিনিই তোমাদের বাঁধন কাটবার ব্যবস্থা করে' দেবেন। এই কথাটা বোঝ, যে, অধীন কেউ কাউকে করে না, মানুষ আপনি অধীন হয়। এটা চোদ্দ আনাই মনের গোলামী, তুমি কাউকে না বাঁধলে তোমায়ও কেউ বাঁধবে না। মন মুক্ত ত জগৎ মুক্ত। মানুষকে গজাবার জন্ত তার অনন্ত দিকের বাঁধন খুলে' দেওয়ার নামই ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম রাজনীতির বাবা।"

একটা পুরাণের গল্প

সত্যযুগে একবার বড় বড় ভট্‌চায্যি পণ্ডিতেরা মিলে ভোগ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি কামনা করে' যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন তাঁদের চাঁই। সতীকে তিনি ঘরের মেয়ে বলে' নেমন্তন্ন করে' এনেছিলেন; কিন্তু সতীর ঐ যে তেকেলে বুড়ো বর—শিবঠাকুর—তাঁকে কর্ম্মকর্ত্তারা বেশ একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখতেন। কে ওটা ভাঙড়, লক্ষ্মীছাড়া; অজানা, অচেনা? জাত নেই, ধর্ম্ম নেই, না-মানুষ, না-দেবতা। তাই শিবের আর নেমন্তন্ন হল না।

গম্ভীরভাবে তিলক-ফোঁটা কেটে যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জেলে গালভরা মন্তর আওড়াতে আওড়াতে পণ্ডিতেরা হোম করতে বসেছিলেন। অগ্নির সপ্তজিহ্বা লক্‌লক্‌ করে' আকাশে উঠেছিল; পণ্ডিতেরা তারস্বরে 'স্বাহা' 'স্বাহা' করতে করতে ঘি ঢালছিলেন; সোমরসের পাত্র কর্ত্তাদের হাতে হাতে ঘুরছিল; এমন সময় দক্ষ প্রজাপতির মনে হল—কোথায় আমি ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ—সমাজের শিরোমণি, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—আর আমার মেয়ে গিয়ে পড়ল কোন্‌ চালচুলোহীন অভাগার হাতে!—তিনি শিবের নিন্দা করতে আরম্ভ করে' দিলেন।

আসন্ন বিপদের ভয়ে সতীর বুক কেঁপে উঠল; তিনি কাতর দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে চাইলেন; বোঝাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চায় কে?—পণ্ডিতেরা সবাই যে সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

শিবের নিন্দা শুনে সতীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। যারা মহাকারণের সন্ধান জানে না, আপনাদের দর্পে অন্ধ, তারা আবার কি যজ্ঞ করবে?—সতী মূর্চ্ছিত হয়ে যজ্ঞকুণ্ডে পড়ে' দেহত্যাগ করলেন।

সতীর যারা লোক, তারা শিবের কাছে সেই সংবাদ নিয়ে গেল। গম্ভীর অন্তস্তল তাঁর ভেদ করে' একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। ত্রিনয়ন ধক্‌ ধক্‌ করে' উঠে প্রলয়ের আগুন তা থেকে বা'র হল। দেখতে দেখতে শিব-মূর্ত্তি রুদ্ররূপ হয়ে উঠল,

আর সেই রুদ্রের অঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ ভূত, প্রেত, পিশাচ 'মার্' 'মার্' শব্দে দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে ছুটল।

হায়রে! কোথা গেল যজ্ঞকুণ্ডের আগুন, কোথা গেল সাধের তিলক-ফোঁটা, কোথায় রইল জটাজুট! দক্ষের ঘর শ্মশানের মত পিশাচের নৃত্য-ভূমি হয়ে রইল।

শিব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ল। শিব স্তিমিত-নেত্রে ধ্যানমগ্ন হ'লেন; সংসারের সঙ্গে আর তাঁর সম্বন্ধ রইল না।

সতী আবার পুনর্জীবিতা হলেন—হৈমবতী উমারূপে। পূর্ব্ব-সংস্কারবশে শিবকে খুঁজতে বেরুলেন। সোনায় অঙ্গ মুড়ে, মদনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিবের সুমুখে হাজির হলেন—শিবের ধ্যান ত ভাঙ্গল না। কিন্তু ধ্যান যে ভাঙ্গাতে হবে—উমার সংসার যে তা না হলে গড়ে না। মদন হেসে বললেন—"ভাবনা কি? আমি শিবের ধ্যান ভঙ্গ করব।" ব'লে বাছা বাছা পাঁচটি বাণ নিয়ে শিবের অঙ্গে মারলেন। মহাযোগীর ধ্যান অকালে ভেঙ্গে গেল। তিনি ক্রুদ্ধ নয়নে চেয়ে দেখলেন—সুমুখে মদন। একটা আগুনের হল্‌কা যেন মদনের উপর দিয়ে বয়ে গেল; সৌভাগ্য-দর্পিত মদন যেখানে বসেছিল, সেখানে পড়ে' রইল একমুঠো ছাই।

শিব আবার ধ্যানে বসলেন—আর উমা! তাঁর মনে শত ধিক্কার জেগে উঠল। গয়না তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; বল্কল পরে' মহা-যোগীর ধ্যানভঙ্গ প্রত্যাশায় তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন।

যুগ যুগান্তর কেটে গেল; কত ঝড় বাদল বজ্র মাথার উপর ডেকে গেল—উমার সাড়া নেই; উমার অন্তরাত্মা মহাশিবের সন্ধানে ছুটেছে!

তপস্যা যেদিন পূর্ণ হল, সেদিন উমা চেয়ে দেখলেন, শিব তাঁর মুখের দিকে হাসিভরা চোখে চেয়ে আছেন। শিবেরও যে উমাকে চাই—আনন্দের সংসার যে তা না হলে গড়বে না।

তারপর শিবের যে সন্তান হয়েছিল—তিনিই দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়। অসুরদের হাত থেকে স্বর্গরাজ্য তিনিই উদ্ধার করেছিলেন।

* * * *

এই যে আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী ভারত—এই সতীর মৃতদেহ। কোন্ অতীত যুগে মদদর্পিত শাসকের দল তাঁকে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, সেই অবধি মায়ের প্রাণহীন দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে' আছে। যেখানে যেখানে এক এক খণ্ড সতীর দেহ পড়েছে, বদরিকা থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত, হিন্দুকুশ থেকে গৌহাটী পর্য্যন্ত, সাধকরূপী শিবাবতার সেইখানে সেইখানে মায়ের দেহ পুনর্জীবিত করতে বসে গেছেন। এই মৃতদেহের উপর কত ঝড় বায়ু বয়ে গেল—হুন এল, শক এল, পাঠান এল, মোগল এল—সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে পর্ত্তুগীজ এল, ফরাসী এল, ইংরেজ এল। একবার অকালে ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। আকাশে বিজলীরেখার মত মারাঠার তলোয়ার চিক্‌মিকিয়ে উঠেছিল, পঞ্জাবের সুপ্তসিংহ মায়ের মূর্চ্ছাভঙ্গের কথা ঘোষণা করে' গর্জ্জন করে' উঠেছিল—কিন্তু মা তখনও আপনার শিবকে পুরোপুরি চিনতে পারেননি। যে ঐশ্বর্য্যে সেজেগুজে তিনি শিবের সঙ্গে মিলিত হতে গেছলেন, তা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে শিবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে হল।

* * *

তারপর আজ প্রায় দু'শ বৎসর কাটতে চলল। ওগো শক্তি-পীঠের সাধকেরা, তোমাদের সাধনা কি আজ পূর্ণ হয়েছে? তপঃশক্তি-ভূষিতা মায়ের নূতন রূপ কি আজ তোমাদের চক্ষে ফুটেছে? মহাশিব কি আজ হর্ষোৎফুল্ল চোখে মায়ের দিকে চেয়েছেন? দেব-সেনাপতির জন্মবার্ত্তা কি তোমরা শুনেছ? সংসার কি এবার সত্যই শিবের লীলাভূমি হবে?

ওরে মন হবেই হবে

বিজ্ঞরা হেসে বলছেন—"ছোঁড়াগুলো করছে কি? সেই দুদিন পরে যখন ঐ কলেজের দরজা মাড়াতে হবে, তখন আর ন্যাকামি করে' ছাড়া কেন? আর কলেজ ছাড়লেই যদি স্বরাজ হত, তা'হলে আর ভাবনা কি?" আমরা বলি, বিজ্ঞ হে! অতি-বুদ্ধি বলে' একটা জিনিষ আছে যার চেয়ে একটু অল্প-বুদ্ধি হওয়া ভাল। কলেজ ছাড়লেই যে হাতে হাতে স্বরাজ মিলবে, এটা বাজে কথা হতে পারে, কিন্তু কলেজ কামড়ে পড়ে' থাকলে যে কোনোদিন স্বরাজ মিলবে, এটা আরও বাজে কথা।

স্বরাজের পূর্ণ মূর্ত্তি হয়ত আজ ছেলেদের মনে জাগেনি; কি পেলে যে তাদের দুঃখ, দৈন্য, জ্বালা যায়, তা হয়ত তারা জানে না; কাজ করতে গেলে হয়ত তারা হাজার ভুল করবে—কিন্তু তা'হলেও এ কথা হাজারবার সত্যি যে, যে ঠাট দেখে তোমরা ভুলে' আছ, তা আজ ছেলেদের চোখে মরীচিকা বলে' ধরা পড়েছে, যে মিথ্যার পায়ে ফুল-চন্দন দিয়ে তোমরা নিজেদের কৃতকৃতার্থ বলে' মনে করছ, তা যে সুধু পাষাণ, এ কথাটা ছেলেরা বুঝেছে। তাদের প্রাণে কেবল এই কথাটাই উঠেছে যে, ভগবান যাদের মানুষ করে' গড়েছেন, তারা কি পাশকরা ভালছেলে হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবে? ঐখানেই কি মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ? ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত গাদা গাদা ভালছেলে জন্মেছে আর মরেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর কান্না ত ঘোচেনি। মিথ্যাকে মিথ্যা বলে' না চিনলে সত্যের মূর্ত্তি কারও কাছে প্রকাশ হয় না;—আজ বাঙ্গালীর ছেলে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে' চিনেছে।

তোমরা বলবে—"পনের বৎসর আগেও ত একবার চিনেছিলে; সে ভাব কোথায় গেল?" —যায়নি গো যায়নি। বর্ত্তমানের মধ্যে অতীত বেঁচে আছে, বাঙ্গালীর প্রাণে সব কথা গাঁথা আছে। আমাদের সব জ্বালা একদিন আনন্দের ধারা হয়ে ছুটবে।

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে।"

এই যে হাজার হাজার তরুণ-প্রাণের আর্ত্তনাদ—তোমরা কি ভেবেছ এটা সুধু খেয়াল, সুধু ছেলেখেলা? না—এটা বাংলার ক্ষুব্ধ অন্তর্দেবতার দুরশ্রুত গর্জ্জন; বাংলার হৃদয় বিদীর্ণ করে' যাঁর ভীষণ মোহন মূর্ত্তি একদিন আত্মপ্রকাশ করবে, এ তাঁরই পদধ্বনি।

কারও কথা তোমরা শুনো না; যে বন্ধন টেনে ফেলে দিয়েছ, তার দিকে আর ফিরে চেয়ো না। শান্ত, শুদ্ধ, সমাহিত হয়ে এইবার নিজের অন্তরের দিকে ফিরে চাও। তোমাদের মন, বুদ্ধি, প্রাণ, শরীরের মধ্যে দিয়ে বাংলার যে আত্মশক্তি ফুটে উঠছেন, তাঁর হাতে নিজেদের যন্ত্রস্বরূপ ছেড়ে দাও। ভাবনার তো শেষ নেই; ভেবে কুলকিনারা পাবে না। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কতটুকুরই বা খবর জানে? জগৎ-জুড়ে যে মহাশক্তি নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করছেন—আপন আপন হৃদয়গুলি তাঁর পায়ের তলায় মেলে দাও। মানুষের জীবনে আর জাতির জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে, যখন বে-হিসাবী বোকাই হয় বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিমান হয় বোকা। যারা আপন-ভোলা হয়ে অকূল-পাথারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারাই পায় কূল; আর যারা তীরে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে হিসাব করতে থাকে, তারাই মরে ডুবে। আজ বাংলার সেইদিন আবার এসেছে।

'জয় মা' বলে' আজ জীবন-তরী ভাসিয়ে দাও; অকূলের যিনি কাণ্ডারী, তিনি ঝড় তুফান কাটিয়ে তোমায় কূলে নিয়ে যাবেনই যাবেন। সারা জীবনটাকে তাঁর হাতে তুলে' দাও; তিনি নিজের মত করে' তোমায়-আমায় গড়ে' নেবেনই নেবেন। সত্যই যদি চেয়ে থাকি, পথ দেখাবার লোকের অভাব হবে না।

"ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে,
দেখবি সবাই আসবে সেজে,
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে
ওরে মন হবেই হবে।"

পাবেই পাবে

ঝড়ের আগে ওড়ে শুক্‌নো পাতা, তার বন্ধন নেই বলে'; ভোরের আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে জাগে কচি ছেলে, আর চীৎকার করে' নেচে কেঁদে সবাইকার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়; প্রভাতের বাতাস এসে তার কানে কানে বলে' যায়—রাত কেটেছে, রাত কেটেছে।

আমাদের ছেলেদের কানে কানে জীবন-প্রভাতের মলয় হাওয়া বলে' গেছে—ঘুমোবার আর সময় নেই, সুশীল ও সুবোধ বালক সেজে পুঁথির ভেতর মুখ গুঁজে ভালছেলে হবার আর সময় নেই, হাজার বছরের ধুলি-শয্যা ছেড়ে তোমরা একবার ওঠ।

ছেলেরা তাই লাফিয়ে, নেচে-কুঁদে, চীৎকার করে' পাড়া জাগাচ্ছে। যাঁদের চোখে সুধু নাচন-কোঁদনটুকু পড়ছে, তাঁরা বলছেন—"এ আবার কি ন্যালা? সুধু নাচের চোটেই দুনিয়া ধসকে দেবে না কি?" ছেলেরাও কথাটার ঠিক

উত্তর দিতে পারছে না, কেননা তাদের জ্ঞান এখন সুধু নেতিনেতির রাস্তা ধরে' চলেছে। যা গড়তে হবে, তার মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট হয়ে তাদের মাথায় ফুটে ওঠেনি; যে রাস্তা ধরলে দেশকে নিজের মধ্যে পাবে, সে রাস্তার জন্যে তারা হাৎড়ে হাৎড়ে বেড়াচ্ছে।

কাজে লাগতে যারা চলেছে, তাদের টিটকারী করে' বাধা দিলে খুব সস্তা দরে বিজ্ঞতা দেখান হতে পারে, কিন্তু তাতে কাজ কি এগুবে? রাস্তাটা যে তাদের চোখে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠেনি, তা তারা নিজেরাই জানে; কিন্তু-বসে' থাকলেই ত চলবে না। অন্তর থেকে যিনি ফুটে বার হবার চেষ্টা করছেন, তিনিই যে তাদের স্থির থাকতে দিচ্ছেন না।

ছেলেরা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা তাদের জ্ঞান আর শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করছে।

বাইরের গড়নে হাত দেবার আগে তাদের আমরা সুধু এই কথাটা মনে রাখতে বলি যে, স্বাধীনতা জিনিষটা সুধু বাইরের নয়। সুধু বাইরের অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে না। স্বাধীন মানুষে যে আচার-অনুষ্ঠান, রাজনীতি, সমাজনীতি গড়ে' তোলে, তাই স্বাধীনতার বাইরের মূর্ত্তি। আমাদের ভিতরে যদি স্বাধীনতা ফুটে না ওঠে তা'হলে আমরা যে-কাজে হাত দেব, তাতেই আমাদের অন্তরের গোলামীর ছাপ পড়ে' যাবে। আগে নিজের মনের ভিতর ঢুকে বেশ হাড়ে হাড়ে অনুভব কর যে, তুমি ছোট নও, কোনো বন্ধনের দাস নও, জীবন-মরণে তুমি মুক্ত, —দেখবে যে তুমি যে-জিনিষে হাত দেবে, তাতে তোমার অন্তরের আনন্দধারা ফুটে বা'র হবে।

আর এ কথাটা ভেবো না যে, দু'দশ হাজার লোককে হাত করে' দল বাঁধতে পারলেই দেশকে স্বাধীন করে' তুলবে। নিজের স্পর্শে প্রত্যেকের মধ্যে যদি স্বাধীনতা ফুটিয়ে তুলতে না পার, তা'হলে একটা নতুন রকমের স্বদেশী জবরদস্তি গজিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাকে স্বাধীনতা বলে' ভুল কোরো না। স্বাধীন জীবের সমষ্টির নাম যদি স্বাধীন জাত হয়—তা'হলে গোড়া থেকে এই চেষ্টা কোরো যেন প্রত্যেকেই নিজের ভেতর নিজের স্বাধীন সত্তাকে খুঁজে পায়। যে-শক্তি তোমার-আমার সকলের ভেতর দিয়ে বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন, সেই শক্তির স্বরূপ যিনি যতখানি ধরতে পেরেছেন, তিনিই ততখানি রাস্তা বলে' দিতে পারবেন—স্বাধীন ভারতের বাইরের রূপ তিনিই ততখানি গড়তে পারবেন।

ছেলেদের মধ্যে ঐ শক্তির প্রথম প্রকাশে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, সেটা বাজে জিনিষ বলে' উড়িয়ে দিলে চলবে না। তবে সেটা সত্যের শেষ কথা নয়।

এ চাঞ্চল্যের পর যে সময় আসছে, তাতে তোমাদের ধীর, স্থির, আত্মস্থ হয়ে বসতে হবে। যে মন নিয়ে পুরাণোকে ভেঙে নতুনকে গড়তে যাবে, সে মনের যেন অন্তর্য্যামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়, সে যেন বাইরের কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে সবটা নিজের অন্তরের দেবতার কাছে সঁপে দিয়ে বলতে পারে—আমি তোমার, এ কাজও তোমার। এ শরীর-মনে ফুটে উঠে—তোমার কাজ তুমি কর।

সহস্র বিভীষিকার মধ্যে ঐ মন্ত্র ছেড়ো না; সহস্র ঝঞ্ঝার মধ্যে ঐ নামটি ভুলো না। দেখবে এবার কুল পাবেই পাবে।

বয়ে যায় পতিত-পাবনী
তীরে তার ভীষণ শ্মশান

স্বর্গ থেকে যখন মন্দাকিনীর ধারা মর্ত্ত্যলোকে আসছিল, তখন প্রশ্ন উঠেছিল—এ ধারা ধরবে কে? মদমত্ত ঐরাবত ছুটে এসেছিল সে ধারা ধরতে; কিন্তু পশু বেচারী, নাকে-মুখে জল ঢুকে দম আটকে হাঁপিয়ে উঠল, আর তৃণখণ্ডের মত সে ধারার মুখে কোথায় ভেসে গেল। শান্ত আপন-ভোলা শিব তখন জটা-জাল বিস্তার করে' অচল অটল ভাবে সে ধারা মাথা পেতে নিয়েছিলেন। পতিত-পাবনীর স্রোত মর্ত্ত্যলোকে সেদিন থেকে বইছে।

আজ আবার স্বর্গের দ্বার খুলে' গেছে; মন্দাকিনী-তরঙ্গের গভীর গর্জ্জন আমাদের কানে এসে পৌছেছে। আবার প্রশ্ন উঠেছে—আমরা ঐরাবতের মত পশুবুদ্ধি নিয়ে সে স্রোতের মুখে ভেসে যাব, না শান্ত শিবের মত অহঙ্কারের উন্মাদনাকে মুছে ফেলে সে স্রোতকে মাথা পেতে নেব?

আমাদের অন্তর্নিহিত বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে ঐ খরস্রোত ছুটে এসে একদিন আমাদের মনের দুয়ারে

ধাক্কা মেরে গেছল। আমাদের সমস্ত জাতটার শরীর সেদিন কেঁপে উঠেছিল।

সে অনেক আগেকার কথা; তখন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ।

আমরা সে স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে সে স্রোতকে আয়ত্ত করে' নিজেদের মনোমত কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। বুঝিনি যে, সে বন্যা আপন ভাবে আসে, আপন ভাবে যায়; অহঙ্কারের সাধ্য নয় তাকে আয়ত্ত করা। তাই ঠিক ঐ ঐরাবতের মতই সে স্রোতের মুখে ভেসে যেতে হয়েছিল।

আজ আবার সেই উত্তাল-ভাব-তরঙ্গের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। বিষ্ণু-পাদ-নিঃসৃত মন্দাকিনীর ধারা আজ আমাদের প্রাণ মন দেহ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশকে নতুন করে' গড়বার জন্যে আমাদের মনের দ্বারে এসে ধাক্কা মারচে। অহঙ্কারের বশে নেচে কেঁদে সে স্রোতকে আয়ত্ত করতে গেলে আবার সে স্রোত ফিরে যাবে; আমরা যে মরুভূমিতে আছি, সেইখানেই পড়ে' থাকব।

আজ তাই তোমাদের পায়ে ধরে' অনুরোধ করছি, অহঙ্কারকে সরিয়ে দাও, ভাব-বিলাসিতার মোহে ভুলো না—শান্ত আপন-ভোলা শিবের মত সে ধারার তলায় গিয়ে দাঁড়াও। তোমার বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ সেই স্বর্গের আনন্দ ধারায় ভরে উঠুক। যার কাজ সেই করুক; তুমি শুধু তার হয়ে যাও।

তোমাদের চাঞ্চল্য দেখে, তোমাদের দিশেহারা নৃত্য দেখে বিদ্রূপ করি বলে' তোমরা বিরক্ত হও জানি—কিন্তু একথাটা ভুলোনা যে আমরাও তোমাদেরই; তোমাদের গায়ে যা বাজে তা আমাদের গায়েও বাজে। নিজের মন যখন ঐরাবতের মত শুঁড় ফুলিয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকেই অতীতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের খোঁচা মারি। তোমাদের গায়ে লাগে? তোমরাও যে সেই মনের অংশ।

ভাব-বিলাসিতার সুখ অনেক তা জানি; কিন্তু সে সুখের মায়া আজ তোমাদের ত্যাগ করতে হবে। দেশের যে আত্মশক্তি আজ জেগে উঠে বাইরে ফুটে ওঠবার জন্যে তোমাদের মধ্যে ধাক্কা মারছে, তার কাছে আপনাকে উৎসর্গ করে' দিতে হবে। তাকে নিজের মধ্যে পেতে হবে; তার জ্ঞানে নিজেদের বুদ্ধিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে; দেহ, মন তাঁর হাতে যন্ত্র করে' ছেড়ে দিতে হবে। তখন যা গড়ে' উঠবে তাই হবে খাঁটি গড়ন। সুধু অহঙ্কার দিয়ে যা গড়বে, তা অনেকবার ভেঙে পড়েছে, ভবিষ্যতেও ভেঙে পড়বে।

সত্যকথা অপ্রিয় হলেও আপনার লোককে তা বলতে হয়। এটা ত চোখের সামনেই দেখছ যে, সুধু ভাবের ঘোরে যারা নেমেছিল, তারা গাজন আরম্ভ হতে না হতেই ঢলে' পড়ছে। দু'দিন আগে যারা কলেজ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাদের অনেকেই আবার চাদরে মুখ ঢেকে ক্লাসে গিয়ে বসছে। চরকা কেটে এর মধ্যেই অনেকের হাত ব্যাথা হয়ে গেছে। এ সব কথা নিয়ে হাসাও চলে, কাঁদাও চলে; কিন্তু সেই হাসি-কান্নাটাকেই আমাদের সর্ব্বস্ব করে' তুললে চলবে না। ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ক্ষণিক উত্তেজনায় চঞ্চল না হয়ে প্রবাল-কীটের মত তিল তিল করে' নিজেদের অস্থি দিয়ে আমাদের নিজেদের দাঁড়াবার স্থান গড়ে' তুলতে হবে।

বাঙ্গালীর ছেলে ভুলোনা যে, শব-সাধনার এই মহানিশা—ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নাচবার সময় এ নয়। বাংলার এই শ্মশানে বসে' শবকে যে বাঁচাতে চায়—তাকে উত্তেজনায়, উন্মাদনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে যোগভ্রষ্ট হলে চলবে না। বীর-সাধকের বংশসম্ভূত তোমরা—মৃদঙ্গ করতাল তোমাদের জন্যে নয়। আঁধার যেখানে ঘনীভূত হয়ে এসেছে, আকাশে যেখানে চন্দ্র নেই, গৃহে যেখানে দীপশিখা নেই, পিছনে যেখানে বাহবা দেবার কেউ নেই, মরলে যেখানে এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলবার কেউ নেই—সেইখানে তোমার আসন পেতে তিল তিল করে' মর। তোমার সমাধির উপর মায়ের পাদপদ্ম সহস্রদল বিস্তার করে' ফুটে উঠবেই উঠবে।

সত্যি সত্যি কি চাও?

স্বামী বিবেকানন্দ বলে' গেছেন—সুধু চালাকী দিয়ে কোনো বড় কাজ হয় না। দেশের লোকের গতিক দেখে মনে হয় যে, ঐ কথাটা বেশ করে' একবার ঝালিয়ে নিয়ে আমাদের সভাসমিতিগুলোর সামনে টাঙিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমরা সবাই মনে মনে ঠিক করে' বসে' আছি যে, কোনো রকমে তালগোল পাকিয়ে চুপ করে' বসে' থাকলে

বা মাঝে মাঝে একটু আধটু হল্লাগুল্লা করলেই কাজটা যথা সময়ে আপনা আপনিই হয়ে যাবে, আর আমরা তখন গোঁফে তা দিতে দিতে স্ফূর্ত্তি করে' মজা লুটবো।

তা হবে না। একটা জিনিষ আগে আমাদের বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবে যে, আমরা যা করবো তাই হবে; আমাদের পঙ্গু ইচ্ছাটিকে চরিতার্থ করবার জন্তে আকাশ-ফুঁড়ে কিছু পড়বে না।

যারা কুড়ে, গেঁতো, হতভাগা, তাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্তে ভগবানের দয়ার সমুদ্রে কখনো বান ডাকবে না। যারা নিজেদের ফাঁকি দেবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাদের ফাঁকি দেবে। জগতে যারা কিছু করেছে বা পেয়েছে, তারা চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তা পায়নি বা করেনি। তাদের বুকের রক্ত জল করতে হয়েছে; প্রাণের শত বাঁধন ছিঁড়ে রক্তাক্ত মনটিকে হাসিমুখে ইষ্টদেবতার পায়ে ধরে' দিতে হয়েছে। সস্তায় কিস্তি পেয়ে যারা ফুরফুরে হাওয়ায় তরী ভাসিয়ে দিয়ে এ অকূলে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করেছে, তারা চিরদিনই দেখেছে যে—"কূলেতে কণ্টকতরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।" তোমরা আজ কি করে' সে অদৃষ্টকে ফাঁকি দেবে?

মুক্তির সিংহদ্বার বীরদের জন্তেই খোলা থাকে; যারা হট্টগোলের মাঝখানে পড়ে' সুধু গণ্ডায় আণ্ডা মিশিয়ে যায়, তাদের জন্তে নয়। সিন্নি দেখে যারা এগোয় আর কোঁৎকা দেখে যারা পেছোয়, তাদের সুধু কর্ম্মভোগই সার; চিরদিন তারা শত্রু হাসাবে।

জগতের কাছে দেশের অপমান দেখে তোমরা একেবারে ডিগবাজী খেয়ে যখন কলেজের দোতালা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলে, তখন কি ভেবেছিলে যে, তিন দিন রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করে' বেড়ালেই আমাদের অপমান মুছে যাবে? তা যদি না মনে করে থাক, ত দিন তিনেক যেতে না যেতেই আবার চাদরে মুখ ঢাকা দিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে ক্লাসে ঢুকে নোটবুক খুলে, বসে' গেলে কি করে'? তোমরা ইংরেজী সাহিত্য পড়, ইংরেজী ইতিহাস পড়, ইংরেজের চরিত্র কি বোঝনি? ইংরেজ তার শত্রুকে শ্রদ্ধা করতে পারে, কিন্তু তার গোলামকে ঘৃণার চক্ষেই দেখে থাকে।

দেশভরা কান্নার রোল উঠেছে; মেয়েরা কাপড়ের অভাবে ফাঁসি খেয়ে মরছে, ছেলেরা পেটে হাত দিয়ে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করে' মরছে; আর তোমরা? সোনার চশমা চোখে এঁটে, বিজলীপাখার তলায় বসে' হিসেব করছো যে, কত নম্বর পেলে তোমার নামের পিছনে এম্-এ ডিগ্রীটা ঝোলাতে পারবে! আর তারপর হয় মাষ্টারী করে' ছেলেদের মুখস্থ করাবে B-L-A ব্লে C-L-A ক্লে; নয়ত সরকারী অফিসে ৪০৲ টাকা মাইনের চাকরী করবে, আর হাঁ করে' দেখতে থাকবে বছরে বছরে কত কোটি টাকা দেশের বাইরে চলে' যায়। তোমাদের বড় সাধের পাশকরা বিদ্যের এই পর্য্যন্ত না দৌড়?

স্বাধীনতার জন্তে সত্যি সত্যি যাদের প্রাণ কাঁদে, থিয়েটারী ঢঙ করে' তারা নিজেদের ঠকায় না। বুকে যাদের আগুন জ্বলে, তাদের চোখের জল শুকিয়ে যায়। নিষ্ঠা যাদের জাগে, ব্রত উদ্‌যাপনের আগে আর তারা ঘরে ফেরে না। আর যারা হ্যাংলা ঘরের ক্যাংলা ছেলে, যা পায় তাই খায়, তারা চিরদিন জগতের কৃপাপাত্র হয়েই থাকে।

সব জিনিষের জন্য সাধনা করতে হয়। রাতারাতি কোনো জাত স্বাধীন হয় না। আগে অন্তরের স্বাধীনতা চাই, তারপর তা বাইরে ফুটে উঠবে। ভিতরে যারা গোলাম, তারা বাইরের স্বাধীনতা পায় না, পেলেও রাখতে পারে না। যে মহাপুরুষের চরিত্রবলের কাছে আজ সমস্ত দেশ মাথা হেঁট করেছে, তিনি স্বরাজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে যা ঘোষণা করেছেন সেটুকু কখনো তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছ? তিনি বলেছেন,—"Swaraj has to be experienced by each one for himself. One drowning man will never save another, Slaves ourselves, it will be mere pretension to think of freeing others." মহাত্মা গান্ধীর এই কথাগুলি আগুনের অক্ষরে বুকের মাঝে লিখে রেখো। আমাদের দেশসেবার আয়োজন যে এতদিন ব্যর্থ হয়ে এসেছে, তার মূল কারণ ঐখানে। ভিতরে গোলাম থেকে আমরা বাইরের গোলামি ঘোচাতে গেছি, তাই সব কাজ আমাদের পণ্ড হয়ে গেছে।

খাঁটি রাস্তা ধরবার সময় কি এখনো আসেনি? যখনই মরণের পার থেকে অন্তরবাণী আমাদের কানে এসে পৌছাবে, তখনই কি আমরা কানে আঙুল দিয়ে বসে' থাকব? যখনই দেবতা

অমৃতভাণ্ড হাতে করে' আমাদের দরজায় এসে উপস্থিত হবেন, তখনই কি আমরা বলব—চাই না?—মিথ্যাতেই কি আমরা চিরদিন ভুলে থাকব? সত্যি কি কখনো চাইব না? ডাকের মত ডাক কি কখনো দেব না?

হরিনাম আর মাগুরমাছ

রাবণ রাজা স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করবার আগেই মরে' গিছলেন, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তার জন্যে বিশেষ দুঃখ করবার কারণ নেই।

হরিবোলের সঙ্গে সঙ্গে মাগুরমাছের ঝোল আর তার চেয়েও আর-একটা উপাদেয় জিনিষ যেদিন আমরা জুড়ে' দিয়েছি, সেদিন গোলোকধাম আর মর্ত্ত্যলোকের মাঝখানে পাকা সিঁড়ি যে তৈরী হয়ে গেছে, সে-বিষয়ে ভক্ত-সমাজে আর মতদ্বৈধ নেই। সে সিঁড়ি ভেঙে ভক্তদের আর উপরে ওঠবারও দরকার হয় না। হরি নিজেই নাকি মাগুরমাছের গন্ধ পেয়ে নীচে নেমে ভক্তদের কাঁধে ভর করেন। ভক্তেরা সুধু উৎসবের আনন্দে নেচে, গেয়ে, আছাড় খেয়েই খালাস। আর হরি যদি গোলোকেই চুপটি করে' বসে' থাকেন, তাতেই বা ক্ষতি কি? হরির চেয়ে নামের মাহাত্ম্যই যে বড়! তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে খেতে ত কোনো বাধা নেই! হরিকে কে চায়? —তাঁর নামটা নিয়েই যে আমাদের কারবার।

ভগবানকে পাবার চেয়ে তাঁকে প্রচার করবার চেষ্টাটাই আমাদের বেশী—কেননা তাতে কষ্ট বেশী নেই, অধিকন্তু লাভ যথেষ্ট। ভগবানকে বেচে খেতে পারলেই আমরা খুসী। ভগবানের ত কিছু করবার জো নেই—বেচারী যে ঠুঁটো জগন্নাথ!

কিন্তু ওগো ও উৎসবানন্দের দল! মাঝে মাঝে একবার এ কথাটা মনে কোরো—ভগবানের সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দেবতা হবার আগে মানুষ হতে হয়, মহাপুরুষ হবার আগে পুরুষ হতে হয়, গুরু সাজার আগে শিষ্যত্বের কঠোরতা মেনে নিতে হয়। সস্তার কিস্তি অনেক সময় বানচাল হয়ে যায়!

প্রচারের জন্যে ভেবে ভেবে তোমাদের কাহিল হতে হবে না। যা সত্য তা স্বয়ংপ্রকাশ, তা নিজের আনন্দেই ভরপুর। নিজের কাঁধে ঢাক বেঁধে তা বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের মহিমা নিজে ঘোষণা করে না; বেশ্যার মত সাজসজ্জা করে' তা লোকের মন ভুলাতে চায় না। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে ভাড়াটে ভক্তের দরকার হয় না, কেননা সত্য চিরদিনই নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

গোলাপ, টগর, মল্লিকা যখন আলোতে পাঁপড়ি মেলে ফুটে ওঠে, তখন তারা ভ্রমরদের বাড়ী বাড়ী নোটিশ পাঠিয়ে দিয়ে বলে না—"ওগো আমরা ফুটে আছি, তোমরা এসে আমাদের চারিদিকে একবার গুন্ গুন্ করে' যাও।" পূর্ণিমার চাঁদ যখন আকাশের বুকের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে' যায়, তখন সে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সুপ্ত বিরহীদের জাগিয়ে দিয়ে বলে না— "তোমরা ওঠ, একবার আমায় দেখে বিরহের ব্যথা চাগিয়ে তুলে' চোখের জলে বান ডাকাও।" মধুর গন্ধে ভ্রমর আপনি এসে জোটে; অমৃতের লোভেই হোক্ আর কলঙ্কের লোভেই হোক্, প্রণয়ী নিজের প্রাণের তাড়ায় আকাশের পানে তাকায়।

কথাগুলো ভালো লাগছে না—না? এ ব্যবসাদারীর দিনে যখন সাধুর সাধুত্বের পরিমাণ তার জটার বহরে, যখন ভক্তির পরিমাণ কীর্ত্তনের উচ্চরোলে, যখন স্বদেশ-প্রেমের পরিমাণ পড়ে' পড়ে' মার খাওয়ার শক্তিতে, যখন বিদ্যাদানের পরিমাণ বিদ্যালয়ের আয়তনে, তখন এ কথাগুলো তোমাদের ভালো লাগবে না, তা জানি। কিন্তু এ মেকি চালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেদের সর্ব্বনাশ যে কতখানি করচো, তা ভেবে দেখবার দিন এসেছে।

তোমরা যে মনে মনে ঠিক করে' বসে' আছ "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে"—ব্যাপারটা হয়ত ঠিক সে রকম না-ও হতে পারে। সিন্নির লোভে এসেছ ভালো কথা; কিন্তু কোঁৎকার ভয় যাতে সয়, তার ব্যবস্থাও কোরো।

কবির কথা মাথায় থাক—এ দুনিয়াটা ঠিক রঙ্গালয় নয়। এখানে পাউডার মেখে রূপসী সাজা বেশীদিন চলে না। শেষে চোখের জলে গালের রং ধুয়ে যায়; কজ্জল লাগান সত্ত্বেও কোটরগত চোখ ধরা পড়ে, হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা'র গলার 'চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ' সুর ঢাকা পড়ে না

দেখছো না দেশময় আজ পর্য্যন্ত কত মেকি ধরা পড়লো, কত সঙ্কীর্ত্তনের দল গলাভেঙে বসে' পড়লো? সেজেগুজে রাস্তায় অনেকেই বার হয়, কিন্তু মাঝখানে হাতের করতাল আর বাজে না, সাধের মৃদঙ্গ ফেঁসে যায়, অহঙ্কারের বিজয়-নিশান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

কাজের মধ্যে উৎসবের আনন্দে জীবকে ফুটিয়ে তুলবে? হায় রে, কি জীবন অন্তরে পেয়েছে যা বাইরে প্রকাশ না করিলেই নয়? অন্তরের বিরাট শূন্য কি ভরেছে? তা যদি না ভরে' থাকে, ত এই দীনতার, নগ্নতার বীভৎস প্রদর্শনী খুলে' জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হচ্চ কেন?

একটা কথা বোঝ যে, সুধু উন্মাদনা দিয়ে নতুন জীবন লাভ করা চলে না। তার জন্যে বুকের রক্ত জল করতে হয়।

কাজের কথা

কথাটা অনেকের হয়ত ভালো লাগবে না, তবুও স্পষ্ট করে' বলা ভাল। বন্ধুকে অপ্রিয় সত্যও বলতে হয়।

তোমরা ভাবের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছ; উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে পড়েছ, কিন্তু মনে রেখো যে, উত্তেজনাই কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। জীবনটা অভিনয় নয়, কর্ম্মক্ষেত্র।

স্বাধীনতা আজ দেশশুদ্ধ সবাই চায়। নানা ঘটনা পরম্পরায় দেশ আজ নিজের দুরবস্থা জেনেছে। নিরক্ষর শ্রমজীবী পর্য্যন্ত বুঝেছে যে, যে-দেশে সে জন্মেছে সে-দেশ তার নিজের নয়।

সে দু'হাত দিয়ে যে পরিশ্রম করে, তার ফল ভোগ করে অপরে। সে লাঙ্গল ঠেলে যে শস্য জন্মায়, তাতে ক্ষুধা মেটে অপরের। তাকে রক্ষা করবার ভাণ করে' যে মাথায় পাগড়ী বেঁধে বেড়ায়, সে তার রক্ষক নয় ভক্ষক।

পনের বৎসর আগে দেশের লোকের চোখ খুলতে আরম্ভ হয়েছিল। নানা নির্য্যাতনের ভেতর দিয়ে সে জ্ঞান পূর্ণতর হয়ে আসছিল। আজ মহাত্মা গান্ধীর কৃপায় দেশের আবালবৃদ্ধ-বণিতার কাছে সে সংবাদ গিয়ে পৌছেচে।

দেশ আজ চঞ্চল; পরাধীনতার জ্ঞান আজ তাই শেলের মত লোকের প্রাণে বিঁধচে।

দেশের আত্মা আজ তাই বন্ধনমুক্ত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মুমুক্ষু হলেই মুক্তিলাভ হয় না। মুক্তির জন্য সাধনা চাই। ভাবপ্রচার স্বাধীনতালাভের প্রথম সোপান মাত্র; তার শেষকথা নয়।

দেশ যতদিন অন্ধ জড়ের মত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, ততদিন উচ্চকণ্ঠে মুক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ততদিন সহস্র নির্য্যাতন মাথায় তুলে নিয়ে, পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার সহ্য করে' ঘাটে মাঠে পথে চীৎকার' ক'রে প্রচার করবার দরকার ছিল যে—পরাধীনতা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।

আজ সে কথা সবাই শুনেছে, সে কথা সবাই বুঝেছে। যারা আজ চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির, প্রাণ থাকতেও মরা, তারাই সুধু নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করেনি। এ জন্মে তারা করবেও না।

কিন্তু এই প্রচারের কাজ কি এখনো শেষ হয়নি? শত শত ছেলে বুকের রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতার কথা যে দেশের অঙ্গে ছেপে দিয়ে গেছে!

বৃথা শক্তিক্ষয়ের আর সময় নেই। আজ সাধনার দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। কিন্তু শক্তি-পরীক্ষার দিন এখনো আসেনি!

যেখানে জুজুর ভয়ে দেশ আড়ষ্ট, অথবা যেখানে অর্দ্ধজাগ্রত দেশের পুনরায় ঘুমিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে, সেখানে শত বাধা বিপদ তুচ্ছ করেও আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার; কিন্তু আদর্শকে মূর্ত্ত করে' তুলতে হলে সুধু ভাব-প্রচারের কোলাহলই যথেষ্ট নয়—তার জন্য নীরব সাধনার প্রয়োজন। দেশের সমস্ত লোককে একপ্রাণতার সূত্রে গাঁথতে হলে ভাবের উত্তেজনা ছাড়া আরও কিছু দরকার।

দলে দলে জেলে গিয়ে জেলকে তীর্থক্ষেত্র করে' তুলবে, ভাবোন্মাদের আনন্দে দেশকে মাতাবে—কিন্তু দোহাই তোমাদের, এই কথাটুকু ভুলো না যে, সুধু ভাবোন্মাদের ফলে কোনো দেশ স্বাধীন হয় না। ভক্তিসাধনা খুব বড় জিনিষ, কিন্তু শক্তিসাধনা না থাকলে, ভক্তি শেষে ভাব-বিলাসিতা হয়ে দাঁড়াবে।

উত্তেজনার বশে মরণকে আলিঙ্গন করা খুব বড়কথা নয়। মরণের মধ্যেও একটা নেশা আছে; একটা লোভ আছে। সে নেশা তোমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে।

আজও দেশ শতধা-বিচ্ছিন্ন সতী অঙ্গের মত খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে' আছে। দেশের খণ্ড খণ্ড শক্তি এখনও কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠেনি। সেইদিকে আজ দৃষ্টি দেবার দিন এসেছে। একে একে না মরে' সকলে মিলে বাঁচবার চেষ্টা কর।

শক্তিসঞ্চয়ের পূর্ব্বে অসময়ে যারা শক্তিপ্রকাশ করতে যায়, তাদের পরাজয় অনিবার্য্য। সাহস থাকলেই তা সব সময় আড়ম্বর করে' প্রকাশ করা সমীচীন নয়। মনে রেখো যে, আইরিশরা যেদিন নিজেদের স্বরাজ্য ঘোষণা করে, তার বহুপূর্ব্বেই নিজেদের দেশের শক্তিকেন্দ্রগুলি গড়ে' তুলেছিল। জাপান রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার বহুদিন পূর্ব্ব হতেই সব আয়োজন ঠিক করে' রেখেছিল।

স্বরাজ ঘোষণা করলেই কি স্বরাজ পাওয়া যাবে? দেশময় নিজেদের শাসন-কেন্দ্র কি গড়ে' তুলতে পেরেছ? যদি গড়ে' থাক ত সেগুলিকে রক্ষা করবার শক্তিসংগ্রহ কি করেছ? তা যদি না করে' থাক ত সুধু ফাঁকা আওয়াজে কি হবে?

বুদ্ধির বাঁদর-নাচ

মানুষের বুদ্ধির মত ফাঁকিদার জিনিষ দুনিয়ায় খুব কমই আছে। সে শাঁখের করাতের মত আসতে-যেতে দুদিকেই কাটতে পারে। বুদ্ধিকে যা ফরমাইস কর, সে তোমার কাছে যুক্তি-তর্কের আড়ম্বর ক'রে, তাই প্রমাণ ক'রে' দেবে। বুদ্ধির সামনে যতখানি আলো, পেছনে তার দশগুণ অন্ধকার। কে যে তাকে পেছন থেকে চালায়, তার সন্ধান বুদ্ধি জানে না; অথচ নেচে-কুঁদে হামবড়াই করে' বুদ্ধি প্রচার করে' আসছে যে, তার মত আর দুটি মিলবে না। আমাদের বৈয়াকরণেরা অনেক দিন হ'ল আবিষ্কার করে' গেছেন যে, বুদ্ধি জিনিষটা স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ মেয়ের জাতি; সুতরাং স্ত্রীধর্ম্ম তার মধ্যে থাকবেই। মেয়েদের চালিয়ে নিয়ে যাও ত বেশ চলবে, তোমার ভাত রাঁধবে, মাথা টিপে দেবে, আদর-আপ্যায়িত করে' কৃতার্থ করবে। কিন্তু মেয়েদের ফাঁদে যদি পা দাও অর্থাৎ তোমার নাকে দড়ি দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার অধিকার যদি মেয়ের হাতে তুলে' দাও ত বাস্—দুশো ঠক্কর খেয়ে শেষে গোরুর গাড়ী চাপা পড়তেই হবে।

বুদ্ধিরও ঠিক সেই দশা। নিজের সঙ্গে যদি একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া থাকে, তুমি কি চাও তা যদি ঠিক জান, তাহ'লে বুদ্ধি তোমার অভীষ্ট খুঁজে পাবার রাস্তা বাৎলে দেবে, নানা রকম সৎপরামর্শ দেবে। আর তোমার নিজের গোড়ায় যদি গলদ থাকে, নিজের স্বভাব যদি না চেন, দীন হীন কাঙ্গালের মত যদি বুদ্ধির কাছে গিয়ে বল—"অয়ি শুভে, আমি কি চাই আমাকে বলে' দাও, চাওয়া উচিত কি না জানিয়ে দাও"—তা'হলে বুদ্ধি তোমাকে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবেই বেড়াবে, তোমাকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে শেষে কাজের বার করে' ছেড়ে দেবে।

আমাদের কাজের প্রেরণা আসে আমাদের স্বভাব থেকে; বুদ্ধির ধর্ম্ম হচ্ছে সেই প্রেরণার সুমুখে খানিকটা আলো ধরা, যাতে অল্প আয়াসে কাজ সিদ্ধ হয়। প্রেরণা আসা উচিত কি না, এ নিয়ে যদি বুদ্ধি তর্ক তুলতে চায় তা'হলে বুদ্ধির কান মলে দেওয়া উচিত, আর বেশ করে' তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে আমাদের প্রভু নয়, অন্তরঙ্গ নয়—কাজ করবার যন্ত্র মাত্র।

তোমরা ভাবছ হঠাৎ আমার তত্ত্বকথার উৎস খুলে' গেল কেন? সত্যি কথা বলছি, 'ইংলিশ-ম্যানে'র স্তম্ভে স্বৈরিণী-বুদ্ধি বিপিন বাবুকে কি নাচ নাচাচ্ছে, তাই দেখে-শুনে। বিপিন বাবু লিখেছেন—"To throw all reasons and logic overboard in thinking about one's duties under some impulse or passion, whatever may be the object of this impulse or passion, is to commit violence to thought." অর্থাৎ যুক্তিতর্ক না মেনে সুধু একটা ভাবের বা অন্তরের প্রেরণার উপর নির্ভর করে' যদি কর্ত্তব্য স্থির করা যায়, তা'হলে বুদ্ধির উপর অত্যাচার করা হয়। আমরা বলি—না, তা নয়, ওটা বুদ্ধির উপর অত্যাচার নয়, বুদ্ধিকে আক্কেল দেওয়া, বুদ্ধিকে নিজের জায়গা চিনিয়ে দেওয়া।

মায়ের স্নেহ-ক্ষুধাতুর প্রাণ যখন ছেলেকে আদর করবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন বিপিন বাবুর মতে মায়ের উচিত ন্যায়শাস্ত্র খুলে' বিচার করতে বসা যে, ছেলেকে আদর করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য! মানুষের যখন মলমূত্র ত্যাগের বেগ আসবে, তখন তাড়াতাড়ি আবেগ ভরে তা না করে' বোধ হয় আধ ঘণ্টা বসে' বসে' বিচার করা উচিত যে, এ কার্য্য করলে বুদ্ধির উপর অত্যাচার হবে কি না!

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের অন্তরের প্রেরণা যখন বুদ্ধির উপর থেকে আসে, তখন বুদ্ধির কাজ সেই প্রেরণাকে কাজে পরিণত হবার জন্যে যথা সম্ভব সাহায্য করা, রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া; তার উপর মোড়লী করতে যাওয়া নয়। মানুষের অন্তরে স্বাধীনতা উপলব্ধি করবার যে আবেগ আছে, তার উৎস বুদ্ধির রাজ্যের বাইরে। ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা বিচারের জিনিষ নয়। যার মনে সে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, সে বুদ্ধির কাছে গিয়ে তার দর যাচাই করতে যায় না। আপনার মহিমায় সে প্রতিষ্ঠিত; বেণের হিসাবের সে কোনো ধার ধারে না।

সুরেন্দ্র নাথ যখন যুবাপুরুষ ছিলেন, প্রাণে যখন নবীন আশা, নবীন উদ্যম ছিল, তখন তিনি দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর মুখ দিয়ে যে সমস্ত যুক্তি বার হ'ত, তা সেই নবীন আশা-আকাঙ্ক্ষারই অনুযায়ী। তারপর যখন বুড়ো বয়সে সে সব আকাঙ্ক্ষা শুকিয়ে গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত যুক্তিও তিনি ভুলে' গেলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিপিন বাবু দেশকে তোলপাড় করে' তুলেছিলেন, তখন দেশ যেমন পরাধীন ছিল, এখনও ঠিক তাই। বিপিন বাবু এখন বদলে গেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সব পুরোণো যুক্তির সারবত্তা তিনি দেখতে পান না। অথচ তখনও তিনি লজিকের দোহাই দিতেন, এখনও দেন। কারণটা কি?—কারণ এই যে, লজিকের নিজের কোনো রং নেই, যার হাতে লজিক পড়ে, তিনি তাঁর অন্তরের রং দিয়ে লজিককে রঙীন করে' তোলেন।

দেশের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; তারা পুরোপুরি স্বাধীনতা চায়—এইটাই গোড়ার সত্য; তার সঙ্গে যুক্তি তর্কের কোনো সম্বন্ধ নেই। কি করে' সেই স্বাধীনতা পাবার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে, কি করলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, এইগুলো স্থির করার পক্ষে লজিক সাহায্য করতে পারে। স্বাধীনতা চওয়া উচিত কি না—স্বাধীনতার দর কি —এসব প্রশ্ন যদি লজিক ওঠাতে যায়; তা'হলে বলতে হবে—"বাবা লজিক, তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও; ডেঁপোমি কোরো না।"

অনন্ত লীলা

সেকালে দেশের ইংরেজী-জানা দল যখন কংগ্রেস করেছিলেন, তখন কর্ত্তারা বলতেন—"ও! তোমরা ত সংখ্যায় আড়াই জন; দেশের কে-বা তোমাদের চেনে, কে-বা তোমাদের ধার ধারে? তোমাদের কথা শুনে যদি দেশকে স্বায়ত্ত-শাসন দিয়ে ফেলি, তা'হলে আমাদের আশ্রিত চাষা-ভুষো-কুলি-মজুরের দলকে তোমরা চেপে মেরে ফেলবে। ও-সব রাজভক্ত প্রজাকে ত আমরা ছাড়তে পারি নে।"

স্বায়ত্ত-শাসন না-দেবার তখন সেইটাই ছিল প্রধান যুক্তি।

আর আজ যখন রাস্তার কুলি-মজুর পর্য্যন্ত মনের কথা খুলে বলতে আরম্ভ করেছে, তখন কর্ত্তারা বলছেন—"আরে ছ্যাঃ! ওরা ত কুলি-মজুর, ওরা কি বোঝে? দেশের যত ভাল ভাল লোক, যত গণ্যমান্য সভ্যভব্য খাঁ-বাহাদুর, রায়-বাহাদুর, খাঁ-সাহেব আর রায়-সাহেব, সবাই আমাদের দিকে। এরা এক একজন বিত্তের জাহাজ, বুদ্ধির বৃহস্পতি —এঁদের কথা শুনবো, না কুলি-মজুরদের কথা শুনবো?

অতএব স্বায়ত্ত-শাসনের আবেদন না-মঞ্জুর।

যারা চটে' গিয়ে মনের দুঃখে বা পেটের জ্বালায় বেশ গোটাকতক কড়া কড়া সত্যিকথা শুনিয়ে দিতে আরম্ভ করলে, কর্ত্তারা তাদের বললেন—"ও লোকগুলো নেহাৎ পাজি। দেখ, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে কত কষ্ট সহ্য করে' আমরা ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করচি, জল খাবার ভাঁড়, পরবার কৌপীন, গায়ে দেবার ছেঁড়া কাঁথা—কিছুরই এদের অভাব রাখিনি, তবু এরা অনর্থক আমাদের গালিগালাজ করবে! খাবে কি? কেন গাছে আমড়া আছে, পাড়ুক আর খাক; মাঠে ঘাস আছে, ছিঁড়ুক আর রাঁধুক। বন জঙ্গল লতায় পাতায় ভরা—খাবার দুঃখ এদের আবার কি? এরা যে চেঁচায়, সেটা সুধু অভ্যাসের দোষে। শান্তিভঙ্গ করা এদের পেশা। আমরা যদি রাগ করে' দেশ ছেড়ে চলে' যাই, তখন দেখবে একবার তামাসা! খিবা, বোখারা, গজনী, কান্দাহার থেকে সাত হাত লম্বা আট হাত চওড়া সব জংলিরা এসে এদের একেবারে খোড়কুঁচি করে' ফেলবে।"

যদি বলো—"দোহাই কর্ত্তা, একবার রাগ করে' ঐ তামাসাটা দেখিয়ে দাও"—তা'হলে কর্ত্তারা

বলেন—"আরে, পাগল হলে নাকি! এরা আমাদের উপর রাগ করেছে বলে' কি এদের উপর আমরা রাগ করতে পারি? এদের এমনি ভালবেসে ফেলেছি যে, ছাড়তে গেলে মায়া হয়। আহা, অপোগণ্ড শিশু এরা, আমরা এদের না দেখলে কেইবা দেখবে-শুনবে, কেইবা এদের রিফর্ম বিলের গাধার দুধ খাইয়ে মানুষ করবে?"

এই বিশ্বগ্রাসী ভালবাসার চাপে লোকে যখন হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে, তখন কর্ত্তারা বলেন—"আরে ধরো, ধরো; এরা পাগল হয়েছে। বাবা সার্জেণ্ট, বাবা কনেষ্টবল, এদের আলিপুরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা দাওয়াই লাগাবার ব্যবস্থা করে' দাও। ওখানে জায়গা না হয় খিদিরপুরে নিয়ে যেতে পার। দরকার হলে ঘাড় ফুঁড়ে দিয়ে একটু রক্তমোক্ষণ করতেও ভুলো না। মোটকথা চিকিৎসার যেন ক্রটি না হয়।"

যাঁরা এদিক-ওদিক দুদিক রেখে কর্ত্তাদের সঙ্গে একটা রফা করতে চান, কর্ত্তারা তাঁদের বলেন,—"আরে, আমরাও তাই চাই। তোমাদের এ বোঝা বইতে আর আমরা পারি নে। ঘর সর্ব্বস্ব সবই তোমাদের, আমাদের হাতে সুধু চাবিটি বৈ ত নয়। তোমরা মানুষ হয়ে ওঠ; তারপর একটা ভাল দিন দেখে তোমাদের হাতে চাবিটি দিয়ে দেবো।" এই নাবালকের দল মাঝে মাঝে কর্ত্তাদের দরজায় হাজির হয়ে বলেন—"কর্ত্তা গো, দেখ দেখি, আমরা মানুষ হয়েছি কি না?" কর্ত্তারা ঘাড় নেড়ে, মাথা চেলে বলেন—"হুঁ, গোঁপের রেখা দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু হাড় এখনো শক্ত হয়নি। এই বিপুল রাজ্যভার এখনি তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে শেষে কি তোমাদের বিপদে ফেলবো? জানই ত আমাদের কি রকম দয়ার শরীর।"

দেশসুদ্ধ লোক ভাবতে বসে' গেছে—"তাই ত, করা যায় কি? কর্ত্তাদের যে বুঝিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।" কেউ কাঁদছে, কেউ রাগছে, কেউ অভিমান করে' মুখ ফিরিয়ে বসে' আছে, কেউবা দেবতার দরজায় মাথা খুঁড়তে লেগে গেছে; কিন্তু তারা যে মানুষ হয়েছে, তা প্রমাণ করবার যা প্রকৃষ্ট পন্থা, তা কেউ ধরছে না; যে যুক্তির উপর আর কোনো শক্তি চলে না, তা কারও মাথায় আসচে না; এ সোজা কথাটা কেউ বুঝবে না যে কর্ত্তারা কাজের লোক, কাজ চান, কথা চান না।

আমরা কিন্তু কর্ত্তাদের তারিফ না করে' থাকতে পারচি না। মনে মনে কেবল বলচি—"সাবাস কর্ত্তা, সাবাস! চাল তো চালছো ভাল, কিন্তু দেখো যেন তোমার শান্তিপর্ব্বের আয়োজন শেষে উদ্যোগপর্ব্বে দাঁড়িয়ে না যায়।

কিস্তি ও মাৎ

ফরাসী দেশের একজন রাজাকে তাঁর মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিলেন—"Do what the people wish, but punish them for wishing it."—লোকে যা যাইচে তাই কর, কিন্তু তারা চাইচে বলে' আগে তাদের খুব ঠ্যাঙ্গাও। রাজা, তাঁর ছেলে, তাঁর নাতি, তস্য ছেলে, তস্য নাতি—সবাই সে কথাটা বংশ পরম্পরাক্রমে মেনে এসেছিলেন। কিন্তু শেষে একদিন দেখলেন যে, রাজার মুকুট ধুলোয় পড়ে' লুটুচ্ছে, আর রাজা-রাণীর কাটা মাথা গিলোটিনের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কিন্তু মজার কথা এই যে, রাজা বা রাজার জাত কেউ দেখে শেখে না, ঠেকে শিখতে চায়। কিন্তু যখন ঠেকে তখন প্রায়ই শেখবার আর অবসর থাকে না—একেবারে যাত্রা বদলে আসতে হয়। ফরাসী, রুষিয়া, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া প্রজার সঙ্গে সংঘর্ষে সব দেশের রাজারই ঐ দশা হয়েছে। তবু রাজার জাত, বেড়ালের জাত—আড়াই পা যেতে-না-যেতেই সব ভুলে যায়। প্রজাকে লাঠিপেটা করে' সিধা করবার লোভ কেউই ছাড়তে পারে না। সবাই ভুলে যায় যে, হাতের লাঠি ঠিক লক্ষ্মীর মতই চঞ্চলা।

লাট কর্জ্জন যখন বীরত্ব করে' বাংলা দেশ দু'ভাগ করে' দিয়েছিলেন, তখন লোকে অনেক অনুনয় বিনয় করে' বলেছিল—"কর্ত্তা, ও-কর্ম্মটি কোরো না।" কর্ত্তা চোখ রাঙ্গিয়ে বলেছিলেন—"হট্ যাও কালা বাঙ্গালী! তোমাদের কথা শুনে আমি রাজ্য চালাতে আসিনি।" বঙ্গভঙ্গ যখন হয়ে গেল, তখন মডারেটদের ধর্ম্মপিতা গ্লাডষ্টোনের প্রিয় শিষ্য মর্লিও বলেছিলেন—"ওটা settled fact, এটা আর রদ করা চলে না।"

আমাদের সুরেন বাবু তখন চৌষট্টি হাজারের মায়ায় কাৎ হয়ে পড়েননি। তিনিও সে সময় রাগের মুখে একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন—"আমি ইংরেজকে বেশ ভাল করেই চিনি। দু'হাতে

ইংরেজের পায়ে ধরলে কিছু হবে না। একটা হাত দিয়ে তার গলাটা একটু টিপে ধরো।" বুড়োর পরে আর সেদিন ছিল না। গলার হাত আবার পায়ে নেমেছিল; কিন্তু দেশের লোক তাঁর সেই কথাটা মেনে নিয়েছিল। এমনকি অনেকে দুটো হাতই গলায় দেবার প্রস্তাব করেছিল।

দলে দলে লোক জেলে গেল। পুলিশের গুঁতো, গুর্খার সঙ্গীন, সবই কাজে লাগলো। এদিকে মাথাও যেমন ফাটতে লাগলো, অপর দিকে বোমাও তেমনি ফাটতে লাগলো। এই কাটাকাটির মাঝখানে ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লেগে গেল। লাট মর্লি যিনি কিছুদিন আগে দূরবীন দিয়ে দেখেও ভারতে one man rule ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি, তাঁরও হঠাৎ দৃষ্টি খুলে' গেল। সেরা প্রমাণ পাবার পর তিনি বললেন— "না, ছিটে ফোঁটা যা-হোক-কিছু আর না দিলে নয়।" মর্লি-মিন্টো রিফর্ম সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করবার বয়স লোকের চলে' গেছে। দেশের লোকের মনে সেই যে আগুন লেগেছিল, তা আর নিভলো না। লড়ায়ের তাপে ইউরোপে যখন রাজার পর রাজার সোনার মুকুট গলে' যেতে লাগলো, এ দেশেও যখন হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিতে লাগলো, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিত যোগ দিতে লাগলো, এমনকি দেশী ফৌজের রাজভক্তিও যখন সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠলো—তখন কর্তারা ম্লানমুখে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন—"লাও আর এক কিস্তি রিফর্ম।"

মডারেটের দল বগল বাজাতে বাজাতে যে যার পুঁটুলি সামলাতে সরে' পড়লেন। কিন্তু আগুনের হলকা বাড়তে বাড়তে বেড়েই চললো। রিফর্ম বিলের শান্তি-জলের ছিটেয় তা নিভলো না। এ ত ছিটে-ফোঁটার কথা নয়। এ যে একেবারে গোড়ার কথা নিয়ে টানাটানি পড়েছে। এ দেশ তোমাদের কি আমাদের, সেই কথারই একটা চরম মীমাংসা আজ লোকে চায়। কর্তারা বল্লেন—"যা দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। আর দশটি বছর কেউ কিছু চেয়ো না। আবার যদি চেঁচামেচি কর, ত আমাদের রুদ্রমূর্তি দেখিয়ে দেবো।"

শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ গুজরাতের এক কোণ থেকে একজন জীর্ণ শীর্ণ তপঃক্লিষ্ট সাধকের মুখ দিয়ে তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা দেশের কানে অভয়মন্ত্র দিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন—"বেঁচে মরে থাকার চেয়ে মরে বাঁচা অনেক ভাল।"

কর্তারা যা চিরকাল করে' থাকেন, আজও তাই করলেন। আগে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন; বললেন—"এ সব জনকত ক্ষ্যাপাটে লোকের কাজ।" কিন্তু এই ক্ষ্যাপামি যখন ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ, ইতরভদ্র, পুলিসপল্টন সবাইকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হলো, তখন তাঁরা বললেন—"লাগাও ডাণ্ডা।" সিভিল গার্ড ছুটলো, সার্জেণ্ট ছুটলো, রাইফেল কাঁধে গুর্খা ছুটলো। প্রচণ্ড শান্তি স্থাপনের ফলে মারামারি হল, লুটপাট হল, গুলিও চললো।

আজ একে একে, দশে দশে, শতয় শতয়, ক্রমে হাজারে হাজারে ছেলেরা এসে জেল ভর্তি করে' দিয়েছে। জেলে আর জায়গা নেই বলে' গুদামও ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। অসহযোগ নেতাদের সবাই জেলে—বাকি সুধু মাহাত্মা গান্ধী।

অথচ আন্দোলনের বিরাম নেই, উৎসাহ ভঙ্গের কোনো লক্ষণ নেই। পুলিস পাহারা, এমনকি মডারেটদের পর্য্যন্ত মন টলতে আরম্ভ করছে। তাঁরা একটা একটা রফারফির প্রস্তাব নিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছেন। কর্তাদেরও মনোগত ভাব এই বলে' মনে হচ্চে 'আরও দু'চার ঘা ডাণ্ডা দিয়ে দেখি; তারপর না-হয় এক কিস্তি রিফর্ম দিয়ে দেওয়া যাবে।'

আমরা কর্তাদের বলি—"কিস্তির পর কিস্তি দাও; কিন্তু মাৎ তোমাদের হতেই হবে।"

বাঘ ও মৃদঙ্গ

সেদিন আমাদের বড়লাট সাহেব বক্তৃতার মুখে বলে' ফেলেছিলেন যে, যারা স্বরাজ চায়, তাদের হয়তো তলোয়ারের বহর দেখিয়ে কেড়ে নিতে হবে, নয় সেলাম ঠুকতে ঠুকতে দানস্বরূপ পার্লামেন্টের কাছ থেকে ভিক্ষা মেগে নিতে হবে। তাঁর মনের কথাটা হচ্চে এই—'স্বরাজ স্বরাজ করে চেঁচামেচি কোরো না; ওতে আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আপাততঃ চুপচাপ করে' পড়ে থাকো; যদি দেখি তোমরা আমাদের কথামত উঠছো, বসছো, ফিরছো, তখন খুসী হয়ে পার্লামেন্টের কাছে তোমাদের হয়ে দুটো কথা

বলে' দিতে পারি। আর তা না করে' তোমরা যদি চোখ রাঙাও আর লম্বা লম্বা কথা কও তো হুঁসিয়ার—আমাদের গুর্খা আছে, হাইল্যাণ্ডার আছে, মসার-রাইফেল আছে, মেসিন গান আছে, উড়ো জাহাজ আছে, আর খুব কড়া ঝাঁঝাল মেজাজ আছে। এ সবের সঙ্গে লড়তে চাও তো —'চলে' এসো মিঞা।'

অনেকদিন আগে, সেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম বয়কটের ধুম লেগে যায়, তখন এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' কাগজখানাও চোখরাঙিয়ে ঠিক এইরকম কথাই বলেছিল। বেশ একটা হুমকি দিয়ে 'পাইওনিয়ার' এ দেশের লোককে জানিয়ে দিয়েছিল যে, যে-সব জাত সাম্রাজ্য গড়ে (Imperial race) তাদের মধ্যে ব্যাঘ্রধর্ম্ম (tiger qualities) সুপ্ত হয়ে পড়লেও একেবারে লুপ্ত হয় না। দরকার মত সেই সব শাণিত নখদন্তের সদ্ব্যবহার করতে তারা কিছুমাত্র ইতস্তত: করে না। এই পনের বৎসর ধরে' আমরা সেই ব্যাঘ্রধর্ম্মের নমুনা যথেষ্ট পেয়েছি; আর আজও কলকাতার মোড়ে মোড়ে পাহারাওয়ালার লাঠি আর গুর্খার রাইফেলের রূপ ধরে' সেই ব্যাঘ্রধর্ম্ম আমাদের মাঝখানে ঘুরে' বেড়াচ্চে।

আমাদের দেশের লোক বলে—'ভাল রে ভাল, তোমাদের সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ে আমরা বিচার করতে যাই, আর তোমরা সে-সব কথার উত্তর না দিয়ে লাঠির গুঁতোর ভয় দেখাও কেন? লাঠি কি একটা যুক্তি?'

আসল গোলই হয়েছে সেইখানে। আমাদের দেশের ধাতই ভিন্ন। আমাদের দেশের নবন্যায়ের পণ্ডিতেরা ছাপ্পান্ন রকমের প্রমাণ আর তিন শ' বত্রিশ রকমের ভ্রমের সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার করে' দুনিয়ার সব তত্ত্বের একটা হেস্তনেস্ত মীমাংসা করে' গেছেন, কিন্তু ইংরেজের ন্যায়শাস্ত্র একটু অন্য রকমের। ইংরেজ যখনি তার রাজার কাছে কিছু চাইতে গেছে, তখন সুধু মুখের যুক্তির উপর নির্ভর করে' নিশ্চিন্ত হয়নি। 'ম্যাগনা কার্টা'ই বলো আর 'বিল অব রাইটস'ই বলো, ইংরেজকে সবই আদায় করতে হয়েছে লাঠি ঠ্যাঙার জোরে। কাজেই আমরা যখন পড়ে পড়ে মার খাই আর জিজ্ঞাসা করি যে, লাঠিটা কি একটা যুক্তি, তখন সে আমাদের কথা মোটেই বুঝতে পারে না। সে ভাবে—'এরা আবার কি রকম জীব? আমরা যাকে যুক্তি বলি, ইংরেজের কাছে তা সুধু মুখের কথা।'

এই আয়র্লণ্ডের ব্যাপারটাই দেখোনা। পার্ণেল তাঁর লোকদের বললেন—'তোমরা লাঠিসোঁটা ছাড়, আমি ইংরেজকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হোমরুল আদায় করে' দেবো।' পার্লামেণ্টে বক্তৃতার ধুম পড়ে' গেলো; বুড়ো মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন আইরিশদের স্বপক্ষে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে ফেললেন। ইংলণ্ডের লোক সব কথা শুনলে; তারপর জিজ্ঞাসা করলে— 'তা তো হলো; কিন্তু যুক্তি কই?' রেডমণ্ড এসে আবার চেঁচাতে লাগলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের লোক ঘাড় নেড়ে বললে—'উঁহু, ও ঠিক যুক্তি হলো না।' তখন ডি ভ্যালেরা, গ্রিফিথ আর মাইকেল কলিন্সের দল মিলে তিন-চার বছর ধরে' এমন যুক্তি শুনিয়ে দিলে যে, ইংলণ্ডকে বলতে হলো—'বাস্ বাস্! বৎস, আর যুক্তি চাইনে, তোমরা কি বর চাও তা বলো।' ইংলণ্ডে আয়র্লণ্ডে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। যে মাইকেল কলিন্সকে ইংলণ্ড দু দিন আগে খুনে, ফাঁসুড়ে, ডাকাত বলে' সম্ভাষণ করেছিলেন, যে মাইকেল কলিন্সকে ধরে' দেবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই মাইকেল কলিন্সের হাতে হাসিমুখে ডাবলিন কাসল সঁপে দিয়ে ইংলণ্ড বললেন—'তোমরা মনের সুখে ঘরকন্না করো; আমরা তা'হলে এখন বিদায় হই।'

আমাদের দেশের লোক এসব ব্যাপার কাগজে পড়ে আর হাঁ ক'রে আকাশ পানে তাকিয়ে বলে— 'প্রভু তোমারি ইচ্ছা! আমরা এতদিন মিল, মর্লি, মেকলে আউড়ে বেড়ালুম, এত ভালো ভালো নীতিকথা, তত্ত্বকথা মুখস্থ করলুম, সে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়ে গেল? লাঠির যুক্তিটা কি সত্যই এত বড় যুক্তি?"

আমাদের দেশের লোকের মন এ কথায় সায় দিতে চায় না। এটা আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কারের বিরুদ্ধে। মানুষের মধ্যে যদি পশুও থাকে ত আমরা সে পশুকে পোষ মানাতে চাই। তাই, ভাগবতকথা শুনিয়ে বাঘের হবিষ্যান্নে রুচি করান যায় কি না, বাঘের একদিন মৃদঙ্গ বাজিয়ে হরি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেবার সম্ভাবনা আছে কি না —এই পরীক্ষা আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছে। এ পরীক্ষা যদি সফল হয় ত স্বীকার করতেই হবে যে, এ দেশ জগতে একটা নতুন যুগ নিয়ে এলো।

—

গুরু মহারাজ কী জয়

আজ ঊর্দ্ধবাহু হয়ে প্রাণভরে' বলো—গুরু মহারাজ কী জয়। আজ দিগন্ত কাঁপিয়ে বলো—

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়
নাহি আর আগু পিছু
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাহি তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।"

হাজার বৎসর ধরে' যারা অহল্যার মতো পাষাণস্তূপে পরিণত হয়েছিল, নবজীবনের আনন্দে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; মরণের ভয়ে যারা ঘরের কোণে একদিন লুকিয়েছিল, মুক্তির পূর্ব্বাস্বাদ পেয়ে আজ তারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে; যৌবনে যারা জরার ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিল, আজ তারা বার্দ্ধক্যের মুখোস ফেলে দিয়েছে; মৃত্যুকে যারা শান্তি ভ্রমে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিল, আজ তারা অশান্ত হয়ে উঠেছে; মরণকে জীবনের শেষ ভেবে যারা এতদিন নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে আজ তারা মৃত্যুলোভী হয়ে দাঁড়িয়েছে; নিজেদের দুর্ব্বল, অসহায় ভেবে যারা পরের পায়ের তলায় পড়েছিল, আজ তারা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে, কোন্ অশ্রুতপূর্ব্ব আশার বাণী আজ হতাশের প্রাণে আশার সঞ্চার করেছে; মূকের মুখে আজ ভাষা ফুটেছে; হাজার বৎসরের পঙ্গু আজ গিরি লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছে। তাই বলো একবার—গুরু মহারাজ কী জয়।

আত্মবিস্মৃত দাস আজ আপনার ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেয়েছে—আজ তাই মৃত্যু তার পদানত, চিত্ত তার বিক্ষোভহীন। রাজারও যিনি রাজা, মরণও যাঁর ভয়ে ভীত, ভয়ানকেরও যিনি ভয়স্বরূপ, তাঁর অভয়-মূর্ত্তি আজ যাদের চিত্তপটে ফুটে উঠেছে—কোন্ পাহারাওয়ালার লাঠি, কোন্ সার্জ্জেণ্টের ব্যাটন, কোন্ গুর্খার রাইফেল আজ তাদের মুক্তির গতিরোধ করবে? বিশ্বময় যে আপনাকে প্রসারিত করে' দিয়েছে, কোন্ কারাগৃহ আজ তাকে আবদ্ধ করবে? মরণের মাঝে যে জীবনের প্রসার দেখতে পেয়েছে, কোন্ ঘাতক আজ তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারতে পারবে?

আকাশে বাতাসে আজ সুধু এই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে—ভয় নাই, ভয় নাই। অভয়-বাণী লোকের প্রাণে প্রাণে সুধু এই কথাই বলে' যাচ্ছে—যদি আপনাকে পেতে চাও তো আপনাকে ভোলো, যদি আপনাকে ধরতে চাও তো আপনাকে ছাড়ো, যদি আপানাকে বাঁচাতে চাও তো আপনাকে মারো। শিশু আজ তাই মায়ের কোল ছেড়ে ছুটেছে, যুবক আজ তাই সুখশয্যা ভুলেছে, বৃদ্ধ আজ তাই নবীন অরুণালোকের আশায় চক্ষু মেলে চেয়েছে। ভবিষ্যতের আলো আজ বর্ত্তমানের উপর এসে পড়েছে, তাই সবারই কণ্ঠে সুধু একই ধ্বনি—গুরু মহারাজ কী জয়।

অসম্ভবকে তুমি সম্ভব কর, দর্পিতকে তুমি হীন কর, দীনকে নির্য্যাতিতকে তুমি আশ্রয়দান কর, দুষ্টকে তুমি দমন কর, দীনকে তুমি রাজ-শ্রীতে মণ্ডিত কর—তাই ওগো ভারতের ভাগ্যবিধাতা। আজ কণ্ঠে তোমার জয়ধ্বনি কাঁপিয়ে তুলেছে। কিন্তু আজও কি তোমার যোগনিদ্রা ভাঙ্গবার সময় হয়নি? গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরীর কুল ঘিরে' আজ আবার ভক্ত-দেহের রক্ত-লহরী তোমার পদযুগলের উদ্দেশে ছুটতে আরম্ভ করেছে—আজও কি তোমার আত্মপ্রকাশের দিন আসেনি? ভয় ভাবনাহীন চিত্তে আজ আবার সহস্র সহস্র বীর তোমার পদপ্রান্তে সহস্র সহস্র শির ডালি দিতে এসেছে, তুমি তাদের ভক্তির উপহার গ্রহণ করবে না? অযুত প্রাণের কাতর বেদনা কি আজও তোমার প্রাণ ব্যথিত করে' তোলেনি?

আজ এস, তুমি এস। আত্মভোলা, গৃহহারা লাঞ্ছিতের দলকে তোমার রুদ্র পতাকার নীচে ডেকে নাও। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে যারা মানুষকে কৃমিকীটের মত তুচ্ছ মনে করে, সেই দর্পিতদের জানিয়ে দাও যে, অবমানিতের কাতর ক্রন্দন তোমারই বুকে জমাট হয়ে উঠেছে। শত হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভের উপর যারা অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করেছে, তাদের দেখিয়ে দাও যে, সে স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যে তোমারই নরসিংহমূর্ত্তি বিদ্যমান। বালক প্রহ্লাদের মুখের জয়ধ্বনিতে আজ কারাগৃহ মুখরিত; লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী আজ তোমারই শরণ-প্রার্থিনী; লৌহ-শৃঙ্খলিত বসুদেব-দেবকী আজ কংস-কারাগারে পাষাণভার বুকে ধরে' তোমারই আশাপথ চেয়ে পড়ে' আছে। নাগরিকেরা আজ ঘাটে, মাঠে, রাজপথে শত নির্য্যাতন সহ্য করে' সুধু বলছে—গুরু মহারাজ কী জয়।—হে জগদ্গুরু। আজ জাগো। তুমি জাগো।

ডাকের মত ডাক

গুরু গোবিন্দ একদিন চুপ করে' বসেছিলেন, এমন সময় দূরবর্ত্তী গ্রাম থেকে তাঁর জনকতক শিষ্য কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হল। তিনি তাদের কাছে বসিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কাঁদছ কেন? তোমাদের কি হয়েছে?" তারা উত্তর দিলে "মহারাজ! অনেক দিনের যত্নে সঞ্চিত উপহার আমরা আপনার জন্যে আনছিলাম, রাস্তায় মোগলরা তা আমাদের মেরে কেড়ে নিয়েছে।" গুরু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা বাধা দিলে না কেন?" তারা বললে—"মহারাজ! আমরা দুর্ব্বল হীন জাতি; কেউবা জাঠ, কেউবা জোলা! আমরা কি করে' মোগলদের সঙ্গে লড়্‌বো? তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোঁফদাড়ি, দেখলেই আমাদের ভয় হয়। আমাদের কারো নাম লালু, কারো নাম পাঁচু; আর তাদের যতবড় চেহারা, ততবড় নাম। আমরা কি এদের সঙ্গে লড়তে পারি?"

গুরু সিংহের মত গর্জ্জন করে' দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—"আমার শিষ্য আর কেউ লালু-পাঁচু থাকবে না। আজ থেকে আমার নাম গোবিন্দ রায় নয়; আজ থেকে আমার নাম গোবিন্দ সিংহ; আর তোমাদের সকলেরই উপাধি আজ থেকে সিংহ। যারা এতদিন পর্য্যন্ত জাঠ, জোলা, চামার ছিলে, আজ থেকে তারা নিজেদের গোবিন্দ সিংহের স্বজাতি বলেই জেনো। চড়াই পাখী দিয়ে যদি আমি বাজ শিকার করতে পারি, তোমাদের দিয়ে যদি মোগল রাজ্য ধ্বংস করতে পারি, তবেই আমার গোবিন্দ সিংহ নাম সার্থক হবে।"

সেই জাঠ, চামার, জোলার বংশধরেরাই একদিন দিল্লীর সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল। যারা নিজেদের হীন, দুর্ব্বল ভেবে ভেবে যথার্থই হীন, দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, গুরু গোবিন্দের কৃপায় তারা মৃত্যুভয় জয় করে' ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে গেছে।

এটা নতুন প্রথা নয়। যখনই এই দেশে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, দেশে ক্ষত্রিয় শক্তির অভাবে সমাজ অত্যাচারে আকুল হয়ে উঠেছে, তখনই এ দেশের মহাপুরুষেরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে নতুন ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করে' সমাজরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পরশুরাম যে শূদ্রজাতির সাহায্যে দর্পিত, ধর্ম্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়দের দমন করেন, তাদের বংশধরেরা আজ-কালের নবশায়ক বা নবশাখ। সেকালের সূর্য্যবংশী, চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় যখন লোপ পেয়ে গিয়েছিল, ভারতবর্ষ যখন শক, হুন, পারদদের পায়ের তলায় পড়েছিল, তখন নিম্নজাতিকে সংস্কারপূত করেই নতুন অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

আজ যাঁরা এই নির্বীর্য্য সমাজের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের ঐ নিম্নস্তরের দিকেই লক্ষ্য করতে হবে। যারা আমাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে সাহস করে না, আজ যদি আমরা বাঁচতে চাই ত তাদের কোলে তুলে নিতে হবে। যাদের হীন, অস্পৃশ্য বলে' সমাজের প্রান্তভাগে স্থান নির্দ্দেশ করে' দিয়েছি, পা দিয়ে যাদের ছুঁলে আজ আমরা অপবিত্র হয়ে যাই, তাদেরই সংস্পর্শে আজ আমাদের পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। অপরকে মানুষ হবার অধিকার দিয়ে আজ আমাদের মানুষ হতে হবে।

আজ যারা মুক্তিমন্ত্রের উপাসক, পরের বন্ধন কেটে দেওয়াই আজ তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। যারা সহস্র বৎসর ধরে' উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, আশায় যদি তাদের বুক ভরে' না দিতে পার, অসাড় বাহুতে যদি তাদের শক্তিসঞ্চার না করতে পার, প্রেমের বলে যদি তাদের আপন অঙ্গের অঙ্গীভূত না করতে পার, তবে এ জাতীয়-যজ্ঞের অগ্নি ধূমেই পরিণত হবে।

দেশের আজ যে দুরবস্থা, তার মূলে বিদ্যার, বুদ্ধির বা culture-এর অভাব ততটা নয়, যতটা সমবেদনা বা তীব্র ইচ্ছাশক্তির অভাব। পুঁথি বগলে করে' কলেজে গিয়ে বা দার্শনিক গবেষণা করে' এ দুরবস্থা ঘুচবে না! চাই সেই মহাপ্রাণ যা অপরের দুঃখে কাতর হয়ে উঠবে, চাই সেই অদম্য অপরাজেয় আকাঙ্ক্ষা যা সমস্ত বাধাবিঘ্ন ধূলিসাৎ করে' দেবে। চাই প্রাণবন্ত সজীব মানুষ, যারা অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধাবোধ করবে না, দীন হীন কাঙ্গালকে বুকে আঁকড়ে ধরতে যাদের মনে সঙ্কোচের উদয় হবে না, বড় বড় কথার আবরণ দিয়ে যারা নিজেদের সঙ্কীর্ণতাকে ঢাকবে না। চাই সেই আত্মভোলা কর্ম্মীর দল, স্বর্গের সুধার চেয়ে যাদের কাছে মর্ত্ত্যলোকের হলাহলই বেশী মধুর, মরণ যাদের ভয়ে ভীত, দুঃখ যাদের দুঃখ দিতে না পেরে লজ্জাবনত।

কোথায় তারা, যারা নিজেদের ষোল আনা ছেড়ে দিয়ে পরের ষোল আনা পেতে চায়, যারা নিজেদের নিঃশেষ করে' দিয়ে নিজেদের পূর্ণরূপ

দেখতে চায়, যারা নির্ভীক চিত্তে বলতে পারবে—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

বাংলার নবজীবন

বিশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত স্বাধীনতার কথা বললে বাঙ্গালীর ছেলেরা হেসে সে-কথা উড়িয়ে দিত। দেশের যে স্বাধীন হওয়া দরকার বা স্বাধীন হওয়া সম্ভবপর, এ-কথা ভাবতে তাদের মাথা ঘুরে' যেত। চীনে বক্সার-বিদ্রোহের সময় একজন জাপানী সেনাপতি একজন বাঙ্গালী যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমাদের দেশ স্বাধীন হবে কবে?" যুবক উত্তর দিয়েছিল—"স্বাধীন! কই, সে-কথা ত আমরা কখনো ভাবিনি।" দেশের পেশাদারী রাজনৈতিক পাণ্ডারা তখন ভালো ভালো ইংরেজী গৎ মুখস্থ করে' বাহবা নিয়ে বেড়াতেন। দু'শ কি একশ বৎসর পরে যখন আমরা ভাষায়, ভাবে ও আচারে-ব্যবহারে ফিরিঙ্গিস্থানের একটা নকল সংস্করণ হয়ে উঠতে পারব, তখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ঐ রকম একটা কিছু আমাদের বখ্‌সিস করে' দেবেন—এই আশায় ও আনন্দে আমাদের পাণ্ডারা মসগুল হয়ে থাকতেন। সে কালের ভালো ভালো ছেলেরা বিলেতে গিয়ে I. C. S. হতে পারলেই নিজেদের জন্ম সার্থক মনে করত। অভাবপক্ষে বাপ-পিতামহের রাজভক্তির দোহাই দিয়ে একটি ডেপুটীগিরি বাগাবার চেষ্টায় ফিরত। লাট সাহেবের দরবারে মাঝে মাঝে যে রাজনীতির প্রহসন হত, তা ব্যঙ্গকাব্যের মালমসলা জোগাত মাত্র। ভারত-উদ্ধারের কথা তখন একটা উদ্ভট কল্পনা মাত্র বলে' গণ্য হত।

একটা মোহের আবরণ এসে আমাদের অতীত ইতিহাস আমাদের চোখ হতে অপসারিত করে' দিয়েছিল। নিজের জাতকে আমরা চিনতাম না, বুঝতাম না। কলেজপাঠ্য ইতিহাসে যা পড়তাম তা সুধু আত্মগ্লানির কথা, ভীরুতার কথা, কাপুরুষতার কথা। চোখের সামনে যা দেখতাম তাও সুধু তোষামোদের ছবি, দুর্ব্বলতার ছবি। স্বদেশ-প্রেমের কথা বলতে গেলে আমাদের তখন মহারাষ্ট্র হতে শিবাজী বা পঞ্জাব হতে গুরুগোবিন্দকে ধার করে' নিয়ে আসতে হত।

তারপর একদিন সাত শ' বছরের অন্ধকার ভেদ করে' বাংলার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। বাঙ্গালীর ছেলে বুঝলে যে এতদিন পরে তাদের ডাক এসেছে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বিবেকানন্দের তপস্যা বৃথায় যায়নি; জাতীয় জীবনের কোনো নিভৃততম গুহায় তা এতদিন নীরবে শক্তিসঞ্চার করছিল।

বাঙ্গালীর ছেলে যেন এই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় এতদিন বুকে বেদনা ও লাঞ্ছনার ভার নিয়ে পাষাণী অহল্যার মত পড়েছিল। এইবার মহাশক্তির আশীর্ব্বাদী স্পর্শে তার কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ সোজা হয়ে গেল। মোহের ঠুলি তার চোখ হতে খসে' পড়ল। সে বুঝল যে, এতদিন ধরে' দেশে যে রাজনীতির অভিনয় হয়ে এসেছে, তা সুধু কাঙালের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের ক্রন্দন, মোহাবিষ্টের দুঃস্বপ্ন মাত্র। যার দেশ নেই, রাজ্য নেই, তার পক্ষে দেশ ও রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টাই একমাত্র রাজনীতি।

সেই আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হৃদয়ে নবীন বসন্তের আবির্ভাব হল। বাংলার কবির কণ্ঠে দেশের বন্দনা-গান ধ্বনিত হয়ে উঠল, বাঙ্গালীর প্রাণ আশায় ফুলে' উঠল, বাঙ্গালীর শীর্ণবাহুতে বল দেখা দিল। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বাংলার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বাঙ্গালীর ছেলেকে মুগ্ধ করে' ফেললে। সে বুঝলে যে সেও মানুষ, উন্মুক্ত আকাশের তলায় উচ্চশির হয়ে দাঁড়াবার তারও অধিকার আছে।

পরের পায়ের তলায় নিজের জীবন বিকিয়ে চুপ করে' পড়ে' থাকতে সে রাজী হল না। এতদিন যে স্বাধীনতার কথা ভাবতেও সাহস করেনি, আজ সেই স্বাধীনতার জন্য সে স্নেহের বন্ধন, অর্থের মোহ, নাম-যশের লালসা ভুলে' ঘরের বার হয়ে পড়ল।

তারপর পনেরো বৎসর কেটে গেছে। বাঙ্গালীর আত্মোদ্ধার ব্রত আজও উদ্‌যাপিত হয়নি বটে, কিন্তু সে সঙ্কল্প লোহার শিকলেও বাঁধা পড়েনি, ফাঁসিকাঠেও তা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গত কয়েক বৎসর ধরে' ঝঞ্জার পর ঝঞ্জা মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আজ আর আত্মগ্লানি, বিক্ষোভ ও বিভ্রম এ জাতকে মারতে পারবে না।

মৃতসঞ্জীবনী ভাব-মন্দাকিনীর অমিয় প্রবাহ স্পর্শে পরপদলাঞ্ছিত পতিত জাতি আজ নবজীবনের পূর্ব্বস্বাদ পেয়ে সতেজ ও পুষ্ট হয়ে উঠেছে। যে জাতির গৌরবময় অতীতের বাণী নিত্য কানে বাজে, সে জাতি মরে না; পদস্খলন হতে পারে কিন্তু ধ্বংস হয় না। আজ ভগবানের পাঞ্চজন্য মুক্তিকাম সাধকের কানে মরণবরণ মন্ত্র ঘোষণা করে' দিয়েছে, আজ সেই মন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে সকল-ভোলা, সকল-হারা কর্ম্মীর দল প্রেয়কে ফেলে শ্রেয়ের অন্বেষণে ছুটেছে, বৈরীরোষানলকে অবহেলার হাসিতে তুচ্ছ করে' আপনাদের সর্ব্বস্ব তাতে আহুতি দিচ্ছে—আজ আর এ জাতির আত্মবিস্মৃতি ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

আজ চাই সুধু সাহস, ধৈর্য্য আর আত্মবিশ্বাস। এ ব্রত উদ্‌যাপিত হবেই হবে, এ সাধনায় সিদ্ধি আসবেই আসবে।

মহাত্মার দান

তখন মহাত্মাজীর বিচার চলছিল। তাই সকালবেলা চায়ের কাপ ঘিরে আমাদের দু'চারজন বন্ধু তুমুল তর্ক জুড়ে' দিয়েছেন—'জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মাজীর বিশেষ দান কোন্‌টুকু।"

আমাদের এক নবীন বন্ধু কলেজ ছেড়েই বাড়ীতে চরকা আর তাঁত বসিয়েছিলেন। তিনি অবজ্ঞাভাবে বললেন—'তোমরা এ নিয়ে কেন যে মাথা ঘামাচ্ছ, তা ত জানিনে। মহাত্মার বিশেষ দান যে চরকা, তা তিনি নিজমুখে হাজারবার বলে' গেছেন। এ সোজা কথাটা গাধাতেও বুঝতে পারে।'

আমাদের এক পুরাণো কংগ্রেসওয়ালা বন্ধু এতক্ষণ নীরবে চা পান করছিলেন। তিনি চায়ের কাপটি নামিয়ে রেখে বললেন—"গাধাতে যা বুঝতে পারে, মানুষে তা আবার অনেক সময় পারে না।' এ সময়ে যদি বাংলাদেশে গোটা-কতক স্বদেশী মিল হয়, তা'হলে দুদিন পরে হয়ত পদী পিসির চরকা পদী পিসির হাতে ফিরে গিয়ে পৈতা কাটতে থাকবে। আমার ত মনে হয় যে, তাঁর খাটি কাজ হচ্ছে কংগ্রেসটাকে ভেঙ্গে গড়া। আগে ওটা ছিল সুধু সাম্বাৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধে বক্তৃতার আড্ডা; আর এখন সত্যি সত্যিই কাজের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরকা কতদিন টি'কবে, তা জানিনে; কিন্তু এ কাজটার মার নেই।'

আমাদের যে বন্ধুটি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে লাঠির ঘা খেয়ে 'পুণ্যে বিশাল' হয়ে এসেছিলেন, তিনি পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন—'কংগ্রেসের পরমায়ু কতদিন, তা জানিনে; কিন্তু পুলিসের লাঠির পরমায়ু হয়ত তার চেয়ে বেশী। কংগ্রেস যেদিন সত্যি সত্যিই কাজের আড্ডা হবে, সেদিন কর্ত্তারা তাকে unlawful assembly বলতে দেরী করবেন না। তখন না থাকবে চরকা, না থাকবে কংগ্রেস। কি যে টি'কবে, তা ত বুঝতে পারছিনে।'

প্রথম বন্ধু একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—'কংগ্রেস মরবে না; মহাত্মার অহিংসা-মন্ত্রই কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখবে। চরকার চেয়ে যদি মহাত্মাজীর বড় দান কিছু থাকে ত ঐ অহিংসা-মন্ত্র। চরকা এ দেশে নতুন যুগ এনে দেবে।'

আমাদের কুস্তিগীর পালোয়ান বন্ধু—যিনি জামালপুরে মন্দির ভাঙ্গার সময় লাঠি ঘাড়ে করে' মন্দির রক্ষা করতে ছুটেছিলেন—তিনি বলে' উঠলেন—'অহিংসা টহিংসা যা বলছ, ওগুলো আমার কাছে বড় ধোঁয়াটে রকমের ব্যাপার। বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে' নিতাই গৌর পর্য্যন্ত অনেকেই ও-কথা বলে' গেছেন, কিন্তু দেশের দুঃখ যে তা থেকে বিশেষ কিছু ঘুচেছে তা ত দেখতে পাচ্ছি নে। গুজরাতের লোক এখনও পর্য্যন্ত মানুষের রক্ত খাইয়ে ছারপোকা পোষে—তা বলে' ত গুজরাতে এখনও সত্যযুগ আসেনি। আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর ত বলি যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলটাই হচ্ছে মহাত্মাজীর খাটি কাজ।'

আমাদের কংগ্রেসী বন্ধু বললেন—'হিন্দু-মুসলমানের মিল সেইদিন হয়েছে বলবো, যেদিন খেলাফত-সভা কংগ্রেসের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। এখন যে মসলা দিয়ে মিলনটাকে গেঁথে তোলা হচ্ছে, সে মসলাটা অনেকখানি বিদেশী। মুসলমানের প্রাণ খেলাফতের জন্যে যতটা কেঁদেছে, দেশের জন্যে ততটা কেঁদেছে কি না বুঝতে পারছি নে।'

আমাদের প্রথম বন্ধুটি চোটে গিয়ে বললেন—'তোমাদের সব তাতেই অবিশ্বাস।'

তর্কটা ক্রমে ঘুসোঘুসির দিকে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় আমাদের চাকর ভজুয়া

সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কাগজ খুলে দেখি, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—মহাত্মার ছ' বৎসর জেল।

তর্কটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। আমাদের পালোয়ান বন্ধু আর এক কাপ চা ঢালতে লেগে গেলেন। কালেজী বন্ধু বললেন—'ইস্! ছ' বছর!' কংগ্রেসী বন্ধু বললেন—'আজ একটা প্রোসেশন বের করলে হয় না?'

ভজুয়ার দিকে চেয়ে দেখলুম। মুখে তার কথা নেই—চোখ জলে ভরে' গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'কি রে তুই কাঁদছিস্ কেন? গান্ধী মহারাজের জেল হয়েছে, তা তোর কি?

ভজুয়া চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—'বাবুজি, ও-কথা বোলো না। তিনি যে আমাদের আপনার লোক।'

কাগজের দিকে চেয়ে দেখি, মাহাত্মা বিচারককে বলেছেন—"I am a farmer and weaver by profession."

তিনি ব্যারিষ্টার নন্,—দেশের নেতা নন, সমাজ-সংস্কারক এমনকি ভদ্রলোক অবধি নয়। তিনি চাষা ও তাঁতি।

অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে' গেল। "No man spake like this man." জেলে অনেকেই গেছে, কিন্তু এমন কথা ত আর কেউ বলেনি। দেশের মাটির সঙ্গে এমন করে' নিজেকে মিশিয়ে ত আর কেউ দেয়নি।

আমাদের ভজুয়া জাতে কাহার। তার চোখের জলের ইতিহাস তখন বুঝতে পারলুম। বুঝলুম এই জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মার শ্রেষ্ঠ দান কি।

বন্ধুদের বললুম 'ভদ্রলোক যদি কখনো প্রাণের টানে আবার ছোটলোক হয়, তখনই এ জাতের উদ্ধার হবে। তার আগে নয়।'

বাজে কাজ

শুনতে পাওয়া যায়, হাতের কাছে কাজ-কর্ম্ম না থাকলে লোকে খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে' থাকে। চোখের সামনেও দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেসের কাজকর্ম্ম যত কমে' আসছে, হিন্দু-মুসলমানের মারামারি, কর্ম্মীদের ভিতর ঝগড়া তত প্রবল হয়ে উঠছে। যে-কাজ নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, সে-কাজ বহুকাল আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। উপাধি বর্জ্জন, আদালত বর্জ্জন, কলেজ বয়কট,—কাউন্সিল বয়কট—এর মধ্যে কোনোটাই পুরোপুরিভাবে সফল হয়নি; কিন্তু সেটা সরলভাবে স্বীকার করতে আমাদের অভিমানে ঘা লাগে বলে' আমরা লম্বা লম্বা কথার সৃষ্টি করে, নিজেদের ঠকাই আর পরকে ঠকাবার চেষ্টা করি। যে industrialism এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা খদ্দর প্রচার অরম্ভ করি, সেই খদ্দরের মধ্যে ক্রমে industrialism প্রবেশ করেছে। তুলোর জন্যে আমরা বাজারের দিকে হাঁ করে' চেয়ে আছি; কংগ্রেস অফিসগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে Wardha cotton এর advertising agency; আর বাজাজের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাঁরা খদ্দর প্রচার করছেন, তাঁদের মুখ ফুটে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবার সাহস নেই। বাজাজ যেখানে তুলো বেচে দশ লক্ষ টাকা লাভ করেছেন, সেখানে কংগ্রেস ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করে' কংগ্রেসের কর্ম্মীদের মাথা কিনে রেখেছেন। কংগ্রেসী খবরের-কাগজওয়ালারাও এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন না, কেননা বাজাজের টাকা থেকে সাহায্য না পেলে তাঁদের ভারত-উদ্ধারের ব্যবসা চলে না। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যাঁরা সুধু চরকা কেটে দেশ-উদ্ধারের সঙ্কল্প করেছেন, তাঁরা কেবল জিহ্বা দিয়েই চরকা কাটছেন; তাঁদের সজীবতার আর লক্ষণ নেই।

মাঝে কথা উঠেছিল যে, আইনভঙ্গ আরম্ভ করতে হবে, আর তার জন্যে ২৫ লক্ষ টাকা আর ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক চাই। কিন্তু এতদিনে চীৎকারের ফলে স্বেচ্ছাসেবকও জোটেনি, টাকাও জোটেনি। সুতরাং দেশব্যাপী আইনভঙ্গ যে কংগ্রেসের কর্ত্তারা শীঘ্র আরম্ভ করবেন না, এটা ধরে' নেওয়া যেতে পারে। দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের প্রভাব যে কমে' গেছে, একথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কেন এমন হল? কর্ত্তারা বললেন—"দোষ আমাদের নয়, দোষ দেশের লোকের। আমরা যে সুপরামর্শ দিয়েছি, তা যদি দেশের লোক শুনতো' তা'হলে এতদিন কেল্লা ফতে হয়ে যেতো।" দেশ উদ্ধার করবার সামর্থ্য তাঁদের নেই—এই কথাটা সরলভাবে স্বীকার করে' কংগ্রেসের কর্ত্তারা যদি নিজের নিজের ঘরে ফিরে

যেতেন, তা'হলে হয়ত দেশের লোকে নিজের রাস্তা নিজে দেখে নিতো; কিন্তু কর্ত্তারা তা করবেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের রসদ বন্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা কংগ্রেস-অফিসে বসে' বসে' সদুপদেশ বর্ষণ করতে থাকবেন। এখন তাঁরা আইনভঙ্গ করার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন যে, অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দেশের লোকের সেবা করো; তারপর দেশ একদিন সুপ্রভাতে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে জেগে উঠবে।

এই সেবাধর্ম্ম পালন করবার সংকল্প যে অতি সাধু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই কংগ্রেসের যা গোড়ার কথা—দেশের স্বাধীনতালাভ —তা কি সুধু এই সেবার দ্বারা সিদ্ধ হবে? পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না, তখন ভারতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বসিয়ে দেবার উপযুক্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক তোমরা কোথা পাবে? দেশে যে যে কারণের ফলে অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, রোগ, মহামারী এসেছে, সেগুলো বর্ত্তমান থাকতে তোমরা কেমন করে' দেশকে সেবার দ্বারা প্রবুদ্ধ করবে? ছেঁদা কলসীতে জল ঢেলে কতদিনে তোমরা কলসী ভরবে? আজ যেমন বয়কটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, দুদিন পরে তোমাদের সেবাধর্ম্ম পালনের চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ হবে। লোককে দু ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করা বা ম্যালেরিয়ার সময় তাদের মুখে দুটো কুইনাইনের বড়ি তুলে' দেওয়া যে পুণ্য কাজ, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তা থেকে যে লোকের মনে স্বাধীনতাস্পৃহা গজিয়ে উঠবে, একথা জোর করে' বলা যায় না।

তা'হলে উপায়? দেশের লোক কংগ্রেসের ডাকে কেন সাড়া দিচ্ছে না, আগে তাই বুঝতে হবে। আমাদের মনে হয়, এই সাড়া না দেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, দেশের লোক যা চায়, কংগ্রেসের কর্ত্তারা ঠিক সে জিনিষ চান না। কংগ্রেসী স্বরাজ কথাটার অর্থ আজ পর্য্যন্ত ধোঁয়াটে হয়েই আছে; সেই স্বরাজে জনসাধারণের আর্থিক আর সামাজিক অবস্থা যে কি রকমের হবে, তা কংগ্রেসের কর্ত্তারা এখনও স্পষ্ট করে' বলেননি। যে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের জ্বালায় দেশের লোক অস্থির, সে সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর করার সঙ্গে স্বরাজের কি সম্বন্ধ, তা কখনও স্পষ্ট করে' বলা হয়নি। স্বরাজ-গবর্ণমেন্টের অধীনে দেশের লোক—জমিদার, মহাজন বা কলওয়ালার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে কি না—তা কখনও দেশের কৃষক বা শ্রমজীবীদের স্পষ্ট করে' বলা হয়নি। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এমন কোনো কাজে হাত দেওয়া হয়নি, যাতে দেশের গরীব লোকেরা মনে করতে পারে যে, তাদের আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কংগ্রেসের বাঞ্ছনীয়। দেশের শতকরা ৮০ জন লোকের দুঃখের যেখানে গোড়া, সেখানে হাত না দিয়ে কংগ্রেসের কর্ত্তারা সুধু আধ্যাত্মিক ফাঁকা আওয়াজ করেছেন অথবা সেই দুঃখের উপর সেবাধর্ম্মের বাজে প্রলেপ দিচ্ছেন। দেশের লোক যখন তাঁদের কথায় সাড়া দিচ্ছে না, তখন তাঁরা কংগ্রেস-অফিসে বসে' গম্ভীরভাবে প্রচার করছেন যে, দেশের লোক এখন অবুঝ; সুতরাং স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করবার সময় এখনও আসেনি। দোষটা যে দেশের নয়, তাঁদের নিজেদের—এ কথা বললে তাঁরা হয় রাগে ফুলে ওঠেন, নয়ত অভিমানে কেঁদে ফেলেন। এই রাগারাগি, কাঁদাকাটির পালা অনেকদিন গাওয়া হয়েছে। এখন যাঁরা দেশকে উদ্ধার করতে চান, তাঁদের আগে এই সমস্ত নেতাদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। কংগ্রেসকে এই পুরাণো ওস্তাদদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে আনতে হবে।

নব বর্ষ

ওগো বৈশাখের রুদ্র দেবতা, আজ আমাদের সহস্র বৎসরের দিন-গণনা শেষ করো। বসন্তের মলয়-হিল্লোল আজ বন্ধ হোক, দুগ্ধফেণনিভ বিলাস-শয্যা আজ কণ্টকময় হোক, স্নেহ-কাতর মন আজ তিক্ত হয়ে উঠুক, করুণ-অশ্রু আজ চোখের কোণে শুকিয়ে যাক, মায়া-মমতার বন্ধন আজ বিষধরের মত আমাদের দংশন করুক।

আজ বাঙ্গালীর বুক ভরে' তোমার প্রলয়-বিষাণ বেজে উঠুক। বজ্রের মত কর্কশ স্বরে আজ তুমি জানিয়ে দাও যে, মরণই সত্য, যন্ত্রণাই সত্য, দুঃখই সত্য, কারাগারই সত্য, ধ্বংসই সত্য, হলদিঘাটই সত্য, পাণিপথই সত্য, জালিয়ানওয়াবাগ সত্য, চৌরিচৌরা সত্য। আজ বাঙ্গালার শ্মশান জুড়ে'— "ভীম রুদ্র তালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন-ভরা চরণ।"

শান্তির মোহ, সৃষ্টির মোহ, constructive programmeএর মোহ ঘুচিয়ে দাও। তোমার দিগন্তবিস্তৃত তপ্তশলাকাবৎ পীত জটাজাল দেখে যে ভীরুর প্রাণ কেঁপে ওঠে, তোমার পূজার ভয়ে যারা ঘরের কোণে বসে' শান্তির বচন আওড়ায়, তোমার ডমরুর ধ্বনি শুনে যারা ভীত ত্রস্ত হয়ে উপবাসের আয়োজন করে, আজ সে

"মেঘগুলোকে শেষ করে' দেশ-চিতার বুকে নাচো।"

কাউন্সিলের শীতল ছায়ায় বসে' আজ যারা হিসাব-নিকাশের ভাণ করছে, তাদের বুঝিয়ে দাও যে, চিত্রগুপ্তের খাতা না দেখলে ও-হিসাব আর মিলবে না; অশ্রুজলে সিক্ত করে' যারা পাষাণ প্রাণ গলাবার রঙীন নেশায় মশগুল, তাদের দেখিয়ে দাও যে, এ পাষাণ আগুনের তাপে ছাড়া গলে না; বক্তৃতার বন্যায় যারা এ মরুভূমিকে প্লাবিত করে' স্বায়ত্ত-শাসন ফলাবার অলস স্বপ্ন দেখছে, তাদের বুঝিয়ে দাও—এ মরুভূমিকে উর্ব্বর করতে হলে লক্ষ নর-হৃদয়ের শোণিতধারা চাই।

"হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে।"

কাল-বৈশাখীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তুমি—ঝঞ্ঝারূপে, বন্যারূপে, মহামারীরূপে, দুর্ভিক্ষরূপে, অত্যাচাররূপে তুমি অহরহঃ আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূজার বলি সংগ্রহ করে' ফিরছ; আজ স্বেচ্ছায়, পরমানন্দে, ষোড়শোপচারে তোমার পূজার আয়োজন করবার শক্তি আমাদের দাও। আজ—

"মুক্তিদাতা মরণ এসো কাল-বোশেখীর বেশে
জীবন তুমি, সৃষ্টি তুমি, জরা-মরার দেশে।"

কাজ কি এ পুঞ্জীকৃত লাঞ্ছনাভরা দাস-জীবন? কাজ কি এই বুকভরা কান্না চেপে লোক-দেখানো দেঁতো হাসি? কাজ কি দুর্ব্বলের অহিংসার ভাণ? কাজ কি খদ্দর চাপা দিয়ে মৃতদেহের লজ্জা নিবারণের দুশ্চেষ্টা? কাজ কি সভা-সমিতি করে' গম্ভীরভাবে প্রলাপ বকা? কাজ কি বাহিরে একতার অভিনয় করে' ঘরে গিয়ে মানের কান্না? কাজ কি এই গলিত শবদেহকে পুষ্পাভরণে শোভিত করা? অগ্নির মত পাবন কেহ নয়—দাও আজ চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে—সহস্র বৎসরের অন্ধকার ভেদ করে' উঠুক চিতার আগুনের অভ্রংলিহ দীপ্ত শিখা।

"দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী
মড়ার মুখে আগুন উঠুক হাসি।"

অতীতের দুঃস্বপ্ন আজ ভুলিয়ে দাও। হাজার বৎসর ধরে' যে মিথ্যার পাষাণ আমাদের বুকে চেপে আছে, তা চূর্ণ করে' দাও। বিদ্যার আভিজাত্য, ধনের আভিজাত্য, পশুবলের আভিজাত্য ধ্বংস করে' আজ—

"জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নামকরণ।"

সিংহবাহিনী

—সিংহবাহিনি, তোমার ও-মূর্ত্তি ত বাঙ্গালী ছাড়া আর কেউ দেখেনি। বাংলাই ত শক্তিপীঠ; কিন্তু শাক্ত-বাঙ্গালী আজ কোথায়?

—যারা দিকে দিকে তোমার পূজা প্রচার করেছিল, তাদের বংশধরেরা আজ কোথায়?

—যারা দশ দিক জুড়ে' তোমারই মূর্ত্তি দেখেছিল, কোনো দিকেই যে আর তাদের ঠাঁই নেই!

—তোমার কৃপায় যারা ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার মধ্যে দেখেছিল, আজ ব্রহ্মাণ্ডে যে আপনার বলবার তাদের আর কিছুই নেই!

—যারা মৃত্যুঞ্জয়ী ও বিগতশোক হবার সাধনা করেছিল, আজ মৃত্যু তাদেকে ঘিরেছে, শোকে তারা মুহ্যমান।

—যারা মুক্তি ও সিদ্ধি চেয়েছিল, আজ তারা সর্ব্ব বিষয়ে পরপদাবনত; সর্ব্ব কর্ম্মই আজ তাদের ব্যর্থ।

—অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে যারা কোটি সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, আজ তারা নিজেরাই অন্ধকারে দিশেহারা।

—যাদের রুদ্রদৃষ্টির সম্মুখে মরণ একদিন শিউরে উঠেছিল, আজ তারা মরণের ভয়ে ভীত।

—যাদের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে সত্য একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, আজ তারা পরের মুখের শোনা কথাই সার করেছে।

—আজ বাংলায় সত্যদর্শী ব্রাহ্মণ নেই, মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষত্রিয় নেই, ঐশ্বর্য্যকামী বৈশ্য নেই; চারিদিকেই শুধু পরপদলেহী শূদ্র!

—আজ গোঁজামিল দেবার ক্ষমতার নাম বুদ্ধি; পরের কথায় সায় দেওয়ার নাম একতা; ভাব-

বিলাসিতার নাম ধর্ম্ম; শোনা-কথার ব্যবসার নাম culture; আলস্যের নাম শান্তি।

—আজ ভারবাহী গর্দ্দভের নাম উচ্চৈঃশ্রবা; দাস-সুলভ সহিষ্ণুতার নাম বীরত্ব; মূর্চ্ছার নাম সমাধি।

—আজ রোদনের নাম দয়া; বলির নাম হত্যা; দুর্ভিক্ষের নাম তিতিক্ষা।

—আজ দারিদ্র্যের নাম ত্যাগ; কারাগারের নাম স্বরাজ-আশ্রম; অক্ষমতার নাম ক্ষমা।

—আজ বচনের নাম জ্ঞান; অনশনের নাম শুদ্ধি; আত্মহারার নাম বিশ্বপ্রেমিক।

—আজ বাংলার দেবসেনার হাতে সুধু চরকা; লক্ষ্মীর হাতে সুধু তাঁত; গণেশের হাতে সুধু চাঁদার খাতা।

—বাংলার ভারতী আজ বিশ্বভারতীর মুখোস পরে' ভাঙ্গা বীণা কোলে করে' কাঁদতে বসেছে। বাংলার সুর আর সে-বীণায় বাজে না।

—ওগো সিংহবাহিনি! আজ বাংলায় কোথায় তোমার আসন? বাহন হবার উপযোগী পুরুষ-সিংহ কোথায়?

যার ভীমগর্জ্জনে অসুরের সিংহাসন টলে' উঠবে, যার বিদ্যুৎবর্ষী স্পর্শে মৃত আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, যার দিব্যপ্রভায় মোহান্ধেরও দৃষ্টি খুলবে, সে নরোত্তম কোথায়?

—ওগো সিংহবাহিনি! তোমার সেই মহাসাধক কোথায়?

বিজয়া

—মৃণ্ময়ীর পূজা শেষ হয়ে গেছে। মৃণ্ময়ীর বিসর্জ্জন শেষ হয়ে গেছে। এখন সুধু পড়ে' আছে —এই জড় দেশে জড় দেহের আলিঙ্গন; বিজয়ার নামে ছেলেখেলা।

—পরাধীন দেশে মহাশক্তির পূজা হয় না। দাসের মধ্যে চিন্ময়ীর আবির্ভাব হয় না। মৃত্যু-ভয়কাতর যারা, তাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়-সোহাগিনীর প্রকাশ অসম্ভব।

—অতীতের অনুসন্ধান না করে', ভবিষ্যতের বিচার না করে', যারা মহাশক্তির কাছে নিজের সবটুকু উৎসর্গ করে' দিতে পারে, তারাই পূজার অধিকারী। অট্টহাস্যে মৃত্যুকে লজ্জিত করে' যারা আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এ মরণোৎসব তাদেরই জন্যে।

—সে পূজার মন্ত্র আজ বাঙ্গালী ভুলে' গেছে, তাই বাংলা আজ নিরানন্দ, বাঙ্গালী আজ পরপদানত। মায়ের কোল ভুলে' গেছে, তাই আজ সে ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত। আজ আত্মবলির সাধক নেই, তাই মায়ের আবির্ভাব আর হয় না। আজ নিজের নিজের ক্ষুদ্র অহঙ্কারের গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে অন্ধকারে পড়ে' আছি, তাই বিজয়ানন্দের অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত।

—কিন্তু এমন দিন থাকবে না। মায়ের করুণার ধারা রুদ্র-মূর্ত্তির আবরণ নিয়ে আমাদের অহঙ্কারের গণ্ডী ভেদ করবেই করবে। শতবাধা সত্ত্বেও মহাশক্তির বিপুল আনন্দ আমাদের বুদ্ধি, মন, প্রাণকে অভিভূত করে' ফেলবে।

—বুদ্ধির চাঞ্চল্য আমাদের ঘুচে' যাবে, মনের আবিলতা দূর হবে, প্রাণের উদ্দামতা শান্ত হবে। সমস্ত আধার সুধু মায়ের শক্তিতে পূর্ণ হবে।

—সেই দিনের জন্যে এস আজ সবাই প্রস্তুত হই। সেই দিনের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এস আজ সবাই দেহের সঙ্গে দেহ, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, মনের সঙ্গে মন, বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধি মিলিয়ে নিজেদের একত্ব অনুভব করি।

—এস আজ ধ্যান করি যে, বাংলা দেশ সেই মায়ের কোল; বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা সেই মহা-জ্যোতিরই খণ্ড-প্রকাশ।

ঊনপঞ্চাশী

—:•:—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ঊনপঞ্চাশী

—:*:—

অবতারের মহিমা

সে দিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলাই চায়ের পেয়ালা কোলে করে' পণ্ডিত হৃষীকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে বসে' রকম-বেরকমের খোসগল্প করা যাচ্ছে, এমন সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে গোপাল দা' এসে উপস্থিত।

গোপাল দা'কে তোমার মনে আছে ত? দাদার যা' বয়স, তাকে ঠিক যৌবন বলা চলে না, কিন্তু এখনও তেমনি নধর গোল-গাল চুকচুকে চেহারা; আর দুপয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-কর্ম্মেও মতিগতি হয়েছে। বার, ব্রত, উপবাস, হাঁচি, টিকটিকি প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণের অনেকগুলিই দেখা দিয়েছে, টাকের পিছনে একটি ছোটখাট টিকিও গজিয়েছে। দাদা ফিরছেন এই পূজোর পর সস্ত্রীক গয়া দর্শন করে।

ঘরে ঢুকেই একখানা ঠ্যাং-ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বস্‌তে গিয়ে দাদা প্রায় ডিগবাজী খাব-খাব হয়েছেন, এমন সময় পণ্ডিত হৃষীকেশ চায়ের পেয়ালায় গোঁফজোড়া ডুব্‌ড়ে চোখছুটি উঁচু করে' খুব সহানুভূতিসূচক স্বরে বললেন—"দেখো, দাদা, ভাঙ্গা চেয়ারখানায় যেন বোসো না"। দাদার চোখের কোণে সাত্ত্বিক প্রকৃতির ঈষৎ বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল; কিন্তু দাদা সেটুকু সাম্‌লে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"এবার গয়ায় গিয়ে দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত। সহজে কি মোহান্ত দেখাতে চায়! অনেক কাকুতি-মিনতি করে' তবে দর্শন পেয়েছি। অবতার-পুরুষের অঙ্গ কি না—এই এত বড়! আর কি মহিমা, ভায়া! অমন হাজার হাজার লোক সেখানে পূজো মানস করে' আধিব্যাধি থেকে মুক্ত হচ্ছে।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ ততক্ষণ নিজের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে' দাদার জন্য এক পেয়ালা ঢেলে ভুল করে' নিজের মুখের দিকে তুলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বুদ্ধদেবের দাঁতের মহিমা শুনে' সেটা আবার নামিয়ে রেখে বল্‌লেন—"তা, আর হবে না! আমাদের বিটূলেরাম বাবাজী ত ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকায় লিখেই গেছেন—"হরির চেয়ে হরি-নামের বেশী মাহাত্ম্য—তা' বুদ্ধদেবের চেয়ে তাঁর দাঁতের মহিমা যে বেশী হবে, এতো জানা কথা।"

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এ রকম বক্রোক্তি শুনে গোপাল দা' একটু ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মায় যে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল, তা তাঁর অস্থি, মজ্জা, মেদ, বসা, চর্ম্ম, ফুঁড়ে বহিরঙ্গে প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতজী ফের বক্তৃতা শুরু করে' দিলেন—"শাস্ত্রে যে বলে অবতার-পুরুষেরা আত্মভোলা, গোপালদা'র কথা শুনে সে-সম্বন্ধে আজ আমার সব সন্দেহ দূর হ'য়ে গেল। আহা! দেখ একবার তামাসা! বুদ্ধদেব নিজেই সংসারের আধিব্যাধির দাওয়াই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হয়রাণ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের দাঁতের যে এত গুণ তা' যদি জান্‌তেন ত একটা-কেন, বত্রিশটাই উপ্‌ড়ে ফেলে গোপালদা'কে বখ্‌সিস দিয়ে যেতেন। বৌদিদিকে আর তা'হলে ঢোলকের মত মাদুলি ব'য়ে বেড়াতে হোতো না।"

বক্তৃতার ঝাপ্‌টা লেগে চা'টা মাঝ থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে আমিই সেটার সদ্ব্যবহার করে' নিজেকে একটু গরম করে' নিলুম। কেননা দেখ্‌লুম যে, এই শনিবারের বারবেলায় পণ্ডিতজীর জিহ্বাখানি বেশ একটু বিষিয়েছে, কাউকে-না-কাউকে না ছুব্‌লে তিনি ছাড়বেন না।"

রাগে গোপালদা'র শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে অন্ধকার বর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তক্তাপোষে একটা বিরাট চাপড় মেরে তিনি বল্লেন—"কি সর্ব্বনেশে কথা! আমি দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত, আর তুমি না বল্লেই হবে! অবতার-পুরুষদের তুমি ঠাওরেছ কি? তাঁদের মহিমা যুগযুগান্তর ধরে' থাকে।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ বক্তৃতার পর গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার জন্যে এতক্ষণ আর এক পেয়ালা

চা ঢাল্‌ছিলেন। এক চুমুক খেয়ে জিহ্বাটা বেশ একটু শানিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—"সে কথা আর বল্‌তে। মহিমার জ্বালায় হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে উঠেছে। এলেন ত্রেতাযুগে অবতার রামচন্দ্র, আর ছেড়ে দিয়ে গেলেন দেশের মধ্যে এক পাল হনুমান। গেরস্তর বাগানে কলাটা, মুলোটা, বার্ত্তাকুটা কিছুই আর থাকবার জো নেই। তারপর দ্বাপরে এলেন শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র, ঢলাঢলি রক্তারক্তি যা করে' গেলেন, তার ছাপ এখনও দেশ থেকে মোছেনি। কলিতে নাকি এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ —আর ছেড়ে দিয়ে গেছেন দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে নেড়ানেড়ী। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে বাড়ীর ভিতরে এসে—'জয় রাধে কৃষ্ট', দাও মা দুটি ভিক্ষে, দিতেই হবে;—আর এদিকে চালের দর ১২৲ টাকা। আজকাল আবার গাঁয়ে গাঁয়ে অবতার গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মে দেশময় ত্যাগধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করতে লেগে গেছেন। পুরাণো অবতারদের তবু দুটো ফুল বিল্বপত্র দিয়েই তুষ্ট করা যায়; কিন্তু এই হালফ্যাসনের অবতারদের বচনের ঠেলা সাম্‌লাতে পোড়া দেশের যে কত দিন লাগ্‌বে তা' ভগবানই জানেন।'

পণ্ডিত হৃষীকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি চা টুকু শেষ করে' দিলেন। গোপাল দা' কি-একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁর ভাবটা স্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হবার পূর্ব্বেই মা সরস্বতী পণ্ডিতজীর জিহ্বায় ভর করে' বোসলেন। তিনি উর্দ্ধবাহু হয়ে শূন্যে একটা টুস্‌কি মেরে বল্লেন—"চুলোয় যাক্ ত্যাগের কথা; ঘরে সম্পত্তির মধ্যে ত একটা বুড়ী ব্রাহ্মণী আর একটা শিংভাঙা গোরু; তা'ও আবার দু'বছর থেকে দুধ দেয় না। সেগুলো না-হয় কামিনী-কাঞ্চনের দোহাই দিয়ে ত্যাগই কল্লুম। আর এই দুর্ভিক্ষের দিনে অবতার-পুরুষদের হুকুম মত কোনো দিন বা উপবাস, কোনো দিন বা পান্তাভাত ভক্ষণ, তা'ও না-হয় চল্‌তে পারে। কিন্তু অবতারেরা যদি পাঁজি-পুঁথি দেখে একটা ভাল দিন স্থির করে' হুকুম করেন যে, আজ পাঁচ্‌টা দশ মিনিট থেকে সাতটা বাইশ মিনিট পর্য্যন্ত সবাই মিলে কাঁদ; কাল ন'টা সতের মিনিট থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সবাই মিলে গড়ের মাঠে গিয়ে ডিগবাজী খাও; তা'হলে যে পৈতৃক প্রাণটা নিতান্তই অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। এ সব দাঁত-পুজো, খড়ম-পুজো, কাঁথা-পুজোরই উল্টো পিঠ।"

কথাগুলোর মধ্যে রাজনীতির একটু বোট্‌কা গন্ধের আভাষ পেয়ে তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্যে আমি বল্‌লাম—"ও-সব সে কালে চল্‌তো, পণ্ডিতজী; আজকালকার ছেলেরা অত সহজে ঘাড় নোয়ায় না।"

পণ্ডিতজী একটু হেঁসে বল্লেন—"ঐ ত তোমাদের রোগ, ভায়া; পুরাণো বন্ধু একটু বেশ বদ্‌লে এলে আর তোমরা চিন্‌তে পার না। মানুষের ধাত কি আর অত সহজে বদ্‌লায়? ছাপান্ন পুরুষ ধরে' যারা খড়ম-পুজো কোরে এসেছে, তাদের ঘাড়গুলি কা'রো-না-কারো পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। যেমন-তেমন একটা হলেই হলো—হয় গুরুঠাকুর, নয় প্রভুপাদ, নয় মহাত্মা, নয় লিডার। ওসব এক জিনিসেরই কালভেদে ভিন্ন রূপ। এঁরাই প্রমোশন পেয়ে ক্রমশঃ অবতার হ'য়ে দাঁড়ান। তখন তাঁদের হাড়ে ভেল্কি হয়, দাঁতে রোগ সারে, চটিজুতোর শুকতলা ভিজিয়ে খেলে একবারে পরমপদ প্রাপ্তি হয়।"

চটিজুতার কথা শুনে গোপাল দাও হেসে ফেল্লেন, কিন্তু পণ্ডিতজীর তখন বক্তৃতাটা মাথায় চড়ে গেছে। তিনি বল্লেন—"না, না, দাদা, এটা হেসে ওড়াবার কথা নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এমনকি গার্হস্থ্যনীতিতে পর্য্যন্ত আমরা ঐ খড়ম পুজোকেই সার সত্য বলে' স্থির করে' ফেলেছি। ফুল বিল্বপত্র হাতে করে' বসে' আছি, যেই একটি ছোটখাট মহাপুরুষের আবির্ভাব, অমনি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে, ঢাক ঢোল কাঁশি বাজিয়ে, চামর ঢুলিয়ে, হেঁসে কেঁদে, নেচে গেয়ে এমনি একটা বীভৎস ব্যাপার করে' তুলি যে, মহাপুরুষটি যদি সাক্ষাৎ ভগবানও হন, ত তাঁর ভূত হ'য়ে যেতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না। তারপর তাঁর দাঁত, নখ, চুল নিয়ে দলাদলি আর মারামারি। তিনি ফুস কর্‌লেন কি ফাস্ কল্লেন, টুক্ কর্‌লেন, কি টাক্ কর্‌লেন—এই নিয়ে গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা। এ সব কি ধর্ম্ম রে বাপ!—এ শুধু জড়ভরতের জটলা; বক্-ধার্ম্মিক শেয়াল-কোম্পানির আধ্যাত্মিক হুক্কা-হুয়া।"

গোপাল দা এতক্ষণ চুপ করে' ভ্যাদা গঙ্গারামের মত বসে ছিলেন। এইবার পণ্ডিতজীকে থাম্‌তে দেখে একটু সাহস পেয়ে বল্লেন—"তা' বলে ত আর বাপ পিতাম'র ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়তে পারিনে।"

পণ্ডিতজী লাফিয়ে উঠে বল্লেন—"সে দোষ ত তোমার নয়, দাদা, দোষ তোমার ভগবানের। মনটা যার এখনও চার পায়ে হাঁটে, তাকে মানুষের

আকার দিয়ে তার শরীরটাকে দু'পায়ে হাঁটান— একটা অত্যাচার বই ত নয়। মনটা আমাদের খুঁজছে কোথায় কার পায়ের তলায় পড়ে' নাক রগড়াবে; তাই আমরা সব কাজেই একজন-না-একজন মুরুব্বীর দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। পরকালের ব্যবস্থা করতে হবে—ত টেনে আন দু'চারটি মহাত্মাকে না-হয় অবতারকে; দেশের স্বাধীনতা চাই ত আওড়াও মিল-বেনথামের বুলি; সমাজ গড়তে হবে ত নিয়ে এস ধার করে' বল্‌সেভিজম্, ঘরকন্না গড়তে হবে, ত ডাক রাঙ্গা ঠানদিদিকে, না হয় ত পদী পিসিকে। মোট কথা কারো-না-কারো আওতায় পড়লে তবে আমরা থাকি ভাল। আমাদের মনগুলি যে এক-একটি বোরখাঢাকা পর্দ্দানসিন বিবি। ভগবানের খোলা হাওয়া গায়ে লাগলেই তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। আমাদের মনে মনে বেশ একটা ভয় আছে যে পাঁচজন মুরুব্বী দিয়ে ভগবানের এই সৃষ্টিটাকে ঠেক্‌না দিয়ে না রাখলে সৃষ্টিটা একদিন হুড়মুড় করে' পড়ে যাবে। তাই আমাদের কথায়-কথায় পরের দোহাই, বাপ-পিতাম'র নাম করে' নিজেদের পঙ্গুত্ব লুকিয়ে রাখা। নমঃশূদ্রের জল চল্ করতে হবে, ত দেখ পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য কি বলে' গেছেন; আর পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য যে এদিকে কবে মরে ভূত হ'য়ে গেছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যাঁরা জাত মানেন, তাঁরা দোহাই দেন পুঁথির আর যাঁরা মানেন না তাঁরা দোহাই দেন ফ্রেঞ্চ রিভলিউসনের। দোহাই একটা দেওয়া চাই!! নিজের ব'লে ত আমাদের কিছু নেই। সমাজ আর ধর্ম্ম—বাপ ঠাকুরদাদার; দেশটা বিদেশীর; আর মনটা—যিনি দয়া করে দুটি পায়ের ধুলা দেন, তাঁর। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে খড়ম-পুজো আর কর্ম্মের মধ্যে পাদোদক পান। সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত, আর ইংরিজী-পড়া গ্রাজুয়েট—সবাকার ঐ এক গতি; তফাতের মধ্যে এই যে, একজন গড়াগড়ি দেন পূর্ব্বমুখ হ'য়ে আর একজন পশ্চিম মুখ হ'য়ে; একজন মন্ত্র আওড়ান সংস্কৃতে আর একজন আওড়ান ইংরিজিতে। ধর্ম্মের বেলায় সত্যপীর, আর রাজনীতির বেলায় মণ্টেগু।"

কর্ত্তৃতাটা বেশ জমে আসছে, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে পোঁ করে শাঁক বেজে উঠতেই পণ্ডিতজী থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। ও! আজ যে পূর্ণিমা! আমরা বাহিরে বসে বক্তৃতা করছি আর ব্রাহ্মণী যে ঘরের মধ্যে সত্যপীরকে সিন্নি খাওয়াচ্ছেন। তার পরেই দরজার শিকলি নেড়ে ডাক পড়ল—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্, ঠুন্ ঠুন্ ঠান। আমি একটু উস্‌খুস্ করছি দেখে পণ্ডিতজী বল্লেন, "যাও, ভায়া, সত্যপীরের কথা শোন গে। আজ তা'হলে এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

পণ্ডিতজী বেরিয়ে পড়লেন; আর আমি গোপাল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে সত্যপীরের কথা শুনতে চললুম। পুরুতঠাকুর তখন গলা ছেড়ে পড়ছেন—

"একথা শ্রবণ কালে যেবা অন্য কথা বলে
আর যেবা করে উপহাস,
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই তাহার নিষ্কৃতি নাই
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ।"

পণ্ডিত হৃষীকেশের যে হঠাৎ কি সর্ব্বনাশটাই ঘটবে, তাই ভেবে আমি শিউরে উঠতে লাগলাম।

কলের ওস্তাদী

আমাদের পাড়ায় যদু পোদ্দারের ভাইপো মার্কিন মুল্লুক থেকে কলকারখানা গড়বার ওস্তাদ হ'য়ে ফিরে এসেছে—এই কথা শোনা অবধি আমাদের শিরোমণি মশায়ের নাতিটির মুখে আর হাসি ধরে না। ছেলেটা আমার ভারি ন্যাওটো; সুবিধা পেলেই তালটা, বেলটা, কলাটা, নৈবিদ্যির মাথার সন্দেশটা বাড়ীতে না বলে আমায় এনে দেয়। ফলার ঘুসতে, ছাঁদা বাঁধতে, দক্ষিণে আদায় করতে তাকে এক-রকম অদ্বিতীয় পুরুষ বললেই হয়। পুজোর সময় মাগ্যিগণ্ডার বাজারে এবার ফলারের ধুমটা ভারি কমে গিছলো বলে' সে এতদিন মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছিলো। যদু পোদ্দারের ভাইপো একটা দুধের না কিসের মস্ত বড় কারখানা বানাবে শুনে' সে হাসতে হাসতে গড়াতে গড়াতে ফুর্ত্তির চোটে আকাশ পানে ঠ্যাং ছুড়তে আরম্ভ করে' দিল। আমি ত ছেলেটার রকম সকম দেখে বললাম—"কি রে ক্যাবলা, ক্ষেপলি নাকি—" ক্যাবলা আরও খানিকটা ঠ্যাং ছুড়ে' শেষে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—"না গো দাদা মশাই, ভারি মজা হয়েছে; সন্দেশ এবার সস্তা হবেই হবে। গয়লা বেটারা এবার খা জব্দ হবে। যদু পোদ্দারের ভাইপো এমনি একটা কল বানিয়েছে যে, তা বসাবার জন্যে তিন কোশ জমি চাই। কলের এক মুখে থাকবে পঞ্চাশ হাত লম্বা চওড়া বাঘ-মুখো একটা প্রকাণ্ড

দরজা, আর-একদিকে থাকবে গোটা ২০।২৫ মোটা নল; আর ভিতরে রকম-বেরকমের এঞ্জিন। একদিক দিয়ে তাড় করে' তুমি একপাল গরু সেই কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে' দাও; খানিক পরে দেখ্‌বে ও-মুখের নলগুলো দিয়ে বেরুচ্চে—দুধ, দই, ছানা, ঘি, মাখন, কাঁচাগোল্লা, চটিজুতো আর শিঙের শক্ত চিরুণী। কল কি সাত্মাত্তিক চিজ, দাদামশাই! ওতে হয় না এমন জিনিস নেই।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ এতক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে' থেলো হুঁকোটায় ভুড়ুক ভুড়ুক টান দিচ্ছিলেন। এইবার খুব একটা দম্‌কা টান টেনে নাক দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া বা'র করে' দিয়ে বল্লেন—"এ আর তুই বেশী কি বল্‌লি, ক্যাব্‌লা? আমাদের চোখের সামনেই ত এর চেয়ে আরও চমৎকার সব কল বসান রয়েছে। তোরা চোখ থাকতে দেখ্‌বিনে, তার আমি কি করব বল্?"

ক্যাব্‌লা ত পণ্ডিতজীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

পণ্ডিতজী বললেন—"অত বড় হাঁ করিসনে, বাপ। কথাটায় দম আটকানর মত বিশেষ-কিছু নেই। আমিত চারিদিকে ঐ রকম কল ছাড়া আর-কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আচ্ছা, এই ধর—রঘুনন্দন কোম্পানীর পেটেণ্ট ব্রহ্মচারিণী তৈরির কল। একটা বিধবা বা সধবা মেয়েকে ধরে' তার নাক চুল কেটে, গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও—দিন কতক পরে ঐ কল থেকে হয় একটা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী, নয় একটা যক্ষাকেশো ব্রহ্মচারিণী বেরিয়ে আসবেই আসবে। তার পর ধর কল নং দুই—পতিব্রতা তৈরির কল। খুব ছেলেবেলায় একটা কচি কাপড়ে-হেগো মেয়েকে ঘোমটা দিয়ে সাতপুরু মুড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও, মাঝে মাঝে কেবল এক একখানা গয়না ছুঁড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দিও—দেখ্‌বে বছর কতক পরে একটি খাসা নথ-নাকে, মিশি-দাঁতে, খাঁটা-হাতে সীতা বা সাবিত্রী তোমার ঘর উজ্জ্বল করে' দাঁড়িয়ে আছে।

"এ সব না হয় সেকেলে মিস্ত্রীর গড়ন; তা বলে আজকালের মিস্ত্রীরাও ফেলা যায় না। ঐ আমাদের গোঁফেশ্বর মিস্ত্রী এমনি কল বানিয়েছে যে, তার মধ্যে খানকত সরকারী ছাপমারা বই ভরে' দিয়ে একটা গাধা হোক্, ঘোড়া হোক্, ভেড়া হোক্, যা-হোক্ একটা তার মধ্যে পুরে' দাও, বছর কতক না যেতে যেতেই কলের ও-মুখ থেকে একটা M. Sc. B. Sc বেরিয়ে আস্‌বেই আস্‌বে। এ কি কম ওস্তাদি, বাবা!

"তারপর আমাদের টেক্‌ষ্টবুক কমিটি রায়-বাহাদুর তৈরি কর্‌বার কি কলই না বানিয়েছে! একটা ছোট ছেলেকে ধরে দীনেশ বাবুর রাজারাণীর ছবিওয়ালা বইগুলোর খানকয়েক পাতা দিয়ে তাকে মুড়ে ঐ কলের মধ্যে ফেলে দাও—একেবারে মাথায় সামলা আঁটা একটা রায় বাহাদুর, না-হয় রায় সাহেব সেখান থেকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে আস্‌বে। সাবাস জোয়ান! এমন না হলে কারিগর!!

* * *

পণ্ডিতজী আবার থেলো হুঁকোটা তুলে' নিলেন। ক্যাব্‌লা কিন্তু হাঁ করে' তাঁর মুখের পানে চেয়েই রইল।

ভবপারের নৌকা

গোপাল দাদার গুরুঠাকুর এসেছেন শুনে' পণ্ডিত হৃষীকেশের হঠাৎ কি রকম ভক্তির উদ্রেক হোলো; তিনি তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়েই এই শীতকালের সন্ধ্যেবেলা গুরুজীকে দর্শন করতে বেরিয়ে পড়্‌লেন। আমি ভাবলুম—হবেও বা, পণ্ডিতজীর বয়স ত প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হ'যে এলো; সূর্য্য ত বিলক্ষণই পশ্চিমে হেলে পড়েছে; এইবার বুঝি পণ্ডিতজীর একটু পরকালের চিন্তা এসেছে। বিশেষতঃ গোপাল দাদার গুরু এক প্রকাণ্ড সিদ্ধপুরুষ বলে' প্রসিদ্ধ, তাঁর চেলাও দশ-বিশ হাজারের কম হবে না।

প্রায় এক ঘণ্টা চুপ করে' বসে' আছি, দেখি না পণ্ডিতজী—আস্তে আস্তে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে' দিয়ে তক্তাপোষের উপর বসে' পড়লেন। মুখখানা খুব গম্ভীর বটে, কিন্তু চোখের কোণে একটু চাপা চাপা দুষ্ট হাসি।

"কি পণ্ডিতজী, এরি মধ্যে সাধু-দর্শন শেষ হ'য়ে গেল যে!"—বলে আমি হুঁকোটা পণ্ডিতজীর হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।

পণ্ডিতজী হুঁকোটা রেখে দিয়ে বল্‌লেন—"না, ভায়া, এ আর চল্‌বে না। একে ত সাধুজী ভাব-জগতের যে আধ্যাত্মিক ধোঁয়া ছেড়ে দিয়েছেন, তা'তেই আমার দম্ আটকাবার যোগাড় হয়েছে;

তার ওপর এই মায়িক, নশ্বর, পার্থিব ধোঁয়াটা এসে জুটলে আমার প্রাণে-বাঁচা দায় হবে।"

আমার একটু রাগ হোলো। সবাই বলে গোপাল দাদার গুরু মস্ত বড় সাধু; আর পণ্ডিতজী তাঁর ওপুর টিপ্পনী কাটতে ছাড়লেন না। আমি বল্লুম—"দেখ, পণ্ডিতজী, তুমি একটি বিশ্বনিন্দুক। অত বড় একজন সাধু যাঁর চরণ পেয়ে কত লোক তরে যাচ্চে, তাঁকে দেখে তোমার মন উঠল না।"

পণ্ডিতজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—"কি করব, ভায়া,—আমার কেমন পাষণ্ড-নক্ষত্রে জন্ম, খুঁৎটাই আগে চোখে পড়ে। আমি দেখতে গেলুম একটা পুরো মানুষ আর দেখে এলুম পাঁচ-সাত হাত লম্বা জটাওয়ালা এক ভুঁড়েল সাধু বাঘছালের ওপর বসে' বসে' সকলকার ভব-রোগ সারাবার পেটেণ্ট দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন। অনেক বোঝবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু এই 'ভব'টা যে একটা রোগ, এটা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না।

"আর একটা বড় মজার কথা মনে পড়ে গেল। সেকালে দময়ন্তী যখন স্বয়ম্বরা হন, তখন রাজ-সভায় দেবতারা লোভে লোভে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারও চোদ্দটা মাথা, আঠারটা ঠ্যাং, কারও বা পনেরটা নাক, ত্রিশটা পাছা—সবাই এক-একটা কেষ্ট বিষ্টু ধনুর্দ্ধর। কিন্তু দময়ন্তী সটান গিয়ে নলরাজার গলাতেই মালা দিয়ে বলেছিলেন—'আমি নারী, সুতরাং আমি নরই চাই। দেবতা নিয়ে আমার কি হবে?"

"আমার সেই কথাই মনে হ'তে লাগল—ভবপারে গিয়ে আমি করব কি? আমার এপারের যা-কিছু নিয়েই যে কারবার। এপারের তোমরা কেউ একটা ব্যবস্থা করতে পার?

সেই সেকালের বৃদ্ধ শঙ্করের আমল থেকে আজকালকার ছোটখাট গুরুর গুরু পরম গুরু পর্য্যন্ত সবাই, নৌকো নিয়ে কূলে দাঁড়িয়ে হাঁকচেন—চলে আয় ভবপারের যাত্রী, সস্তা দরে পার করে দেব। কেউ বলছেন—আমার নৌকোর গেরুয়া নিশান একেবারে পরম ধামের মুক্তি ঘাটায় গিয়ে লাগবে; নৌকায় বোস, হালুয়া পুরির অভাব হবে না। কেউ বা বলছেন—আমার নৌকায় গাব মাখান হয়েছে। জল ঢোকবার কোন ভয় নেই। ঝড় লেগে তুফান লেগে যদি নৌকা এক পেশে হয় তবে আমাদের নাচন কোঁদনের ভরেই নৌকা সামলে উঠবে। ঐ বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক, তার উপরে শব্দ-ব্রহ্মের ঢোলোক যেখানে বাজছে, আমার নৌকা বদর বদর বলতে বলতে একেবারে তোমাদের সেইখানে পৌঁছে দেবে।—বাপ, জগৎটা যে দুঃখময়, তা পারে যাবার যাত্রীদের এই জগৎ থেকে সরে পড়বার জন্ত ঠেলাঠেলি দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায়।

পণ্ডিতজীর মুখখানা যখন খুলে যায়, তখন লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না। এক নিঃশ্বাসে সব মহাপুরুষদের মুণ্ডপাত করতে দেখে আমি বল্লুম—"তোমার দুঃসাহস ত কম নয়। তুমিই শুধু ঠিক বুঝেছ, আর সবারই ভুল?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"চটে যেয়ো না দাদা; বড় বড় নামের বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমায় চেপে মেরে কোন লাভ নেই। নিউটন মাথা ঘামিয়ে বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই বার করে' গিয়েছিলেন; কিন্তু আজ কালের কলেজের ছেলেরাও তাঁর চেয়ে বেশী জিনিস জানে। তা দিয়ে কি প্রমাণ হয় যে, ঐ সব ছেলেরা নিউটনের চেয়ে বুদ্ধিমান? শুধু এই টুকুই বোঝা যায় যে, মানুষের জ্ঞানের মাত্রা বেড়ে চলেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। আগেকার মহাপুরুষেরা যে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেইটেই চরম সত্য, বা একমাত্র সত্য, এ কথা না মানলে আর তাদের পন্থা ভিন্ন অন্ত পন্থা খুঁজলে যদি তাদের অপমান করা হয়, ত আমি নাচার। তাঁরা ভবপারে যাবার রাস্তা বাৎলে গেছেন—বেশ কথা। গোলোকের উপর ঢোলকই থাক আর নোলকই থাক, সে সংবাদে আমার দুঃখ ঘুচবে না। সেই যে সেদিন গুপে বাগদীর ছেলেটাকে জমিদারের কাছারিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম মারলে, তার চীৎকারেই আমার কান ভরে আছে, সেখানে শব্দ-ব্রহ্মের ঢোলকের আওয়াজ একেবারেই ঢুকছে না। আমি এ-পারের মাটি কামড়েই পড়ে' থাকবো, এইখানেই গু ঘাঁটব। আমার দুঃখে যদি কোন দেবতার প্রাণ কাঁদে ত তাঁকে গোলোক ছেড়ে আমার কাছে আসতে হবে। ও-পারে গিয়ে কি রকম চুশ মজা লুটবো, তার লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাকে ভোলালে চলবে না। স্বর্গের দেবতা যদি স্বর্গেই থেকে যান, মর্ত্তে যদি তাঁর পা না পড়ে, ত সে দেবতার কাছে মাথা খুঁড়ে আমার কোন লাভ নেই। সবাই যদি এখানে থেকে মরে, ত আমি একলা পালিয়ে গিয়ে বেঁচে কি করব?

মহাপুরুষদের নিয়ে এই রকম খোঁচাখুঁচি দেখে আমার প্রাণটা আঁৎকে উঠছিল। আমি বল্লাম

"পণ্ডিতজী, অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ভগবানের বিষয় নিয়ে এ রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ কি ভাল?"

পণ্ডিতজী হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লেন—ও, তাই বটে! ঐটে হজম করতে বেগ পেতে হচ্চে। তা, দেখ, ভগবানের একটি নাম রসনাথ। তিনি যে sunday schoolএর হেডমাষ্টারের মত খুব একজন গম্ভীর পুরুষ, একথা আমার অদৌ মনে হয় না। তাঁরা ভগবানকে নিয়ে পুঁটলি বেঁধে ভব-পারের পেটেণ্ট পিল তৈরি করেন, তাঁদের ব্যবসার হানি হতে পারে বটে—কিন্তু ভগবান যদি নিতান্ত বেরসিক না হন, তা হলে ঐ জন্যে আমার উপর চটে যাবেন বলে ত মনে হয় না। আর মহাপুরুষদের কথা যদি তুললে ত বলি—সত্যের ভাঁড়ার যদি তাঁরা ওজাড় করে গিয়ে থাকেন, আর আমাদের পক্ষে তাঁদের এঁটো কাঁটা দু-এক দানা খুঁটে খাওয়া ভিন্ন যদি উপায়ান্তর না থাকে, তা'হলে এই দুনিয়ার কলে চাবি বন্ধ করে দিয়ে ভগবানের এই সৃষ্টির ব্যবসা তুলে দেওয়াই উচিত।

আমি বললুম—একবার ভবনদীর ওপারে গিয়ে সেইজন্যে একখানা দরখাস্ত না হয় ভগবানের দরবারে পেশ করে আসি।

পণ্ডিতজী ঘাড় নেড়ে বললেন—ওরে গাধা, ওরে আদার ব্যাপারী—দরখাস্ত পেশ করবার জন্যে এবার আর তোকে ডিঙ্গিচড়ে ওপারে যেতে হবে না। এবার ভরা ভাদরের বান ডেকে এপার ওপার সব একাকার করে দিয়ে যাবে। গুরুগিরির ব্যবসাটা এবার আর টিকিবে না।

ছিরিচরণের ছুঁচো

সেদিন সকালবেলা চা খাবার পর পণ্ডিতজীর একটু খোসমেজাজ দেখে একবার এগিয়ে দুবার পিছিয়ে, শেষে একটু গলা খেঁকারি দিয়ে দুঃসাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করলেম—আচ্ছা পণ্ডিতজী, যদি রাগ না করেন, ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি গুরু ঠাকুরদের পিছনে অত লেগেছেন কেন?

আমি আরও এক কাপ চা ঢালছি দেখে পণ্ডিতজীর ভালতোবড়া মুখখানিতে একটু হাসির আভাষ ফুটে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন—রাগ কেন করব ভাই; রাগ আমার শরীরে নেই বললেই হয়। যা দেখতে পাও, ওটা রাগের আকার, ওতে মানসিক বিকারের গন্ধমাত্র নেই। দুর্ব্বাসা ঋষি মরার সময় আমার প্র-পরা-অপ-সম-নি-পিতামহকে যে আশীর্ব্বাদ করে গিছলেন, তারই যা-কিছু ছিটে-ফোটা পড়ে আছে। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।

চায়ের কাপটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে খুব আদরে-ভরা একটা চুমুক দিয়ে পণ্ডিতজী বলতে লাগ্‌লেন—দেখ, এই গুরু গিরির কথা যদি জিজ্ঞেস করলে, ত ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি।

জান ত, ডাক্তারেরা একটা জন্তু জানোয়ারের এক আধখানা হাড়ের টুকরো পেলেই তা দেখে বলে দিতে পারেন যে, জন্তুটা ক' হাত লম্বা, ক' হাত চওড়া, তার কটা ঠ্যাং, সে কি খায় ইত্যাদি. আমিও তেমনি অনেককেলে ওস্তাদ কিনা তাই কোন একটা সমাজের আধ-টুকরা অনুষ্ঠান দেখলেই তাদের চাষা-ভুষো থেকে আরম্ভ করে রাজারাজড়ার পর্য্যন্ত হাঁড়ির খবর বলে দিতে পারি। ঐ যে সেদিন দেখ্‌লুম গঙ্গার ধারে নেড়া বটগাছের তলায় জটা-জুটওয়ালা বাবাজীটি ছাই মেখে বসে' বসে' গাঁজায় দম মারছেন আর গুপে বাগ্‌দীর ছেলে থেকে আরম্ভ করে' পেন্সেন-প্রাপ্ত সব-ডেপুটী পর্য্যন্ত মাদুলী ভরে' ভরে' তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে যাচ্চে—এই থেকে যদি বল, ত আমি এদেশের সমাজতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, রাজতত্ত্ব, সব নিখুঁত করে' তোমার সামনে কষে দিতে পারি।"

পণ্ডিতজীর কথা শুনতে শুনতে গোপালদাদার হাঁ-টা ক্রমে আকর্ণ বিস্তৃত হবার যোগাড় হচ্ছে দেখে, পণ্ডিতজী চায়ের কাপটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—"গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও ভায়া; কাণে শুনে কথাগুলো বোঝবার সুবিধে না হয়, মুখ দিয়ে শোনা ছাড়া আর উপায় কি? তা, মুখ দিয়েই শোন; আর একটু চিবিয়ে বুঝো, তা'হলে নিতান্ত গুরুপাক না'ও হতে পারে।

গোপাল দা নির্ব্বিবাদে চাটুকু গিলে ফেলে পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"তার পর?"

—"তারপর আর কি! গুপে বাগদীর ছেলেটাকে হাসতে হাসতে ফিরে যেতে দেখে আমার মনে হোলো—নিজের বিদ্যেটা ঠিক কি না একবার পরীক্ষা করে' দেখি। ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞেসা করলুম—"হাঁরে থ্যাদা, আজ এখনি যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-ভগবান একেবারে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ধরা চুড়ো পরে ঐ আকাশ ফুঁড়ে তোর

সাম্‌নে ঝুপ করে' নেমে এসে তোকে বলে—খ্যাঁদা, বর নে—তাহোলে তুই কি চাস ?"

খ্যাঁদা রাঙা রাঙা দাঁত বার করে' এক গাল হেঁসে ফেলে বললে—"এঁজ্ঞে বাবাঠাকুর, আমরা শুদ্দুর ক্ষুদ্দুর মানুষ, আমাদের কি সে ভাগ্যি হবার জো আছে ?"

—'ধর যদি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েই যায় ?'—

খ্যাঁদা আমতা আমতা কর্‌তে কর্‌তে মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"এজ্ঞে, আমি তা'হলে বলি, দেবতা, আমি যেন মরে বৈকুণ্ঠে গিয়ে আপনার ছিরিচরণের আশে পাশে ছুঁচো হ'য়ে কিচ্‌মিচ করে' বেড়াই।"—

সেদিন জমিদারের নূতন নায়েবটা যখন গুপে বাগদীর ছেলেকে ধরে বাকি খাজনা আদায়ের জন্য মার্‌তে মার্‌তে একেবারে লম্বা করে' ছেড়ে দিলে, আর ছোঁড়াটা শুধু নায়েবের হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি কর্‌তে লাগলে, তখন আমার চোখে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশ, এক-তরফা রকমের বলে মনে হয়েছিল।

আর তার পরদিন তার গায়ের ব্যাথা মর্‌তে-না-মর্‌তে যখন দেখলুম যে, সে ঐ বট-তলার গঞ্জিকানন্দ বাবাজীর পায়ের তলায় চৌদ্দপোয়া হয়ে পড়ে' মাদুলী ভরে' পদধূলি সংগ্রহ করছে, তখন বেশ দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম যে, তার মনটা অনেক দিন থেকে লম্বা হয়ে' পড়ে' আছে বলেই সেদিন নায়েবের পায়ের কাছে তার শরীরটা অত শিগগির লম্বা হ'য়ে পড়েছিলো। তোমরা ভাবছ তিন বৎসর অন্তর লাটসভার সভ্য গড়বার জন্যে ভোট দিতে পেলেই তারা স্বাধীন হ'য়ে উঠবে। হায় রে পোড়া কপাল! মাথায় যার সাপে কামড়েছে, তার পায়ের আঙ্গুলে বিষ-পাথর লাগালে কি হবে।

পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনে আমারও একটু ভাবনা হ'য়ে গেল। গোপাল দা'ও একটু উস্‌খুস্ কর্‌তে কর্‌তে জিজ্ঞেসা কর্‌লেন—"তাইত! তা'হলে উপায় ?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"উপায় আর কি! ভগবানের খোলা হাওয়া লোকগুলোর মনে একটু লাগতে দাও; তাতে আধ্যাত্মিক সর্দ্দি, কাশি হবার কোনোই ভয় নেই। আর তোমার পেশাদার গুরু-ঠাকুরদের বলো একটু আওতা ছেড়ে দাঁড়াতে।"

স্বদেশী সেপাই

সেদিন রাজনীতির বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে গোটা দুই বেফাঁস কথা পণ্ডিত হৃষীকেশের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বলে' আমাদের রায়-বাহাদুর পার্ব্বতী দাদার বড় ছেলেটা আজ তাঁকে এসে পাকড়াও করেছে। আন্দোলনের জোরে ভারত স্বাধীন হবে শুনে কেন তিনি হেসেছিলেন, এ কৈফিয়ৎ আজ তাঁকে দিতেই হবে!

এবার কংগ্রেসের পর কলকাতা থেকে কলেজ বয়কট করে' ফিরে আসা অবধি ছেলেটি ভীষণ-রকমের স্বদেশী হয়ে উঠেছে। তার বুটের ফিতে থেকে আরম্ভ করে গলার নেক্-টাই, আর মাথার হ্যাটটী পর্য্যন্ত একেবারে ষোল আনা স্বদেশী কোম্পানীর তৈরী! গ্রামে এসে সে একটা "জাতীয় ইস্কুল" খুলবে বলে' চাঁদার খাতাও খুলেছিল; তবে চিফ-সেক্রেটারির কাছ থেকে তার বাপের নামে একখানা লম্বা-চাওড়া চিঠি আসবার পর সেটা ধামা-চাপা পড়ে গেছে।

একে ত রায়-বাহাদুর একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার; তাঁর জমিদারীর শুধু বাজে আদায়ই হবে ৫।৭ হাজার; আর সেই সেদিন পুন্যার নজর দিতে দেরী হয়েছিল বলে তাঁর কাছারীতে গুপে বাগ্‌দীর ছেলেটা মার খেয়ে এখনও নেংচে বেড়াচ্চে; আর তারপর—গোদের উপর বিষফোড়া—তাঁর দৌহিত্রীর সঙ্গে আমাদের পুলিশ সুপারিন্-টেনডেন্টের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—আর এ দিকে তাঁর ছেলেটি পুরোদস্তর স্বদেশী সেপাই; পাড়ার ছেলেগুলো ইস্কুলে গেলেই তাদের ঠ্যাং খোঁড়া করে' দেবে বলে সে শাসিয়ে বেড়াচ্চে। বাপ বেটার এই দুই জাঁতা-কলের মধ্যে পড়ে' চাষা-ভূষোরা একেবারে পিষে যাবার যোগাড় হয়েছে।

পণ্ডিতজী ছেলেটার মুখখানির দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন—"দেখ, বাবা, অনেক দিন আগে—সেকালের স্বদেশী যুগেরও আগে—একবার পাড়াগাঁ অঞ্চলে ভারত-উদ্ধার প্রচার করতে গিয়েছিলুম। একটু চালাক চটপটে রকমের এক চাষাকে ধরে' প্রায় দেড় ঘণ্টা আন্দাজ বক্তৃতা ঝেড়ে যখন মনে হ'ল, তাকে কাৎ করে' এনেছি, তখন সে অতি বিনীত ভাবে যোড়হাত করে' আমায় বল্লে—'আমার একটি নিবেদন আছে।'

"আমি এই গরুড়ের মত ভক্তটি পেয়ে বিষম উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম—'কি, কি ?'

"সে বল্লে—'দেখুন, আপনাদের হাতে দেশ স্বাধীন হবার ২।৪ ঘণ্টা আগে আমায় একটু খবর দেবেন; আমি সপরিবারে বিষ খেয়ে মরে থাক্‌ব।'

তখন লোকটার কথা শুনে আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তোমাদের দেখে-শুনে মনে হয় যে, লোকটার কথা একেবারে বাজে নাও হতে পারে।"

আমাদের স্বদেশী সেপাইটি বললেন—"আমি থাকলে তাকে চাবকে সোজা করে' দিতুম।"

পণ্ডিতজী বললেন—"বাবা, চাবকানি অনেক দেখেছি; কিন্তু চাবুকের চোটে লোককে বেঁকে পড়তেই দেখেচি; একটাকেও সোজা হতে দেখিনি। তোমার দাদা-মশায় চাবুকের চোটে জমিদারীর আয় বিলক্ষণ বাড়িয়ে গেলেন, তোমার বাবাও শাস্ত্র-চর্চ্চার অবসরে যথেষ্ট চাবুক-চর্চ্চা করেন—আর ভবিষ্যতে সুবিধা পেলে তুমিও তা কর্‌বে—কিন্তু সোজা কটাকে করেছ?"

ঐ বেতালা কথা কওয়া পণ্ডিতজীর কেমন রোগ। পাছে কথাটা রায়বাহাদুরের কাণে ওঠে, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম—"তা, ছেলেরা যা কর্‌ছে, সে ত ভালর জন্যেই কর্‌ছে। দেশটা স্বাধীন হ'লে গৌরবের ভাগীদার ত চাষাভুষোরাও হবে।"

পণ্ডিতজী আমার দিকে একটা এমনি বিতিকিচ্ছি রকমের চাউনি চাইলেন, যা তাঁর চোখেও বড়-একটা দেখিনি। তিনি একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"দেখ, তোমাদের ঐ ন্যাকামি শুন্‌তে শুন্‌তে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে। তোমরা কথায় কথায় বল—'আহা দেশটা যদি আমাদের কথায় সাড়া দিত ত এতদিন আমরা কেষ্ট বিষ্টু হয়ে যেতুম। ছাপান্ন পুরুষ ধরে যাদের গলায় এক পা আর পেটে এক পা দিয়ে চেপে রেখেছ—আজ টিকি ধরে হেঁচকা টান মারছ বলে কি তোমাদের ফরমাইস মত তারা নেচে উঠবে? ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে যাদের পরাধীন করে রেখেছ, যাদের ছুঁলে তোমাদের নাইতে হয়, যাদের বেগার খাটিয়ে তোমরা নবাবী কর, আজ তাদের স্বাধীনতার কথা বোঝাতে গিয়ে নিতান্তই বেহায়া না হলে তোমরা লজ্জায় মরে যেতে। মানুষের মনের আধখানা পরাধীন রেখে বাকি আধখানাকে স্বাধীন করে দেবে?—বলিহারী তোমাদের বুদ্ধি হে। তোমার রাজনীতির চর্চ্চা করবে কে?—যারা করবে, তাদের যে মেরে রেখেছ। এ জাত যদি কখনো বেঁচে উঠে লড়ে, ত আগে লড়বে তোমাদের সঙ্গে।

আমি দেখলাম, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে ক্রমে সাপ বেরিয়ে পড়্‌বার জোগাড় হচ্চে। তাড়াতাড়ি পণ্ডিতজীর মুখ বন্ধ কর্‌বার জন্যে এক কাপ চা তৈরি করে বললাম—"থাক, এদিকে চাটা যে জুড়িয়ে গেলো।"

পণ্ডিতজীর কাছে থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের রায়বাহাদুরের ছেলে ওরফে স্বদেশী সেপাই মুখখানা বেজায় গম্ভীর করে' বললে—"আপনি বলেন কি, আমরা দেশটাকে এত করে বল্‌ছি আমাদের সঙ্গে উঠ্‌তে—আর দেশটা উঠ্‌বে না?"

পণ্ডিতজী হোঃ হোঃ করে' হেসে উঠে বল্লেন—উঠ্‌বে বৈ কি। দেশের যদি একটু লজ্জা সরম থাকে, ত তোমরা পাঁচজন ইয়ার-বন্ধু মিলে, দুবার "Arise awake" বলে তুড়ী মেরে ডাকলেই তোমাদের জননী ভারতবর্ষ একেবারে হুড়্‌মুড়্‌ করে লাফিয়ে উঠবে। আর তাও বলি, বেটীরই কেমন আক্কেল। সেই যে হাজার বছর ধ'রে ঘাড়মুড় ভেঙ্গে পড়ে আছে, আর উঠবার নামটি নেই। রাণা সঙ্গ ডেকে খুন হয়ে গেল—বেটীর মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটল না। শিবাজী, গুরু গোবিন্দ, মায়ের অনেক আদরের ছেলে—তাদের ডাকে বুড়ী একবার চোখ চাইতে না চাইতে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। তাঁরা কেউ বা ডেকেছিলেন—হিন্দীতে, কেউ বা ডেকেছিলেন মারাঠিতে; সে ডাক হয়ত মায়ের মনে ধরেনি। এইবার তোমরা সব স্বদেশী কাপ্তেন মিলে গোলদীঘির পাড় থেকে ইংরেজী ডাক ডাক্‌লে হয়ত বেটী ভয়ে ডরে উঠতে পারে। তা বেয়ে চেয়ে দেখ একবার।"

স্বদেশী সেপাই একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললে—দেখি দু-এক বছর নেড়ে চেড়ে। দেশটা উঠল ত উঠল, আর তা না হয় ত বাবার জমিদারীটা ত আর কোথাও যায়নি।

পণ্ডিতজী বললেন—এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের কথা বলেছ। দেশে এরকম বুদ্ধিমানের দল যে রকম প্রবল বেগে বেড়ে উঠছে, তাতে দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। নেপালে বেড়াতে গিয়েও সাধুদের মহলেও একবার এ রকম একটি বুদ্ধিমান দেখেছিলুম। সেবার ভারি শীত পড়েছে। একে নেপালী শীত, মাটির উপর হাতখানেক বরফ জমে গেছে, তার উপর ভুরি ভোজনের ব্যবস্থাটাও বড় সুবিধে রকমের হচ্ছিল

না, তাই আমরা ধরমশালার এক কোণে আগুন জ্বালিয়ে একেবারে টুপভুজঙ্গ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় বেঁটে খেটে জোয়ান গোছের এক সাধু পুরুষ দরজার কাছে উকি মেরে বল্লেন—ওঁ।

আমরা তাড়াতাড়ি 'নমো নারায়ণ' বলে অভিবাদন করে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি চক্ষু বুজে বল্লেন—ওঁ।

সব কথার উত্তরেই সাধু ওঙ্কার ধ্বনি করেন দেখে আমার ত ভ্যাবাচাকা লেগে যাবার যোগার হয়ে পড়েছিল, এমন সময় আমার এক বন্ধু বললেন —আরে হাঁ করে দেখছিস কি? এটা আর্ বুঝতে পারছিস্ নে যে, বৈরাগ্য আর শীতের চোটে সাধুজীর মনটা একেবারে ত্রিকুটে লয় হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। বেশ এক বাটী গরম চা কর দেখি; আর খানকতক মোটা মোটা রুটী বানিয়ে তার সঙ্গে ঐ কুমড়োটা কেটে খানিকটা ছক্কা করে দে। একবার দেখি চেষ্টা করে সাধুজীর মনটা যদি নেমে আসে। শাস্ত্রে বলে কুমড়োর মত এমন বৈরাগ্যনাশন দাওয়াই মেলাই মুস্কিল। তাড়াতাড়ি একবাটি গরম চা করে সাধুজীর মুখের কাছে ধরতেই সাধুজী সেটুকু জঠর-নিহিত ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়ে আনন্দে দন্ত বিকশিত করে বল্লেন—ওঁ।

কুমড়োর ছক্কা দিয়ে দিস্তে খানেক রুটি খাবার পর সাধুজী ওঙ্কারলোক থেকে পার্থিব লোকে নেমে এসে আমার বন্ধুটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেল্‌লেন। তখন সাধুজীর এই পাঞ্চভৌতিক খোলসটি কোন্ কুল উজ্জ্বল করেছে, খোলসের মালিক সম্বন্ধের কোনখানে কে আছে, এই সম্বন্ধে সদালাপ আরম্ভ হল। ঘণ্টা খানেক পায়তারা কস্‌বার পর, সাধুজীর মনটা যখন দু-তিনবাটি চায়ে গলে একেবারে থসথসে হয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন—দেখ, গত বৎসর ধানটান কাটার পর প্রায় শ'খানেক টাকা হাতে পেয়েছিলুল; তা একটী বিয়ে করতেই সব খরচ হয়ে গেল। আর মেয়েটি ছোটি, বয়স বছর ১২।১৩; আমি ভাবলুম দূর ছাই আর কাজ নেই, ঘরে থাকলেই খরচ, তাই এক সাধুর কাছে ভেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তা দেখি দু-চার বছর, ব্রহ্ম মিল্‌ল ত ভাল, না হয় ঘর ত আছেই।

পণ্ডিতজী হেসে বল্লেন—দেখলে, ব্রহ্মচিন্তা করুলে কি হয়, হিসেব বোধটি ঠিক আছে! তোমাদের দেশচিন্তাও ঐ রকম।

—:—

ধর্ম্মের ব্যবসা

মাস গেলে আমার অন্তত: দুটিমণ চালের দরকার—অথচ আজ এই বারই তারিখে সকাল বেলা আটটা না বাজতে বাজতে বাক্স খুলে দেখি আমার নগদ পুঁজি সাত টাকা সাড়ে ছ' আনা। সংসারটা যে একটা অত্যন্ত খারাপ জায়গা—আমার মত নিষ্ক্রিয় পুরুষের উপযুক্ত স্থান একেবারেই নয়—শাঙ্করভাষ্য না পড়েই বুঝতে পারলুম। সেকালে নিত্যানন্দ গোঁসাই অবধূত মার্গ ছেড়ে যে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ ব্যাপারটা খুঁজে খুঁজে আমি চৈতন্যচরিতামৃত ঘেঁটে ঘেঁটে হায়রাণ হয়ে গেছি—আজ বেশ দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম তার আর যে কারণ থাক আর না থাক, সে কালে চাল যে সস্তা ছিল, এটা নিশ্চয়ই তার একটা প্রধান কারণ। বৈরাগ্যটা মনের এক কোণে জমাট হয়ে আসছিল, এমন কি গুনগুন্ করে—কিমত্র হেয়ং ইত্যাদি শ্লোক আওড়াতে আরম্ভ করছিলুম, এখন সময় পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, সেই হেয় জীবটি চায়ের বাটিটি হাতে করে বলছেন—নাও, চা খেয়ে নিয়ে একবার ওঠ দেখি; ঘরে চাল যে বাড়ন্ত।

এটা ত জানা কথা—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। এ পোড়া চাল না খেলেই নয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, কে-একজন মহা-পুরুষ তাঁর আশ্রমে ছেলেদের ভাতের বদলে কচু খেতে দেন। ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে কচুতত্ত্বের নিশ্চয়ই নব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ভাতের বদলে কচুটা চালাতে পারলে এই অন্নসমস্যার দিনে আমাদের ইহকাল পরকাল দুই রক্ষা হয়। গিন্নি কচুর মহিমা একেবারেই বুঝতে পারলেন না; আমাকে একটা পুড়িয়ে খেতে দিতে রাজী হলেন মাত্র। এমন বুদ্ধি না হলে আর শাস্ত্র ওদের বেদ পড়াতে নিষেধ করবেন কেন?

যাই হোক, ইহকাল পরকালের সমন্বয় কি করে' করা যায়, এ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময় খেলো হুঁকোটী হাতে করে' বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে দিতে পণ্ডিত হৃষীকেশ এসে হাজির।—"কি ভায়া, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে টিকটিকির ল্যাজনাড়া দেখতে দেখতে কি জ্ঞান সঞ্চার করা হচ্ছে?" আমি বল্লাম—"পণ্ডিতজী, মহা মুস্কিলে পড়েছি। সাত টাকা সাড়ে ছ' আনা পুঁজি নিয়ে ত আর সস্ত্রীক সংসারধর্ম্ম করা চলে না। আর গিন্নির কেমন বদ্ অভ্যাস—পৌনঃ-

পুনিক দশমিকের মত বছর বছর বংশবৃদ্ধি করেই চলেছেন। এ পরাধীন দেশে ও-কার্য্যটা যে একটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে মহাত্মাদের মতামত সব শুনিয়ে দিলুম, তা বোঝবার নামটি নেই। মাষ্টারী করে' ত আর চলে না; ছোঁড়াগুলো বলে ব্যবসা কর। আরে, বিনা মূলধনে এখন কি ব্যবসা চালাই?"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"এটা আর মাথায় এলো না! এ ধর্ম্মের দেশে আব কি ব্যবসা?—ধর্ম্মের ব্যবসা চালাও!"

আমাকে হাঁ করে' তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে পণ্ডিতজী বললেন—"এতে মাথা-ঘামাবার তো কিছু নেই। এই দু' বছর আগে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখি এক বাবাজী একটী নোড়াতে সিঁদুর মাখিয়ে অশথতলায় বসে' আছেন। তার পরের বৎসর গিয়ে দেখি সেখানে বেশ একখানি চালাঘর উঠেছে; নোড়াটি একখানি চৌকির উপর বসেছেন, আর মেয়েরা গঙ্গাস্নান করে' পুণ্যসঞ্চয় করে' বাড়ী ফের্‌বার সময় নোড়াটিকে এক এক পয়সা প্রণামী দিয়ে পরকালের ব্যবস্থা করছেন। এবারে যদি যাই ত নিশ্চয় দেখতে পাব যে, চালাঘরখানি কোটা হ'য়ে গেছে; আর নোড়ারাম বাবাজী রূপার সিংহাসনে বসে' মৃদুমন্দ হাস্য করে' বন্ধ্যাদের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন। বিনা মূলধনে এমন খাঁটি স্বদেশী ব্যবসা থাকতে তোমরা কেন যে ভেবে মর, তা'ত আমি বুঝতে পারি নে! এই একটা সোজা হিসেব করে' দেখ না, আমাদের দেশের যত রকম রোগ তত রকম দেবতা। জ্বরের জন্যে জ্বরাসুর আছেন, সাপে কামড়ানর জন্যে মা মনসা আছেন, বসন্তের জন্যে মুখে ডাইমন কাটা শীতলা বুড়ি আছেন, ছেলেদের মাথাখাবার জন্যে বাবা পঞ্চানন্দ ওরফে পেঁচো আছেন, কলেরার জন্যে মা ওলাবিবিরও আমদানী হয়েছে—বাকি আছে শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা আর প্লেগ। আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জার যে রকম ধূম তাতে একটা কাঠের বিতিকিচ্ছি রকমের মূর্ত্তি গড়িয়ে তার মুখে খানিকটা তেল, কালি আর সিঁদুর মাখিয়ে নাকে গোটা দুই পোঁটা ঝুলিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বস্‌তে পার, তা হলে দু মাসের মধ্যে যদি তোমার দোতালা বাড়ী না ওঠে, আর নাদুস নুদুস ভুঁড়ি না নামে তো আমার নাক কেটে দিও। এমন কি, গিন্নি যদি বছর অন্তর ছেড়ে ছ মাস অন্তর তোমার বংশ বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করেন, তা হলেও খাওয়াপরার ভাবনা হবে না।'

আমি পণ্ডিতজীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললুম—"মহারাজ, কলিযুগে তুমিই ধন্য। ভোগ মোক্ষের সমন্বয় একা তুমিই করেছ।"

নিরামিষ লড়াই

সেদিন দুপুরবেলা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবান একটু শুয়েছেন, মা লক্ষ্মী ঠাকুরের পাতের পরমান্নটুকু খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে পান চিবুতে চিবুতে ঠাকুরের পদসেবা করতে বস্‌বার জোগাড় করছেন, গরুড় পাখা দুখানি নেড়ে নেড়ে ঠাকুরকে একটু হাওয়া করে' ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় নারদ ঋষি এসে খবর দিলেন যে, স্বর্গ থেকে দেবতাদের একটা ডেপুটেশন এসে হাজির। লক্ষ্মী ঠাকরুণ পৌষ মাসের দিন নানা রকমের পিঠে পুলি করে' খাইয়েছিলেন বলে' ঠাকুরের ভোজনটা একটু গুরুতর রকমেই হয়েছিল। এই অসময়ে বেরসিক দেবতাদের ডেপুটেশনের কথা শুনে তিনি কপট নিদ্রায় চক্ষু বুজে ম্যা' য়্যো করতে করতে লেপখানি টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ী দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। নারদ ত একটি বাস্তু ঘুঘু। তিনি বেশ বুঝলেন যে, দেবতাদের কপালে আজ বিলক্ষণ দুঃখ আছে; তবে সে কথা ত আর দেবতাদের সামনে মুখফুটে বলা চলে না! যে রকম দেশ-কাল পড়েছে তাতে দেবতারা হয়ত চোটে গিয়ে স্বর্গে একটা গণতন্ত্র ঘোষণা করে' বসবেন। তিনি দেবতাদের কাছে ফিরে এসে গভীর সহানুভূতিসূচক স্বরে বললেন—আপনারা আপনাদের অভাব অভিযোগগুলো লিখে একখানা দরখাস্ত ঠাকুরের দরবারে পেশ করুন; আমি ঠাকুরকে সব কথা বুঝিয়ে বলে' দেব।

দেবতারা তখন বৈকুণ্ঠের উঠানে এক সভা আহ্বান করলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতিকে সভাপতি করা হলো। ভীম গর্জ্জন করতে করতে বায়ু দেবতা তখন প্রথম প্রস্তাব আরম্ভ করলেন,—

"যেহেতু পিতামহ ব্রহ্মা গত রাত্রে নিদ্রা যাবার পর থেকে (বলা বাহুল্য ব্রহ্মার এক দিন নর-লোকের হাজার বৎসর) স্বর্গে অসুর দলের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, এবং যেহেতু বুড়ো বয়সে অহিফেন

যেহেতু প্রসাদাৎ ব্রহ্মার নিদ্রার মাত্রাটা বেড়েই চলেছে, আর সৃষ্টিরক্ষার কাজকর্ম দেখা-শুনা তাঁর দ্বারা হয়ে উঠে না, সেহেতু এই দেবসভা প্রস্তাব করছেন যে, বুড়োর আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে অসুরদের রাজপাট অচল করবার জন্য তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করা হোক।"

বরুণ এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে দেবতার দুঃখ বর্ণনা করতে করতে কেঁদে সভাস্থল ভাসিয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগলেন—"অসুররা যে রকম ব্যাদড়ামি আরম্ভ করেছে, তাতে আমরা অমর যদি না হতুম ত এতদিন আমাদের দেবত্ব ঘুচে' প্রেতত্ব প্রাপ্তি ঘট্‌ত। বলেন কি মশয়, একটু মুখ খুলে কথা কইবার জো নেই—অমনি জেলে পুরে দেয়; দেবলোকের টাউন-হলে একটা মিটিং করতে গেলে লাঠির গুঁতোয় তা ভেঙ্গে দেয়। রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে শোবার জো নেই, ফিস ফিস করে' গিন্নির সঙ্গে কথা কইলেই বলে 'কন্‌স্পিরেসি' করছ। এ সম্বন্ধে আবেদন নিবেদন অনেক করা সত্ত্বেও যখন আটটি রম্ভা ছাড়া আর বেশী কিছু পাওয়া যায় নি, তখন দুঃখের সহিত অসুর বাবুদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আর আমাদের পোষাচ্ছে না। এতে তাঁদের গুঁতোর চোটে আমাদের প্রাণ যায়—ত কি আর করব, না হয় ভিক্ষে মেগে খাব।"

অগ্নি তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠে তাঁর সপ্তজিহ্বা লক্ লক্ করতে করতে বলে উঠলেন—"দাসত্বের রজ্জু আমাদের জ্বালিয়ে দিতেই হবে। দুর্ভিক্ষই হোক আর মহামারীই হোক, ম্যালেরিয়াই হোক আর ইনফ্লুয়েন্‌জাই হোক, আমাদের এই তেত্রিশ-কোটির প্রাণ যখন বেরুবে না—তখন আর আমাদের কিসের ভয়? আপনারা যদি আমার সাহায্য করেন, বায়ু যদি একটু অনুকূল হয়ে বইতে থাকেন, ত আমি ত একাই অসুর-পুরী পুড়িয়ে ছারখার করে' দিতে পারি—এর জন্যে এত কান্নাকাটিই বা কেন, সহযোগিতা বর্জ্জনের বাসনাই বা কেন?"

অগ্নির এই রকম অসাত্ত্বিক প্রস্তাব শুনে দেবতাদের মুখ শুকিয়ে এল। যমরাজ সভাপতির কাণের কাছে গিয়ে বলে দিলেন,—"সুরটা বড় চড়া হয়ে যাচ্ছে না? শেষে কি এই বুড়ো বয়সে আমাকেই নিজের বাড়ী যেতে হবে।"

বায়ু চন্দ্রকে ইঙ্গিত করে' দিতেই তিনি মধুর হাসিতে সভাস্থল উজ্জ্বল করে' বলতে লাগলেন—"দেখুন ভ্রাতৃবর্গ, আমরা যখন দেবতার জাত, তখন আমরা মুখে যাই বলি, আমরা যে একেবারে হাড়ে হাড়ে সাত্ত্বিক, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। সুতরাং মারামারি রক্তারক্তি প্রভৃতি আসুরিক ব্যাপারগুলোর আলোচনা আমাদের মধ্যে যত কম হয়, ততই ভাল। আমরা যে অসুরবৃন্দের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করতে যাচ্ছি, এতে যেন আমাদের মনে বিদ্বেষ-বুদ্ধির ছিটে ফোঁটাও না আসে। আমি যে এতকাল চন্দ্রায়ন ব্রত করে' তপঃশক্তি সংগ্রহ করেছি, তার ফলে অসুরদের প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দেব; বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার হবে।"

চটপট করতালিধ্বনির মধ্যে চন্দ্রদেব আসন গ্রহণ করতেই শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় নবীন গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বল্‌লেন—"প্রেমের বন্যা-টন্যা যা শোনা গেল, তা যে অতি উপাদেয় জিনিষ, তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই; কিন্তু আপনাদের এই প্রেমের বন্যা আসবার আগে অশ্রুর বন্যায় স্বর্গরাজ্য না ভেসে যায়—তার ব্যবস্থাও যেন করা হয়। অসুরদের সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই আমার একটু আলাপ পরিচয় যে আছে, তা' ত আপনারা সকলেই জানেন। তারকাসুরকে যখন প্রেম শেখাবার দরকার হয়েছিল, তখন ত চন্দ্রদেব অমৃতভাণ্ড ছেড়ে উঠ্‌তে চান নি—আমাকেই সে কাজটা করতে হয়েছিল। আমি যে উপায়ে তা করেছিলুম, সেটা যে ঠিক কোপনি এঁটে নামাবলী গায়ে দিয়ে আর চরণামৃত খেয়ে নয়, তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। আপনাদের যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে দেব-সেনাপতির কাজ যে আমার দ্বারা চলবে, তা ত মনে হয় না। লোটা কম্বল নিয়ে এ বয়সে ময়ূর চেপে কীর্ত্তন করে' বেড়ান আমার পোষাবে না।"

ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত সেন কলেজ ছেড়ে দিয়ে মহা ফক্কোড় হয়ে উঠেছিল। সে কোণ থেকে চীৎকার করে' বলে' উঠল—"হিয়ার হিয়ার!"

সভাস্থলে তুমুল গোলমাল আরম্ভ হল। নানা-রকম অসাত্ত্বিক সম্ভাষণের পর উভয় পক্ষের মধ্যে টেবিল, বেঞ্চ ছোড়াছুড়ির সম্ভাবনা দেখে বুদ্ধিমান দেবগুরু বল্‌লেন—"আচ্ছা, এ বিষয়টা মীমাংসার ভার সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতিকে দেওয়া হোক। তিনি যখন ত্রিগুণাতীত, তখন এই সত্ত্ব, রজের দ্বন্দ্বের মীমাংসা তিনি করে' দিলেই ভাল হয়।"

* * *

এদিকে কোলাহল শুনে' নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় তিনি চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করলেন—"নারদ, ব্যাপার কি? এত গোল কিসের?"

নারদ একটু মুচকি হেসে বললেন—"প্রভুপাদ, এবার দেবতাদের একটা নূতন ফরমাস আছে; আপনাকে এবার নিরামিষ লড়াই করতে হবে।"

চক্রপাণি ভগবান বললেন—"ওদের রকম যে-রকমের আবদারের চোটে আমার কানে তালা ধরে' গেছে। ওদের বলে' দাও যে, ও-রকম ন্যাকামি শোনবার আমার সময় নেই।"

—

ন'মাসে স্বরাজ

গোপাল দা'র ছেলেটি লাফাতে লাফাতে এসে বল্লে—"বাস্, হয়ে গেল!"

"কি হোলো রে, পুঁটে?"

"কি আবার?—স্বরাজ। আর ন'মাস বাকি বৈ ত নয়। তার পরেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ছেলেটির যে রকম বিষম উৎসাহ, তাকে চুপ করে' বসিয়ে রাখাই দায়। আমি পকেট থেকে একখানা বিস্কুট বা'র করে' তার হাতে দিতেই সে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"বিলিতি নয় ত?" তার উত্তর পাবার আগেই টপ করে' মুখে ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল। আমি তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলুম—"হাঁ, পুঁটু, স্বরাজ ব্যাপারখানা কি রে?"

ছেলেটি আমার দিকে বেশ একটু অবজ্ঞাভরে চেয়ে বললে—"ও! তাও জানেন না বুঝি? স্বরাজ মানে কি জানেন,—অর্থাৎ কি না—আপনি গোলদীঘিতে যাননি বুঝি?"

"না, বুড়ো মানুষ কি করে যাই বাবা?"

"ও:! তাই বটে! সেখানে কত লোক এসে যে রোজ স্বরাজ করে' যায়। সেখানে কত জন রোজ বিকেলে এসে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়ে যায়; আবার বলে ন'মাস এই রকম করতে পারলেই পাকা স্বরাজ হয়ে যাবে। তারা ত আমাদের বলে দিলে ইস্কুল ছেড়ে সব বেরিয়ে পড়। আমরা পঞ্চাশজন ছেলে টিফিনের সময় পালিয়ে এসেছি। ফোর্থ মাষ্টার বেটা আমাদের ধরতে এসেছিল; আমরা 'স্বরাজ কি জয়' বলে, তাকে ঢিল মেরে চম্পট দিয়েছি।"

ছেলেটি তড়াক্ করে' লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি ইস্কুলে ছুটে গিয়ে মাষ্টারের চেয়ারে আলপিন গুঁজে রাখবার দায় থেকে যে সে অব্যাহতি পেয়েছে, এইটাই কি কম লাভ? ইস্কুল ছাড়তে না ছাড়তে তার মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা সেরে গিয়ে বেশ যেন রক্তের আভা দেখা দিয়েছে। একটা মানুষ গড়তেই যখন দশ মাস লাগে তখন ন'মাসে একটা জাত গড়ে উঠবে—এটা বিশ্বাস করি আর না করি—এই ন'মাসে যে ছেলের বাপের ডাক্তার খরচ অনেকটা কমবে, এ কথা আমি দিব্যি করে' বলতে পারি।

পুঁটুরামের ফুর্ত্তি দেখে আমারও বৈরাগ্যগ্রস্ত হাড় ক'খানা একটু নড়ে চড়ে উঠল। ভাবলুম "স্বরাজ কি জয়" বলে আমিও একবার বেরিয়ে পড়ে' গোলদীঘিতে গিয়ে প্রাণটা দিয়ে আসি। রাস্তায় দেখা হোলো আমাদের ক্ষুদিরামের বড় ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি অতি সৎ, ব্যাদড়ামী করবার বুদ্ধিটুকু তার নেই। আমাদের কুইনের ছাপমারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকায় পাক খেতে খেতে বেচারী বিনা দোষে ফোর্থ ইয়ারে পৌঁছে গেছে। এবারে বি,এ, পাশ দিয়ে বাঙ্গালী জীবন সার্থক করবার চেষ্টায় ফি পর্য্যন্ত জমা দিয়েছে, এমন সময় এই স্বরাজের ফ্যাসাদে ফেঁসে গিয়ে বেচারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

'না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ,
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

এদিকে কলেজে গেলে ছেলে মহলে মুখ দেখাবার জো নেই, ওদিকে—এখনও ন'মাস দেরী। ছেলেটি একটু আমতা আমতা করতে করতে জিজ্ঞেস করলে—"কি বলেন, কলেজ ছাড়ব না কি?"

কেন জানি না, আমার ইচ্ছা হোলো ছেলেটাকে আক্কেল দিয়ে দিই। সে কুপ্রবৃত্তিটা সংযত করে' জিজ্ঞেস করলুম—

"নিজে কি ঠিক করলে?"

ছেলেটি বললে—"ভাবছি, সবাই যখন বলছে যে, ন'মাসে স্বরাজ পাওয়া যাবে, তখন না হয় একবার ছেড়ে দিয়েই দেখি।"

আমার হঠাৎ বক্তৃতা পেয়ে গেল। বললুম—"স্বরাজ কি ভীমনাগের দোকানের কাঁচা গোল্লা যে, অপরে তোমাদের তা গিলিয়ে দেবেন? আগে বলতে স্বরাজ ইংরেজ দেবে, এখন বলছ স্বরাজ গান্ধী মহারাজ দেবেন। দশ বিশ লাখ গোলাম নিয়ে যদি একটা স্বাধীন জাত গড়ে ওঠা সম্ভব

হয়, ত ন'মাসে কেন ন'দিনেও তা হতে পারে। কিন্তু স্বরাজ পাওয়ার সঙ্গে মানুষ হওয়ার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, ত তোমাদের কলেজ আর টেক্‌ষ্ট বুক আর প্রফেসারগুলোকে বস্তায় পুরে গঙ্গায় ভাসিয়ে না দিলে ত হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি নে। স্বরাজ পেতে হোলে আগে স্বরাট হতে হবে। নিজের ভিতরে যা নেই, তা কেউ তোমায় দিতে পারবে না। তোমার মত সোনার চাঁদকে নিয়ে যদি স্বরাজ গড়া চ'লে, ত বাওয়া ডিমে তা দিলেও বাচ্ছা ফুটবে।"

আমার মত শান্ত জীবের এ রকম আকস্মিক আস্ফালন দেখে ছেলেটি যেন ভ্যাবাচাকা মেরে গেল। আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং"—ইত্যাদি। শিষ্‌ দিয়ে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে গোলদীঘির দিকে চললুম, একটা দোতালা বাড়ী থেকে সন্ধ্যার বাতাস কাঁপিয়ে খুব করুণ কণ্ঠে কে গাইছে—

"ওগো যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা।"—

আমি বললুম—"ঠিক কথা; তা হলে বাজে বক্তৃতায় কিছু হবে না।"

ক্রন্দোলন

পণ্ডিত হৃষীকেশ সন্ধ্যাবেলা অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বসে বসে' তামাক টান্‌চেন, এমন সময় বিষণ্ণ বদনে গোপাল দা' এসে উপস্থিত। তাঁর গোলগাল মুখখানি একেবারে ভাবনায় প্রায় তিনফুট ছয় ইঞ্চি ঝুলে পড়েছে। তক্তপোষের এক কোণে বসেই তিনি বলে উঠলেন—"কি বিপদেই পড়া গেছে।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে
কাল হোল তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে।

ছেলেটা পড়াশুনা কচ্ছিল ভাল। আজ হপ্তা-খানেক হোলো বইগুলো টেনে ফেলে দিয়ে ঘাটে মাঠে মিটিং করে' বেড়াচ্ছে। নাওয়া-খাওয়া চুলোয় গেছে; আজ সিনেট হলে ধরনা দিয়ে পড়ে' থাক; কাল উপোস কর, পরশু শোকসভা কর—ভাল ফ্যাসাদ সব জুটেছে।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ চোখ বুঁজেবুঁজেই বললেন—"তা' ত হবেই। ইঙ্গবঙ্গ যে এবার রজস্তম যুগ পার হয়ে সত্ত্বের কোঠায় এসে ঠেকেছে। আর একটু পরেই নির্ব্বাণ।" আমি জিজ্ঞেস করলুম—"সে আবার কি রকম?" পণ্ডিতজী বললেন—"ত্রিগুণ ভেদে ভগবানের পর্য্যন্ত রূপভেদ হয়—হিঁদুর ছেলে এ কথাটা ত জান?

সুতরাং সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের চাপে ইঙ্গবঙ্গ politics যে রকমারি রূপ ধরবে, এ আর বেশী কথা কি। প্রথম যখন ফিরিঙ্গি সভ্যতা এদেশে এসে আমাদের বাপ-পিতম'র নাম দিলে ভুলিয়ে, তখন আমরা ইংরেজের মুখের দিকে দেখতুম আর ভাবতুম—হায়, হায়! ভগবান কি ভুল করেই আমাদের এ দেশে জন্ম দিয়েছেন। সে ভুল শোধরাবার জন্যে একদিকে যেমন আমরা সাবান মেখে, ঝামা ঘসে, র‍্যাঁদা বুলিয়ে চাড়মাটাকে কটা করবার চেষ্টায় ফিরতে লাগলুম, অপরদিকে তেমনি ইংরেজীতে হেসে, ইংরেজীতে কেসে, ইংরেজীতে স্বপন দেখে মনটাকেও যতদূর পারি ফিরিঙ্গি মার্কা করে' তুলতে লাগলুম। আমরা যে ইংরেজ নই, এতে আমরা তখন মনে মনে বেশ একটু লজ্জিত। এইটেই হোলো তোমার সেকেলে কংগ্রেসী যুগের মনস্তত্ত্ব। আমাদের রাজনীতির এটা তামস যুগ। যথাসাধ্য ইংরেজের মত হওয়া সত্ত্বেও যখন ইংরেজ আমাদের হাতে রাজপাট ছেড়ে দিলে না, তখন আমরা আরম্ভ করলুম আন্দোলন আর ক্রন্দোলন।"

"ক্রন্দোলন!—ওটা কি জিনিষ, পণ্ডিতজী?"

"আরে ওটা আর বুঝলে না, ক্রন্দন আর আন্দোলন একসঙ্গে জমাট বেঁধে গিয়ে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম ক্রন্দোলন। ওটার সার মর্ম্ম হচ্চে এই—'বাবা' ইংরেজ—তোমার চেয়ারের পাশে আমাদের একটু বসতে জায়গা দাও, বাবা! উঃ অত ঠেসে ধর কেন? আমাদের যে দম বেরিয়ে যাচ্ছে! আরে বাপ্‌! অত দাঁত খিঁচুচ্চ কেন? দেখ না, আমরা লেখাপড়া শিখে প্রায় তোমার মত হয়েছি; একটু পাউডার মাখলে আর চেনবার জো নেই।'

গোপাল দা' এই সময় জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি বলতে চান, ও থেকে কিছু আমরা পাইনি?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"পাবো না কেন, যথেষ্ট আক্কেল পেয়েছি, তাই ত ১৯০৫-এর পর এল রাজনীতির রাজসিক যুগ। তখন আমাদের অন্তরের দেবতাটি অন্ধকার মূর্ত্তি ছেড়ে রক্তমূর্ত্তি ধরেছেন, কাজেই তখন "ক্রন্দোলনে"র বদলে আরম্ভ হোলো—গুঁতো। তখনকার মূলমন্ত্র হচ্ছে—'দে ডাণ্ডা, দে ডাণ্ডা।" ফিরিঙ্গি সভ্যতার উপর চোটে গিয়ে আমরা তখন বাইরের সাবান, বুরুষ, ছেঁড়া পেন্টুলান

নে ফেলে দিয়েছি বটে, কিন্তু মনের ঢংটা বদলায়নি। মনটা তখনও বলচে—'একবার ওদের শিল, ওদের নোড়া নিয়ে ওদের দাঁতের গোড়ায় লাগাতে পারলে হ'ত ভাল।' শিল-নোড়া যখন পাওয়া গেল না, তখন আমরা অভিমান ভরে হ'য়ে দাঁড়ালাম সাত্ত্বিক।

"এই যে গোস্বামী মতে ভারত-উদ্ধার আরম্ভ হয়েছে, এর মূলমন্ত্র হচ্ছে :—স্বরাজ যদি না দাও, ত তোমাদের সঙ্গে আড়ি ; ও কালামুখ আর দেখবো না।—এটা হচ্ছে ইঙ্গবঙ্গের সাত্ত্বিক যুগ—তবে যদি না চটো, দাদা, ত বলি—তামস-সাত্ত্বিক।"

আমার কথাটা ভাল লাগলো না ; জিজ্ঞেস করলুম—"তোমার ঐ খুঁতধরা রোগটা বুঝি আর গেল না ? এত ত্যাগ-সংযম থাকতে ব্যাপারটা তামস-সাত্ত্বিক হতে গেল কেন ?

পণ্ডিতজী "তিতিক্ষা সাধনাই যদি সাত্ত্বিকতার ষোল আনা হতো, তা'হলে আর ভাবনা কি ? দেখ্‌ছো না ব্যবস্থাগুলো প্রায় পুরোপুরি 'নেতি, নেতি' ধরণের ? এ কোরো না, ও কোরো না—কিন্তু করতে হবে কি, তার একটা স্পষ্ট ধারণা কারো নেই। এর ফল হতে পারে মিথ্যাকে ছাড়া, কিন্তু সত্যকে পাওয়া নয়। যম, নিয়ম, উপবাস, হবিষ্য—অবিশ্যি জিনিষ ভাল—তবে পঙ্গু। ভগবান কি Sunday school-এর হেড মাষ্টার, যে, খ্রীষ্টানী দশ আদেশের একটু উনিশ-বিশ হলেই আমাদের নরকস্থ ক'রে দেবেন ? একটা জাত যখন নিজের শক্তির আস্বাদন পেয়ে বেঁচে ওঠে, তখন কি কতকগুলো নিষেধের বোঝা মেনে নিয়ে চলে না কি ? নিজেদের যে আমরা চিনিনি তার প্রমাণ ত পদে পদে পাচ্ছি। সব নেতাদের জিজ্ঞেস কর যে, ইংরেজ চলে' গেলে তাঁরা দেশটাকে কি রকম করে' গড়তে চান। তাঁদের ধারণাগুলোর পনের আনা ভাগ ফিরিঙ্গিস্থান থেকে ধারকরা—ঐ পার্লামেণ্ট, ভোট, ব্যালট্ আর মেজরিটি। আমাদের মাথায় ভিতরকার স্বরাজের সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ আছে কি না তা এখনও আমরা ভেবে দেখিনি। এই যে ভাবের তুফান উঠেছে, এতে লোকের মনগুলোকে দেশের দিকে ফেরাবে ; এইটাই এর কাজ। এটা পুরোণোকে ভাঙবে, কিন্তু নতুন ছকে গড়বে কি ? তার ত কোনো লক্ষণ দেখছিনে ; সবাইকার অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তারা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছে ; চলবার পথ পাচ্ছে না। তাই ত মনে ভয় হয়—আবার একটা অকালবোধন হোলো নাকি ? তমের পর রজঃ এল, তারপরে এলেন সত্ত্ব—শেষে নির্গুণে গিয়ে ঠেলে উঠবে না ত ?"

আমারও একটা ভাবনা হোলো। জিজ্ঞেস করলুম—"এই 'নেতি' নেতি'র রাস্তা ভেঙে স্বরাজে গিয়ে পৌছোবে ক'জন ?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন ত পঞ্চপাণ্ডব মিলে। শেষ স্বর্গের দরজায় গিয়ে যখন হাজির হলেন—তখন বাকি শুধু মহারাজ যুধিষ্ঠির আর তাঁর কুত্তা।"

মন আমার

বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি। একদিন সন্ধ্যাবেলা একলা পেয়ে মনকে জিজ্ঞেস করলুম—মন, কি চাও।

মন শুক্‌নো মুখে চুপ কোরে বসে রইল। কথার কোনো উত্তরই দিলে না।

সেবার পাসের পড়া পড়চি। সবাই আমাকে বলত ভাল-ছেলে। জিজ্ঞেস করলুম—"মন একবার চুটিয়ে পাসটা কোরে নেবে ? বেশ ত গেজেটের ডগায় নাম উঠবে, সোনার মেডেল পাবে, খোদ লাটসাহেব এসে হাতে সার্টিফিকেট দেবে, ছেলেমহলে হৈ হৈ পড়ে যাবে।"

মন একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—পোড়া কপাল, পেয়াদার আবার শ্বশুর-বাড়ী, গোলামের আবার বিয়ে!

লেখাপড়ার গুমরটা মনে মনে একটু ছিল ; সেখানে ঘা খেয়ে একটু শিউরে উঠলুম।

তবে কি চাও। মন,—টাকা ? কলকাতার বুকের উপর একখানা সাদা মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান বাড়ী, চমৎকার একখানা মোটর আর ব্যাঙ্কে লাখ কতক ? কি বল ?

মন আমার মুখ তুল্‌লে না। শুধু বল্‌লে—"একলা মানুষ ও-সব নিয়ে আমি করব কি ? দুবেলা দুমুঠো ভাত, আর মাথা গোঁজ্‌বার একটু জায়গা পেলেই হ'ল।"

মনের এই উদাস উদাস ভাব দেখে ভাবলুম মন আমার বুঝি লুকিয়ে 'লভে' পড়েছে। একটু ইতস্ততঃ কোরে চুপিচুপি জিজ্ঞেস্ করলুম—"একটি টুকটুকে রাঙা বউ বিয়ে করবে ? খাসা মেয়ে! বেশ চারিদিক আলো করে' ঘুরে' বেড়াবে।"

মন আমার হাই তুলে বললে—"নিজের বোঝাই বইতে পারিনে—তার উপর আবার একটা মেয়ে।"

রোগটা ঠাওরাতে পারলুম না।

* * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গোলদীঘির ধারে একজন প্রকাণ্ড স্বদেশী পাণ্ডার লেকচার শুনে খুব খানিকটা হৈ চৈ করে বাসায় এসে খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়িছি। খোলা দোর জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না বিছানার উপর যেন ঢেউ খেলছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টেরও পাইনি। আধা রাতে হঠাৎ যেন বুকটা দুড়্ দুড়্ করে উঠল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি মনটা আমার ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে। আঃ, সে কি কান্না! বুকটা যেন মুচড়ে মুচড়ে নিঙড়ে নিঙড়ে কান্নার ধারা ছুটছে। আমাকে জাগতে দেখে মন আমার খানিকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চুপ করলে। অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে, তোর কি হয়েছে বল্‌না? কি করলে তুই সুখী হোস?"

আবার ফোঁপানি সুরু হলো। আমি ভাবলুম বুঝি বক্তৃতা শুনে মনের আমার নেতা হবার সাধ হয়েছে। বললুম—"হ্যাঁরে, ছেলেদের সর্দ্দারি করবি? কত হাততালি পাবি, ফুলের মালা পাবি, খবরের কাগজে তোর নামে প্রবন্ধ বেরুবে; আর এখন থেকে সুরু করলে কালে লাট সাহেবের সভার সভ্যও হতে পারিস। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়াও বিচিত্র নয়—অথচ খরচ একটি পয়সা নেই। কি বলিস্?"

মন আমার নাকটা সিঁটকে উঠল। মুখটা আমার চেপে ধরে বল্‌লে—"ওগো, রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমি কি ছ্যাঁচোড় না দাগাবাজ, আমায় ফক্কিকারি দিয়ে ভোলাচ্ছ?"

কি বিপদ! তবে কি মনের আমার বৈরাগ্য হল? জিজ্ঞাসা করলুম—"তুই কি সাধু হবি নাকি? চল, গেরুয়া ছুবিয়ে নিয়ে তা'হলে বেরিয়ে পড়ি। একটা আলখেল্লা আর কমণ্ডলু নিয়ে আরম্ভ করা যাক; শেষে চেলা টেলা জুটলে একটা ভাল জায়গা দেখে মঠ বেঁধে বসা যাবে'খন।"

মন আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপটি মেরে হাঁ করে চেয়ে রইল; শেষে একটু ঘাড় নেড়ে শুধু বললে—"ছি!"

* * *

বাঙ্গালীর ছেলে সেপাই হবে—একথা তখন কে ভেবেছিল? কিন্তু আজ তা'ও হলো। ১৯১৫ সালে যে ফরাসীর সঙ্গে জার্ম্মাণের যুদ্ধ হবে, আর আমি ফরাসী পল্টনে ভর্ত্তি হয়ে লড়াই কর্ত্তে যাব—এ কথা আমার ভাগ্য-বিধাতা ছাড়া আর কে আগে জানত? ভাল ছেলে হওয়া বা বড় লোক হওয়া আমার পোষাল না। আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছি। যত দূর দেখেছি, সব ফরাসী জাতটা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। ঘর ছেড়ে, বৌ ছেড়ে, ছেলে ছেড়ে, ধন ঐশ্বর্য্য ছেড়ে—যুবা, বুড়ো, ল্যাংড়া, লুলো, সব রাইফেল কাঁধে ছুটেছে। নিশান উড়ছে, বিউগল বাজছে, আর কান ফাটিয়ে ঐ এক গান উঠছে—"Allons enfants de la patrie" - - - আজ আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির ধারা ছুটেছে আর আমরা মাঠের পর মাঠ ভেঙ্গে ডবল কদমে চলেছি। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে বিজলী চমকাচ্ছে; দূরে জর্ম্মাণের তোপের আওয়াজ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে।

মনটা আমার ফরাসী সেনার সঙ্গে সঙ্গে বেশ তালে তালে পা ফেলে চলেছে। হঠাৎ—কড়াং—ং!—কান ফাটিয়ে, চোখ ধাঁধিয়ে, কোথা থেকে একটা শেল আমাদের খুব কাছাকাছি এসে ফাটলো। যে যেখানে পারলে গুড়ি সুড়ি মেরে মাটীর উপর পড়লো। শেলের এক টুকরো তার মাথায় এসে লেগেছিল।

মরণকে এত কাছে পেয়ে প্রাণটা যেন উন্মাদনায় ভরে গেল। মনে পড়লো সেই মেসের ছেলেগুলো, যারা পাশ করেছে, আর বেঁচে মরে আছে। বাড়ীতে বুড়ী মা আর ছোট ভাইটা—আসবার সময় যার গলা জড়িয়ে ধরে এ পাষাণ চোখেও জল এসেছিল—দূর হোগ গে!

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম—মন আমার যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তার চোখ দুটো যেন বিদ্যুতের মত চকচক করছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি মন, একবার ঝাঁপিয়ে পড়বে?"

মন আমার একটা পাগলের মত অট্টহাসি হেসে বল্‌লে—"মরণের লোভ যে কত বড় তা আমি জানি; কিন্তু যাঁদের জন্যে মরলেও সুখ হতো, এরা ত আমার তা নয়।

* * *

"তবে চুলোয় যা"—বলে আমি চলতে আরম্ভ করলুম। সেই যে চলেছি, আজ অবধি চলা আর আমার শেষ হলো না। যুদ্ধ শেষ হবার পর শুনলুম ইউরোপ নাকি একটা জাতিসংঘ গড়ে জগতে

সত্যযুগ আন্‌বে। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম—"দেখতে যাবি নাকি রে?" মন বল্‌লে—"ধ্যাৎ, ওটা ত জাতিসংঘ নয়, ও হলো মাতব্বরদের বদ্‌জাতি সংঘ।"

তুই যে আমার বেজায় আবদেরে, মন!

চল্লুম রুশিয়ায়—সেখানে নাকি সব ভেদাভেদ রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে লেনিন মানুষকে সমান করে গড়বে। গিয়ে দেখলুম, হাঁ—একটা নতুন রকমের কল বসেছে বটে। মানুষকে সেই কলের মধ্যে ফেলে, কারও মাথাটা ছেঁটে দিয়ে, কারও ঠ্যাংটা ভেঙ্গে দিয়ে, সকলকে সমান করে গড়বার চেষ্টা হচ্ছে বটে। যার নাকটা একটু বড়, দাও তার নাকটা ইঞ্চি খানেক কেটে; যার চোখ দুটো একটু গোল গোল, দাও তার চোখ দুটো ছুরি দিয়ে পটল-চেরা করে। একেবারে ভীষণ রকমের সাম্য! কর্ত্তার যদি জ্বর হয়, ত সবাই খাও সাগু; কর্ত্ত যদি পাশ ফিরে শোন, ত কেউ চিৎ হয়ে শুতে পাবে না। শুনলুম এর নাম Commune! মন আমার খানিকটা চুপ করে থেকে থেকে বলে উঠল—বাপ!

* * *

ছুট, ছুট, ছুট!—একেবারে ছুটতে ছুটতে তুর্কীস্থান, কাবুল, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ভেদ করে' বাংলার মাটীতে ন্যাংটা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ কোথায় তুমি আমার স্বপ্নের বাংলা?—কোথায় তুমি, মা! দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়ে তুমি একদিন বাঙ্গালী সাধকের মানস-পটে এঁকে উঠেছিলে, আর আজ দেখি সবাই আমারই মত জীর্ণ, ক্লিষ্ট, ক্ষত-বিক্ষত দেহ প্রাণ নিয়ে পরের পায়ে ধরণা দিয়ে পড়ে আছে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম মন আমার চোখ বুজে একেবারে চুপ্‌ হ'য়ে গেছে! শুধু অন্তর্য্যামিনীর পদপ্রান্তে তার কাতর প্রার্থনা উঠেছে—একবার, এসো মা, এসো মা!

পুঁটের স্বরাজ

সকাল বেলা উঠে পুকুর-ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে দেখি পাড়ে একটা খেজুর গাছের তলায় তিন চারটে ছোট ছোট ছেলে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর যে মিন্‌সে খেজুর গাছে তাড়ী দেয়, সে রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ হ'য়ে আস্ফালন জুড়ে দিয়েছে! কি ব্যাপার?—হাত-মুখ ধোয়া ত চুলোয় গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি তাড়ীর কলসীটা ফুটো হয়ে গেছে আর তা থেকে টস্‌ টস্‌ করে' তাড়ী পড়্‌ছে। মুখুজ্যেদের পুঁটের দিকে আঙুল দেখিয়ে তাড়ি-ওয়ালা বল্‌লে—"দেখুন দেখি কর্ত্তা-মশাই, ঐ ছোঁড়াটা ঢিল মেরে আমার কলসীটা ফুটো ক'রে দিয়েছে।" ভাবলুম বুঝি হাতে-হাতে ধরা পড়ে' পুঁটে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়্‌বে। কিন্তু পুঁটু সে ছেলেই নয়! সে তার দেড়হাত পরিমাণ দেহটাকে বেঁকিয়ে ধনুকের মত ক'রে ঘাড়টাকে একটু বাঁ দিকে হেলিয়ে উত্তর দিলে—"বেশ করেছি ভেঙেছি; সবুর কর তুই ন' মাস। তারপর স্বরাজ হ'লে তোকে ধ'রে ঐ খেজুর গাছে ফাঁসি দেব।"

তখন আমার জ্ঞান-নেত্র ফট্‌ করে' ফুটে' উঠ্‌ল। ঠিক্‌ ঠিক্‌! এটা তা'হলে স্বরাজেরই প্রথম অধ্যায়! কাল দেখছিলুম বটে একটি নাকে সোণার চশমা দেওয়া "My deer" রকমের নবীন ছোকরা সিদ্ধু মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে বসে' বসে' একখানা খবরের কাগজ পড়ে' ছেলেদের কি শোনাচ্ছিল। কল্‌কাতা থেকে এসেছে নাকি?

আমি ত তাড়াতাড়ি তাড়ীওয়ালাকে একটু ঠাণ্ডা করে', ছেলেগুলোকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে এলুম। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে' জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে পুঁটে, সকালবেলা পাঠশালে না গিয়ে বুঝি তাড়ীর কলসী ভেঙ্গে বেড়ান হচ্ছে?"

পুঁটে তার আড়াই ইঞ্চি মুখখানা আমার চেয়েও গম্ভীর করে' উত্তর দিলে—"ও নবীন পণ্ডিতের পাঠশালায় ত আমরা আর যাব না; আমাদের যে ন্যাশ্‌নাল পাঠশালা হয়েছে।"

আমি ত হাঁ করে' ফেললুম। বললুম—"আরে মোলো; পড়িস্‌ ত শিশুশিক্ষা; তার আবার ন্যাশ্‌নাল পাঠশালা কিরে?"

পুঁটে হারবার ছেলে নয়। সে বল্‌লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ; এইবার থেকে যে আমাদের ন্যাশ্‌নাল শিশুশিক্ষা পড়ান হবে।"

আঃ খেলে কচুপোড়া! ন্যাশ্‌নাল শিশুশিক্ষা! বাপের বয়সে তা ত কখন দেখিনি। পুঁটেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ন্যাশ্‌নাল পাঠশালা বস্‌বে কি খেজুর গাছের তলায়? ওখানে গিয়ে কলসী ভাঙ্গতে গেলি কেন?"

আমি বুঝ্‌লুম ভেতরে একটা-কিছু কথা আছে। অন্ধকারে ঢিল মারা গোছ করে' জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"ঐ সিদু মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে যে বাবুটি এসেছেন—আচ্ছা, কি নাম ভাল—"

পুঁটে ফট্ করে' বলে ফেল্‌লে—"রেবতী বাবু।"

আমি মনে মনে একটু হেসে বল্‌লুম—"হাঁ। রেবতী বাবু—তিনিই ন্যাশ্‌নাল পাঠশালা খুল্‌ছেন—না? তা বেশ—কাল তিনি কি বল্‌লেন তোদের?"

পুঁটে নীরব। দেখ্‌লুম ছেলেটা একটা জাত-কাটা বিচ্ছু।

হঠাৎ দাঁত-মাত খিঁচিয়ে বলে উঠ্‌লুম—"বলবি নে পাজি? দাঁড়াও একবার লাগাচ্ছি জল-বিচুটি।"

পুঁটের পাশে দাঁড়িয়েছিল যদু পোদ্দারের ছেলে নন্দদুলাল। সে একবার পুঁটের মুখের দিকে চেয়ে দরজার দিকে ফিরে দেখ্‌লে। দরজাটা বন্ধ—পালাবার রাস্তা নেই। তখন সে মাথা চুল্‌কুতে আরম্ভ করে' দিলে। আমি তাকের উপর থেকে গোটা দুই নারকুলে কুল পেড়ে তার হাতে দিয়ে বল্‌লুম—"বল্‌ত, বাবা নন্দদুলাল—রেবতী বাবু কি বল্‌লেন?"

নন্দদুলাল কুল দুটো এক সঙ্গে মুখে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—"রেবতী বাবু বললেন—তাড়ীর কলসী ভেঙ্গে দিয়ে এলে দুটো করে' লেবেনচুস দেবেন।"

বুঝ্‌লুম—তাহ'লে স্বরাজের propaganda work আরম্ভ হ'য়ে গেচে।

ছেলেগুলোকে বিদায় করে' দিয়ে তামাকটি সেজে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুটি টান মেরেছি, এমন সময় সিদু মণ্ডলের ছেলে স্বয়ং গোপীনাথ দূরে থেকে "পেন্‌নাম হই, বাবাঠাকুর" বলে' দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

—"কিরে গোপীনাথ, সকাল বেলা, কি মনে করে' রে?—"

গোপীনাথ কাছে এসে মেজের উপর উবু হ'য়ে ব'সে চুপি চুপি বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—"এজ্ঞে, বাবা বল্‌লে—যা না-হয় একবার বাবাঠাকুরের কাছে, ব্যাওরাটা ত ভাল বুঝ্‌ছি নে।"

—"কি ব্যাওরা রে?"

—"এজ্ঞে, ঐ যে কল্‌কাতা হোতে গোরা হেন একটি ছোকরা বাবু এয়েছেন—আঃ কি বল্‌ব বাবা-ঠাকুর, তানার নাক দিয়ে যেন ইংরেজীতে খৈ ফুট্‌তে নেগেছে। তা তিনি ত দুদিন থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে' ঘুরে' কার কত বিঘে জমী আছে, কত ধান হয়, কত পাট হয় তার তল্লাস কর্‌তে নেগেচেন। মতলব কিছু বুঝিনে বাবাঠাকুর। তিনি ত বল্‌চেন—কলকাতার বাবুরা না কি, কি কোম্পানী খুলেচেন; তাতে নাম লেখালে নাকি আর রোডসেস, খাজনা, ট্যেক্‌স দিতে হবে না। গোমস্তা বাবুকে জিজ্ঞেস করতে গেছলাম। গোমস্তা বাবু বলে' দিয়েছে—'ও সব জরীপের লোক, জমী মাপ-জোপ করে' খাজনা বাড়াবে; ভাল চাস ত মেরে তাড়িয়ে দে'। তা সবাই ত ঠিক করেছে, সাঁঝের বেলা ওনাকে গো-বেড়েন দিয়ে দেবে। তাই বাবা বল্‌লে—যা না-হয় একবার বাবাঠাকুরকে সত্যি-মিথ্যে জিজ্ঞেস্ করে' আয়।"

—আমি দেখ্‌লুম, এরই মধ্যে স্বরাজ অনেক-খানি এগিয়েছে। তামাকটা আর আমার খাওয়া ছেলো না। শেষে কি ভদ্রলোকের ছেলে ন'মাসে ভারত উদ্ধার কর্‌তে এসে বেঘোরে মারা পড়্‌বে। হুকোটা ছেড়ে আস্তে আস্তে গোপীনাথের সঙ্গে তাদের চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হ'লুম। দেখ্‌লুম—স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সব আসবাব একেবারে স্তরে স্তরে সাজানো।

একটি চরকা, তিন বাণ্ডিল সুতো, দুখানা খবরের কাগজ, দু প্যাকেট গান্ধীমার্কা সিগারেট, একটি ছোট ষ্টোভ, এক ডজন বাতি, একটি চায়ের কাপ—একখানি তক্তপোষের এক পাশে সাজান রয়েছে, আর শ্রীমান রেবতী মোহন বি-এ একখানি ছোট পকেট বুকে খস্ খস্ করে নোট লিখছেন। বয়সে ২১।২২ আন্দাজ, এখনো ভাল গোঁফ উঠেনি, নাকে চসমাটা এমনি ট্যাড়া ভাবে লাগান যে দেখলেই মনে হয় ইনি ইংলিশে অ-নর। ঈষৎ দন্তরুচি কৌমুদী বিকাশ করে' বল্‌লেন—"আমি আপনাদের villageটা organise কর্‌তে কি জানেন, যা দেখছি তাতে ছেলেদের মধ্যে propaganda খুব successful হবে আশা করচি; তবে চাষাগুলো worthless—এদের মধ্যে কাজ কর্‌তে হ'লে টাকা চাই। আর কি জানেন—গোঁফ-দাড়ি নেই বলে' আমার কথা লোকে শুনতে চায় না।"

আমার প্রাণপুরুষ অন্তরের মধ্যে খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ছিলেন। সে হাসিটা চেপে আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম—"গোঁফ বা টাকার জন্যে বিশেষ ভাবনা নেই। দুইই কামালে বাড়ে। আপাততঃ সাতটি দিন বক্তৃতাটি একটু বন্ধ রাখুন। স্বরাজ

যায় আবার আসে, কিন্তু পৈতৃক প্রাণটা চাষার হাতে গেলে আর ফিরবে না।"

সংকীর্ত্তনে ভারত-উদ্ধার

বিশুদা'র ভাইপো গোপাল ছেলেটি বড় ভাল। তবে তার মাথায় এখনো টাক পড়েনি আর হজম শক্তিটাও বেশ সতেজ আছে বলে' বিশুদ্ধ ভক্তি-তত্ত্বটা সে বরদাস্ত করে' উঠতে পারে না। সেদিন সকাল বেলা পণ্ডিতজীর কাছে বসে আছি, এমন সময় গোপাল একখানা মাসিক কাগজ হাতে করে' এসে উপস্থিত। মুখখানা একটু শুকনো শুক্‌নো। চোখ দেখলে মনে হয় যেন ভেবে ভেবে রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। তাকে দেখেই আমি জিজ্ঞেস করলুম—"কি গোপাল! সব খপর ভাল ত রে?"

গোপাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—"বড় মুস্কিলে পড়ে' গেছি, দাদা। এই দেখুন না জ্যেঠামশাই আমার কি কীর্ত্তি করে' বসেছেন।"—বলেই গোপাল মাসিকখানা খুলে' পড়্‌তে আরম্ভ করে' দিলে—"জানি বাঙ্গালা দেশ ভাবের দেশ। বাঙ্গালার মাটির ওপরে আজকের এই ভাবের ঢেউ নূতন জিনিষ নয়। ভাব জিনিষটা যতই বড় হোক, আর যতই ভাল হোক, শক্তিহীনের পক্ষে তার ফলটা খুব ভাল হয় না। দুর্ব্বল দেহে যেমন সবল নাড়ী প্রায়ই মারাত্মক, লঘু আধারের পক্ষে গুরু আধেয় যেমন নিরাপদ নয়, অনধিকারীর পক্ষে শক্তিসম্পন্ন বীজ যেমন অনিষ্টকর, লঘু চিত্তে ভাবাবেশ তেমনি অশুভকারী। এমন কি, ভগবদ্‌ভক্তির ভাবটা পর্য্যন্ত এ নিয়মের বাইরে নয়। গৌরাঙ্গ ঠাকুরের এমন ভক্তির ধর্ম্ম, জ্ঞানের রজ্জুর দ্বারা সংযত না হওয়ায় বাঙ্গলা দেশের যে অধঃপতন ঘটিয়েছিল, তার ফল বাঙ্গালী এখনও হাড়ে হাড়ে ভুগ্‌ছে। তার পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলার নাট্য-কলায় যে ভাবের আতিশয্য বাঙ্গালী জীবনকে আন্দোলিত করে, তার ফলে সমগ্র বঙ্গ বহুকাল যাত্রা পাঁচালী তরজা আর কবির লড়াইয়ে মত্ত হ'য়ে সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছিল।"

পণ্ডিতজী এই পর্য্যন্ত শুনে' বলে' উঠ্‌লেন—"কেন, এ ত বেশ কথা! এতে তোমার আপত্তি কি গোপাল?"

গোপাল একটু হেসে বললে—"পণ্ডিতজী, এ পর্য্যন্ত না-হয় বুঝ্‌লুম। গৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মের সঙ্গে তরজা পাঁচালীর সম্বন্ধটা না-হয় জ্যেঠা মহাশয়ের খাতিরে স্বীকার করেই নিলুম; কিন্তু সেই ভাবের নেশা ছোটাবার জন্যে জ্যেঠামশাই যে দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন, সেটা ত একবার শুনে নিন্।"

জ্যেঠামশাই ভাবের নাচানাচি বন্ধ করে' দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই পরক্ষণে জিজ্ঞেস করুচেন:—"তিন হাজার পাগলা ছেলে হিসাব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে পারবে? দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, ভগবানের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নিত্যানন্দের মত প্রেমে পাগল হ'য়ে ছুটে আস্‌তে পারবে? * * * পাগলামিতে একেবারে বুঁদ হয়ে থাক্‌তে হবে।"

এই পর্য্যন্ত শুনেই পণ্ডিতজী বলে' উঠ্‌লেন—"দাঁড়া, দাদা, দাঁড়া। একটু সম্‌ঝে সম্‌ঝে রস গ্রহণ করতে দে। তত্ত্বকথাটা একটু ঘোলাটে রকমের হ'য়ে উঠ্‌ল না? গৌরাঙ্গ ঠাকুরের ধর্ম্মটা জ্ঞানের রজ্জু দিয়ে সংযত করা হয়নি বলে দেশে যত অঘটন ঘটেছিল তার তালিকা ত তুই এইমাত্র শোনালি। এখন নিত্যানন্দের মত প্রেমে পাগল হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে', পাগলামিতে বুঁদ মাতাল হ'য়ে পড়ে' থাকলে সে-সব দোষ খণ্ডে যাবে না কি? এতদিন ত জানতুম যে কুকর্ম্মই হোক আর সুকর্ম্মই হোক, গৌর নিতাই যা করেছিলেন, দুজনে মিলেই করেছিলেন, এখন গৌরের প্রেমটুকু বাদ দিয়েই নিতাইয়ের প্রেমটুকু রাখ্‌তে হবে, না কি করতে হবে কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে যে! গৌরাঙ্গের ভক্তিতত্ত্ব থেকে যদি পাঁচালী, তরজা আর কবির লড়াই বেরিয়ে থাকে, তা'হলে এ নবীন নিতাইদের প্রেমতত্ত্ব থেকে যে খেমটা বা খেউর কেন বার হবে না, তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! কই, পড় দেখি আর একটু, ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে কি না দেখি।"

গোপাল মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"তাই ত! জ্যেঠামশাই যে দেশের নাড়ীর জন্য সর্ব্ব-ভাবাত্মক প্রেমরসের ব্যবস্থা করলেন, সেটা জ্ঞানাগ্নিতে কত পুট পাক করা হয়েছে, তা যে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। শুনুন দেখি আপনি যদি এ চিকিৎসার মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারেন? জ্যেঠামশাই বল্‌ছেন—'আমি চাই এমন বিশ-পঞ্চাশ জন মানুষ, যারা ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁত বুনবে, প্রয়োজন হ'লে চাষীদের মত পোষাক পরে মাটী-কোপাতে যাদের লজ্জা বোধ থাকবে না, হরি নামের তুফান তুলে যারা পথে গেয়ে বেড়াবে। আমি চাই এমন

মানুষ, হরিনামের শক্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে, প্রেমের জগজ্জয়ী শক্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে। * * * হরিনামের সরস কথায় একদণ্ডে মানুষকে পাগল করে' দেওয়া যায়, তা আমাদের অচিরে প্রমাণ করতে হবে। * * * * একমাত্র নামের গুণে অসম্ভব সম্ভব হবে, জলে শিলা ভাসবে, আকাশে কুসুম ফুট্‌বে * * * আর ইংরাজ প্রভুর উচ্চাসন থেকে নেমে এসে ভারতের পদে বিলুণ্ঠিত হবে।'

পণ্ডিতজী হেসে বল্‌লেন—"হরিনামের তুফান তুলে' রাস্তায় ধেই ধেই করে' বেড়াবে আর অবসর মত ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁত বুনবে আর চাষ করবে—এ রকম বিশ-পঞ্চাশ জন লোক আজকাল মালপো ভোগের ব্যবস্থা করলেই মিল্‌তে পারে। তবে হরিনামের জগজ্জয়ী শক্তিতে তাদের বিশ্বাস আছে কি না, তা তোমার জ্যেঠামশাইকে পরীক্ষা করে' নিতে হবে। তাঁর মত শুষ্কতরুও যখন এই বয়সে "মুঞ্জরিল", তখন হরিনামের যে খানিকটা মাহাত্ম্য আছে, তা স্বীকার করতে হবেই। গৌরাঙ্গ-দেবের সময় বনের-বাঘ-ভালুকও নাকি সঙ্কীর্ত্তন শুনে নেচেছিল, এই রকম শোনা যায়। কিন্তু পাঠান বাদশারা যে সিংহাসন ছেড়ে গড়িয়ে পড়েছিলেন, তার ত কোনও প্রমাণ পাইনে। আর ভাল কথা—হচ্ছিল হরিনাম, তার ভেতর ইংরেজের উচ্চাসন ছাড়াছাড়ির কথা এল কেন হে?"

গোপাল বল্‌লে—"আজ্ঞে, ঐটেই ত গোড়ার কথা। জ্যেঠামশাই বল্‌তে চান যে, স্বরাজ পেলেই যখন মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, তখন স্বরাজ স্বরাজ ভুলে গিয়ে ইংরাজকে তার প্রাপ্য গণ্ডা খাজনা দিতে থাকো, আর রাজনীতির সকল সম্পর্ক ছেড়ে একটা মনুষ্যত্বের আন্দোলন কর, একটা প্রেমের propagandaর আয়োজনে লেগে যাও।"

পণ্ডিতজী হাঁফ ছেড়ে বলে' উঠ্‌লেন—"ও, তাই বটে! তা ইংরেজের কি কি প্রাপ্যগণ্ডা তা জ্যেঠামহাশয়কে ঠিক করে' দিতে বলিস্। ঐ প্রাপ্যগণ্ডা ঠিক করতে গিয়েই ত স্বরাজের ফ্যাসাদ উঠেছে। আমাদের ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁত বুন্‌তে আর হরিনামের তুফান তুল্‌তে দেখলেই যদি ইংরেজ ভক্তির কুয়াশার ঝাপ্‌সা দেখে সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়ে' যায়, ত তোর জ্যেঠামহাশয়ের টাকের উপর একটা মুকুট পরিয়ে দিয়ে না-হয় তাঁকেই সেই সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু জানিস্ ত দাদা, আমি একটা জাতকাট পাষণ্ড। আমার কেবলি মনে হচ্ছে যে, শুধু নামের গুণে জলে শিলাও ভাস্‌তে পারে, আকাশে কুসুমও ফুট্‌তে পারে—তবু ঐ কার্য্যটা হবে না। দেখছিস্‌নে তুকারামের সঙ্গে এসেছিলেন রামদাস ও শিবাজী, নানকের পরে এসেছিলেন গুরু গোবিন্দ? আর এবারে কি চরকার সঙ্গে মৃদঙ্গ জুড়ে দিলেই কাজ হাসিল হবে?

ত্যাগের ভোগ

পণ্ডিতজী খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"তোমরা যাই বল, আর যাই কও, ত্যাগের মত ভোগ আর নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম—"সে আবার কি রকম? তুমি হেঁয়ালিতে তত্ত্ব-কথা প্রচার করতে আরম্ভ করলে যে।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ভাখ, কথাগুলো বেশী সোজা হ'য়ে গেলেই হেঁয়ালির মত শোনায়; কিন্তু ওর মধ্যে গবেষণা করবার বিশেষ-কিছু নেই। আচ্ছা, ঐ যে সেদিন প্রমথ বলে' ছেলেটি এসেছিল, দেখেছিস্ ত? খুব ভালছেলে—একেবারে university ফাটিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু আধঘণ্টা তার সঙ্গে কথা কইলেই সে প্রকারান্তরে জানিয়ে দেবে যে, ইচ্ছে করলেই সে একটা কেষ্টবিষ্টু হতে পারত; আর ইচ্ছে করেই সে তা হয়নি। কথা-গুলো বল্‌বার সময় তার টানাটানা চোখ দুটো কেমন ভাবে ঢুলে' পড়ে দেখেছিস্? তার অন্তরাত্মা যেন একেবারে নিজের সঙ্গে প্রেমে পড়ে নিজেকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে চুমো খেতে যাচ্ছে।"

আমি বললুম—"ভালরে ভাল! নিজের কাজ যদি নিজেকে ভাল লাগে, তাতে ত অন্তরাত্মার তুষ্টি হবেই! এতে তুমি খুঁত ধরবার কি পেলে?"

পণ্ডিত বল্‌লেন—"আরে, ঐ ত তোরা গোল করিস্। আমি খুঁত ধরি, তোদের কে বল্‌লে? আমি শুধু সব জিনিসের স্বরূপ কথন করে' যাচ্ছি। মানুষ নিজেকে কত রকম করে' ভোগ করছে, তাই দেখাচ্ছি মাত্র। ঐ যাকে বলিস্ ত্যাগ, সেটাও ভোগের রকমারি। আচ্ছা, সেদিন যখন প্রমথ খদ্দরের শার্ট আর ধুতি পরে' দেখা করতে এল, তখন তার চোখ দুটো আহ্লাদে টপ্ টপ্ করে' কি রকম নাচ্‌ছিল দেখেছিস্? আমি দিব্যি করে'

বল্‌তে পারি যে, সে এখানে আসবার আগে আরসির সামনে অন্ততঃ দশ মিনিট দাঁড়িয়ে চুলগুলো একটু উস্‌কো খুস্‌কো ক'রে দিয়ে দেখেছিল যে, মোটা কাপড় আর চিলে শার্টে তাকে বেশ মানায়। নিজের রূপ দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য করিছিস্ কি না জানিনে, যে, সে প্রায়ই বলে যে কোনও মেয়ের ফাঁদে পড়্‌বার ছেলে সে নয়। কথাটা আমার মনে হয় ভারী সত্যি। নিজেকেই সে এত ভালবেসে ফেলেছে যে, আর কোনও ভালবাসার জায়গা তার মনের ভিতর নেই।"

সমালোচনাটা আমার কি রকম কি রকম ঠেক্‌ছিল। আমি বল্লুম—"পণ্ডিতজী, তুমি বড় Cynic।"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"সত্যি কথাকে যদি কাপড়-চোপড় পরিয়ে তারপর ভদ্র-সমাজে বার হবার অনুমতি দিস্, তা'হলে অবিশ্যি আমি নাচার। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ন্যাংটা সত্যি কথার মধ্যে একটা রস আছে, যা' সব রসের চেয়ে মধুর। আর এতে দোষই কি? নিজের মাধুরী মানুষ নিজে ভোগ করছে—এ কথাটা শুনে এত বিবর্ণ হয়ে' ওঠ্‌বার কি আছে? আজকাল সভ্য-সমাজে অনেক ধার্ম্মিক মেম-সাহেবদের গলায় একগাছি করে' ছোট-ছোট রুদ্রাক্ষের মত দানার মালা থাকে দেখেছিস্ ত? তুই কি বল্‌তে চাস, যে, যে সত্যটা বাইরে ঐ মালার মূর্ত্তি ধরে' বুকের উপর দুলছে—সেটা একেবারে ষোল আনাই আধ্যাত্মিক? তার মধ্যে ললিত শিল্পকলার খাদ কি একটুখানিও নেই? মালাটা পর্‌বার আগে মেমসাহেবেরা কি ভাবে না যে, ধর্ম্মের ঐ বিগ্রহটাকে কোথায় কেমন করে' দোলালে বেশ মানাবে?"

আমি বল্লুম—"দেখ পণ্ডিতজী, দাঁতের সুড়সুড়নি নিবারণের জন্যও ত দেশ, কাল, পাত্র মান্‌তে হয়। নরম মাংস পেলেই যে এক কামড় দিতে হবে, তার ত কোনো মানে নেই।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"এর ভেতর নরম-গরমের কোনো কথাই নেই। এই আমার কথাই ধর না; আমার মাংস যে বেশ নরম, এ কথা একা আমার কলহপ্রিয়া গিন্নী ছাড়া আর বোধ হয় কেউ বল্‌বেন না; আর হাতে গঙ্গাজল লেগে থাক্‌লে তিনিও বল্‌বেন কি না সন্দেহ; আমার কীর্ত্তিটাই শোন্। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় যখন ছোঁড়ারা হরিসভায় টেনে নিয়ে গেল, তখন বুড়ো হ'লে হবে কি,—বাঙ্গালীর কোমর কি না—তাই সকলকার দেখাদেখি এক-একবার খেলিয়ে খেলিয়ে উঠতে লাগল। 'যা থাকে কপালে'—বলে' আমি সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম। প্রায় পনের মিনিট লাফিয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, তখন শুন্‌তে পেলুম পাশ থেকে দুটো বুড়ী মাগী বলাবলি করছে—'আহা, পণ্ডিত যেন ভাবে ঢলে' ঢলে' পড়্‌ছে। আমি যে জন্যে ঢলে' পড়্‌ছিলুম, সেটা যে ভাবের চৌদ্দ-পুরুষেরও কেউ নয়, তা বোধ হয় তোমাকে বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু করি কি, যাই ঐ কথাগুলো কাণে যাওয়া, অমনি ধিনিক্ ধিনিক্ করে' ফের নাচ সুরু করে' দিলুম। এক-একবার মনে হতে' লাগলো যে, দশা লাগাবার কায়দাগুলো যদি আয়ত্ত করে রাখতুম্ তা'হলে এই সময় ভারী কাজে লেগে যেতো। পাছে হাতে-পায়ে চোট লেগে যায়, সেই ভয়ে দশা লাগা আর আমার হ'য়ে উঠলো না। কিন্তু সেই সময় যদি সাহস করে' হাড়টা পাটার মায়া ত্যাগ করে' একবার আছাড় খেয়ে পড়্‌তে পার্‌তুম, তা'হলে কি রকম যে একটা 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে' যেতো, তা ভেবে এখন আমার আপশোষ হচ্চে। সুবিধেমত ত্যাগধর্ম্ম পালন কর্‌তে পার্‌লে, সেটা একদিন না একদিন কাজে লেগে যায়ই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বক্তৃতা বন্ধ করে' দিয়ে নিতান্ত ভাল মানুষের মত পণ্ডিতজী আমার মুখের দিকে একবার চাইলেন। বাঁকা কথা ছাড়া তিনি সোজা কথা বল্‌বেন না বলে' প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন। তাঁর গোবেচারীর মত নির্ব্বিকার মুখ দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। আমি বল্লুম—"পণ্ডিতজী, লোকের দোষ-ত্রুটিকে ঠাট্টা কর, সে এক কথা। ত্যাগ ধর্ম্মটাকে অমন খোঁচা মার্‌বার দরকার কি?" পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ত্যাগ বলে' যে একটা ধর্ম্ম আছে, তা ত আমি জানিনে। ত্যাগ কাউকেই যে ধরে রাখে না; আর যা ধরে রাখে না, তা ধর্ম্ম হবে কি করে? ত্যাগের গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, ভগবান সৃষ্টি করে' একেবারে ল্যাজেগোবরে হ'য়ে পড়েছেন, আর এখন সৃষ্টি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন—এই না? আর এই কথাটাই সংস্কৃত করে' বল্লেই তার নাম হ'য়ে যায় শঙ্কর ভাষ্য। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, তা নিয়ে টিকি-ছেঁড়া-ছিঁড়ি যতক্ষণ ইচ্ছে করতে পার; কিন্তু ভগবানকে এত বড় না-মরদ ত আমার

কখনই মনে হয় না। ভগবান আর যাই হোন্, তিনি গোঁসাইও নন্, নির্ব্বাণ-লোভী উদাসীও নন।"

ধর্ম্মের সোল এজেন্সি

গোপালদা আমাদের বেশ দুপয়সা জমিয়েছিল, কিন্তু এবার একটি টাটকা পাশকরা ভাল ছেলে দেখে বড় মেয়েটীর বিয়ে দিতে গিয়ে দেনায় কিছু জড়িয়ে পড়েছে। মেজ মেয়েটিও দশ উতরে এগারয় পড় পড়, সুতরাং শাস্ত্রমতে এক রকম অরক্ষণীয়া বল্লেই চলে। গোপালদার মত নিষ্ঠাবান হিন্দু ত আর সেটির বিয়ে স্থগিত রেখে নিরয়গামী হতে পারেন না। তাই গোপালদা মহা ভাবিত হ'য়ে পড়েছেন। আর গোদের উপর বিষ-ফোড়ার জ্বালাটা একবার দেখ। পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বৌদিদি আমার একটির পর একটি বংশধর প্রসব করেই চলেছেন। সে সব নেড়ি গেঁড়িগুলি সামলায় কে? দাদার একটি বেঁটে-খেটে গোবদা-গাবদা রকমের পিশ-শাশুড়ী অসুখের সময় বৌদিদিকে দেখ্‌তে এসে যে আড্ডা গেড়েছেন, তা আজ প্রায় এক বছর হ'য়ে গেল, নড়বার নামটি নেই। আজ ক্ষুদে মঙ্গলবার, কাল ঘেঁটুই ষষ্ঠী, পরশু তেরস্পর্শ—পোড়া পাঁজীওয়ালারাই কি একটা যাত্রা কর্‌বার ভাল দিন রেখেছে? তার উপর পুঁটি, খেঁদি আর গোব্‌রা তাঁর এমনি ন্যাওটো যে তিনি চোখের আড় হলেই তারা নাকি সব হেদিয়ে মারা পড়্‌বে। বৌদিদির একটি বিধবা পিস্‌তুতো বোন তারকেশ্বরে জল দিতে এসে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসে। তারপর থেকে তাকে এমনি গেঁটেবাতে ধরেছে যে, গোপালদা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, ততক্ষণ সে মেয়েটি আর নড়্‌তে চড়্‌তে পারে না। আহা অনাথা মানুষ, কোথাই বা যাবে?

এই ত অবস্থা। কাজেই গোপালদার বৈরাগ্যের মাত্রা যত পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়্‌তে আরম্ভ করেছে, মেজাজটাও সেই অনুপাতে চড়্‌ছে। বয়সও প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হোলো। আর তার উপর আজ খেঁদির জ্বর, কাল পুঁটির পিলে, পরশু পিশ-শাশুড়ীর দ্বাদশীর পারণ—এ সব কি ভাল লাগে? গোপালদা তাই ক্ষুব্ধ হ'য়ে তামাক টানুতে টানুতে বল্লেন—"কি বল্‌বো ভাই, এক একবার মনে হয়, যেদিকে দু চক্ষু যায়, বেরিয়ে পড়ি।' গয়লা বেটা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে; মুদী ত এমনি তাগাদা আরম্ভ করেছে যে, রাস্তায় বা'র হওয়াই দায়। এখন উপায়?"

পণ্ডিতজী ঘরের কোণে বসে' এক মনে চক্ষু বুজে তামাক টানছিলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলুম—"হাঁ পণ্ডিতজী, একটা উপায় ত কিছু বাতলে দাও।"

পণ্ডিতজী চক্ষু খুলে' গোপালের দিকে চেয়ে বল্লেন—"আরে, বুদ্ধি থাক্‌লে আবার পয়সার ভাবনা? আমি তোমায় আধ ঘণ্টার মধ্যে এক শো আট রকম পন্থা বলে' দিতে পারি; তাতে ধর্ম্মও হবে, অর্থও হবে। হাতের কাছে কিছু না পাও, গোটা দুই চার স্বপ্নাদ্য মাদুলি বা অব্যর্থ বটিকা বার করে' দাও। একটার নাম রেখে দাও 'ভবরোগ কালানল মাদুলি'—আর বলে' দাও তিব্বত দেশীয় মহাপুরুষ শ্রীমৎ বুজরুকলাল তোমায় স্বপ্নে সেটা দিয়ে গেছেন। রোজ সকালে উঠে সেই মাদুলিটি ধুয়ে একটু করে' জল খেলেই তাতে পারা ঘা, নালি ঘা, খোস পাঁচড়ার ঘা, প্রদাহ, চুলকানি, ফুসকুড়ি, ফোড়া, সাদা সাদা ঘা, চাকা চাকা ঘা, নতুন ঘা, পুরাতন ঘা, প্রাণের ঘা, নসীবের ঘা, যত রকম-বেরকমের কণ্ডূল ও ক্ষত প্রদাহাদি আরোগ্য হয়। আমাদের ঘেয়ো জাতটার বাজারে তা হলে হু হু ক'রে তোমার মাদুলীর কাটতি হবে।

বিনা পরিশ্রমে রাতারাতি কিছু লাভ হয় শুনলে আমাদের দেশের লোকে একেবারে লাফিয়ে উঠবে। তারপর রাস্তার ধুলো, ঘুটের ছাই আর বটের আটা মিশিয়ে একটা মহা-পুরুষত্ব লাভের অব্যর্থ বটিকা-টটিকাও করতে পার। আর বিজ্ঞাপন দেবার সময় বলে' দিও যে, বটিকা সেবনের ফলে লোকে মহাপুরুষ যদি নাও হয়, ত পুরুষ নিশ্চয়ই হতে পারবে। এ দেশে পুরুষের চেয়ে মহাপুরুষের সংখ্যা যে রকম বেড়ে চলেছে—তাতে কোনটা যে এখন বেশী দরকার, তা বোঝা মুস্কিল।"

গোপাল দা' একটু বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"পণ্ডিতজীর সব কাজেই ঠাট্টা।"

পণ্ডিতজী বললেন—"আচ্ছা দাদা, এ সব ছোটখাট ব্যবসায় তোমার মন না উঠে, ত আমি তোমার পয়সা রোজগারের পাকা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি। তাতে একটু বুদ্ধি খরচ কর্‌তে হবে বটে, কিন্তু একবার জমিয়ে নিতে পার্‌লে, তিন পুরুষ ধরে' বসে' খেতে পারবে। ভাল কথা, তোমার গুরুজী আস্‌ছেন কবে?"

গোপালদা' বললেন—"এই বৈশাখী পূর্ণিমার দিন।"

পণ্ডিতজী লাফিয়ে উঠে বললেন—"বাঃ বাঃ! ঠিক লেগে যাবে এখন। তুমি এখন থেকে রটিয়ে দাও, যে, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন জগদ্গুরু পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীশ্রীনির্ব্বিচারানন্দ স্বামীজী মহারাজ হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর মঠ থেকে পরা-সিদ্ধি লাভ করে, জীব-উদ্ধার করবার জন্যে ভারতখণ্ডে নেমে আসছেন। তুমি নিজেও একটু-আধটু জটা-টটা পাকাতে লেগে যাও। গৈরিকটা রেশমীই রেখে দিতে পার। বললেই চলবে—ওটা ভোগ মোক্ষের সমন্বয়। তার পরের কাজটুকুই আসল কাজ। তোমাকে বসতে হবে একেবারে প্রধান চেলা হয়ে। স্বামীজীকে ঘরের ভিতর পুরে এক-খানা নোটিশ টাঙ্গিয়ে দাও যে, তুমিই এই ধর্ম্মের কারবারের আদি ও অকৃত্রিম সোল এজেণ্ট। তোমার সুপারিশ না হলে স্বামীজীর কৃপালাভ অসম্ভব। তারপর বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও :—

(১) খাঁটি নির্ব্বাণ মুক্তি—মায়ার লেশ মাত্র নাই; বড় বড় মঠে গিয়ে পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারেন। দশ মিনিটে নির্গুণ ব্রহ্ম দর্শন না হইলে মূল্য ফেরৎ; নগদ মূল্য ১০৲ টাকা; কিস্তিবন্দি করিলে ১২॥০ টাকা।

(২) অকৃত্রিম বৈকুণ্ঠধাম দর্শন—মূল্য—৮৲ আট টাকা। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য ৬।০ ছয় টাকা চার আনা।

(৩) ইচ্ছামত দেবদেবী দর্শন—দেবতার তারতম্য অনুসারে তিন হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত।

একবার লাগিয়ে দাও দেখি, দাদা। তারপর টাকা আধুলী আর মোহর এমনি ঝমাঝম করে, পড়তে থাকবে যে, তোমার পিশ্ শাশুড়ী ধামায় করে' কুড়িয়ে শেষ করতে পারবে না।"

গোপালদা চুপ করে' বসে কি ভাবতে লাগলেন।

পণ্ডিতজী বললেন—"ভাববার এতে কিছু নেই; চাই শুধু একটু সাহস আর মিথ্যে কথা বলবার কায়দা; তা দু'চার দিন অভ্যাস করলেই আপনি এসে যাবে। আর এটা ত আর কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কত লোক এমনি করে' তোফা নেয়াপত্তি রকমের ভুঁড়ি পাকিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' সোণার গড়গড়ায় তামাক খাচ্চে। এ দুনিয়ার, জানই ত দাদা, শতকরা নিরানব্বই জন লোক একেবারে আস্ত গর্দ্দভ; চক্ষু বুজে ব্রহ্ম দর্শন হোলো কি অন্ধকার দর্শন হোলো, তাই ঠিক করতে পারবে না। আর এক আধটা বেয়াড়া লোক যদি তর্ক তোলে, তা'হলে আমায় কিছু দক্ষিণার ভাগ দিলেই আমি সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো যে, শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীচরণ প্রসাদে আমি নির্গুণ ব্রহ্মপুরুষকে হস্তামলকবৎ পেয়ে বসে' আছি। বস্, ল্যাঠা চুকে গেল।"

গোপাল দা' মাথা চুলকুতে চুলকুতে উঠে গেলেন। তার তিন দিন পরেই দেখি হ্যাণ্ডবিল ছাপান আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

আমার বরাত

ছেলেবেলায় একজন বৈদ্যনাথের ফকির আমার হাত দেখে গুণে বলেছিল—"বাবা, তোমার যে রকম অদৃষ্টের জোর দেখছি, তা রাজবংশে জন্মালে তুমি নিশ্চয় একটা রাজপুত্তুর হতে। তোমার রাজদণ্ড একেবারে জল জল করছে।" ভুল ক'রে রাজার ছেলে না হয়ে যখন বাবার ছেলে হয়ে পড়েছি, তখন আর উপায় কি? কিন্তু রাজদণ্ডটা ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারচে না।

আহ্লাদের চোটে সে দিন মাসীমায় বাক্স থেকে একটা চকচকে সিকি চুরি করে ফকির বাবাজীকে প্রণামী দিয়েছিলুম। তারপর দিন থেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দেখ্‌ছি, কবে কোথা থেকে একটা রাজ্য আর আধখানি রাজ কন্যা আমার অদৃষ্টে এসে পড়ে। কিন্তু বামুনে কপাল কিনা—পাথর চাপা।

* * *

সেই পাথর ফুঁড়েও একদিন আঁধার ঘর আলো করে' রাজকন্যা এসে পড়লেন। রাজকন্যাই বলতে হবে—কেননা তিনি ভাজনপুরের রাজার পিসতুতো শালার মাসতুতো বোনের ভাসুরঝি! অদৃষ্টটা আধখানা ফলে গেছে দেখে বাকি আধখানার জন্যে ওত পেতে বসে রইলুম। প্রথম যখন ১৯০৬ সালে স্বদেশীর পেটের ভিতর থেকে স্বরাজ উঁকি মারতে লাগল, তখন মনে হোলো এইবার বুঝি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে! তা, শিকে ছিঁড়ল বটে; কিন্তু রাজদণ্ডটা হাতে না এসে, পড়্‌লো একদম ঘাড়ে, আর দিলে আমায় একেবারে ধরাশায়ী করে। কোথায় রইল রাজ্য, আর কোথায় রইলেন রাজকন্যে!

* * *

আক্কেল যখন ফিরে এল—তখন বেশ বুঝতে পারলুম যে, হয় আমার খিদে পেয়েছে, নয় মাথা ধরেছে, নয় ভীষণ বৈরাগ্য হয়েছে। ঐ তিনটে জিনিষ এমনি এক রকম যে, আমার চোখে ওদের তফাৎ ধরাই পড়ে না। অনেক বিচার করে' স্থির করলুম যে, শাস্ত্রমতে যখন এ রকম অবস্থায় বৈরাগ্য হওয়াই উচিত, তখন নিশ্চয় আমার বৈরাগ্য হয়েছে। বিশেষতঃ আমার ধাৎটাই এমনি যে, ফি বছর অঘ্রাণ মাসে আমার একবার ক'রে বৈরাগ্য হোতো; আর শীতকালে কপি কলাইসুঁটি খাবার পর ভাল হয়ে যেতো। আমি মনে মনে তাই ঠিক করলুম যে, আবু পর্ব্বতের গুহায় গিয়েই হোক, আর নর্ম্মদার তীরে জঙ্গলে গিয়েই হোক, একবার চেপে আসন গেড়ে বসে সেকালের ঋষিদের মত হাজার দশেক বছর তপস্যা জুড়ে দেওয়া যাবে। কি রকম গভীর ত্যাগস্বীকার—তা তারিফ কর!

* * *

সেকালে রামচন্দ্র যখন কৈকেয়ীর প্যাঁচে পড়ে' বনে গিছলেন, তখন অযোধ্যার চারদিকে এমনি মরাকান্না উঠেছিল যে, তার জের এখনো পর্য্যন্ত মরেনি! এখনও আমাদের শশী মণ্ডলের মা সন্ধ্যাবেলা পা ছড়িয়ে রামায়ণ পড়ে আর নাকের জলে চোখের জলে হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, রামচন্দর এমনই কি বাহাদুরি করেছিলেন? আমি দিব্যি করে বলতে পারি যে, সঙ্গে যদি সীতা ঠাকুরুণের মত এক জোড়া শ্রীচরণের নূপুরধ্বনি রিনিঝিনি বাজতে থাকে, আর লক্ষণের মত ভাই খ্যাটের জোগাড় করে দেয়, তা হলে চৌদ্দ বছর কেন, আমরণ আমি বনে বনে কাটিয়ে দিতে পারি। তোমাদের কলকাতার দিকে ফিরেও চাইনে।

* * *

তাই ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম যে, একবার গিয়ে তপস্যায় বসি। দ্যুলোক ভূলোক যখন তপস্যার চোটে কেঁপে উঠবে, তখন আর কিছু হোক না হোক, তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে দেবতারা একটা উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন। অন্ততঃ বামুনের কপালে একটা রম্ভা ত জুটবে। তা জুটলো বটে; এক আধটা নয়, একেবারে অষ্টরম্ভা!

মোট কথা হচ্ছে যে, ধুনি জ্বালাতে-না-জ্বালাতেই পুলিশে তাড়া করলে। সেকালে তপস্যা করতে বসলে যখন দেবতাদের আসন টলে উঠতো, তখন তাঁরা নানা রকমের ষড়যন্ত্র করতেন বটে, কিন্তু সে সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য্য ছিল। আর আজকালকার রাজাদের যে aestheticsএর জ্ঞান একদম নেই, তার প্রমাণ হাতেই পেলুম।

কোথায় উর্ব্বশী, তিলোত্তমা—আর কোথায় পুলিশের ইন্সপেক্টর; আবার তাও মুখময় গোঁফ, দাড়ি। আরে ছ্যা:—

* * *

এখন যদি তোমার রামচন্দর আর একবার জন্মে বনে যান, ত সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁকে ১০৯ ধারায় পড়ে তিনটী বচ্ছর চট শেলাই করতে না হয়, ত আমি যা বলি সব মিথ্যে। রাজার ছেলে হ'য়ে বনে যাওয়া—এ কি ইয়ারকি? নিশ্চয় কোনো সিদিশাস কু-মতলব আছে।

যাক্ সে কথা। কিন্তু নর্ম্মদার তীরে একটি সগুম্ফ তিলোত্তমা আমার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করতেই আমি তপস্যাটা মুলতুবী রেখে সরে' পড়েছি। বাইরের রাজ্যির আশা ছেড়ে দিয়ে ঠিক করেছি যে, লোকে যেমন এঁড়ে গোরুর লেজ ধরে' বৈতরণী পার হয়, আমিও তেমনি বিজলীর চমক ধরে' অন্তরের মণিকোঠায় ঢুকে পড়ে' নিজের রাজ্যি ফেঁদে দেবো।

দেশের ভবিষ্যৎ

পণ্ডিতজী একটিপ নস্য নিয়ে বল্লেন—"দেশের কথা? তা শুনতে চাও ত বলতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি?"

ছেলেটী হাঁ করে' পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল, একটা ঢোঁক গিলে বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ, বিশ্বাস করব বৈ কি; আপনি বলুন না।"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"দেখো বাপু, আমি বলে' খালাস; ভালমন্দ জানিনে। তা ছাড়া জানই ত, আমি রোজ সন্ধ্যার সময় একটু করে' আফিম খাই।"

ছেলেটি আর-কিছু বল্‌বার আগেই পণ্ডিতজী আর এক টিপ নস্য নিয়ে আরম্ভ করে' দিলেন:—

"সে দিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা। সমস্ত দিন ঝুপ্ ঝুপ্ করে' জল পড়ে রাস্তাঘাট একেবারে ভেসে গেছে। পথে জন-প্রাণী নেই। মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করে' বাতাস বইছে, আর থেকে থেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি জানালা

খুলে চুপ করে' আকাশের পানে চেয়ে আছি, এমন সময় মনে হোলো, সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাঁপতে আরম্ভ করেছে। চার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম ঘর, দোর, জানালা, বাড়ী, কোথাও কিছু নেই, সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি আছি—কিন্তু কই, আমার শরীরটাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। ভাবলুম্ স্বপন দেখ্‌ছি—কিন্তু ন', দিব্যি টন্ টন্ করছে জ্ঞান। মনে হতে লাগলো শূন্যে কোথায় সোঁ সোঁ করে' উড়ে' চলেছি। সেই মহাশূন্য জুড়ে' কেও নেই—স্রধু আমি, আর আমি।"

ছেলেটি জিজ্ঞেস কর্‌লে—"আপনার ভয় কর্‌লো না?"

পণ্ডিতজী আর এক টিপ নস্য নিয়ে বল্‌লেন—"না, ঠিক ভয় নয়, তবে সমস্ত মনটা যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। আর মনে হতে লাগলো, একটা কিছু ঘট্‌বে, কিছু ঘট্‌বে। কতক্ষণ এ রকম ছিলাম তা জানিনে, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ শুনে আমার যেন সমস্ত মনটা কেঁপে উঠ্‌লো। এখানে কাঁদে কে? নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—যেন অস্পষ্ট কি একটা দেখা যাচ্চে। কে ও? কান্নার শব্দটা ক্রমে আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। মনে হতে লাগলো—কার যেন দেহ, মন, সব গলে গিয়ে একটি কান্নার সুর হয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলছে। কে ও কাঁদে?"

ছেলেটি পণ্ডিতজীর কাছে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—"তারপর?" পণ্ডিতজী খানিকটা চুপ করে' থেকে বল্‌লেন—"তারপর, তারপর হঠাৎ সে কান্না চুপ হ'য়ে গেল। সুমুখে চেয়ে দেখি, মহাশূন্য জুড়ে একটা জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে—আর সেই জ্যোতিঃর মাঝখানে এক দিব্যমূর্ত্তি। আর তাঁর পা থেকে একটা আলোর তরঙ্গ ছুটে গিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বক্ষে। সেই আলোতে দেখ্‌লাম—যে কাঁদ্‌ছিল সে কে!"

আমি তখন চুপ করে' বসেছিলাম। পণ্ডিতজীর এই আজগুবী ব্যাপার শুনে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"কে সে?"

পণ্ডিতজী আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"দেখলুম—একটি মেয়ে মাটীতে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। জীর্ণ শীর্ণ আসমুদ্র-হিমাচল-ব্যাপী কঙ্কালসার দেহ, আর কালো চুলের রাশি কাদায় লুটাচ্চে। তার পিঠের উপর একখানা প্রকাণ্ড পাথর চাপান আর পাথরের ধারে ধারে রক্তের দাগ লেগে রয়েচে। আলোর একটা তরঙ্গ গিয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদের মত মেয়েটার মাথার উপর পড়লো। সারা দেহ তার কেঁপে উঠলো। সে আকাশের পানে মাথা তুলে' দেখ্‌লে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মুখ করুণায় ভরে' গেলো। তিনি বললেন—।

মেয়েটি একবার হাতের উপর ভর দিয়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। পাথরের চাপে দেহ তার ফেটে ফেটে রক্তের ধারা ছুটতে লাগ্‌ল। মুখ তার চোখের জলে ভেসে গেলো। দিব্যপুরুষের পায়ের দিকে একবার কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে সে আবার পড়ে' গেলো।"

ছেলেটির মুখখানি বেদনায় ভরে' উঠলো। সে তার চোখ দুটি পণ্ডিতজীর চোখের উপর রেখে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"সত্যি?"

পণ্ডিতজী নস্যদানিটা বেশ করে' ঠুকে আর এক টিপ নস্য খুব জোরে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—"সত্যি-মিথ্যে জানিনে, যা দেখলুম তাই বল্‌ছি। সত্যি কি মিথ্যে তা ত চোখের সামনেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। ১৯০৭ ও দেখেছ, ১৯২১ ও দেখছ, পাঁচ-সাত বছর বেঁচে থাক্‌লে বাকিটাও দেখ্‌বে।"

হেঁয়ালিটা যেন একটু অস্পষ্ট হ'য়ে এল। ছেলেটি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"বাকিটা কি দেখ্‌লেন?"

পণ্ডিতজী একটু চুপ করে' থেকে বল্‌লেন—'যা দেখ্‌লুম, তা আফিমখুরির বাড়া। ভগবান কখনো কাঁদে বলে' মনে হয়?—হয় না। কিন্তু আমি সেইদিন ভগবানকে কাঁদতে দেখেছি। বেশ স্পষ্ট দেখেছি—সেই মেয়েটির জন্যে ভগবানের চক্ষু ফেটে জল পড়্‌লো। তিনি বললেন—"ওঠো, আমি যে তোমায় চাই।"

মেয়েটি চুপ করে' পড়ে' রইলো। বল্‌লে—"আমার শক্তি ফুরিয়ে গেছে; তোমার শক্তিতে আমায় তুলে' নাও। আমার দেহ, মন, প্রাণ যদি বেঁচে ওঠে, ত তোমার শক্তিতে বেঁচে উঠুক।" ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম হাসিতে ভরে' উঠেছে। হায় রে কাঙ্গাল ভগবান! তুমি এই কথাটি শোন্‌বার জন্যে এই হাজার বৎসর বসেছিলে? তারপর? তারপর সেই জ্যোতির তরঙ্গে গা ভাসিয়ে ভগবান নেমে এলেন। মেয়েটির হাত ধরে' বল্‌লেন—"এইবার ওঠো, তোমার বাঁধন খসে' গেছে।"

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"হাঁ পণ্ডিতজী, এটা কি খেয়াল?' পণ্ডিতজী বললেন—"কি জানি

দাদা, আমি তাই ভাবি। একবার মনে হয়—'এও কখন হয়'? আবার মনে হয়—'দেবতার লীলা; হবেও বা।'"

—

রকমারি স্বরাজ

সেদিন পণ্ডিতজীর ঘরে ঢুকে দেখি যে, তাঁর অমন তালগোল পাকান মুখখানি যেন বেগুন-পোড়ার মত হ'য়ে গেছে—চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্ত একেবারে নাসিকাবর্ণ। আমাকে দেখেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—"ভাখ, হপ্তায় হপ্তায় যদি এক-একবার নিয়ম করে' দাঁত খিচুনো যায়, তা'হলে দু-একটা দাঁত-খিচুনি বন্ধু-বান্ধবের গায়ে লাগ্‌বেই। সত্যি সত্যি ত আর ফি-বার রাস্তার লোক ধরে তাদের কাছে দাঁতের আর জিহ্বার কসরৎ দেখান চলে না। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের তাতে ঘোরতর আপত্তি। যিনি কাস্তে ভেঙে করতাল গড়িয়েছিলেন, তিনিও চোটে গেছেন, আর যিনি—"

কথাটা আর শেষ হোলো না। দরজার কাছে গোপালদা'র গোঁফ জোড়া দেখা দিতেই পণ্ডিতজী বলে' উঠ্‌লেন—"Talk of the devil and he is sure to come, এই যে গোপাল দা, কি খবর?"

গোপাল দা বল্‌লেন—"আর খবর! সেদিন গোলদীঘিতে বক্তৃতা শুনে এসেছিলুম যে, ঘরে ঘরে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে; তাই একবার নিজের ঘরে চেষ্টা করে' দেখ্‌ছিলুম। তা খদ্দরের নমুনা দেখেই গিন্নী তাঁর তিলফুলজিনী নাসাটীকে ৪৫ ডিগ্রী উঁচু করে' জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেখানে বিরাজ করছেন, তার দশক্রোশের মধ্যে স্বরাজকে ঘেঁসতে হবে না। তিনি যে-ঘরের গিন্নী, সে-ঘরের কোণে পক্ষীরাজের ডিম ফুটলেও ফুটতে পারে, কিন্তু স্বরাজের ডিম ফোটবার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজে কাজেই আর করি কি! 'দেবী আমার, সাধনা আমার'—বলে তাঁকে দূর থেকে আলিঙ্গন জানিয়ে সরে' পড়লুম।"

কথাগুলো শুনেই পণ্ডিতজীর বেগুন-পোড়ার মত মুখখানিতে কে যেন লঙ্কাবাটা ছড়িয়ে দিলে। তিনি তাঁর চোখ দুটি পাকিয়ে একবার রাইট টার্ণ করে' নিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—"ও ত জানা কথা। ঘরটা বাঙালীর পররাষ্ট্র; সেখানে স্বরাজ ফাঁদবার উপায় নেই। স্বরাজ গড়তে চাও, ত চলে' যাও একদম গোলদিঘীর পাড়ে আর গম্ভীবের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে মোটর চড়ে' বেড়াও, নয় ঢুকে পড় বিজলী সম্পাদকের মত অন্তরের মণি-কোটায়। পরের অন্তরে খোঁটা গাড়্‌তে গেলে যখন তাদের আপত্তি, তখন স্বরাজের খোঁটা নিজের অন্তরে গাড়া ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু এক এক জনের প্রাণের মধ্যে এক এক রকম স্বরাজের হুমোপাখী যে ডিম পাড়্‌ছে, তার কর্‌ব কি?"

আমি জিজ্ঞেস করলুম,—তাতে এত দোষটাই বা কি?

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"আরে বাপু, এই অন্তরের স্বরাজ একদিন-না-একদিন ঘোমটা খুলে' বাইরে বা'র হবে। তখন কার স্বরাজ খাঁটি, তাই নিয়ে গোলমাল লাগ্‌বে না? দেবভূমি ভারতের এই তেত্রিশ কোটী (অপ-) দেবতারা সবাই নিজের নিজের অন্তরে যদি এক-একটি স্বরাজ গড়ে' ফেলেন, তখন এই তেত্রিশ কোটী স্বরাজের ঠোকাঠুকিতে একটি স্বরাজও টিকিবে কি না সন্দেহ। শেষে খুচরো খুচরো স্বরাজের ঠেলা সাম্‌লাবার জন্যে রুশিয়া থেকে স্ব-রাজ না আমদানি করতে হয়! কে কার কাছে ঘাড় নোয়াবে বল,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কেউ ত কারু চেয়ে কম নয়! আমরা এক-একটি নোড়া নই, এক-একটি শালগ্রাম!

আমি মাথা চুলকুতে চুলকুতে বল্লুম—"তা, পণ্ডিতজী, গোড়ায় অমন একটু-আধটু গলদ হয়েই থাকে। দেশটা যখন নিজেদের হাতে এসে পড়্‌বে, তখন বাকি সবটা ঠিক ঠিক গড়ে নেওয়া যাবে।"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"অর্থাৎ আগে 'রাজ'টা গড়ে নেওয়া যাক্, তারপর 'স্ব'টা তার সঙ্গে জুড়ে দিলেই চল্‌বে; এই না? খুব বুদ্ধিমানের কথা; কিন্তু গড়ে কে? কেউ কলম, কেউ মৃদঙ্গ, কেউ লাঠি, আর কেউ তেলের বাটি নিয়ে হাজির হয়েছেন। কার অন্তরে যে কি রকম রাজ্যটী আছে, তা ত বোঝবার জো নেই। সবাই বলছে—'খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।' বক্তৃতা হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আর 'স্ব' টাকে খুঁজে না পেলে কোন রাজই গড়ছে না।

গোপাল দা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"অত গভীর তত্ত্ব বুঝিনে; তবে এটা ঠিক যে, দেশের সবাই এখন নিজের নিজের স্বার্থ বুঝ্‌তে পেরেছে। তা থেকেই একটা কিছু গড়ে উঠ্‌তে পারে; কেননা সেইটাই তাদের 'স্ব'।

পণ্ডিতজী ম্লান হেসে বললেন—"অত বুদ্ধি না হলে আর আমাদের পোড়া কপাল পুড়বে কেন? আচ্ছা, দেখ দেখি, এই তেত্রিশ কোটী দেবতাদের 'স্ব'টা কোন খানে? জমিদার দেবতা ভুঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন তাঁর 'স্ব' ঐ লাটের কিস্তিতে, রায়ত তার পাঁজরার উপর হাত দিয়ে বলছে 'আমায় 'স্ব' পেটের জ্বালায়'। কলওয়ালা বলছেন—'বাৎসরিক ডিভিডেণ্ডে'; মজুর বলছে—'হপ্তায় সাতসিকায়'। গোঁফেশ্বর বাবু বলছেন—'স্ব আছে এক কোটী টাকায়; লাট সিঙ্গি বলছেন—'খোলা ভাঁটিতে'। হিন্দু বলছেন—'বর্ণাশ্রমে', মুসলমান বলছেন—'খেলাফতে'। এতগুলো 'স্ব' নিয়ে একটা রাজ গড়া বড় মুস্কিলের কথা বটে। আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"তা হলে উপায়?" পণ্ডিতজী বললেন—উপায় নিরুপায়ের উপায়। জানই ত "It is the unexpected that always happens." বিশ্বাস না হয় খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন লটকে দাও। বলো—"হারিয়ে গেছে; আমাদের স্বরাজ গড়বার স্ব-টুকু। কেউ কেউ বলছেন, ওটা এদেশে কখনো ছিল না, বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে; কেউ বলছেন ভট্টাচার্য্য মশায় মাদুলিতে পুরে বর্ণাশ্রমের বাক্সতে বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেচেন। মোট কথা, কোথায় যে জিনিষটা আছে, তা কারও বুদ্ধির ভাণ্ডারে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। খুঁজে যে পাবে—চুপি চুপি আমায় জানিও। সারা দেশটাকে তার পায়ে লুটিয়ে দেব।"

গোপালদার বুজরুকি

প্রায় মাস দুই হোলো গোপাল দা'র আর কোন খপর-টপর পাওয়া যায়নি। তাঁর গুরুজী যখন এসেছিলেন, তখন দিন-কতক ছেলেদের মুখে অনেক রকম গুজব শোনা গিয়েছিল। গুরুজী নাকি দিনে রাতে কিছুই একেবারে খান না। রাত দুপুরে আসন করে' বসে মাটী ছেড়ে সাড়ে তিন হাত উপরে উঠে পড়েন। মা কালী নাকি অমাবস্যার রাতে তাঁর কাঁধে ভর করলে তিনি খল্ খল্ করে' হাসেন, আর কিড়মিড় করে' দন্ত বিচ্ছেদ করেন। আর নাকি তিনি বলেছেন যে, যাবার সময় তিনি গোপালদা'কে সব সিদ্ধিই দিয়ে যাবেন। কথাগুলো শুনেই বুঝেছিলুম যে, গোপাল দা' এইবার একটা কেষ্ট-বিষ্ণু হ'য়ে দাঁড়াবে।

সেদিন সকালবেলা আর কিছু কাজ ছিল না বলে' পণ্ডিতজীকে বল্লুম—"চল না, একবার গোপাল-দা'র খপরটা নিয়ে আসি।" পণ্ডিতজী চাদরখানা কাঁধে ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন "চল, অনেক কীর্ত্তিই এ বয়সে দেখা গেল; গোপালের কীর্ত্তিটাও দেখা যাক। গোপাল যে রকম উৎসাহী পুরুষ, তাতে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে একটা ছোটখাট মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, টিকে থাকতে পারলে কালে একটা অবতার হ'য়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। দেখা যাক্, যদি গোপালের কৃপায় স্বর্গে একটা berth reserve করে' রাখা যায়।

গোপাল দা'র বাড়ী পৌছতে-না-পৌছতেই তিনটী ছেলে এসে সমস্বরে খপর দিলে যে, গুরুজী এখন ধ্যানে বসেছেন। 'গুরুজী চলে' গেছেন না?' জিজ্ঞাসা করতেই পণ্ডিতজী আমার গা টিপে দিয়ে বললেন—"চুপ। বুঝছো না তোমার গোপাল দা'ই এখন গুরুজী হয়ে' উঠেছেন?" গোপাল দা'র গুরুজীত্ব প্রাপ্তি শুনে আমি বোধ হয় একটু বেশী রকম হাঁ করে' ফেলেছিলুম; আর ছেলেরা আমার দিকে যে রকম করে' চাইলে, তাতে এটা বেশ বুঝতে পারলুম যে, তাদের কোমল প্রাণে না জেনে-শুনে কোথায় একটু ব্যথা দিয়ে ফেলেচি। চুপচাপ করে' বৈঠকখানায় প্রায় আধ ঘণ্টাটাক বসে আছি, এমন সময় একটি ছেলে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এসে আস্তে-আস্তে সংবাদ দিলে—"মহারাজ আসছেন। মহারাজ আসছেন।" অনেকগুলি ছেলে সেখানে বসেছিল, তারা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে' বললে—"গুরু মহারাজকি জয়," আর পাশের একটী দরজা খুলে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে প্রবেশ করলেন—কে বল দেখি? আমাদের শ্রীমান্ গোপাল দা'।

এই দু'মাসের মধ্যেই গোপাল দা'র চেহারা ফিরে গেছে। দিব্যি সুঠাম, নধর চেহারা; পরণে গেরুয়া—অথচ পরিপাটী লম্বা কোঁচা ঝুলছে। গায়ে গেরুয়া রঙের পাতলা আলখেল্লা আর মাথায় বাবরী। একেবারে সত্বের মূর্ত্তরূপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালাগাছ-টিতে একটা চক্‌চকে মহত্ত্ব ফুটে বেরুচ্ছে। আর সবচেয়ে দেখবার জিনিষ দাদার সেই ত্যাগের নধর, নেয়াপাতি বর্ত্তুল ভুঁড়িটি। দেখে আমার সত্যি সত্যিই ঈর্ষা হোলো।

পায়ের ধূলো কাড়াকাড়িটা শেষ হ'য়ে গেলে, গোপাল দা' একটি যাত্রার দলের বলরাম গোছের ছেলেকে কি একটা ইঙ্গিত করে' দিলেন আর খানিক পরে স্তরে স্তরে রেকাবীতে সাজান চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যে সমস্ত জিনিষ এসে হাজির হোলো, তা দেখে আমার কপালের জ্ঞান-নেত্রটা একেবারে ফট্ করে' ফুটে উঠ্‌লো। বড় বড় সাধুদের যে ভুঁড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেটা যে শুধু আধ্যাত্মিক রসে ভরা নয়—তাতে গব্য রসের খাদও যে যথেষ্ট আছে, তা আর বুঝ্‌তে বাকি রইল না।

ভক্তিতে আমার প্রাণটা একেবারে গলে থস্‌থসে হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি গোপাল দা'র পায়ের কাছে টিপ করে' একটী প্রণাম করে বললুম—"দাদা, আজ থেকে আমায়ও তোমার দলে ভর্ত্তি করে নাও। তোমার পায়ে আজ থেকে আমি একেবারে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করে' দিলুম।"

আনন্দে গোপাল দা'র আধ-বোজা চক্ষুদুটি আরও একটু বুজে এল। তিনি ঈষৎ মাথা নেড়ে বল্‌লেন—"তোমার হবে।"

উৎসাহে আমি লাফিয়ে উঠে বল্‌লুম—"হবে বৈকি দাদা—থুড়ি গুরুজী! চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করে' দিয়ে কত নড়েভোলা লাট হয়ে গেল; আর আমরা সবাই মিলে যদি উঠে পড়ে লেগে যাই, তা'হলে বছর কতকের মধ্যে তোমায় একটা জগদ্‌গুরু কি অবতার করে' তুলতে নিশ্চয় পারবো। তখন আসিষ্ট্যাণ্ট অবতারের পোষ্টটা আমারই প্রাপ্য। ঢাক পিটিয়ে, ডিগবাজী খেয়ে, মূর্চ্ছো গিয়ে, কোন রকম করে আমরা আসর জমকে নেবই নেব। আর আপাততঃ আমাকে হেড-চেলা করে' নিয়ে যদি শতকরা পঁচিশ টাকা কমিসন দেও, তা'হলে আমি retired স্বদেশ-সেবক দলের ছেলেদের মাঝ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তোমার চেলা জুটিয়ে দেব।"

গোপাল দা'র ধ্যান-স্তিমিত চক্ষু একেবারে হাঁ করে' চেয়ে উঠ্‌লো। দাদার বাচ্ছা বাচ্ছা চেলা-গুলির ঢুলু ঢুলু চক্ষু ভেদ করে' যে রকম দৃষ্টি বা'র হতে লাগলো, সেগুলি ঠিক সাত্ত্বিক বলে' ভুল করা মুস্কিল। এমন কি, পণ্ডিতজী পর্য্যন্ত ফিক্ করে' একটু হেসে ফেললেন।

• আমার উৎসাহের এ রকম অমর্য্যাদা দেখে আমি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। গোপাল-দা'র ঠ্যাং জাপটে ধরে' বললুম;—"আমার গতি করতেই হবে। তোমার এ সুগম-মার্গ থেকে আমায় বঞ্চিত করলে চলবে না। তা'হলে আমি মনের দুঃখে গলায় রসগোল্লা গুঁজে দম আটকে মরে যাব। আর যে অবুঝ প্রাণীটাকে অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে বিশিষ্ট রূপে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছি, তিনিও সেই রসগোল্লার রসে ডুবে আত্মঘাতিনী হবেন। চিরদিন আমি ক্ষুধাপীড়িত, পত্নী-তাড়িত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবার জোগাড় হয়েছি। আমার বাড়ী গিয়ে দেখ, চালের হাঁড়িতে ইঁদুরে দুবেলা এন্‌তার ডন্ ফেলছে! কোনো ডেপুটীর সঙ্গে আমার এমন কোনো একটা বিশেষ মধুর সম্বন্ধ নেই যে, ইহকালের বন্দোবস্তটা করে' নিতে পারি।

ইঁদুরের ডন্ ফেলার বহর দেখে গোপালদা'র তুরীয় লোকে লীনপ্রায় মন একেবারে মূলাধারে নেমে এলো। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কাজে কাজেই সে দিনের মত সভা সাঙ্গ করে' আমিও পণ্ডিতজীর সঙ্গে বাড়ী ফিরলুম।...রাস্তায় পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এত থিয়েটারী ঢঙ্ কোথায় শিখ্‌লে হে?" আমি বললুম—"গোপাল দা' যখন আমাদের Dramatic Clubএর ম্যানেজার ছিল, তখন যে আমি তার সাকরেদী করেছি।"

অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ

সেদিন সঙ্কীর্ত্তনের সময় পণ্ডিতজীকে নাচ্‌তে দেখে মালপো-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক তাঁকে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর অনুরোধ করেছেন যে, অষ্ট-সাত্ত্বিক লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁকে একদিন বক্তৃতা করতেই হবে।

"এই সামলাও এখন ঠেলা"—বলে পণ্ডিতজী আমার দিকে চিঠিখানা ফেলে দিলেন; "সেদিনকার সঙ্কীর্ত্তনের জ্বালায় এখনও কোমরে মালিশ করতে হচ্ছে; আর তার উপর আজ যদি অষ্ট-সাত্ত্বিক খেঁচুনীর কসরৎ দেখাতে হয়; তা'লে সন্ধ্যাবেলা দম আটকে গিয়ে রাত নটা আন্দাজ বৈকুণ্ঠে পৌঁছে যাবো। না বাবু, ও-সব বৈকুণ্ঠে-ফৈকুণ্ঠে আমার পোষাবে না। অমনি কেউ মালপো দেয়, ত খবর দিও।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম—"তোমার মধ্যে বৈকুণ্ঠে যাবার লক্ষণ বিশেষ ত কিছু দেখছিনে।"

পণ্ডিতজী আশ্চর্য্য হ'য়ে চোখ দুটো কপালের মাঝখানে তুলে' বল্‌লেন—"বল কি হে! তুমি ত শাস্তর মান না দেখ্‌ছি! একে আজ লক্ষীবার, তার উপর যদি গলায় মালপো আটকে গিয়ে অষ্ট-সাত্ত্বিক খেঁচুনি খেঁচতে খেঁচতে দেহত্যাগ হয়, তা'হলে বিষ্ণুদূতেরা ছেড়ে দেবে মনে করেছ? হরি-ভক্তি-বিলাসের মালপো-খণ্ডখানা একবার পড়ে' দেখো দেখি।"

"তা, বৈকুণ্ঠে যেতে তোমার এত আপত্তিই বা কেন?"

পণ্ডিতজী বললেন—"বাঃ! প্রথমেই ত বৈকুণ্ঠে ঢুকতে-না-ঢুকতে চতুর্ভুজ হ'য়ে যেতে হবে। দুটো হাতের খাটুনিই খেটে উঠ্‌তে পারিনে, তা আবার চারটে হাত! আর ভগবান যে সিংহাসনে বসে' আছেন, তার চারিদিকে পার্ষদেরা যে ধূপ-ধুনো, গুগ্‌গুলের ধোঁয়া দিয়ে রেখেছেন, তা চোখে লাগ্‌লেই ত অন্ধকার। তার ওপর রাত নেই, দিন নেই, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, আরতি লেগেই আছে। বড় বড় ভুঁড়েল ভক্তেরা চারদিকে চামর দোলাচ্ছে, আর ঐ নারদ বাপজীবন কেবল সংস্কৃত শোলোক আউড়ে আউড়ে ঘুরচেন। দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ থেকে আরম্ভ করে' হনুমান দাস বাবাজী পর্য্যন্ত যত সব ভক্তেরা মরে' বৈকুণ্ঠে গেছেন, সবাই হয় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে স্তবস্তুতি পাঠ করছেন, নয় ত লম্বা হ'য়ে পড়ে' পড়ে' নাক রগ্‌ড়াচ্ছেন। বাপ! আর আমার বৈকুণ্ঠে পার্ষদ হ'য়ে কাজ নেই। ঘণ্টা কতক ঐ রকম হাত জোড় করে' দাঁড়িয়ে থাকতে হলেই, হয় আমার নারদের দাড়ী ধরে' টান মারবার প্রবৃত্তি হবে, নয় ত গড়ুরের নাকটা ধরে' আরও ইঞ্চি কতক লম্বা করে' দেবার ইচ্ছে হবে।"

"তাই ত; পণ্ডিতজী, বৈকুণ্ঠের এমন হুবহু নক্সা পেলে কোথা থেকে?"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন,—"দাদা, তোমরা খিস্রুকেলি সোসাইটীর লোক, আর এই খপরটা রাখ না? একবার লেডবিটারের বইগুলো হাতড়ে দেখো দেখি, ভূতলোক, প্রেতলোক থেকে আরম্ভ করে গোলোক, ঢোলোক এমনকি নোলোক পর্য্যন্ত সব রাজ্যের খবর সেখানে পাবে। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা কোন্ লোকে কোন্ খোঁটার বাঁধা আছে, ঐরাবত কি রকম চিন্ময় খোল-বিচালি খায়—তার ফটো পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাবে। বাগবাজারের আড্ডায় বাইরে অত খবর আর কোথাও পাওয়া যায় না। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ, এসব ত অনেক দিনের জিনিষ, কিন্তু ধূম্রমার্গ এঁদের একেবারে নিজস্ব আবিষ্কার। দেড় ছটাক বৌদ্ধধর্ম্ম, আধ ছটাক বেদান্ত, এক ছটাক বুজরুকি আর এক ছটাক গঞ্জিকা, বেশ করে' এক সঙ্গে সিদ্ধ করে' এঁরা ভবরোগের পাঁচন যা বানিয়েছেন—তা তারিফ কর্‌বার জিনিষ বটে।"

সমালোচনাটা ক্রমে সভ্য রুচি বিরুদ্ধ হ'য়ে যাচ্চে দেখে আমি বল্লুম—"চুলোয় যাক তোমার খিস্রুকেলি সভা। তোমার ভাব গতিক যে রকম দেখছি, তা'হলে তুমি সাত্ত্বিক লক্ষণের বক্তৃতা দিতে যাচ্চ না?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"দরকার হ'লে আমি আটটা কেন, চৌষট্টি রকম সাত্ত্বিক লক্ষণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে দিতে পারি—কেননা, বাবাজীদের আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিকতার পর, পদী পিসির গার্হস্থ্য-সাত্ত্বিকতা, অন্তঃপুরের পিঁজরাপুলী-সাত্ত্বিকতা, উপবাসের সাত্ত্বিকতা, রাজনীতিক নৈষ্কর্ম্মের সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি নূতন নূতন জিনিষ গজিয়েছে। তবে কোমরের ব্যথাটা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে দুহাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ায় অপারগ—দাদা, অপারগ।"

পাঠান রাজত্ব

সকালবেলা দাওয়ায় খেলো হুঁকোটি হাতে ক'রে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে একটা আওয়াজ এল—'দাদা-ঠাকুর!' আওয়াজটা যে আমাদের গোপীনাথ ওরফে গুপে বাগ্‌দীর ভাঙ্গা কাঁশরের মত গলা থেকে বেরিয়েছে, তা পিছন না ফিরেও বুঝ্‌তে বাকি রইল না। আর কুণ্ডলী পাকান ধোঁয়াটুকু আমার আজ্ঞাচক্র ভেদ করে' সহস্রারে ওঠ্‌বার সময় মগজের মধ্যে যে রঙ বে-রঙের আধ্যাত্মিক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করছিল, তাতে বাধা দেবার প্রবৃত্তিও আমার ছিল না। তাই পিছন না ফিরেই জিজ্ঞেস করলুম—"কেও, গোপীনাথ যে! কি খবর?"

গোপীনাথ আস্তে আস্তে সুমুখে এসে গলাটা নীচু ক'রে আমার কাণের প্রায় হাত খানেকের মধ্যে মুখ নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—"হাঁ, দাদা-ঠাকুর, সত্যি নাকি? কাবুলের আমীর নাকি দিল্লী দখল করতে আসছে?"

—"আরে বাঃ, এই যে! খবরটা তোর কাছেও এসে পৌঁছেচে দেখ্‌ছি! কে বল্‌লে রে, গোপীনাথ?"

"এঁজ্ঞে ও-পাড়ার বছিরুদ্দি মোড়ল ফুরফুরেতে তাদের পীর সাহেবের দরগায় গিয়েছিল, সেই শুনে এসেছে।"

ক'দিন ধরে' খবরের কাগজে ঐ কথা নিয়েই তাল-ঠোকাঠুকি দেখতে পাচ্ছি। এতদিন ও-ব্যাপার নিয়ে গবেষণা কর্‌বার ভার মেসের ছেলেদের আর দেশের নেতাদের ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলুম। আজ গোপীনাথকে তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে রঙীন আধ্যাত্মিক রাজ্য সৃষ্টি কর্‌বার আরাম ছেড়ে উঠে বস্‌তে হোলো। তাই ত! শেষে সত্যি সত্যি আর-একবার কাবুলী কোঁৎকা অদৃষ্টে আছে না কি?

পাশের ঘরে পণ্ডিতজী চিৎ হ'য়ে চক্ষু বুজে একখানা খবরের কাগজ পড়বার ভান করছিলেন। আমি সেখানে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"বলি ও পণ্ডিতজী, দিব্যি চক্ষু বুজে আরামে পড়ে' থাকা হচ্ছে, এ দিকে আফগান যে এল বলে!"

পণ্ডিতজী একটা হাই তুলে বল্‌লেন—"আরে বাঁচি তা'হলে! চিৎ হ'য়ে পড়ে' পড়ে' কোমরে পিঠে বাত ধরে' গেছে। কাবুলি দাওয়াই ছাড়া এ বাত যে সার্‌বে বলে ত মনে হয় না।"

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লুম—"না না, হাসির কথা নয়, যেখানে এতখানি ধূম, সেখানে কিছু-না-কিছু অগ্নি আছে নিশ্চয়ই। সত্যি সত্যিই যদি আফগানেরা হুমকি দিয়ে এসে দাঁড়ায়—তখন কি হবে?"

পণ্ডিতজী হেসে বল্‌লেন—"আরে হবে আর কি অশ্বডিম্ব; খুব জোর দু একখানা 'পদ্মিনী' নাটক লেখা হবে। আর দেশের যে সব বাবুভায়ারা চোখাচোখা ইংরিজী ইডিয়ম ভেঁজে ইংরেজের কাছ থেকে 'ডমিনিয়ন্ সেলফ্ গবর্ণমেণ্ট' ভোগা দিয়ে মেরে দেবার চেষ্টায় ফির্‌ছেন, আমীর সাহেব দিল্লীতে ঢুকতে-না-ঢুক্‌তেই তাঁরা বড় বড় মৌলবী ধরে' তোফা একখানি ফার্সি দরখাস্ত লিখিয়ে দিয়ে দিল্লীর দরজায় গিয়ে ধর্‌ণা দেবেন। পাঠান হোসেন শার আমলে বাংলা সাহিত্যের কি রকম উন্নতি হয়েছিল, পাঠান সের শার আমলে দেশে প্রথমে কি রকম ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হয়েছিল, এই রকম অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা সে অভিনন্দন-পত্রকে অলঙ্কৃত করবে; ছেলেরা এ, বি, সি, ডি ছেড়ে দুলে দুলে আলেফ, বে, পে, তে শিখতে আরম্ভ কর্‌বে, যাঁরা এখন মিনিষ্টার হ'য়ে পড়েছেন, তাঁরা উজীর হ'য়ে দাঁড়াবেন, আর দেশময় বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে বেড়াবেন যে, পাঠান রাজত্বের মত রাজত্ব কখন হয়নি, হবে না। গ্রীষ্মকালে তাঁরা দারজিলিঙে বেড়াতে না গিয়ে কাবুলে বেড়াতে যাবেন, আর রকম-বেরকমের মেওয়া খেয়ে লাল হয়ে ফিরবেন। পাঠান রাজত্বের নামে এত ভয় পাবার কি আছে? পরের বাপকে বাপ বলা যাদের অভ্যাস আছে, তাদের কাছে ইংরেজই বা কি, পাঠানই বা কি!"

পণ্ডিতজী জিনিষটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছেন দেখে আমার রাগ ধরে' গেল। আমি বল্‌লুম—"আরে ছাই, দেশ শুদ্ধ ত আর মডারেট নয় যে নিজের নিজের পুঁটুলি বাঁধ্‌তে ছুটবে। পাঠান এলে দেশে শান্তিরক্ষা কর্‌বে কে?"

পণ্ডিতজী নিতান্ত ভালমানুষটির মত মুখখানি করে' বললেন—"হাঁ, ওটা ভাব্‌বার কথা বটে। পাঠানেরা ইংরেজের মত অতটা শান্তিরক্ষা কর্‌তে পারবে কিনা সন্দেহ। এত মেশিনগান ওরা পাবে কোথা? দেখ দেখি, ডায়ার কেমন সোণার চাঁদ—পাঁচ মিনিটে হাজার খানেক লোককে একবারে শান্ত করে' ছেড়ে দিল! পাঠানেরা জংলী কি না; শান্তিরক্ষার এত কায়দা শিখ্‌বে কোথা? যতদূর দেখ্‌তে পাচ্চি, লোকে এখন দিব্যি শান্তিতে মর্‌ছে, তখন মহা অশান্তিতে বেঁচে থাক্‌বে। আর হয়ত অনেকদিন ধরেই লোককে বেঁচে থাক্‌তে হবে। কেননা পাঠান যতই পেট ভরে' খাক, ছাঁদা বেঁধে Home Charge বাড়ী নিয়ে যাবে না। দেশময় যে এতগুলো কল-কারখানা বসেছে, তাদের হয়ত শতকরা ২০০৲ টাকা করে' ডিভিডেণ্ট বিলেতে পাঠাবার সুবিধা হবে না। দেশের ধানচাল যদি দেশে থেকে যায়, তা'হলে খুব সম্ভবতঃ লোকে পেট ভরে' খাবে, পেট ভরে' খেলেই শান্তিরক্ষার যে প্রধান সহায়—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, সেগুলো লোপ পেয়ে দেশে অশান্তির মাত্রা বাড়্‌তে পারে। এটা সত্যি কথা, মান্‌তেই হবে যে, ইংরেজেরা এই দেড়শ' বছরে দেশটাকে যত ঠাণ্ডা করে' এনেছে, পাঠানেরা আগে পাঁচশ' বছরেও তা পারেনি।"

কথাগুলো আমার বাঁকা বাঁকা মনে হোলো! আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম—"আচ্ছা পণ্ডিতজী, তুমি

কি সত্যি-সত্যিই মনে কর যে, ইংরেজ রাজত্বের চেয়ে পাঠান রাজত্ব ভাল?"

পণ্ডিতজী আধ হাত জিভ কেটে বল্‌লেন—"আরে রামচন্দ্র! এ কথা আমি আবার কখন বল্‌লুম? আমি ত আর সত্যি সত্যি প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে মরিয়া হ'য়ে বসিনি! কালাপানিতে ফিরে যাবার বিশেষ আগ্রহও আমার নেই। আমাদের দেশের অনেক ইংরেজী-পড়া পণ্ডিত পাঠানের নাম শুনেই তাঁদের বড় সাধের ডিমক্রেশীর শতেক খোয়ার হবে ভেবে কাতর হ'য়ে উঠেছেন, তাই বদ্ অভ্যাস বশতঃ ঐ সব কথাগুলো বলে' ফেল্‌লুম। যক্ষ্মাকাশে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে বেশী লাভ, কি কলেরায় দু-একটা দমকা ভেদ হয়ে মরা বেশী ভাল—এ নিয়ে অনন্ত কাল তর্ক চল্‌তে পারে; বিশেষ কোন সুমীমাংসার আশা আছে বলে' মনে হয় না। তবে কোন পণ্ডিত যদি মনে করেন যক্ষ্মারোগী হ'য়ে ধুঁকতে ধুঁকতে না মর্‌তে পার্‌লে স্বরাজ্য—থুড়ি, স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না, তা'হলে তাঁর বিত্তার বালাই নিয়ে মর্‌তে ইচ্ছা হয়।"

আধ্যাত্মিক Famine Insurance Fund

সেদিন আবার গোপালদা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছলুম। প্রায় ডজনখানেক শিষ্য-সেবকের মাঝখানে দাদা বিরাজ কর্‌ছেন। দেখ্‌লুম এই তিন মাসের মধ্যেই কাঁচা, ডাঁশা, আধ-পাকা, থস্‌থসে পাকা, অনেক রকম শিষ্যিই দাদার জুটেছে; এক-আধটা শিষ্যাণীরও অভাব হয়নি। তবে কচি কচি তালশাঁসের মত শিষ্যের সংখ্যাই কিছু বেশী! একটি ছোট্ট ছেলে মাষ্টারের মারের জ্বালায় non-co-operate করে' এসে দাদার কাছে ধর্ম্মজীবন নিয়েছে। ছেলেটির এমনি গভীর বৈরাগ্য যে, দাঁতের ছ্যাতলাটুকু পর্য্যন্ত মাজে না, চোখের পিঁচুটিটুকু পর্য্যন্ত পোঁছে না—পাছে এই নশ্বর শরীরের উপর আসক্তি এসে পড়ে। দাদা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ছেলেটির যে রকম গভীর নিষ্ঠা আর ভক্তিমার্গে সে যে রকম বন্ বন্ করে' ছুটেছে, তাতে দুদিন পরে সে ধ্রুব-প্রহ্লাদের মাসতুতো ভাই হ'য়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম—"বাপু, কি কর?" ছেলেটি উত্তর কর্‌লে—"গুরু মহারাজ যা' করান।" ভক্তিটা এমনি ছোঁয়াচে জিনিষ যে, শুনে আমার পাষাণ প্রাণও গলে পাঁক হ'য়ে যাবার জোগাড় হোলো; আর থেকে থেকে শরীরটা পুলকে ঝিলিক মেরে উঠ্‌তে লাগলো। ইচ্ছে হলো একেবারে দাদার পায়ে আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়ি।

ও-পাড়ার যদু পোদ্দারের ছেলেকে দাদা ওজস্বিনী ভাষায় আত্মসমর্পণের মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছিলেন। ছেলেটি কিছুদিন আগে লোহার ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা কামিয়েছিল। সেই অবধি দাদা আবিষ্কার করে' ফেলেচেন যে পূর্ব্বজন্মে ঐ ছেলেটির সঙ্গে তাঁহার একটা গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। এ জন্মে যাতে যোগটা বেশ পাকাপাকি হয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র থেকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে, তার জন্যে দাদা উঠে-পড়ে' লেগেছেন। গুরুর নামে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে দিলেই স্বয়ং ভগবান যে সে দান হাত বাড়িয়ে নেবেন, নানাশাস্ত্র মন্থন করে এই সার সত্যটুকু গোপাল দা' তার কাণের মধ্যে বিন্দু বিন্দু করে' ঢেলে দিচ্ছিলেন। বিশ হাজার টাকায় যে বৈকুণ্ঠে একটা Ist class berth reserve (ফার্ষ্ট ক্লাস বার্থ রিসার্ভ) করা যায়, সে কথা ত বেদ্ধিক পুরাণে স্পষ্টই লেখা আছে! আর তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় ত গীতাখানাই পড়ে দেখ না। ভগবান স্বয়ং যে বলে যাচ্ছেন—"যোগক্ষেম বহাম্যহম্", তার মানেটা কি? আধ্যাত্মিক পথের কাঁটা খোঁচা ত সাফ হ'য়ে যাবেই, অধিকন্তু ইহকালেও তোমার বিজয়-রথ একেবারে লোকের বুকের উপর দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে' যাবে! ভোগ আর মোক্ষের একদম সাফ্ সমন্বয়! বস্, আউর কেয়া?

যোগক্ষেমের ব্যাখ্যাটা শুনেই আমার কপালের তৃতীয় নেত্রটা হাঁ করে' চেয়ে উঠ্‌লো। তাইত! আমার গীতাজ্ঞানটা একেবারে মর্‌চে ধরে' গেছে দেখছি! ভগবান যে তাঁর অপোগণ্ড ভক্তগুলির জন্যে একটা Famine Insurance Fund খুলে রেখেছেন, সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। এই যে দেশের তেত্রিশ কোটি জীব 'হা অন্ন হা অন্ন করে' মর্‌ছে—কি ভীষণ বোকা এ গুলো! রোদে পুড়্‌তে হবে না, জলে ভিজ্‌তে হবে না, লাঙ্গল চষ্‌তে হবে না, ধান ভান্‌তে হবে না—শুধু একবার চোখ-কাণ বুজে দাদার ভক্তের খাতায় নাম লিখিয়ে ভগবানের ভাণ্ডারের চাবিকাটিট হাতে নিয়ে বসে' পড়। কারণ, লোকের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তখন হাঁড়ি হাঁড়ি রসগোল্লা আর পান্তুয়ায় তোমার ঘর একদম বোঝাই হ'য়ে যাবে। দেশে দুর্ভিক্ষ?

—আরে তাতে কি? ভগবান অভক্তদের ঘাড় ভেঙে ভক্তদের থ্যাটের ব্যবস্থা করে' দেবেনই। এমন না হলে তাঁর দয়াল নামে কলঙ্ক হবে যে!

ভাব্তে ভাব্তে আমার চোখে একেবারে প্রেমাশ্রুর বান ডেকে গেল। আমি স্থির করলুম যে এখনই আমার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ নগদ তিন টাকা ছয় আনা দাদার পায়ে ধরে' দিয়ে পরকালের না হোক, ইহকালের জন্যে একটা আটুকে বাঁধবার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু দাদা সেদিন বিশহাজারী কাপ্তেনকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বলে' আমার তিন টাকা ছ আনা পকেটেই রয়ে গেল।

তার পরদিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হতেই মনে হোলো দিই একবার তাঁকে যোগক্ষেমের ঠেলাটা দেখিয়ে। ভারি তিনি মাঝে মাঝে সাধুদের ঠাট্টা করেন যে! কিন্তু গোপাল দা'র যোগশক্তির বলে কি রকম অর্থসিদ্ধি হয়েছে তা শুনতে-না-শুনতেই তিনি হাত পা ছড়িয়ে হোঃ হোঃ করে' হাস্তে আরম্ভ করে' দিলেন। লোকটা কি পাষণ্ড গো!

আমার ভারি রাগ ধরে' গেলো। বল্লুম— "তুমি কি বলতে চাও তা' হলে যে, টাকা টাকা করে' মানুষ ছুটোছুটি করে' না বেড়ালে তার আর পেটের জ্বালা ঘুচবে না?"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"আরে পাগল, তা নয়, তা নয়। যারা নারায়ণকে পায়, তারা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীকেও পায়, কিন্তু চোখ বুজে দু' একবার বসতে-না-বসতে যারা মনে করে যে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে নেবে, তাদের ডিগবাজী খেয়ে চিৎ হ'য়ে পড়তে বড় বেশী দেরী লাগে না। আর মেয়েরা ভগবানের মুখে একটা কথা বসিয়ে দিয়েছে জানিস্ ত?—

"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।
তবুও যে করে আশ, হই তার দাসের দাস॥"

ভগবানকে দাসের দাস করবার আগে নিজের সর্ব্বনাশটা করতে হয়।"

প্রেম ও ডাণ্ডা

মেজে-ঘসে রূপ আর ধরে-বেঁধে প্রেম—এটা নাকি হবার জো নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এত বড় মিথ্যে কথা দুনিয়ায় খুব কমই পাচার হয়েছে। মেজে-ঘসে যদি রূপ না ফুটতো তা'হলে ত আমাদের থিয়েটারগুলো এতদিন অচল হ'য়ে যেতো। এই দেখনা আমাদের ফেঁদি সুন্দরীকে। ইনি যখন আলুচেরা চোখ দুটিতে সুর্‌মা লাগিয়ে, চুলগুলি ফুলিয়ে দিয়ে কপালের পরিমাণ ঢেকে ফেলে, জোঁকের মত ঠোঁট দুখানিতে তরল আলতা লাগিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ান, তখন সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসার দশ বছরের তপস্যা ভেঙে যাবার যোগাড় হ'য়ে যায়। অরূপের মধ্যে রূপ ফোটান—এই ত সৃষ্টির গোড়ার কথা!

আর তারপর ধরে-বেঁধে প্রেম। হয় না বলছ? বলি জাহাঙ্গীর বাদশা যখন নুরজাহান বিবিকে বর্দ্ধমান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন, তখন ব্যাপারটা যে খুব নন্-ভায়োলেণ্ট রকমের হয়নি, একথা ইতিহাসে ত লেখে। বেগম সাহেব যে প্রথমটা চোটে একেবারে লাল হয়ে তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করেছিলেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু তিন দিন না যেতে যেতে রাগের লালটুকু যে প্রেমের গোলাপীতে পরিণত হয়েছিল, এ কথা ত আর অস্বীকার করবার জো নেই! ম্যাদামারা ভালমানুষ স্বামীর স্ত্রী দজ্জাল; আর দস্যি জবরদস্ত স্বামীর স্ত্রী হয় একেবারে মেনী বেড়ালটার মত পতিব্রতা— কেন বল দেখি? আসল কথা হচ্ছে—মেয়েরা চায় একটুখানি জবরদস্তি। স্বামী যেখানে মডারেট, স্ত্রী সেখানে একদম সাফ্রেজিট (suffragette)।

রাজনীতিতে যেমন দুটো রাস্তা—মডারেট (Moderate) আর এক্সট্রিমিষ্ট Eztremlst, প্রেমনীতিতেও ঠিক তাই। একালের মডারেট প্রেমিকেরা লতানে চুলে সিঁথি কেটে প্রেমিকার পানে কাতর দৃষ্টি হান্তে হান্তে কবিতার খাতা বোঝাই করেন; আর সেকালের এক্সট্রিমিষ্ট প্রেমিকেরা বেড়ালে যেমন করে' ইঁদুর ধরে তেমনি করে প্রেমিকাকে বগলে পুরে ঘোড়ায় চড়ে' পগার পার হতেন। ছিঁচকাঁদুনে প্রেমের চেয়ে যে মিলিটারী প্রেমটা ঢের ভালো, তার সাক্ষী ইতিহাস আর পুরাণ। আমাদের প্রপিতামহীরা যে প্রপিতামহদের সঙ্গে চিতায় পুড়ে স্বর্গে চলে যেতেন, সেটা শুধু স্বর্গে গিয়েও ঐ মিঠে মিঠে জবরদস্তিটুকু পাবার লোভে। বিশ্বাস না হয়, ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে' দেখো।

* * * *

রাজনীতির দিকেও চেয়ে দেখ না। সেখানেও প্রেম আদায় করবার মন্ত্র হচ্ছে জবরদস্তি। ওয়াশিংটন যদি কাঁদুনি গেয়ে বলতেন যে আমেরিকা স্বাধীন করে' না দিলে তিনি মনের দুঃখে সাত

রাত্রি উপোস করে' মারা যাবেন, না হয় গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বেন, তা'হলে আজ আমেরিকার দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদ্‌তো। আজ যে ইংরেজ আমেরিকার সঙ্গে প্রেমে পড়্‌বার জন্যে এত ব্যস্ত, তার মূলে হচ্ছে ঐ ওয়াশিংটনের ডাণ্ডা। তাল বুঝে ঐ ডাণ্ডা লাগাতে পারুলে নবদ্বার ভেদ করে' প্রেমের প্রবাহ ছুটবেই ছুট্‌বে।

* * * *

আরে দাদা, প্রেমনীতি, রাজনীতির কথা কি বল্‌ছো। গুঁতোর চোটে ভগবান পর্য্যন্ত প্রেম করতে রাজী হ'য়ে পড়েন। মিত্রভাবে সাত জন্মে আর শত্রু ভাবে যে তিন জন্মে মুক্তি হয়, এটা হিঁদুর ছেলে হয়ে ত অস্বীকার করবার জো নেই। আরে না, না—এটা সেকেলে থিওরি মোটেই নয়। আমাদের হারু গয়লা কি করে' তিন দিনে সিদ্ধ-পুরুষ হ'য়ে গেছলো, তা শোননি বুঝি? কিছুই খবর রাখ না; তবে শোন বলি।—

বৈশাখ মাসের রোদে সারাদিন বাঁকে করে' দুধ বয়ে' বয়ে' সন্ধ্যার সময় হারু বাড়ী ফিরে দেখ্‌লে যে, তার মায়ের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে বৌ চলে' গেছে বাপের বাড়ী। উনুনে আগুনটা পর্য্যন্ত পড়েনি। লোকে বলে গয়লার ছেলের আশী বছরের আগে বুদ্ধি খোলে না; কিন্তু পেটের জ্বালায় হারুর তখনি তখনি জ্ঞান ফুটে উঠ্‌লো। সে দিব্যচোখে দেখ্‌তে পেলে যে, সংসারটা একেবারে মরুভূমি। বৈরাগ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেদ না পড়েও বুঝ্‌তে পারুলে যে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" কাঁধে একখানা গামছা ফেলে বাঁকটা হাতে করে' সে সন্ন্যাসী হবার জন্যে বেরিয়ে পড়্‌লো। চল্‌তে চল্‌তে এক শিবমন্দিরে এসে সে-রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দিলে। তার পরদিন হাজার হাজার লোক শিবের মাথায় জল দিতে এলো। কত চাল কলা সন্দেশ এসে স্তূপাকার হ'য়ে পড়লো; কিন্তু গয়লার পোর খোঁজ খবর কেউ আর করলে না। একে বৈরাগ্য, তার পর দুদিন অনাহার; কাজেই হারুর মেজাজটা ক্রমেই চড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার পরদিন সকাল বেলা সে গামছাখানি কোমরে বেঁধে বাঁকগাছটা হাতে নিয়ে একেবারে চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়ালো। যেই যাত্রী আসে, অমনি, দে-ধনাধন্‌। যাত্রীরা ত প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পারুলে চম্পট্‌ দিলে। এ দিকে বৈশাখ মাসের দিন, শিবের মাথায় এক ফোঁটাও জল পড়েনি। শিব ঠাকুরের মাথা ক্রমেই গরম হ'য়ে উঠতে লাগলো। তিনি ষাঁড়কে বল্লেন—"বাবা ষাঁড়, দেখ্‌তো আজ ব্যাপার কি? যাত্রী কেন আস্‌ছে না?" ষাঁড় খুঁজতে খুঁজতে চৌমাথার মোড়ে এসে গয়লার কীর্ত্তি দেখে ত চোটে লাল। কিন্তু যাই শিং নেড়ে তেড়ে যাওয়া, অমনি বাঁক পেটা খেয়ে উর্দ্ধপুচ্ছ হ'য়ে দৌড়। রিপোর্ট পেয়ে শিব মহা চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লেন। নন্দীকে ডেকে বল্‌লেন—"একবার দেখ্‌তো ঐ গয়লা বেটা কি চায়?" নন্দী এলো; কিন্তু হারু তার দিকে ফিরেও চাইলে না। বাঁক কাঁধে করে' তেমনি গট্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে বেলা তিনটে বাজে; শিবের মাথায় জল নেই; পেটে অন্ন নেই; বাবাঠাকুর ত একেবারে ক্ষেপে যাবার জোগাড়। করেন কি? আস্তে আস্তে উঠে নিজেই হারুর কাছে এসে হাজির হ'য়ে বল্লেন—"বৎস, তুমি কি বর চাও? তোমার ওপর তুষ্ট হয়েছি। তোমার বুদ্ধি যে রকম ক্ষুর ধার দেখছি, তুমি রাজ-নীতির চর্চ্চা করলে একটা বড়দরের পেটি্‌য়ট্‌ হতে পারতে।" হারু বল্‌লে—"বড় দরের পেটেল মেটেল আমি হতে চাইনে; আমি চাই রোজ একপেট ভাত আর তিন ছিলিম গাঁজা।" শিব তথাস্তু বলে অন্তর্দ্ধান হলেন, আর হারুও বাঁক কাঁধে করে মন্দিরে ফিরে এলো। সেই অবধি শিব ঠাকুর তাঁর সেবায়েৎকে স্বপ্ন দিয়ে বরাদ্দ করে' দিয়েছেন যে, তাঁর ভোগ হবার আগে হারুর ভোগ হবে।

দেখগে যাও, আজ পর্য্যন্ত হারু সেই মন্দিরে পড়ে' আছে—মাথায় জটা, কোমরে কৌপীন আর হাতে গাঁজার কল্‌কে।

এর পরও ডাণ্ডার মহিমায় যে বিশ্বাস না করবে, সে ম্লেচ্ছ, সে নাস্তিক।

বিয়ে ও পিণ্ডি

দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে শুতে গিয়ে দেখি টেবিলের উপর একখানি চক্‌চকে খামে মোড়া নেমন্তন্ন-পত্তোর। লুচির সম্ভাবনায় আমার ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মী মনটা প্রায় নেচে ওঠবার জোগাড় করেছিল, এমন সময় চিঠিখানি খুলে দেখি—হা পোড়া কপাল।—অমুলেটোলার প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ পাংশুলোচন রায়ের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ঘটোৎকচ স্মৃতিরত্ন জানিয়েছেন যে, মহারাজের বাড়ীতে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদ

করে' এক মহতী সভার অধিবেশন হবে, আর সেখানে আমার মত স্বধর্ম্ম-নিরত পুরুষের সবান্ধবে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বান্ধবের মধ্যে ত' এক পণ্ডিতজী। তাঁকে জিজ্ঞেসা করলুম—"দাদা, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ আইনের ধাক্কায় একেবারে বেঁকে পড়বার জোগাড় হয়েছে। এখন আমরা পাঁচজন ব্রাহ্মণ-সন্তান তাকে ঠেক্‌না দিয়ে সোজা করে' না রাখলে আর উপায় কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"ও-সবে আমি নেই, ভাই! জানই ত, নারী হোল নরকস্য দ্বারং। তার আবার জাতি বিচার কি? নরকেই যদি যেতে হয় ত কুম্ভিপাকে যাব, কি রৌরবে যাব, তা বিচার করে' আর কি হবে? তা ছাড়া বিয়ের বয়স আর আমার নেই। আর যদিও থাকতো, তা'হলে তোমরা নারী-স্বাতন্ত্র্য লিখে লিখে ব্রাহ্মণীকে এমনি বিগ্‌ড়ে দিয়েছ যে, কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমার আর বিয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ করবার সাহস হোতো না।"

পণ্ডিতজীকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার অবসর দিয়ে আবার জিজ্ঞেসা করলুম—"বিয়েটা হোলো ধর্ম্মসংস্কার; ছেলেগুলো জাত-বেজাতের মেয়ে ঘরে এনে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ করে' দেবে, আর তোমার মত পণ্ডিত লোক যে শুয়ে শুয়ে তা দেখবে—এটা কি ভাল?"

পণ্ডিতজী হেসে উঠে বললেন—"আরে, পণ্ডিতও বটে, ব্রাহ্মণও বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিত ত আর নই! ধর্ম্ম বেচে ত আর আমার খেতে হয় না! বিয়েটা যে ধর্ম্মসংস্কার, তা বিলক্ষণই জানি—যেহেতু আমার পূর্ব্বপুরুষদের এই রকম ধর্ম্মসংস্কার করাই ছিল জাত-ব্যবসা। আমার প্রপিতামহ ছত্রিশ বছর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। এই বয়সের মধ্যে তিনি তেষট্টিবার ধর্ম্মসংস্কার করে' তেষট্টি ধর্ম্ম-পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন। এ-হেন আর্য্যকুল-প্রদীপদের বংশতিলক আমি—আমি আর হিন্দু বিবাহের মাহাত্ম্য বুঝি নে? আসল কথাটা কি জান, বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্চে যে যখন মরে' গিয়ে ভূত হবো, তখন ঐ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র আমায় আতপচালের পিণ্ডি চটকে খাওয়াবে। সেকালের কর্ত্তারা যার-তার হাতের রাঁধা ভাত ত আর খেতেন-না, তাই তাঁরা বেছে বেছে স্ববর্ণে বিয়ে করতেন। এখন আমাদের ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই যখন নেই, আমরা সবাই যখন ঈষৎ পাটখিলে বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, তখন স্ববর্ণ দেখে বিয়ে করলেই চলবে, তা সে যে জাতই হোক্ না কেন। যার-তার হাতের ভাত খাই আর না-খাই, পাউরুটি ত খাই; ছেলে না হয় পাউরুটিতে মাখন চটকে আমাদের পিণ্ডি দেবে। প্রেতলোকে সে একটা রাজভোগ হয়ে দাঁড়াবে। আলো চালের পিণ্ডি খেয়ে যে-সব প্রেতের অরুচি হ'য়ে গেছে, তাঁরা তখন তাঁদের বংশধরদের কি রকম বিয়ে করতে স্বপ্নাদেশ দেন, তা দেখে নিও। ময়রার মেয়ে বিয়ে করলে যদি কাঁচাগোল্লার পিণ্ডি খাওয়া যায় ত তাতে কোন সুব্রাহ্মণের আপত্তি হবার কথা নেই।"

বিয়ের শাস্ত্র-সঙ্গত থিওরির এ রকম অর্ব্বাচীন ব্যাখ্যা শুনে আমার মনে ব্রাহ্মণোচিত ক্রোধের সঞ্চার হবার উপক্রম হয়েছিল। আমি একটু তীব্রকণ্ঠে বলে' ফেললুম—"তুমিই না-হয় কুলীন বামুনের বংশধর; প্রপিতামহীদের গুণে তোমাদের রক্তে না-হয় সর্ব্ববর্ণ সমন্বয় হয়ে গেছে; কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক ত আর কুলীন বামুন নয়—তারা নিজেদের আভিজাত্য ছাড়তে যাবে কেন?"

পণ্ডিতজী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন—"মুসলমানদের একটা কথা জান ত—

'আগে হয় উল্লা তুল্লা, পরে হয় উদ্দীন,
তলার মহম্মদ উপরে যায় ভাগ্য ফিরে যদিন।'

নমঃশূদ্রদের রামচরণ যদি আজ মুসলমান হয়, ত তার নাম হ'য়ে যাবে রহিমুল্লা। চাষ বাস করে' দু-দশ বিঘে ধেনো জমি যেদিন তার হবে', সেদিন সে নাম নেবে রহিমুদ্দিন। অদৃষ্ট ফিরে গিয়ে সে যদি সহর অঞ্চলে একটু বাড়ী-টাড়ী করে ত, তার নাম হ'য়ে যাবে রহিমুদ্দিন মহম্মদ। আর তার ছেলে যখন চোখে সোণার চশমা এঁটে, তুর্কী ফেজ মাথায় দিয়ে কলেজে পড়তে যাবে, তখন তার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবে—সৈয়দ মহম্মদ রহিমুদ্দিন। এ সব কথা মুসলমানের পক্ষেও যেমন সত্যি, হিন্দুর পক্ষেও তাই। প্রথম পুরুষে যারা ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, দ্বিতীয় পুরুষে বীরভূম বা বাঁকুড়ায় এসে তারা হ'য়ে যায় গোয়ালা। তৃতীয় পুরুষে তারা হুগলী জেলার সদ্‌গোপ; আর চতুর্থ পুরুষে কলকাতায় এসে দস্তুর মত কায়স্থ। "জাত হারালে কায়েত"—কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে হোলো, জান? পাঁচজন বামুন আর পাঁচজন কায়স্থ—যাঁরা কান্যকুব্জ থেকে সস্ত্রীক এসেছিলেন বলে' বিশেষ প্রমাণ নেই—তাঁরা যে 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' এ শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করেছিলেন, এ কথা ত

ঘটকদের সার্টিফিকেট পেলেও বিশ্বাস হয় না। নেপালে একদল হিন্দুস্থানী বামুন দেখেছিলাম, যারা নিজেদের মায়ের হাতের রান্না খায় না। খোঁজ করে' দেখলুম যে, তাদের বাপেরা নেপালে এসে ছোটজাতের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। বিবাহটা কুশ ফেলে, মন্ত্র পড়ে' শাস্ত্র মতেই হয়েছিল। তবে মেয়ে ছোট জাতের বলে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের রান্না ভাত খেতেন না। তাঁদের ছেলেরাও বড় হয়ে পৈতে ঝুলিয়ে বামুন হয়েছে; কেবল জাতটুকু বাঁচাবার জন্যে নিজেদের মায়ের হাতের রান্না খায় না।

বাঙলাদেশেও যদি খোঁজ কর ত দেখবে যে "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রবীড়, চীন"— মিলে এমন খিচুড়ি পাকিয়েছে, যা পুরীর জগন্নাথের ভোগে দেওয়া চলে। এতদিন পরে অসবর্ণ বিয়ে বলে' নাক সিঁটকান বাংলায় আর ভাল দেখায় না।"

আমি পণ্ডিতজীর মুখটা টিপে বললুম—"থাম থাম। এ-সব কথা রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে বোলো না। কোন্ দিন এক নবীন ক্ষত্রিয়ের হাতে পড়ে' তুমি অকালে প্রাণ হারাবে।"

পণ্ডিতজী বললেন—"ভয় নেই রে, ভয় নেই। তারা মসী ছেড়ে অসি এখনও ধরেনি। তোমার ঐ অম্বুলেটোলার রাজার মত ক্ষত্রিয় ত? যাত্রার দলের নন্দঘোষের মত চূড়ায় শিখিপুচ্ছ বেঁধে গোঁফের সূর্য্যবংশী কাটছাঁট করলেই যদি ক্ষত্রিয় হোতো, তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি? তাঁর নাতনিকে ললিত-কলা শেখাবার জন্যে যে দুজন বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর আমদানী করা হয়েছিল, তাদের বাগান-বাড়ীতে যাতায়াত নিয়ে যে কেলেঙ্কারী রটেছিল, তা তো এখনও মনে আছে! এঁরাই না তোমার বর্ণাশ্রমের স্তম্ভ? রক্ষে কর, বাবা, আর ডেঁপোমিতে কাজ নেই।"

আমিও বললুম—"তাই ভাল; অসবর্ণ বিয়ে রোধ করতে গিয়ে কি শেষে একটা খুনোখুনি করে' বসব?"

দেবতার বাহন

আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের Nonsense Club বেশ জমাট হ'য়ে উঠেছে। ফিস্ ফিস্ করে' বৃষ্টি পড়ছে, কাজেই কারও আর বাইরে যাবার জো নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে গদাই সরকার পর্য্যন্ত আজ বৈঠকে হাজির। গদাইকে দেখেই আমাদের কবিকঙ্কণ মিহি সুরে বলে' উঠলেন— "আরে গদাই যে! তোরও যে দেখছি দেবত্ব-লাভের দিকে নজর পড়েছে!" গদাই হাত জোড় করে' বললে—"আজ্ঞে, আপনারা ত ইহলোকেই দেবতা হবার জোগাড় করুচেন; কিন্তু বাহনের কথাটা একবারও ভাবেননি ত! গদাই সরকার দেবতা হতে না পারুক, বাহন ত হতে পারে। সেই আশায় একবার দেব-সমাজে উঁকি মারতে এসেছি।"

বাইরে বৃষ্টি বেশ ঝম্ ঝম্ করেই আরম্ভ হচ্ছিল। পণ্ডিতজী তাঁর বিপুল দেহভারখানি তুলে একটা সারশি বন্ধ করে' দিয়ে বল্লেন—"ঠিক বলছিস্ গদাই। তোর মত বাহন না হলে আমার দেবত্বের খোলতাই হবে না। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, শীতলার বাহন গাধা, গণেশের বাহন ইঁদুর—এদেরও যখন দেবলোকে জায়গা জুটেছে, তখন আমার বাহন গদাই সরকারেরও স্বর্গের আস্তাবলে একটু ঠাঁই হ'য়ে যাবে। ভয় নেই তোর; আমায় দেখতে যেমন, ওজনে আমি ততটা ভারি নই। আর দেবতা হলেই সূক্ষ্ম শরীর হয়ে' যাবে; তোর চাপা পড়বার কোনই ভয় থাকবে না। তা ছাড়া স্বর্গের আস্তাবলে চিন্ময় ঘাস-জলের সঙ্গে সঙ্গে তোর দু'চার ফোঁটা অমৃতও কোন্-না মিলে যাবে?"

গদাই লাফিয়ে উঠে বললেন—"পণ্ডিতজী ঐটে মাফ করতে হবে। কুকুরের নাড়ীতে ঘি হজম হবে না; আমার পেটেও অমৃত হজম হবে না। শেষে কি অমর হতে গিয়ে বদন ডাক্তারের ঘোড়ার মত হাসতে হাসতে মরে' যাব?"

কবিকঙ্কণ তাঁর কোঁকড়া চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে চক্ষু দুটি অর্দ্ধনিমীলিত করে' বললেন—"কাব্যশাস্ত্রে দশ-বিশ রকমের হাসির তালিকা পাওয়া গেল; কিন্তু ঘোড়ার হাসি!— এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?"

গদাই চক্ষু দুটি বিনয়-নম্র করে' বললে—"ওগো রঘুকুলপতি, তোমাদের মহিমায়—জলে শিলা ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়—আর ঘোড়ায় হাসতে পারে না? তা ছাড়া, এ যে আমার স্বচক্ষে দেখা। বদন ডাক্তারকে চেন ত? যার নাম করলে গেরস্তর হাঁড়ি ফেটে যেত? তার পক্ষীরাজের জুড়িটি চিরকাল ঘাস-জল খেয়ে মানুষ। একবার কলেরায় ঘুম পড়ে' যেতে ডাক্তারের টাকার থলি ফাটো

ফাটো হ'য়ে দাঁড়াল। তখন তিনি খুশী হয়ে সহিসকে হুকুম দিলেন—"ঘোড়াকে দানা খাওয়াও"। ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন টঙস্ টঙস্ করে' ঘুরে' এসে আস্তাবলে গিয়ে দেখে ঘাসের বদলে দানা। এ ওর মুখের দিকে চায়। শেষে দুটোতেই একেবারে চিঁহি চিঁহি করে' হাস্‌তে হাস্‌তে চার পা তুলে' নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে। সহিস, ক্যোচম্যান চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো; ডাক্তার বাবু চেঁচাতে লাগ্‌লেন—"আরে ঘোড়ার মাথায় বরফ দে, বরফ দে।" কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হোলো না। ঘোড়াদের সে হাসি আর থাম্‌লো না। হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের বত্রিশ নাড়ীতে মোচড় খেয়ে শেষে অশ্বিনীকুমারদের হোলো পতন ও মৃত্যু। দেবতার ভোগ্য অমৃতে ভাগ বসাতে গিয়ে আমারও কি শেষে সেই দশা হবে?"

পণ্ডিতজী ঘাড়টা ঈষৎ নেড়ে বললেন—"তাই ত, গদাই, তুই দেবলোকেও থাকতে চাস্, অথচ অমৃতে তোর অরুচি; তোকে নিয়ে যে বিষম জ্বালায় পড়লুম। তোর মতলবটা কি বল দেখি?"

আমাদের যশুরে কৈ এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে এইবার তার প্রকাণ্ড মাথাটা নেড়ে বক্তৃতা সুরু করে' দিলে।—"যদি অভয় দেন, দেবগণ, ত আমি গদাই-এর মনের কথা বলে' দিতে পারি, কেননা যৌবনে আমি কাকচরিত্র, হনুমানচরিত্র প্রভৃতি গুপ্ত-বিদ্যা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করেছিলুম। গদাই দেবতাও হবে ন', দেবতাদের বাহনও হবে না। দেবতা হবে না যেহেতু ঐ গোবরের পিণ্ডে কোন দেবতা যদি পথ ভুলে ঢুকে পড়েন, ত তিন দিনে দম আটকে মারা যাবেন; আর বাহন হবে না যেহেতু তার পৃষ্ঠদেশ এ যাত্রার মত একেবারে রিজার্ভ করা হ'য়ে গেছে। বিশ্বাস না হয়, গদাইএর বাড়ী গিয়ে যে সজীব আহ্লাদী পুতুলটী একসঙ্গে তার ঘর, প্রাণ আর পিঠ জুড়ে' বসে' আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে' দেখুন।"

পণ্ডিতজী এই কথা শুনেই মূৰ্চ্ছিত হ'য়ে পড়বার জোগাড় করছিলেন, কিন্তু আশেপাশে জায়গা নেই দেখে মূর্চ্ছাটা সামলে নিয়ে মরাকান্না জুড়ে' দিলেন:—"গদাই রে, তোর মনে কি এই ছিল। আমি কোথায় ভাবছিলুম, তোকে এক ফোঁটা অমৃত প্রসাদ দিয়ে চিরদিনের জন্য আমার বাহন করে' রেখে দেব, আর তুই যোগ আরম্ভ করতে না করতেই একেবারে ভ্রষ্ট হ'য়ে বসে আছিস্। যাক, কালই আমি মনের দুঃখে বনে গিয়ে তোদের নন্-কো-অপারেশন আরম্ভ করে' দেব।"

গদাই শশব্যস্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল। বললে —"দোহাই পণ্ডিতজী, আপনার দীন হীন বাহনটির ওপর অবিচার করবেন না। বিবাহ রূপ দুষ্কার্য্যটা যদি করেই থাকি ত আপনার বাহন প্রতিপালনের খরচটা একটু বেড়ে যাবে বটে, কিন্তু তেমনি একটির বদলে একজোড়া বাহন পাবেন যে। আর খরচটাও খুব বেশী বাড়বে না, যেহেতু যুগধর্মের অনুশাসন মাথায় পেতে নিয়ে দাস সৃষ্টি করবার পক্ষে গৃহিণীকে আমি কোন রকম সাহায্য করিনি। এমন কি, দেশে এখন কাপড়ের নিতান্ত অভাব দেখে, আমি স্থির করেছি যে, ১লা অক্টোবর থেকে অন্নবস্ত্র ত্যাগ করে' কলাপাতা পরবো ও অগ্নিস্পর্শ করে' কদলী ভক্ষণ করবো। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?"

পণ্ডিতজী প্রসন্ন-বদনে বললেন—"ভক্তরে, তোর জয় হোক। দগ্ধ কদলীর দিকে তোর অকৃত্রিম অনুরাগ দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি। এখন তুই কি বর চাস্, নে।"

সাত্ত্বিক নেশা

"তোমরা কেউ গুলি খেয়েছ? খেয়ে থাক ত লজ্জিত হবার কারণ নেই। গুলি আফিমের রাজসংস্করণ; অতি বাদশাহী নেশা।"

পণ্ডিতজীর প্রশ্নটা শুনে' আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। ফরাসডাঙ্গায় জন্মেছি বটে, কিন্তু গুলি খাবার সৌভাগ্যটা কখন ঘটে ওঠেনি।

আমাদের রামব্রহ্ম পাঁড়ে সেইখানে বসেছিল। সে বললে—"আজ্ঞে গাঁজার কল্কেয় এক-আধ টান দিয়েছি বটে, কিন্তু—গুলি—ওটা দেখা হয়নি।"

পণ্ডিতজী নাক সিঁটকে বললেন—"আরে রাম। কোথায় গুলি আর কোথায় গাঁজা। রাজা আর পঞ্চা তেলি! গাঁজা, চরস, ও সব অত্যন্ত রাজসিক ব্যাপার। টান দিয়েছ কি ধেই ধেই করে' নাচতে আরম্ভ করেছ। গাঁজা খায় ছোটলোকে। আর গুলির মত শান্ত স্নিগ্ধ, মোলায়েম, সাত্ত্বিক নেশা আর দুটি পাবে না। বাদশাহী আমল চলে' যাবার পর থেকে গুলির দুর্দ্দিন পড়েছে বটে; কিন্তু গুলির আড্ডায় চিরদিন চিনির জলে সোলা ভিজিয়ে চাট খেতে হোতো না। জাহাঙ্গীর বাদশা যখন ইয়ার

বন্ধু নিয়ে গুলি খেতে বস্‌তেন, আর নুরজাহান বেগম একশো আট সোণার থালে রকমারি চাট সাজিয়ে দিতেন, তখন তোমরা জন্মাওনি; কিন্তু সে ছিল দিন। তারপর বর্গীর হাঙ্গামার সময় আমাদের আলিবর্দ্দী খাঁ যখন মসনদে চড়ে চক্ষু ছুটি ঢুলু ঢুলু করে' গুলির ধোঁয়ায় সপ্তলোক ভেদ করতেন, তখনও গুলির মান-মর্য্যাদা বজায় ছিল।

মাঝে ইংরেজ রাজ্য আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এমন খাঁটি স্বদেশী ধূমমার্গ ছেড়ে দিয়ে বিদেশী কারণ-তরঙ্গে ভেসেছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের সে মোহ কাটাবার দিন এসেছে। আজকাল সরকার বাহাদুরকে আর দেশের নেতাদের সর্ব্বদাই আড়ষ্ট হ'য়ে থাক্‌তে হয়, পাছে কোথাও Violence বেধে গিয়ে হাতের পাঁচ স্বরাজটা ভেস্তে যায়। তোমরা সবাই যদি ঐ সনাতন ধূমমার্গটাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার ত সরকারের আবগারির আয়ও বেঁচে যাবে, আর দেশে Violence-এর ভয়ও থাক্‌বে না। লোকে মদ খেয়ে মারামারি করে, গাঁজা খেয়ে মাথা ফাটাফাটি করে—এতো সবাই দেখ্‌তে পাচ্ছ। কিন্তু গুলি খেয়ে কেউ কখন টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেছে শুনেছ? একটি টান মেরে ঘরের কোণে তিনটি দিন পড়ে থাক; অন্নসমস্যাও থাক্‌বে না, বস্ত্রসমস্যাও থাক্‌বে না। স্বরাজের আর বাকি রইল কি?"

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে' পণ্ডিতজী তাঁর কামান গোঁফের উপর হাত বুলোতে বুলোতে গম্ভীর ভাবে চেয়ে রইলেন। আগামী কংগ্রেসে এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যাবে কি না ভাব্‌চি, এমন সময় রাইবিলেস তার ট্যারা চোখটি আকাশপানে তুলে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"পণ্ডিতজী—?"

পণ্ডিতজী বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—"এইমাত্র তোমাদের স্বরাজ দিয়ে দিলুম, আবার কি চাই?"

রাইয়ের ট্যারা চোখটি ঘুরে' এসে পণ্ডিতজীর নাকের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে ঢোঁক গিলে বল্লে—"স্বরাজের রাস্তা আপনি বাৎলালেন বটে, কিন্তু সংসারের সব জিনিষের মত এ স্বরাজও ক্ষণভঙ্গুর। এতে কি আর মানুষের দুঃখ ঘুচ্‌বে? এতদিন শুনে' আসছিলুম যে, মানুষ নাকি শীগ্‌গির মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে প্রেমোশন পাবে, কিন্তু এখন শুনচি তার জন্যে তপস্যা চাই। নাককান বুজে তপস্যা-টপস্যা আমার ধাতে বড় একটা সয় না। চট্ করে' অমরত্ব লাভের একটা সোজা উপায় কিছু কর্‌তে পারেন না?"

পণ্ডিতজী তাঁর দশনপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করে' বল্লেন—"ওহো! তুমি স্বারাজ্য সিদ্ধির কথা বল্‌ছো, তার জন্যে আর ভাবনা কি? ও ত স্বরাজেরই মাসতুতো ভাই। আফিমের সঙ্গে শুধু পেয়ারা পাতা মিশালে পাওয়া যায় স্বরাজ; আর তাতে দু-চার ফোঁটা গোলাপ জল ফেলে দিলে যা গড়ে' ওঠে, তারই নাম স্বারাজ্য। বিশ্বাস না হয়, দেখে এসো আমাদের ভোগকুণ্ডুর উৎসবানন্দ বাবাজীর আড্ডায়। বাবাজী আমার এম্‌নি এক পেটেণ্ট মেশিন বসিয়েছেন যে, একটান গোলাপী গুলি টেনে ঐ কলের মধ্যে শুয়ে পড়লেই—তিন রাত্তিরের মধ্যে তুমি চতুর্ভুজ হ'য়ে যেতে বাধ্য। মানুষকে মানুষ বানাতেই কত কত মহাপুরুষের হাড় হিম হ'য়ে এলো, আর আমার বাবাজী শুধু মানুষ কেন, গাধা, বানর, ভেড়া, সব ধর্‌ছেন আর চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন।"

রাই ছেলেটা নিতান্ত পাজি। পণ্ডিতজীর কথার ওপরও আবার জিজ্ঞেস কর্‌লে—"তারা যে চতুর্ভুজ হয়েছে, তার প্রমাণ?"

পণ্ডিতজী একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। বল্লেন—"ওরে নাস্তিক, ওরে অবিশ্বাসী—প্রমাণ আবার কি? তাঁদের দিব্যদৃষ্টি যে একেবারে সপ্তলোক ফুঁড়ে পরম ব্যোমে গিয়ে ঠেকেছে, আর চারাপেয়ো তো উঠে দাঁড়ালেই চতুর্ভুজ, তারওপর তাদের গাঁটে গাঁটে এমনি গুলির মাহাত্ম্য ঢুকে গেছে যে, সেখানকার এণ্ডা, বাচ্চা, গেঁড়ি, গুগলি সবাই দিনে দশ বার করে' দেবলোক থেকে প্রত্যাদেশ পেতে আরম্ভ করেছে। সবাই যেন ভগবানের এক একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি। আবার তোরা চাস্ কি?"

বিস্ময়ে, পুলকে আমাদের চোখ দুটো ঠেলে কপালে ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। শেষে আমাদের কবিকঙ্কণ ভাবে অভিভূত হয়ে গান ধরে' দিলে—

সখি, কোথা সেই দেশ রে
যে দেশের অভিধানে যোগ মানে ভোগ রে,
বাঘ মানে খেঁক্‌শেয়ালি
ভক্তি মানে ঢলাঢলি
সমাধির মানে শুধু হিষ্টিরিয়া রোগ রে।

—

লাট মৈত্রেয়

"লাট মৈত্রেয় এবার আস্‌চেন তা শুনেছ ত?" —পণ্ডিতজী গম্ভীরভাবে আমাদের জিজ্ঞেস্ করলেন। গদাই বল্‌লে—"লাট মৈত্রেয়টা আবার কে? নতুন বড়লাট না কি?"

পণ্ডিতজী ব্যথিতভাবে শিরঃসঞ্চালন করে' বল্‌লেন—"হায়, হায়, লাট মৈত্রেয় কে তা জানিস্‌নে? এতদিন তবে করলি কি? আমি দেহরক্ষা করলে তোদের গতি কি হবে, কে জানে? ভেবেছিলুম এই মাঘী পূর্ণিমার দিন নশ্বর দেহ ত্যাগ করবো। তা তোদের দুঃখ দেখে আরও কিছুদিন থেকে যেতে হবে দেখ্‌ছি। লর্ড মৈত্রেয় হলেন এ যুগের ভাবী বুদ্ধদেব। তিনি গুরু-মা এও কোংএর কাছে তপঃলোক থেকে তার পাঠিয়েছেন যে, জগতে শান্তি-স্থাপনের জন্যে তাঁর আস্‌বার সময় হয়েছে, সুতরাং তাঁর প্রকাশের জন্য একটি শুদ্ধ আধার চাই। তাই কোম্পানী আধার বাছাই করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছেন। কেউ আছে নাকি তোদের সন্ধানে?"

আমি বল্‌লুম—"আমাদের ক্যাবলাকান্ত তো খুব সৎ ছোকরা। ভাজা-মাছটি পর্য্যন্ত উল্টে খেতে জানে না। তা ছাড়া খুব শুদ্ধবংশ। ওর ঠাকুরদাদা আজন্মকাল আলোচাল আর কাঁচকলা ভাতে খেয়ে গেছেন। ওর জন্যে অবতারগিরির একখানা দরখাস্ত পেশ করলে হয় না?"

পণ্ডিতজী হেসে বল্‌লেন—"বাপু, অবতার হওয়া কি সোজা কথা! একশো আট জন্ম পূর্ব্বে থেকে তা প্র্যাকটিশ করতে হয়। এই একশো আট জন্ম সাধনার ফলে এক শো আটটি লক্ষণ অবতার-পুরুষের অঙ্গে ফুটে' ওঠে। মহাবেল্লিক পুরাণে সে সব লক্ষণের একটা তালিকা তোমরা দেখ্‌তে পাবে। হাঁ, ক্যাবলাকান্ত অবিশ্যি ছোকরা ভাল; কিন্তু ওর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঈশান কোণে ঐ যে দেখছো একটি কৃষ্ণবর্ণ তিল—ওতেই সব মাটি করেছে! সাতজন্ম পূর্ব্বে একদিন অমাবস্যায় ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে ভুলে গেছলো—ঐ তিলটি হচ্চে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

কবিকঙ্কণ মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বল্‌লে—"তাইতো—এতগুলো সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ এই ঘোর কলিতে মেলাই মুস্কিল; আমাদের রাইবিলেস সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

পণ্ডিতজী রাইবিলেসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ দেখে বল্‌লেন—"হাঁ, লক্ষণ কিছু-কিছু মিলছে বটে। তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরবর্ণ রংও বটে, আর দশনপংক্তিও সুগঠিত বটে। কিন্তু ঐ যে মুখের মাঝখানে প্রকাণ্ড Note of interrogationএর মত একটা নাক ঝুলছে, ওটা বড় সুবিধের লক্ষণ নয়। দেবদ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ আর গুহ্যাতিগুহ্য পরাবিদ্যার উপর ওর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকবে না। অবতারশিপের যে ক্যাণ্ডিডেট হবে, তার ভিতরটা যাই হোক্ না কেন, পরে-পশ্চাতে গড়ে' নেওয়া চলে; কিন্তু তার বাইরেটা হওয়া চাই একেবারে রামরম্ভার মত মোলায়েম।

হলধর খুড়ো নিজের গাটা একটু টিপেটুপে বল্‌লেন—"না,—ভেবেছিলুম নামটা একবার লেখাব; তা দেখচি গাটা দরকোচা মেরে গেছে। তা ছাড়া রংটাও যথেষ্ট পাটকিলে নয়, আর বয়েসটাও কিছু বেশী হ'য়ে পড়েছে।"

পণ্ডিতজী বললেন—"রংএ ততটা কিছু এসে যেতো না। কিছুদিন বিলেত ঘুরিয়ে আন্‌তে পারলে অনেক শ্যামবর্ণও গৌরবর্ণ হ'য়ে ওঠে। তবে কি জান, যাঁরা অবতার বাছায়ের ভার নিয়েছেন, তাঁরা একটু কাঁচা বয়সেই পছন্দ করেন।"

হলধর খুড়ো সজোরে একটিপ নস্য নিয়ে বললেন—"তা তো বটেই, তাতো বটেই। কথায় বলে—বুড়ো ময়না পোষ মানে না। গুহ্যাতিগুহ্য যে পরা-বিদ্যা, যাকে শাস্ত্রে বলে গেছে 'রহস্যমুত্তমম্', তা তো আর যখন-তখন যাকে তাকে দেওয়া চলে না। গোঁফ উঠ্‌লে আর সে বিদ্যার অধিকারী হবার জো নেই।"

পণ্ডিতজী বললেন—"বুঝ্‌তে ত পারছ, ব্যাপার বড় কঠিন। সেবার মাদ্রাজে একটি দিব্যি আধার পাওয়া গিয়েছিলো। গুরুজী তাকে শোধন করে লর্ড মৈত্রেয়ের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। লর্ড মৈত্রেয়ও নাম্‌বার জন্যে তপঃলোক থেকে এক পা বাড়িয়েছিলেন; এমন সময় দৈত্য দানবে যে উপদ্রব করে' দিলে, তা তো আর তোমাদের অবিদিত নেই। অবতারজী ধামা চাপা পড়ে' গেলেন, আর গুরুমাকে নষ্টপ্রেষ্টিজ উদ্ধারের জন্যে দেশময় দামড়া লাফে ভারত-উদ্ধার করে' বেড়াতে হোলো। কতটা সময় নষ্ট হ'য়ে গেল একবার দেখ দেখি। তা যদি না হোতো, তো এতদিন কোন্ কালে লর্ড মৈত্রেয় এসে বিলেত-লক্ষ্মীর আঁচলের খুঁটে ভারতলক্ষ্মীকে প্রেমের ফাঁসে বেঁধে দিতেন।

'যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন শুনতে পাচ্ছি গুরুমা অবতারশিপের জন্যে ছত্রিশটী নতুন ক্যাণ্ডিডেট জোগাড় করেছেন। আরও গুটিকতক চাই। আমি বলেছি—'ভয় নেই, আমি খুঁজে দেবো!' তোমাদের মধ্যে জনকত যদি আমার সঙ্গে সাধনে বসো, তাহলে আমি একবার তোমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো মিলিয়ে নিয়ে দেখি যে, তোমাদের মধ্যে লর্ড মৈত্রেয় নামতে পারেন কি না। কি বলো?"

আমরা সবাই সাধনে বস্‌বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লুম।

পণ্ডিতজী উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লেন—"হাঁ, এই ত চাই। তোমরা সবাই ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করে' উর্দ্ধমুখ হ'য়ে হাঁ করে বোসো।"

তাই করা হোলো।

পণ্ডিতজী উঠে পায়চারি করতে করতে বল্‌লেন—"দশ মিনিট পরে যখন দেখ্‌বে যে, চুলের গোড়া শিড়িং শিড়িং করছে, পায়ের গোড়'লি শুড়ুং শুড়ুং করছে, আর কাণে রি রি আওয়াজ হচ্চে, তখন বুঝ্‌বে যে তোমাদের মধ্যে লর্ড মৈত্রেয় আবির্ভাব হচ্চেন। তাঁকে আর সেই সময় যেতে দিও না। খপ করে' দু-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিজের মুখ বন্ধ করে' দেবে।"

আমরা খুব ভক্তিভরে সাধনে বস্‌লুম।

দশ মিনিট পরে চোখ খুলে দেখি পণ্ডিতজী কখন সরে' পড়েছেন, আর সবাই মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পুরে' বসে' আছে।

ভগবান ধরা কল

একটা, দুটো, ক্রমে তিনটে চুরুট পুড়ে' ছাই হয়ে' গেল। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু inspiration আর সেদিন এলো না। শেষে বিরক্ত হয়ে "দুত্তোর" বলে' কলম ছেড়ে উঠে পড়্‌লুম। কাঁধে একখানা চাদর ফেলে লাঠিগাছটা বগলে নিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের কাছে গিয়ে বল্‌লুম—"চলুন, একটু সান্ধ্যসমীরণ সেবন করে' আসা যাক্।"

পণ্ডিতজী তখন দু-তিন হাত সম্মুখে ভুঁড়িটিকে বিস্তার করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড তাকিয়া ঠেস দিয়ে গুণ্ গুণ্ করে' তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করছিলেন। আমার আওয়াজ শুনেই বইখানি বন্ধ করে' ভুঁড়ির উপর রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কি, সাহিত্য-সেবা শেষ হোলো?"

একটু আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লুম—"নাঃ—আজ আর কিছু হবার লক্ষণ দেখ্‌লুম না। মা সরস্বতীর দরজায় তিন তিনটে মোটা মোটা ধুপ কাঠি জ্বালিয়ে এক ঘণ্টা উর্দ্ধমুখ হ'য়ে হাঁ করে' বসে' রইলুম; কিন্তু দেবীর দরজা খোলার সাড়া শব্দ কিছু পেলুম না। কাজেই ভাবলুম মা সরস্বতীর উপর আর বৃথা অত্যাচারের চেষ্টা না করে' গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই। তিনিও হাঁফছেড়ে বাঁচবেন, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো।"

পণ্ডিতজী খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ। দেবতারা অত্যন্ত খামখেয়ালী জাত। কিসে যে তাঁদের অনুগ্রহ হয়, আর কেন যে তাঁরা দরজা বন্ধ করে' মুখ ভার করে' বসে' থাকেন, তা মানুষের বাপেরও বোঝবার সাধ্য নেই। "বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়ত দুয়ার খুলবে না"—এ একেবারে ভুক্ত-ভোগীর প্রাণের কথা। তাই যদি হয়, ত নিতান্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে দরজায় ঠেলাঠেলির কর্ম্মভোগটুকু আর কেন? দরজা যখন খোলবার হয় খুলবে, যখন বন্ধ হবার বন্ধ হবে। এ সরল সত্যটুকু বুঝ্‌লে "মেজে ঘসে সাহিত্যিক,' হবার দুশ্চেষ্টা থেকে মানুষ বেঁচে যায়, আর মা বীণাপাণিকেও অরসিকের হাতে পড়ে' গদাপাণি হ'য়ে উঠতে হয় না।"

আমার সাহিত্য-সেবার উপর এ রকম প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাতে আমি যে খুব প্রসন্ন হ'য়ে উঠলুম, তা নয়। পণ্ডিতজীর হাতে রামায়ণ খানার দিকে লক্ষ্য করে' বল্‌লুম—"ঠিক কথা বলেছেন, পণ্ডিতজী। শুধু মা সরস্বতী কেন, খোদ ভগবান থেকে আরম্ভ করে' ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত দেবতা, উপদেবতার উপর অত্যাচার করা মানুষের একটা বদ্ অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কবে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র অবতার হ'য়ে বানরের প্যারেড করিয়ে গিছলেন—আর তাই থেকে আমরা ঠিক করে' বসে' আছি যে, যদি বনের বানর ধরে তাদের লেজ উঁচু করিয়ে প্যারেড করাতে পারি ত স্বয়ং, রামচন্দ্র তাদের মাঝখানে এসে নিশ্চয় হাজির হবেন। রামচন্দ্র বেচারী হয়ত আমাদের কীর্ত্তিকলাপ দেখে বৈকুণ্ঠে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছেন।"

পণ্ডিতজী রামায়ণখানা ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন—"ঠিক বলেছিস! আমারও ক'দিন থেকে ঐ কথাই মনে হচ্ছিল। ভগবান যার উপর

ভর করেন, সে হয়ত নাচে, কাঁদে, হাসে, গায়—কিন্তু ঐ নাচা কাঁদা হাসা গাওয়ার একখানা শাস্ত্র তৈরি করে' যদি আমরা বলি যে শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে ঐ কাজগুলো করলেই ভগবান এসে কাঁধের উপর ভর করবেন, তা'হলে ভগবান যে আমাদের আবদার শুনতে বাধ্য হবেন তা ত মনে হয় না। চৈতন্যদেব প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নদের মাটীতে গড়াগড়ি দিয়ে গেলেন—কিন্তু এই পাঁচশ বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ লাখ লোক নদের মাটী চষে ফেলেও আর-একটা চৈতন্যদেব গড়তে পারলে না। সমাধির সময় মানুষের হাত পা আড়ষ্ট হ'য়ে, জিভ্ তালুতে লেগে যায়, কিন্তু তাই বলে' জিভ তালুতে লাগিয়ে হাত-পা আড়ষ্ট করে' বসে' থাকলে সমাধি যে হতেই হবে, তার ত কোন প্রমাণ পাইনে। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে' তাঁর সাধন প্রণালী চালিয়ে সঙ্ঘ গড়ে' গেলেন, কিন্তু সেই সাধনের কলে পড়ে আর-একটা লোককেও ত বুদ্ধ হতে দেখলুম না। শঙ্করাচার্য্য ষোল বছর বয়সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে' প্রচার করতে লেগে গেলেন। গেরুয়ার পতাকা উড়লো; দেশ মঠে মঠে ছেয়ে গেলো; কামিনী-কাঞ্চন ঘরে পড়ে কাঁদতে লাগলো; লাখ লাখ সাধু "অহং ব্রহ্মাস্মি" হুঙ্কার করতে করতে ব্রহ্মজ্ঞানের তাল ঠুকতে লাগলেন; সোঽহং মন্ত্র জপ করতে করতে কত লোকের গোঁফ দাড়ী পেকে গেল; কিন্তু দশনামীদের ভিতর আর দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ত জন্মাল না। এইসব দেখে শুনেই ত মনে হয় যে, ভগবান মানুষের কাছে আসে যায় নিজের খেয়ালে। যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরা তাঁদের শিষ্য সেবকদের ভগবানধরা ফাঁদ পাতবার কৌশলটা শিখিয়ে যান বটে, কিন্তু সে ফাঁদে ভগবান যে ধরা দিয়েছেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই।"

পণ্ডিতজীর কথাগুলো শুনে আমারও মনে একটু খট্‌কা লাগলো। আমি বল্লাম—"তাই তো কর্ত্তা, তুমি যে ভাবিয়ে তুললে। এত দিনের, আমাদের এত সাধের তিলক, মালা, কৌপীন, জটা, গেরুয়া, তুমি এক নিশ্বাসে সব উড়িয়ে দিতে চাও?"

পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে বললেন—"ঐ তোমাদের দোষ। উড়িয়ে দেবার কথা আমি আবার কখন বল্লাম? প্রাণে সখ থাকে ত তিলক কাট, গেরুয়া উড়াও, জটা ঝোলাও, নাক টিপে ডিগবাজী খাও—কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু যখন মনে কর যে তোমাদের সাধন-ভজনের কসরতে ভগবান কাবু হ'য়ে পড়বেন বা তোমাদের বেশ-বিন্যাসের ঘটা দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে দশ হাত এগিয়ে আসবেন, তখন আমার মুখুজ্যেদের সেই পাগলী মেয়েটার কথা মনে পড়ে।"

—"সে আবার কে?"

—"আহা, সেই বিয়ে-পাগলী মেয়েটা হে! ভুলে' গেছ তাকে? মস্ত বড় কুলীন তার বাপ; কাজেই মেয়ের বয়স যত বাড়তে লাগলো, বরও তত দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠলো। পাড়ার মেয়েদের যখন বর আসতো, তখন তারা হাসিমুখে পান চিবিয়ে বেড়াতো। তাই দেখে পাগলীও ঘরে ঢুকে একগাল পান মুখে পুরে দন্তবিচ্ছেদ করে' বেড়াতে লাগলো। তার যুক্তিটা হচ্ছে এই, যে, বর এলে যখন মেয়েরা হাসে আর পান খায়, তখন সেও যদি হাসে আর পান খায় ত তার বর আসবে না কেন? তিলক, গেরুয়ার যুক্তিটাও অনেকটা সেই রকম।"

আমি অবাক হয়ে হাঁ করে' রইলুম। আমাদের হলধর খুড়ো এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারে বসে' তামাক টানছিলেন। তিনি এইবার হুঁকোটা রেখে দিয়ে বল্লেন—"একেই বলে ঘোর কলি! যোগ, যাগ, নাচন, ভজন, আজ পণ্ডিতজীর হাতে পড়ে' বিয়ে-পাগলীর পান চিবান হয়ে দাঁড়াল! শাস্তর-টাস্তর পড়েও লোকে যে এমন উচ্ছন্ন যায়, তা জানতুম না। বলি, সে কালের মুনি-ঋষিরা যে দশ হাজার বছর ধ'রে হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে তপস্যা করতেন, যদি তাঁরা ভগবান না পেতেন, ত শুধু ইয়ারকি করবার জন্যে তাঁরা ঠ্যাং লটকে ঝুলতেন না কি?"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"খুড়ো, চোটো না। ঋষিরা যদি ঊর্দ্ধপদ হ'য়ে ঝুলে থাকেন, তা'হলে কি পেয়েছিলেন তা নিজেই পরীক্ষা করে' দেখতে পার। দশ ঘণ্টা যদি ঝুলতে পার ত মুখে রক্ত উঠে ব্রহ্মপদ ত পাবেই; তা ছাড়া পরজন্মে তোমার বাদুড় বা চামচিকে সিদ্ধি হবেই হবে।"

হলধর খুড়োর মুখখানা রাগে লাল হবার চেষ্টা করতে করতে শেষে ক্ষোভে কালো হ'য়ে উঠলো।

—"এমন নাস্তিকের পাল্লায়ও মানুষ পড়ে।"—বলে তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। চেয়ারখানা খালি হ'য়ে গেছে দেখে আমি তাতে অম্লান-বদনে বসে পড়ে' পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞেস করলুম—"না, না, হাসি ঠাট্টা নয়। সত্যই কি

আপনি মনে করেন মানুষের ভগবানকে পাবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা ?"

পণ্ডিতজী মুখখানা গম্ভীর করে' উত্তর দিলেন—"বাবা, ভগবান কি এইটুকু যে মানুষ তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরবে আর লাড্ডু পেঁড়ার মত কামড়ে কামড়ে খাবে ? নিজের চেষ্টায় মানুষ ভগবানকে কখনো পায়নি, তবে ভগবান মানুষকে অনেকবার পেয়েছেন। যারা বাইরে থেকে তামাসা দেখে, তারা মনে করে মানুষ ভগবানকে পাচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা ঠিক উল্টো। যতদিন লম্ফঝম্ফ ততদিন অষ্টরম্ভা। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্তই থাক। হলধর খুড়ো চোটে কোথায় বেরিয়ে পড়লো দেখো। শেষকালে ঋষি হবার আশায় ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে কোথাও ঠ্যাং লট্‌কে না ঝুলতে থাকে।"

মেয়ের বিয়ে

সন্ধ্যার সময় দিব্যি ফুটফুটে চাঁদ উঠেছে। ছাদ একেবারে জ্যোৎস্নায় ভরে' গেছে। কবিকঙ্কণ চন্দ্রাহতের মত চাঁদের দিকে চাইতে চাইতে গান ধরে দিলে—

"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল।"

পণ্ডিতজী চক্ষু বুজে থেলো হুঁকায় টান দিচ্ছিলেন। হঠাৎ গদায়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন—"কি গদাই, তোরও ঐ মত নাকি ?"

গদাই এতক্ষণ মরা ছাগলের মত চক্ষু করে' ভাবাবিষ্ট হ'য়ে গান শুনছিল। পণ্ডিতজীর প্রশ্ন শুনে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে—"আজ্ঞে না, মরবার সখ আমার একদম নেই। এই সুমুখে শীতকাল। ভাল করে' কপি-কলাইসুটির ডাল্‌না আর একবার খাবার আগে স্বর্গে হাওয়া বদ্‌লাতে যাবার প্রবৃত্তি আমার মোটেই হয় না। চাঁদের আলো দেখে কবিদের মরবার কথা মনে উঠতে পারে, আমার ত শুধু মনে হয় বিয়ে করবার কথা।"

—"ও একই জিনিস, বাবা, একই জিনিস।"—বলে' হলধর খুড়ো কোণ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।—'বিয়ে করা' মানেই পৈতৃক প্রাণটি খোয়ানো। তার চেয়ে গোটা কতক স্বদেশী বক্তৃতা ঝেড়ে দশ-বিশ বচ্ছর জেলখাটা ঢের ভাল। জানই ত Once a married man, always a married man। ফুর্ত্তি ক'রে সাত পাক দেবার সময় লোকে যদি টের পেত যে, মরণ পর্য্যন্ত ঐ ঘুরপাকই খেতে' হবে, তা'হলে তুমি ভেবেছ কি ঐ কুকর্ম্ম কেউ করতে যেত ? সেকালে স্বদেশীর যুগে আমরা উনপঞ্চাশ জন বীরপুরুষ স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হাতে করে' প্রতিজ্ঞা করে' বসেছিলুম যে, ভারত উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের মুখদর্শন কোরবো না।"

কবিকঙ্কণ বলে' উঠল—"কি খুড়ো! তোমরা যে এক-একজন ভীষ্মদেবের মাসতুতো ভাই ছিলে, দেখতে পাচ্ছি।"

হলধর খুড়োর বিচ্ছিন্ন দশন পংক্তি জ্যোৎস্নায় একবার চিক্‌মিকিয়ে উঠল। কিন্তু তিনি রাগটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন,—"বাবা, মহিষাসুর-মর্দ্দিনীদের পাল্লায় যদি পড়তে, ত বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল। ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করে' যে বিশেষ ঠকেছিলেন বলে' ত মনে হয় না। তা চুলোয় যাক্ ভীষ্মদেব। আমাদের সেই উনপঞ্চাশ জন বীরপুরুষের কথাই বলি। সরকার বাহাদুরের অতিথিশালায় যাঁরা আট-দশ বৎসর ধানে-তাতে খেয়ে কাটিয়ে দিয়ে এলেন, তাঁদের বাধ্য হ'য়ে প্রতিজ্ঞাট৷ রক্ষা করতেই হয়েছিল। আজ তাঁরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তুড়ি মেরে বেড়াচ্ছেন। তাছাড়া বাকি সকলকার আমারই মত অবস্থা! কারও বা তিনটি পুত্তুর চারিটি কন্যে, কারও বা চারটি কন্যে তিনটি পুত্তুর। আরে, বাবা, সরকারী জেলের ত শেষ আছে, আর এই ঘরের জেল যে একেবারে অফুরন্ত।"

হলধর খুড়ো বক্তৃতা শেষ করে' একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়লেন। গদাই জিজ্ঞাসা করলো—"কি খুড়ো, আজ খুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে নাকি ?"

খুড়ো মাথাটা নীচু করেই উত্তর দিলেন—"আরে, ঝগড়া হ'লে ত মিটে যেত। যা হয়েছে তা মরবার আগে মেট্‌বার নয়।"

—"কি হয়েছে কি, বলই না।"

—"বল্‌বো আর কি ছাই! হয়েছে মেয়ে। আজ সকাল বেলা আমার শ্বশুরের বেটা সম্বন্ধী এই সুসমাচার পাঠিয়েছেন যে, তাঁর ভগ্নী আর-একটি কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই একগণ্ডা পুরো হোলো।"

হোঃ হোঃ হোঃ করে' হাসির ধুম পড়ে' গেল। হর্‌রা একটু থামলে হলধর বল্‌লেন—"তোমাদের ত হাসতে হাসতে দাঁতে খিল ধরে' যাচ্ছে, আর এ দিকে আমার জিভ বেরিয়ে পড়চে। বড় মেয়েটা

এই বারো উৎরে তেরোয় পড়েচে। পাড়া-পড়শীরা যাঁরা ডেকে কখনো জিজ্ঞাসা করেননি যে ভাতের উপর কাঁচকলা-ভাতে জুটছে কি না, তাঁরাও এসে দিনে তিনশ'বার অযাচিত ভাবে উপদেশ দিয়ে যাচ্চেন যে, মেয়েকে আর আইবড় রাখা ভাল দেখাচ্চে না। এদিকে একটা অকালকুষ্মাণ্ড পাত্রের দরও অন্ততঃ দু হাজার টাকা, যা বাপের বয়সে কখনো এক সঙ্গে দিখিনি। মেয়ের বিয়ে দিই কি করে'?"

পণ্ডিতজী এতক্ষণ চুপ করে' শুনছিলেন। এইবার বলে উঠ্‌লেন—"বিয়ে দিও না।"

হলধর খুড়ো মাথা চুলকুতে চুলকুতে বল্‌লেন—"তুমি ত বিয়ে দিও না বলে' নিশ্চিন্ত হ'য়ে রইলে; এদিকে আমার যে জাতকুল যায়।"

পণ্ডিতজী এইবার দু হাত নাড়া দিয়ে বল্‌লেন—"মরগে তোমার জাতকুল নিয়ে। বার বছরের মেয়ের বিয়ে না দিলে যদি জাতকুল যায়, ত অমন জাতকুল চুলোয় যাক্। মেয়েকে বড় করে' ছেড়ে দাও, তারপর তার খুসী হয় বিয়ে করুক, না খুসী হয় আইবড় থাকুক। যার বিয়ে কর্‌বার দরকার হবে, সে নিজের ভাবনা নিজে ভাব্‌বে।"

হলধর খুড়ো খানিকটা হাঁ করে' রইলেন। তারপর বল্‌লেন—"ভাল রে ভাল! মেয়েগুলো বিয়ে কর্‌বে না ত খাবে কি করে?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"তুমি যেমন করে' খাচ্ছ, তারাও তেমনি করে' খাবে। ভগবান দুটো হাত দিয়েছেন, খাটবে আর খাবে। বিয়েটা কি মেয়েদের পেশা যে, ঐ করে' তাদের খেতে হবে? তারা ত আর কুলীন বামুন নয়!"

খুড়ো এইবার চোটে গেলেন। বল্‌লেন—"তোমার যত সব অনাসৃষ্টি কথা! ভদ্দর লোকের মেয়ে কি বাজারে মোট বইতে যাবে, না মাথায় সামলা এঁটে ওকালতি কর্‌তে যাবে?"

কবিকঙ্কণ উকিল মানুষ। সে বলে উঠ্‌লো—"মেয়েরা মোট বইতে চায় ত তা করুক গে, কিন্তু তাদের ওকালতিতে আমার ঘোরতর আপত্তি। প্রথমতঃ কথায় তাদের এঁটে উঠ্‌তে পারা যাবে না, আর যদিও পারা যায় ত যুক্তিতে না পারলে তারা শেষে কেঁদে আমাদের হারিয়ে দেবে। জজ সাহেবেরও মাথা ঠিক থাক্‌বে না।"

পণ্ডিতজী হেসে বল্‌লেন—"না হে না, তোমার ভয় নেই। মোট-বওয়া আর ওকালতি করা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যা মেয়েরা খুব ভালই পারে। তোমরা ঠিক করে' রেখেছ যে, তারা বৎসরান্তর তোমাদের একটি বংশধর প্রসব কর্‌বে, আর বংশধরের বাপকে ভাত রেঁধে খাওয়াবে। কিন্তু চিরদিন তারা তা নিয়ে তুষ্ট থাক্‌বে না। পায়রার মত তাদের খোপে পুরে রেখে দিয়েচ, আর ভাব্‌ছ যে তারা দানা খেয়ে আর ডিম পেড়ে বেশ আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি চোখ খুলে' দেখ ত বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, বিনা পয়সার বাঁদী হয়ে থাকার চেয়ে মোট বোয়ে খাওয়াও ভাল।"

গদাই এতক্ষণ চিৎ হ'য়ে পড়েছিল। সে এইবার তার নবীন গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলে' উঠ্‌লো:—"থাক্, থাক্, হাটের মাঝে আর হাঁড়ি ভেঙ্গে কাজ নেই। একটা মাঝামাঝি রাস্তা ধরাই ভাল। স্বয়ম্বর প্রথাটা আবার ফিরিয়ে আন্‌লে কেমন হয়?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"তোর তা'হলে আর চন্দ্রাহত হ'য়ে পড়ে' থাক্‌তে হয় না। একটা দাঁড়াবার গাছতলা জুটতে পারে।"

গদাই দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—"দেখা যাক, মাসখানেক সবুর করে'। স্বরাজটা হ'য়ে গেলে হয় ত একটা স্বয়ম্বরী আইন পাশ হ'তে পারে।"

স্বয়ম্বরা মেয়ে

হলধর খুড়ো সন্ধ্যাবেলা কোমরে গামছা বেঁধে এসে খবর দিলেন যে, অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি মেয়েকে স্বয়ম্বরা করাই স্থির করেছেন। গদাই পকেট থেকে রুমালখানা বার করে' মাথার ওপর ঘুরিয়ে "হুর্‌রে" বলে' চীৎকার করে' উঠ্‌লো। বল্‌লে—"এই ত চাই, এ হোলো একেবারে সনাতন প্রথায় সমাজ-সংস্কার! 'বিপ্র হোক, ক্ষত্র হোক, বৈশ্য শূদ্র জাতি, যে বিন্ধিবে সে লভিবে কৃষ্ণা গুণবতী।' হ্যাঁ খুড়ো, লক্ষ্য টক্ষ্য বেঁধবার কিছু ব্যবস্থা করেছ নাকি?"

খুড়ো বললেন—"না রে না; লক্ষ্যও বিঁধ্‌তে হবে না, হরধনু ভঙ্গও কর্‌তে হবে না। ও-গুলো হোলো স্বয়ম্বর by courtesy। একালে যেমন মা-বাপ পাশকরা ছেলে দেখে মেয়ে দেয়, সেকালে তেমনি ক্ষত্রিয়েরা লড়ায়ে পালোয়ান দেখে বিয়ে দিত। মা-বাপই যদি বর বেছে দিলে, ত মেয়েদের স্বয়ম্বরা হওয়া হোলো কৈ? আমার মেয়ের যা হবে

তা' ও-রকম মেকি স্বয়ম্বর নয়; একেবারে খাঁটি জিনিষ।"

কবিকঙ্কণ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পটল-চেরা চোখ দুটিতে একটা কবিত্ব মাখান ঢুলু ঢুলু ভাব আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। সে এইবার সুরটাকে বেশ মোলায়েম করে' বল্‌লে—"একবার দাও ত খুড়ো সেই খাঁটি জিনিষটির একটু সটীক বিবরণ। বাঙ্গালীর হৃদয়-মরুভূমিতে একটা Romanceএর ধারা ছুটে' যাক। বাঙ্গালীর হৃদয়-গোবরে একবার শালুক ফুটুক।"

খুড়ো বল্‌লেন—"ও-কাজটা মেয়ের বাপের নয়। Romance এর সৃষ্টি তুমি স্বয়ম্বরের পরে কোরো। ইচ্ছা কর্‌লে কালিদাসকে টেক্কা দিয়ে একখানা নতুন রঘুবংশও লিখে ফেল্‌তে পারো। তবে একেবারে সর্ব্ববর্ণ সমন্বয় করবার দুঃসাহসও আমার নেই। বুদ্ধ, কবীর, নানক, নিত্যানন্দ থেকে কেশব সেন পর্য্যন্ত যে কাজ কর্‌তে গিয়ে ফেল হয়েছেন, সে কাজ যে আমার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে হয়ে যাবে, এ আশা আমার নেই। আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, আর 'প্রজাপতি' আফিসে চিঠি লিখে, পণপ্রথা-বিরোধী অকৃতদার সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানকে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতে নিমন্ত্রণ করেছি। তোমরাও সবাই কাল সকালে উপস্থিত থেকো। তারপর তোমাদের অদৃষ্ট, আর আমার মেয়ের বরাত।"

খুড়ো বক্তৃতা শেষ করে' চলে' গেলেন। গদাই তাড়াতাড়ি একখানা আরসির সুমুখে মুখখানা সোজা করে,' বাঁকা করে,' হেলিয়ে দুলিয়ে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগলো। কবিকঙ্কণ ঊর্দ্ধনেত্রে শিষ্ দিতে দিতে ঘরময় ঘুরে' বেড়াতে আরম্ভ করে' দিল। ক্যাবলাকান্ত Dying Cleaningএ কাপড় কাচ্‌তে দিয়েছিল; ধাঁ করে' তা আন্‌বার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লো।

সে রাতটা তো কোন রকমে কেটে গেল। তার পরদিন সকালে উঠে দেখি—সবাই স্নান ক'রে, টেরি কেটে, ধোপদোরস্ত কামিজ গায়ে দিয়ে ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে সেজে-গুজে স্বয়ম্বর-সভায় যাবার উদ্যোগ কর্‌চেন। আমিও তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে ক্ষৌরকর্ম্মটা সেরে নিয়ে তাঁদের পিছু পিছু বেরিয়ে পড়্‌লুম।

খুড়োর বাড়ী গিয়ে দেখি, হাঁ, একটা স্বয়ম্বর-সভা বটে। উঠানের মাঝখানে সামিয়ানা খাটান হয়েছে। খুঁটিগুলো রংবেরঙের পাতালতা দিয়ে ঘেরা; চারিদিকে গাঁদাফুলের মালা। পাশের একটা দিক মেয়েদের জন্যে চিক দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে থেকে এরই মধ্যে গল্পের ফিস্ ফিস্ শব্দ আর চুড়ির টুং-টাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে দর্শকদের বস্‌বার জায়গা, আর পূর্ব্বদিকে মুখ করে' ঘোষেদের বাড়ী থেকে ধার করা খান পঁচিশেক চেয়ার অর্দ্ধবৃত্তাকারে সাজান। সে চেয়ারগুলো বরপদ-প্রার্থীদের জন্য রিজার্ভ।

আটটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তে একে একে, দুয়ে দুয়ে, চারে চারে পণপ্রথাবিরোধী ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা হাজির হতে আরম্ভ করলেন। খুড়ো মহাসমাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা করে' চেয়ারে বসিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। ঘোষেদের রামা মালি এসে তাঁদের গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিলে। খুড়োর ন বছরের তৃতীয় কন্যাটি তার দিদির বিয়ের আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে এক রেকাবি পান নিয়ে এসে বর-সভার শোভা বর্দ্ধন করতে লাগ্‌ল।

নটা বাজ্‌বার পূর্ব্বেই বরেদের চেয়ারগুলি ভরে' গেল। "কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কালো।" অধিকাংশেরই হালফ্যাসানে গোঁফ-দাড়ি কামান। ফ্রেঞ্চ কাট, জার্ম্মান কাট, সেক্‌সপিরিয়ান কাট দাড়িরও একেবারে অসদ্ভাব নেই। চুল কারও বা দশ আনা ছ' আনা, কারও বা একদম কোচ্‌মানী ছাঁট। অধিকাংশেরই নাকে চশমা। কেবল এককোণে—আরে মলো, ওটা কে? পণ্ডিতজী না? বর-সভায় একখানা চেয়ার জুড়ে বুড়ো কি মনে করে? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে আবার রোঁয়া উঠ্‌লো নাকি?

ঠিক সাড়ে নটার সময় কন্যাকে সভায় উপস্থিত করা হোলো। খুড়ো বল্‌ছিল মেয়েটি বারো উৎরে তেরোয় পড়েছে; কিন্তু দেখলে আরও বছর দুয়ের বড় বলেই মনে হয়। বরেদের মধ্যে আগে একটা চঞ্চল চাহুনি, পরে গম্ভীর হবার একটা আড়ষ্ট-চেষ্টা দেখা গেল। আমাদের দাদা মশায় সম্পর্কের ভটচার্য্যি মশায় একখানা নাম ধাম ও গুণাবলী সম্বলিত তালিকা হাতে করে বরেদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন:—

১নং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—বয়সে সাড়ে বত্রিশ। অঙ্কশাস্ত্রে আধ নম্বরের জন্যে বি-এ ফেল করেছেন। তা না হলে এতদিন একটা ডেপুটি হতে পারতেন। আপাততঃ শা-ওয়ালেশের বাড়ী ৩৫ টাকা—"

মেয়েটি তাঁর সুমুখ থেকে সরে গিয়ে দ্বিতীয় বরপদপ্রার্থীর সামনে এসে দাঁড়াল। ভট্‌চার্য্যি মশায়ও তালিকাটা একবার দেখে নিয়ে আরম্ভ করলেন—

"২নং দিগম্বর কাঞ্জিলাল—বয়সে চব্বিশ। মেডিকেল কলেজে ঘুষ দেবার টাকা না থাকায় ক্যাম্বেলে পড়েছেন। আশা আছে যে—"

মেয়েটি বরের আশা-ভরসার কথা শোন্‌বার আগেই পা বাড়িয়ে দাঁড়াল। তৃতীয় বরের সুমুখের দাঁত দুটি উঁচু দেখে মেয়েটি মৃদু হাস্যে জানিয়ে দিলে যে, দাঁত-উঁচু বলে তার বিষম আপত্তি। চতুর্থ বর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, তার উপর বেজায় মোটা। মেয়েটি তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে এমনিভাবে চাইলে যে, বর বেচারা লজ্জায় রক্তবর্ণ হবার বৃথা চেষ্টা করে' শেষে অধোবদন হ'য়ে পড়্‌লো। ভট্‌চার্য্যি মশায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করলেন।—

"৫নং রাইবিলাস মুখোপাধ্যায়—অত্যন্ত সদ্বংশ, ফুলের মুকুটি, কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান। ছ' মাস হলো কাঙ্গালপুরে মুন্সেফি করচেন। সনাতন ধর্ম্মের ওপর প্রগাঢ় আস্থা। প্রাণায়াম সাধন করতে করতে নাক একটু বেঁকে গেছে বটে—"

আর অধিক বিবরণ দেবার দরকার হোলো না। ভট্‌চার্য্যি মশায়ও তাঁর সুমুখ থেকে সরে' পড়লেন।

"৬নং রমণীমোহন ঘোষাল ওরফে কবিকঙ্কণ—ইনি স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ কবি। এঁর কৃপাদৃষ্টি না হলে মাসিকের সম্পাদকেরা নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে যায়। এঁর 'মলয়লতিকা' বার হবার পর 'চর্প টপগুরিকা' পত্রিকায়—"

মলয়লতিকার কি গতি হোলো তা জান্‌বার জন্যে অপেক্ষা না করে' মেয়েটি একেবারে সাত কদম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। ভট্‌চার্য্যি মশায় ফের আরম্ভ করলেন :—

"১০ নং প্রেমতোষ চট্টরাজ—প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের ছেলে। এঁর ঠাকুর দাদার আমলে পুজোর সময় বাইনাচে যা টাকা খরচ হতো তাতে—"

তাতে যে কি অঘটন ঘট্‌তো তা আর জানা গেল না। একে একে সব বরই ফেল হয়ে যেতে লাগলো। হলধর খুড়োর মুখ ক্রমে শুকিয়ে উঠতে আরম্ভ হোলো। এত রকম-বেরকমের ছেলে!—তবু মেয়ের যে কাউকে পছন্দ হয় না। শেষে সব আয়োজন কি পণ্ড হবে নাকি?

পণ্ডিতজী বালাপোসখানি মুড়ি দিয়ে এককোণে এতক্ষণ বসেছিলেন। তাঁর কাছাকাছি হবামাত্র তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভট্‌চার্য্যি মশায়কে বল্লেন—"আপনি একটু চুপ করুন। আমার বিবরণ আমি নিজেই দিচ্চি"। মেয়েও থমকে পণ্ডিতজীর সুমুখে দাঁড়াল। পণ্ডিতজী মেয়েটীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—

"দেখগো লক্ষ্মী, আমায় যদি বিয়ে করো, ত তোমার চুড়ি দেবো, বালা দেবো, হার দেবো, গোট দেবো, বাজু দেবো, মাথায় সিঁথি দেবো, আর চাও ত ক্রাউনও দেবো—"

মেয়েটি ফিক্ করে' হেসে ফেল্‌লে। পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"শুধু অই নয়। হপ্তায় দুদিন থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাব; আর সকালে বিকালে এই এত বড় মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খেতে দেবো।"

চিকের আড়াল থেকে একটা চাপা হাসি শোনা গেল। মেয়েটিও হাস্‌তে হাস্‌তে পণ্ডিতজীর গলায় মালা পরিয়ে দিলে। এই সময় চিকের ভিতরকার অবলাদের কণ্ঠ ভেদ করে যে উলুধ্বনি উঠ্‌লো, তাতে বেশ বোঝা গেল যে, বর-নির্ব্বাচনের সঙ্গে অবলাকুলের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে।

বরেদের মধ্যে কেউ হাস্‌তে লাগলো, কেউ ম্রিয়মান হলো। গদাই আস্তিন গুটিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, পণ্ডিতজীর সামনে খাড়া হয়ে বল্লে—"আমরা এতগুলো সুপাত্র থাকতে তুমি বুড়ো যে এই কন্যারত্ন নিয়ে যাবে, তা আমরা প্রাণ থাকতে সহ্য করবো না। অতএব রণং দেহি।"

পণ্ডিতজী তাঁর বিরাট বরবপু ঈষৎ দুলিয়ে গদাইএর অঙ্গে ধাক্কা মেরে বল্‌লেন—"এই দেহি।" গদাই পপাত ধরণীতলে। পণ্ডিতজী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"ওরে বালক, বসুন্ধরা আর স্ত্রীরত্ন উভয়ই বীরভোগ্যা। শাস্ত্রের মর্ম্ম ত তোরা বুঝলিনে।"

না পড়ে পণ্ডিত

পণ্ডিতজীর কেমন বদ অভ্যাস তাঁর ছেলেটাকে স্কুলে পাঠশালে পাঠাবেন না। ছেলেটা ষাঁড়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে পারা মাথায় করে' বেড়াচ্ছে। তার জ্বালায় গাছে পেয়ারা থাকবার জো নেই, লাউ-মাচায় খুঁটি থাকবার জো নেই, খেজুর গাছে কলসী থাকবার জো নেই। বই হাতে দিলে তার ঘুম পায়, না-হয় মাথা ধরে, না-হয় পেট কামড়ায়। পণ্ডিতজীকে একদিন অনুনয়-বিনয় করে' বল্লুম—

"দেখুন, আপনার ছেলে মুখ্যু হবে, এটা দেখ্‌তে-শুন্‌তে বড় খারাপ। ছেলেটার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।" পণ্ডিতজী অম্লান-বদনে উত্তর দিলেন—"লেখাপড়াটা আমাদের বংশে কেমন সয় না। আমরা সবাই না পড়ে' পণ্ডিত। আমার বাবা যখন ছেলেবেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতেন, তখন দাদা মশায় তাঁর শুভঙ্করীতে বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আচ্ছা বল্ দেখি, এক-একটা শিয়ালের যদি এক-একটা লেজ হয়, তো পঞ্চাশটা শিয়ালের ক'টা লেজ হবে?' বাবা হাঁ করে' উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে, আমরা মন-কষা শিখেছি, এখনও লেজ-কষা শিখিনি।' দাদা মশায় রেগে বাবার কাণ মলে' দিতে গিছ্‌লেন বলে' ঠাকুরমা রাগ করে' তিন দিন ভাত খাননি। শেষে রাগ যখন পড়্‌লো, তখন তিনি হুকুম জাহির করলেন—'আমার ছেলে মুখ্যু হয় ত পণ্ডিতি করে' খাবে। তা বলে ওর গায়ে কেউ হাত তুলো না।' সেই হুকুম আমাদের বংশে বাহাল রয়েছে। আমরা যখন মুখ্যু হই, তখন পণ্ডিতি করে' খাই।"

ডেঁপোমিতে পণ্ডিতজীকে পারবার জো নেই। আমি বল্লুম—"না, না, ঠাট্টা-তামাসা নয়। নন্-কো-অপারেশনের ধুম লাগা অবধি ছেলেটা যে বইটই টেনে ফেলে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সর্দারি করে' বেড়াচ্ছে, মা সরস্বতীর মুখ দর্শন করবে না বলে' প্রতিজ্ঞা করে' বসেছে—এর ফলাফল তো আপনার ভাবা উচিত। বামুনের ঘরের ছেলে মুখ্যু হইলেই গোঁয়ার হ'য়ে দাঁড়ায়। শেষে যে রকম দিন-কাল পড়েছে, কোন্ দিন না একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে!"

পণ্ডিতজী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"ছেলেবেলায় আমিও যখন তাল গাছ থেকে কাকের বাচ্ছা পেড়ে পেড়ে বেড়াতুম, তখন বাবার কাছে আমার নামে ঐ রকম নালিশ হয়েছিল। বাবার টোলের পোড়োরা আমায় ধরতে গিয়েছিল; তাদের মাথায় তাল ফেলে দেওয়া ছাড়া আমি গাছের উপর থেকে এমন দু-একটা কু-কার্য্য করে' দিয়েছিলুম যে, তাদের স্নান করে' শুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। কিন্তু বাবা আমার লেজ-কষাটা বোধ হয় বুড়ো বয়সেও ভাল করে' শিখতে পারেননি; তাই আমার লেজ কষে দিতে ভুলে' গিয়েছিলেন। আমিও ঠিক সেই রকম করে' পিতৃঋণ শোধ করেছি। আর তা ছাড়া আর-একটা কথা কি জানিস্?—তোদের শিশুশিক্ষার সুশীল ও সুবোধ বালকের ওপর আমার অরুচি জন্মে গেছে। আমার ছেলে যদি সুশীল ও সুবোধ হয়, তাহ'লে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।"

বুড়ো বলে কিগো? আমি বল্লুম—"ছেলে না-হয় সুবোধ না হ'য়ে দস্যিই হোলো, কিন্তু তার লেখাপড়া শিখ্‌তে আপত্তি কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"ঐটি হবার জো নেই, বাবা। তোমাদের বিদ্যাদায়িনী যন্তোর এমনি কায়দা করে' তৈরি যে, যিনি বাঘের মত হালুম-হালুম করতে করতে ঐ যন্তোরের মধ্যে ঢুকবেন, তাঁকেও বার হবার সময় মেনি বেড়ালের মত মিউ মিউ করতে হবে। যত বড় দস্যি ছেলেই হোক না কেন, বিদ্যের চাপে যদি মারা না পড়ে, তবু তাকে পঙ্গু হয়ে থাক্‌তেই হবে। সরকারী শান্তিরক্ষার এমন উপায় আর নেই। পাঁচশ' পুলিস ইন্সপেক্টার যে কাজ না করতে পারে, পাঁচটা ইস্কুল মাষ্টারে তা অনায়াসে করে' দিচ্চে। আমাদের দেশে যদি জবরদস্তি বিদ্যে শেখাবার ব্যবস্থা হয়, তা'হলে পুলিসের থানা রাখবার আর দরকার হবে না। ন্যাংড়া, নুলো, কাণা, বোঁচা হয়ে যে সব ছেলে-পিলে কলেজ থেকে বার হবে, তাদের দিয়ে সরকারী শান্তি-সভা স্থাপন করা ছাড়া আর কোন কাজ হবার আশা নেই।"

আমার বড় রাগ হোলো। বললুম—"আপনিও এক কালে কলেজে হাওয়া খেতে যেতেন।"

পণ্ডিতজী বল্লেন—"হাঁ, কুসঙ্গে পড়ে' কিছু-দিন ও-কার্য্য করেছিলুম বটে। কিন্তু সে পাপ আমার অনেকদিন হোলো খণ্ডে গেছে। যতদিন পেটে কলেজী বিদ্যের কণামাত্র ছিল, ততদিন পেট ফাঁপ্‌তো, হাই উঠ্‌তো, চল্‌তে গেলে ঠ্যাং বেঁকে যেতো। তারপর একদিন গোলদীঘির ধারে গিয়ে সিনেট হলের দিকে মুখ করে' মা সরস্বতীর উদ্দেশে গললগ্নীকৃতবস্ত্র হ'য়ে বল্লুম—'মা পেটে যা ছিটে-ফোঁটা দিয়েছ তা সুদশুদ্ধ ফিরিয়ে নাও, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটিও নিয়ো।'

মায়ের মেজাজ তখন শরিফ্ ছিল বোধ হয়। মা আমার প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন—'তথাস্তু'। সেই অবধি আর ওদিক মাড়াইনে। আমা'বু কেমন ধারণা হ'য়ে গেছে যে, কলেজের ছেলেরা একেবারে গয়লার বাছুর হয়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম—"সে আবার কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"আহা! সে গল্পটা জানিস্‌নে? একটা গয়লার ঘরের বাছুর আর একটা বামুনের ঘরের বাছুর একদিন এক যায়গায় ছাড়া পেয়েছিল। গয়লা টেনে দুধ দোয়; কাজে-কাজে তার বাছুরটা একটু কাহিল আর বামুনের শরীরে একটু দয়ামায়া ছিল, কাজেই তার বাছুরটি ওরি মধ্যে একটু হৃষ্টপুষ্ট। বামুনের বাছুর গয়লার বাছুরকে বললে—'ভাই, একটু খেলা করবি?' গয়লার বাছুর বললে—কোরবো। বামুনের বাছুরের বেশ একটু ফুর্ত্তি হোলো। সে বললে—'তবে আয় ভাই খানিকটা ছুটোছুটি ক'রে বেড়াই।' গয়লার বাছুরের ছুটোছুটি করবার সামর্থ্য নেই। সে প্রস্তাব করে' বসলো—'না ভাই, ছুটোছুটিতে কাজ নেই। আয় দেখি, কে কত শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়তে পারে!'—তোমার কলেজের ছেলেদেরও ঠিক ঐ দশা। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এমনি চুষে' ছেড়ে দেয় যে, সারাজীবন কে কত লেজ নাড়তে পারে তাই দেখা ছাড়া আর কিছু তাদের দিয়ে হয় না।"

কথাটা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে আমি রাজি ছিলুম না। কাজে কাজেই পণ্ডিতজীকে বললুম—"আর একদিন ও কথাটার বিচার করা যাবে। আজ চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।"

আর কত দিন

পণ্ডিতজী সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাস্তায় যে রকম জুজুর ভয়, আমরা ভেবেছিলুম বুড়োকে আবার দিন কতকের জন্যে আলিপুরে হাওয়া খেতে না যেতে হয়। মাথা-পাগলা মানুষ, শান্তিরক্ষার বহর দেখে কখন সার্জেণ্ট বাহাদুরদের প্রেমালিঙ্গন করে' বসবে তা তো বলা যায় না! আর সার্জেণ্টরাও যে রকম প্রেমিক পুরুষ, একবার যদি আমাদের পণ্ডিতজীকে ভালবেসে ফেলে, তো সে প্রেমের বন্ধন টেনে ছেঁড়া দায় হবে। কিছুদিন আলিপুরে রেখে দিয়ে তাঁর সেবাশুশ্রূষা না করে' আর তাঁকে ছাড়বে না। আটটা বেজে গেলো; নটা বাজে বাজে। গদাইকে বলছিলুম—"যা, বাবা, একবার না-হয় বড়বাজারের থানাটা পর্য্যন্ত দেখে আয়,—শেষে বুড়ো কি সত্যি সত্যিই—।" কথা আর আমার শেষ করতে হোলো না। চটি জুতোর ফুট্‌ ফুট্‌ আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি পণ্ডিতজীর নবজলধরশ্যাম-বপু সুমুখেই দণ্ডায়মান! মুখের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত হাসিতে ভরে' গেছে।* চোখের কোণে একটা উদ্দাম আনন্দ।

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে' পণ্ডিতজী গদাইএর নাকের উপর ছুঁড়ে মেরে বললেন—"নিয়ে আয় আজ ভেঁটকি মাছের মুড়ো; আর সের-কতক রসগোল্লা। আজ আমি তোদের খাওয়াব। আর কাল মঙ্গলবার চল্‌ কালীঘাটে; আমি মায়ের কাছে জোড়া পাঁঠা পূজো মেনেছিলুম—দিয়ে আসতে হবে। বেটী অনেকদিন থেকে জিভ বার করে' বসে' আছে।"

ব্যাপার কি? গদাই আমার মুখের দিকে চাইতেই, পণ্ডিতজী তাকে এক ধাক্কা মেরে বললেন—"আরে হনুমান, হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কি? লঙ্কায় আগুন লেগেছে দেখছিস্‌-নে? এইবার 'জয় রাম বলে' মার লাফ।"

গদাই ধাক্কা খেয়ে রসগোল্লা আনতে চলে' গেল। আমি আর বাক্যব্যয় না করে' পণ্ডিতজীর জন্যে একছিলিম তামাক সাজতে বসে' গেলুম। অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আমি এটুকু বেশ জানতুম যে, তামাক টুকু পুড়ে' যতক্ষণ না ছাই হবে, ততক্ষণ আর এই ভক্তিতত্ত্বের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা চলবে না।

তামাকটুকু যখন বেশ ধরে' এলো, তখন পণ্ডিতজীর অর্দ্ধনিমীলিত চোখের দিকে লক্ষ্য করে' আমি জিজ্ঞেস করলুম—"সত্যি সত্যিই কালীঘাটে পূজো মানা আছে না কি?"

পণ্ডিতজীর হাত থেকে গড়গড়ার নলটা খসে' পড়ে' গেল। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"বলিস্‌ কিরে? আমরা ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরে' শাক্ত; আর আজ আমি কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা কাটি বলে' তোরা কি মনে করিস্‌, যে, আমার পিতৃপুরুষদত্ত রক্তটাও সাদা হ'য়ে গেছে? রিফর্মের মালপো খেয়ে যারা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে, সে বংশে আমার জন্ম নয়। গাজনের আওয়াজ শুনলেই আমার চড়ুকে পিঠ এখনো চড়চড় করে ওঠে। অনেকদিন আগে, তোরা যখন ছেলে মানুষ, দেশের লোক যখন ঘুমুচ্চে, তখন আমি তিনদিন হত্যা দিয়ে কালীঘাটে পড়েছিলুম। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—'মা, আর কতদিন? কবে তুমি জাগবে?' মা সেদিন বলেছিলেন—'তোদের মেয়েরা যেদিন জাগবে,

আমিও সেদিন জাগ্‌বো।' তারপর মা আমার চোখের সামনে ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, আজ কল্‌কাতার রাস্তায় আমি সে দৃশ্য দেখে এসেছি। তোরা যাই বলিস না কেন, কলিতে কালীই জাগ্রত দেবতা। বেটী পূজোর সময় বলি খায় বটে, কিন্তু বেইমানী করে না।"

আমি ভালমানুষের মত জিজ্ঞেস করলুম—"কি দেখেছিলেন পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"যা দেখেছিলাম তার কতকটা চোখের সামনে তোরাও দেখ্‌ছিস্। আর যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু আরও সাত বছর ধরে তোরা দেখ্‌বি। দেখেছিলাম আর কি। মায়ের রণচণ্ডী মূর্ত্তি। ভারতের এক শেষ থেকে আর-এক শেষ পর্য্যন্ত মা প্রলয়-বহ্নি জেলে দিয়েছেন। উন্মত্ত জনসঙ্ঘ বন্দুক, কামান, গোলাগুলি তুচ্ছ ক'রে ভৈরব নিনাদে দিগন্ত মুখরিত করে' তুলেছে। ঠিক গান্ধীর মত টুপি পরা একজন সেই জনসঙ্ঘকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টায় তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কোথা থেকে একটা বন্দুকের গুলি এসে তাঁর গায়ে লাগ্‌লো। বাস—শান্তির শেষ চিহ্ন মুছে' গেলো। মহাত্মা নিজের জীবন আহুতি দিয়ে দিলেন। সারা আকাশ তাঁর রক্তের আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো।"

আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো। মনে হ'তে লাগ্‌লো—এসব সত্যি না খেয়াল?

পণ্ডিতজী আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে বল্‌লেন—"ভাবছিস্ এ সব আমার মাথার খেয়াল। তবে যাক্ ও-সব কথা। হয়ত বা আফিমের ঝোঁকেই ওসব খেয়াল দেখেছিলুম। কিন্তু আজ কেবলি দুহাত তুলে' লাট কর্জন আর জেনেরাল ডায়ারকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ইচ্ছে হচ্চে। আলমগীর বাদশার পর অমন বন্ধু আর আমাদের হয়নি।"

হাসি চাপা আমার পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে উঠলো। আলমগীর বাদশা যে আমাদের এতবড় বন্ধু, এ কথাটা জানতুম না। ঐতিহাসিকেরা তা লিখ্‌তে ভুলে' গেছে।

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"মুখে আগুন তোর ঐতিহাসিকদের। আকবর বাদশাকে তাদের ভারি মনে ধরে। আঃ খেলে কচুপোড়া। দেশে যদি আর দু'একটা আকবর বাদশা থাক্‌তো, তাহলে রাজপুতেরাও গোলাম মেরে যেত, আর গুরু গোবিন্দও জন্মাত না, শিবাজীও জন্মাত না। শরীরে বিষ ঢুকুলে যেমন শরীরটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হ'য়ে যায়, আকবরের কাছে মিঠে গোলামী শিখে দেশটারও সেই দুর্দ্দশা হ'য়ে আস্‌ছিল। আর আলমগীর!—হ্যাঁ, খাটি তাতার বাচ্ছা বটে। তিন দিনে দেশটাকে বুঝিয়ে দিলে যে, গোলামের সুখশান্তি সব ফক্কিকারী। আলমগীর যদি না জন্মাত, ত গুরু নানকের চেলারা আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বৈষ্ণবদের মত হরিনামের ঝুলি নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তো। ডালহৌসী, কর্জন, ডায়ার ঠিক ঐ আলমগীরের বংশধর। মরা জাতকে বাঁচাবার সিদ্ধমন্ত্র ওদের কাছে। আজ আবার ঠিক ঐ পুরোণো হাওয়া বয়েছে; তাই স্ফূর্ত্তিতে আমার প্রাণ লাফিয়ে উঠছে।"

ঠিক সেই সময়ে রসগোল্লার ঠোঙ্গা হাতে করে' গদাই ফিরে এল। আমি বল্‌লুম—"আজ রাজনীতি চর্চ্চাটা তাহলে থাক। রসগোল্লা-চর্চ্চা তার চেয়ে ঢের বেশী উপাদেয়।"

গদায়ের বৈরাগ্য

স্বয়ম্বর-সভা থেকে ফিরে এসে গদাই সেই যে ঘরের ভিতর ঢুকলো, দুদিন আর তার দেখা পাওয়া গেল না। তিন দিনের দিন সকাল বেলা পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ওরে দেখ্‌না তোরা একবার ছেলেটার কি হলো। শেষে কি ছোঁড়া মনের দুঃখে একটা কাণ্ড-মাণ্ড করে' বস্‌বে?"

কবিকঙ্কণ হাই তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—"কাণ্ড আর কি কর্‌বে? দিন কত আগে হোলে গেরুয়া ছুবিয়ে বিবাগী হ'য়ে যেতো; কিন্তু গেরুয়ার romance আজকাল অনেকটা কেটে গেছে। বিবেকানন্দ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে গেরুয়াও মারা পড়েছে। এখন ছেলেরা শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে স্বামীজীর ছবিকে আরতি করেই কাজ সারে। গেরুয়ার দিকে বড়-একটা ঘেঁসে না।"

রাইবিলাস বললে—"সেদিন আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিলুম; মনে হলো যেন গদাই কি লিখ্‌ছে!"

কবিকঙ্কণ লাফিয়ে উঠ্‌লো। বললে—"ঐরে, সর্ব্বনাশ করেছে! আমার ব্যবসা বুঝি বা মারে! ওর মত অবস্থায় পড়্‌লে আমি একখানা মহাকাব্য, অন্ততঃ একখানা গীতিকাব্য ত শেষ করে' ফেলতুম। বিরহের বেগে inspired হ'য়ে হয়ত সে ঐ কার্য্যই আরম্ভ করে' দিয়েছে।

ক্যাবলাকান্ত এই সময় ঘরে এসে মুচিপাড়ার থানায় একদল স্বদেশী ভলেন্টিয়ারের গ্রেপ্তারের খবর দিলে।

রাইবিলাস যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। সে বল্‌লো—"গদাইকে যা লিখ্‌তে দেখেছিলাম তা হয়ত তার Last Will and Testament."

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ভাল রে ভাল; গদাই শুধু শুধু উইল লিখ্‌তে যাবে কেন? সে ত আর ষোলবছরী খুকি নয় যে, বিয়ে হোলো না বলে মনের দুঃখে কেরোসিনে পুড়ে' মর্‌বে?"

রাইবিলাস বল্‌লে—"ওগো না, কেরোসিনে পুড়ে বা আফিম খেয়ে তাকে কেউ মর্‌তে বল্‌ছে না। সে হয়ত উইল-টুইল করে' ভলণ্টিয়ারদের দলে যোগ দেবে।"

ক্যাবলাকান্ত হেসে ফেল্‌লে। সে বল্‌লে—"ভলণ্টিয়ার হলেই হয় ছ' মাসের জেল দেবে, নয়ত রাত্তিরে ধরে' নিয়ে গিয়ে ধাপার মাঠে ছেড়ে দেবে। তার জন্যে ত উইল কর্‌বার দরকার নেই; বরং জেল আজকাল যা হ'য়ে উঠেছে, তাকে শ্বশুর-বাড়ী বল্লেই হয়।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"তা'হলে বিরহের বন্যা হাল্কা কর্‌বার জন্যে ঐ দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, তার ঘরে গিয়ে একবার খোঁজটাই করা যাক।"

পণ্ডিতজী উঠে পড়্‌লেন। আমরাও সবাই সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌লুম। গদায়ের দরজার কাছে গিয়ে পণ্ডিতজী স্বরটা যথাসম্ভব মিষ্ট করে ডাক্‌লেন—"গদাই, ও গদাই, দাদা আমার, দরজাটা খোল্‌ ত।"

গদায়ের কোনই সাড়া শব্দ নেই।

কবিকঙ্কণ দরজায় চোখ দিয়ে দেখে চুপি চুপি বল্‌লে—"আরে! গদাই বিরহের জ্বালা ঠাণ্ডা করবার জন্যে শুয়ে শুয়ে কমলালেবু খাচ্ছে।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"চুপ কর তুই। গদাই ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, জ্ঞান ওর টন্‌ টন্‌ কর্‌চে। বৈরাগ্য, বিরহ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাধির মূল যে পাকস্থলীতে বা শরীরের অন্য কোনো কেন্দ্রে, তা ও বিলক্ষণই জানে। ছেলেবেলায় আমার যখন ঐ সব ব্যাধির প্রকোপ হোতো, তখন আমি নবীন ময়রার দোকান থেকে গোটাকত রসগোল্লা আনিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিতুম, আর কিছুকালের জন্য ব্যাধির উপশম হ'য়ে যেতো। শরীরের সঙ্গে আত্মার যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তা বরং তোরা কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Experimental psychologyর প্রোফেসারকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসিস্‌। তিনি যে একখানা "এনছাইক্লোপিডিয়া ডিভিনা" অর্থাৎ "ভাগবত বিশ্বকোষ" লিখেছেন, তা দেখেছিস্‌ ত? তাতে পরমাত্মা, জীবাত্মা, ভূতাত্মা, প্রেতাত্মা, সংঘাত্মা প্রভৃতি আত্মাপুরুষের যত রকমফের আছে, তাঁদের শরীরের কোন্‌ কোন্‌ কেন্দ্রের সঙ্গে কি রকম সম্বন্ধ, তার একেবারে সটীক বর্ণনা দেওয়া আছে। গদায়ের যে সমস্ত লক্ষণ দেখ্‌ছি, তা "ভাগবত বিশ্বকোষের" 'মহাত্মা' অধ্যায়ে বর্ণনা করা আছে। আমার মনে হচ্ছে, গদাই আহার-বিহার সংযত করে 'মহাত্মা' হবার চেষ্টা কর্‌ছে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"তাহলে এর antidoteটা আপনি বাৎলে দিন।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"মহাত্মার antidote হচ্ছে সংঘাত্মা। বিশ্বকোষের 'ভাগবত অর্থশাস্ত্র' অধ্যায়ে তুমি সাংঘাত্মার বিবরণ দেখ্‌তে পাবে। মূলাধার আর স্বাধিষ্ঠান চক্রেই প্রধানতঃ সাংঘাত্মার স্থিতি। ঐ দুটো চক্রে ধ্যান কর্‌লেই ভাগবত অর্থশাস্ত্র তোমার দখলে আস্‌বে; আর তুমি বিরাট আধ্যাত্মিক বাণিজ্য গড়্‌বার ছত্রিশ রকম কৌশল শিখ্‌বে; পাইকারী বা খুচরা ভাগবত ব্যবসা চালাইবারও কোন বাধা থাক্‌বে না। ফলে তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সংঘাত্মা হ'য়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। আমি দেখছি যে, গদাইকে এই সাংঘাত্মা দীক্ষিত না কর্‌লে তার আর রক্ষা নেই।"

গদাই এই সময় খট্‌ করে' দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বল্‌লে—"তথাস্তু।"

শ্যাম না এল

ভোর বেলা লেপখানাকে বেশ করে' জড়িয়ে ধরে কবিকঙ্কণ গান ধরে দিয়েছে—

সখি, শ্যাম না এল।
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী পোহাল।

মিঠে মিঠে শীতের সঙ্গে মিঠে মিঠে সুর মিশে বেশ একটা নেশার আমেজ সৃষ্টি করে' আন্‌ছিল, এমন সময় রাইবিলাস লেপের ভিতর থেকে চার ইঞ্চি লম্বা নাকটি বার করে' বলে উঠ্‌লো—

"থামাও বাবা, কাঁদুনি থামাও। কাল চার গণ্ডা পয়সা খরচ করে' চুল ছাঁটিয়ে এসেছ, আর আজ রাত কাটতে-না-কাটতে তোমার কবরী একেবারে শিথিল হ'য়ে গেল? দোহাই কবিকঙ্কণ, তোমার আধ্যাত্মিক বিরহকে খানিকটা লেপচাপা দিয়ে আমাদের আর একটু ঘুমুতে দাও।

কবিকঙ্কণের গান থেমে গেল। সে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে—"না, তোদের মত বে-রসিকের সঙ্গ ত্যাগ না কর্‌লে আর আমার মুক্তি নেই! সকালবেলা কোথায় একটু নাম-কীর্ত্তন কর্‌বো, তা'ও তোদের জ্বালায় হবার জো নেই।"

"চোটো না, কবিকঙ্কণ, চোটো না" বলে রাইবিলাস গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বস্‌লে। এই non-violenceএর দিনে মনে মনে রাগ করাও একটা ভীষণ পাপ। তা ছাড়া ভক্তি-শাস্ত্র আলোচনা কর্‌বারও ত একটা সময়-অসময় আছে। ভগবান ত আর আমাদের মত মেসে পড়ে' থাকেন না। বৈকুণ্ঠধাম ত আমাদের মেসের মত লক্ষ্মীছাড়া জায়গা নয়। এই যে শীত কালের দিন ভোরবেলা তুমি ভগবানকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছ, এটা একটা ভক্তির বাজে খরচ। ভগবান বেচারা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন, তোমার অত সাধের মিঠে কাঁদুনি হয়ত তাঁর কাণেও পৌঁছুচ্চে না। আর যদি শুন্‌তে পেয়ে তোমায় বর দেবার জন্যে তিনি বিছানা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েন, তা'হলে মা লক্ষ্মী তোমার ওপর মনে মনে কি রকম চটে যাবেন তা বুঝ্‌তেই পারছ। ভগবানকে চটিয়ে বরং পার পাবে, কিন্তু মা লক্ষ্মী যদি চটেন ত তোমার ভিটেয় একেবারে ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দেবেন।"

পণ্ডিতজী এতক্ষণ তুমুল নাসিকাগর্জ্জন করে' সুষুপ্তির আনন্দ উপভোগ কর্‌ছিলেন। রাইবিলাসের বক্তৃতার ধ্বনি যখন তাঁর নাসিকার ধ্বনিকে পরাজিত করে' দিলে, তখন তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হোলো। রাইবিলাসের শেষ কথাগুলো বোধ হয় তাঁর কাণে গিয়েছিল। তিনি নিদ্রালসকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—"ঠিক ব'লেছিস্, রাইবিলেস, আধ্যাত্মিক common senseটা তোর বেশ টন্‌টনে। ছেলেবেলা থেকে আমি দেখে আস্‌ছি, যারা মা লক্ষ্মীকে চটিয়ে ভগবানকে ধ'রে টানাটানি করে' তাদের 'কোমরে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম শিরে জটা।' ঐ জন্যেই ত কবিকঙ্কণ আজ সাত বছর ধ'রে আলিপুর কোর্টে হাওয়া খেতে যাচ্ছে, তবু সাতটি পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছে কি না সন্দেহ।"

কবিকঙ্কণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' বল্‌লে—"পণ্ডিতজী, আপনি শেষে ঐ ছোঁড়াদের দলে গিয়ে জুট্‌লেন!"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"কি কর্‌বো, বাবা, আধ্যাত্মিক মোসাহেব-সঙ্ঘে ত আর আমি নাম লেখাইনি যে তত্ত্বজ্ঞানের লেবেল এঁটে মোটা মোটা মিথ্যা কথা পাচার কর্‌বো। চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কাণ টান্‌লেই যেমন মাথা আসে তেমনি মা লক্ষ্মীকে তুষ্ট কর্‌তে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেরও তুষ্টি। এই দেখো না, ইউরোপের ব্যাপার। ওরা হপ্তার ছ'দিন মা লক্ষ্মীর সেবা করে আর রবিবারে গির্জ্জায় গিয়ে একবার ভগবানকে সেলাম ক'রে আসে। আর আমাদের দেশে দিন নেই, রাত নেই, আমরা 'প্রভু হে, দয়াল হে' ব'লে কেঁদে কেঁদে মরচি। কিন্তু প্রভু যে আমাদের ওপর তার জন্যে ওদের চেয়ে বিশেষ-কিছু খুসী হয়েছেন, তার ত প্রমাণ পাইনে। ওরা তবু পেট ভ'রে খেতে পায়, আর আমরা পেটের জ্বালাটা আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ দিয়ে শীতল করি।"

কবিকঙ্কণ ব'লে উঠ্‌লো—"না পণ্ডিতজী; এ কথাটা আপনার মনে লাগ্‌ছে না। শাস্ত্রে বলে' গেছে ভগবানের পুজো কর্‌লেই লক্ষ্মীর পূজো করা হয়; ভগবানের তুষ্টিতেই লক্ষ্মীর তুষ্টি।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—হ্যাঁগো কর্ত্তা, হাঁ। কিন্তু নাকি সুরে কান্নাটাই যে ভগবানকে তুষ্ট কর্‌বার প্রকৃষ্ট পন্থা, এ কথা শাস্ত্র কোথাও বলেনি। শাস্ত্র বরং উল্টো কথাই বলে গেছে যে, বৈরিভাবে সাধন করলে তিন জন্মে যা পাওয়া যায়, খোসামোদ করে' পেতে গেলে তাতে সাতজন্ম লাগে। মডারেটদের স্থান কোথাও নেই—না আধ্যাত্মিক জগতে, না আধিভৌতিক জগতে।

আধ্যাত্মিক গবেষণা ক্রমে আধিভৌতিকের দিকে গড়িয়ে আস্‌ছে দেখে গদাই স্ফূর্ত্তির চোটে বলে ফেল্‌লে—"হায় রে, এ তত্ত্ব যদি আমাদের আধিভৌতিক নেতারা বুঝতেন, তা'হলে আজ কি তাঁদের কবিকঙ্কণের মত সুর করে গাইতে হতো,—

সখি, স্বরাজ না এল;
অবশ অঙ্গ, শিথিল কচ্ছ,
ঐ ডিসেম্বর ফুরাল।"

তার সাধের কবিতার এই রকম বেয়াড়া parody শুনে কবিকঙ্কণের পিত্ত জলে গেল! সে ধাঁ করে লেপখানা ফেলে দিয়ে একেবারে

রুদ্রমূর্ত্তি ধরে' গদায়ের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে' বল্‌লে—"থামা তোর কবিতা, পাজি; নৈলে তোর গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো।"

গদাই লেপের ভিতর ঢুকে গিয়ে কীর্ত্তনের সুরে পাইতে লাগলো—

"আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই হে,
তোমার non-violent নামে যে কলঙ্ক হবে,
তোমার স্বরাজ যে আরও পিছিয়ে যাবে।"

কবিকঙ্কণ ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লে—"তোর মত পাষণ্ড থাক্‌তে স্বরাজের কোনো আশা নেই। আগে আমি তোর গলা টিপে মার্‌বো, তারপর দরকার হয়ত দিন তিনেক উপোস করে' প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।"

গজ-কচ্ছপ যুদ্ধের পুনরভিনয় হবার জোগাড় দেখে সবাই হুড়্‌মুড়্‌ করে লেপ ছেড়ে উঠে পড়্‌লুম। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, সব গবেষণাই সে-দিনকার মত মাঠে মারা গেল।

নদের চাঁদ

"আরে নদের চাঁদ হঠাৎ ভূতলে উদয় যে।"—বলে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পণ্ডিতজী নদেরচাঁদকে জাপ্‌টে ধর্‌লেন।

নদেরচাঁদ মুসলমানের ছেলে। আসল নাম সেখ ইস্‌মাইল। দিব্যি ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুপুরুষ। নদেজেলায় বাড়ী বলে পণ্ডিতজী তার নাম রেখেছিলেন নদের চাঁদ।

জাপটা-জাপটি শেষ হবার পর পণ্ডিতজী তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বল্‌লেন—"তোর আবার এ কি হোলো? তোর সেই ঝালঝুপ্পা সতের গণ্ডা বোতাম আঁটা আলখেল্লা কোথা গেল? তোর সেই লাল তুর্কি ফেজ কই? তোর চাঁচর চিক্কণ বাবরীর এমন দশা কর্‌লে কে? আজ তোর পায়ে চটি জুতো, আর গায়ে খদ্দরের চাদর—এ আবার তোর কি বেশ?"

নদেরচাঁদ খুব খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হো হো করে' হেসে নিয়ে বল্‌লে—

"আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি,
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ,
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

এবার আমদাবাদে গিয়ে আমার তুর্কি হবার সখ মিটেছে। তাই ফেজটি আমার খসে গেছে। এই আক্কেল হয়েছে যে আমি মুসলমান বটে, কিন্তু বাঙ্গালী, তুর্কি নই।"

পণ্ডিতজী তার মুখের দিকে চুপ করে' চেয়ে রইলেন।

নদেরচাঁদ পণ্ডিতজীকে চুপ করে' চেয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"এন্‌ভার পাশাকে স্বাধীন ভারতের সেনাপতি কর্‌বার প্রস্তাবটা শোনেন নি?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ওঃ? তাই বটে। হাঁ শুনেছি বৈ কি। কিন্তু তা শুনে ত ফেজটা আরও শক্ত করে' মাথায় আঁটা উচিত ছিল। তুই সেটা খুল্‌লি কি ভেবে?"

নদের চাঁদ বল্‌লে, আমার পাশে একজন পাঠান বসেছিল; সে বল্‌লে—'কাবুলের দরবার থেকে চেয়ে পাঠালে কাবুলের আমীরও একজন সেনাপতি পাঠিয়ে দিতে পারেন।" কাবুলীওয়ালা এসে ভারতের সেনাপতি হবে—কথাটা আমার একটা বিরাট ঠাট্টা বলে মনে হোলো। অথচ তুর্কী যদি সেনাপতি হ'তে পারে ত কাবুলীই বা কি দোষ কর্‌লে? তুর্কিও মুসলমান, কাবুলীও মুসলমান। তুর্কিদের সঙ্গে কখনও আমার মেলামেশা হয়নি; কিন্তু কাবুলী যে কি চিজ্, তা বিলক্ষণই জানি। যে ভারতে কাবলীওয়ালাকে সেনাপতি কর্‌তে হবে, সে ভারত কি রকম স্বাধীন, তা আমি ভেবে উঠ্‌তে পারছিনে। তারপর কাবুলীর মাথার দিকে চেয়ে দেখলুম যে তুর্কি ফেজের নাম গন্ধও নেই। তখন আমার মনে হোলো কাবুলীও ত মুসলমান; কিন্তু সে ত তুর্কি সাজতে যায় না। আচার, ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে নিজের দেশের কায়দা-কানুন বজায় রাখে; কিন্তু আমরা মুসলমান হলেই নিজের দেশের যা কিছু সব ছেড়ে দিয়ে তুর্কি ফেজ মাথায় তুলি কেন? আরবী, ইরানী, তাতার, আফগান সবাই মুসলমান—কিন্তু কেউ নিজের দেশের ছেড়ে অপরের পোষাক পর্‌তে যায় না। আমরাই বা কোর্‌বো কেন?"

পণ্ডিতজী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"আমাদের দেশী খ্রীষ্টানেরা যে জন্যে পাতলুন পরে ফিরিঙ্গি সাজ্‌তে যায়, তোমরাও সেইজন্যে ফেজ মাথায় দিয়ে তুর্কি সাজো।"

নদেরচাঁদ বল্‌লে—"কথাটা অপ্রিয় হ'লেও ঠিক। বিদেশীর কাছে থেকে যারা ধর্ম্ম পেয়েছে, তারা ধর্ম্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী আচার ব্যবহারও নিয়ে নেয়। তারা ভাবে ওগুলো না হ'লে ধর্ম্মটা খোলতাই হয় না। অথচ ধর্ম্মের সঙ্গে এ সমস্ত বাইরের

আচারের এমন ত কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই। আজ যদি আপনি চীনেম্যানের কাছ থেকে কংফুংজের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তা'হলে আপনাকে আরসুলা বা টিক্‌টিকির চাটনি যে কেন খেতে হবে, তা ত বুঝতে পারছিনে। সাত হাত নলের ভিতর দিয়ে চণ্ডুর ধোঁয়া না টানলে কংফুংজ চোটে যাবেন—এই বা কেমন আব্দার ?"

টিক্‌টিকির চাটনির কথা শুনে হলধর খুড়ো মুখ সিঁটুকে বললে—"আরে থুঃ।"

পণ্ডিতজী বললেন—"খুড়ো হে, অত নাক সিঁটুকো না। স্বরাজের যে রকম পরস্মৈপদী আয়োজন, তাতে অদৃষ্টে কি যে ঘটবে তা বলা যায় না। মুসলমানেরা যদি বলেন যে স্বাধীন ভারতের সেনাপতিকে তুর্কিস্থান থেকে আমদানি করতে হবে, তা'হলে চাটগাঁয়ের বৌদ্ধ মগেরা আর ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গিরাও ঠিক করতে পারেন যে, একজন চীনে বা জাপানী জাঁদরেল না হলে তাঁদের চলবে না। হিন্দুরা যে রকম উদ্ভট সাত্ত্বিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা বেগতিক দেখলেই পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে তুরীয় লোকের চর্চ্চা করতে আরম্ভ ক'রে দেবে। তখন সুলতান মামুদ আসবেন কাউণ্ট ওকুমাকে তাড়াবার জন্যে, আর কাউণ্ট ওকুমা আসবেন সুলতান মামুদকে তাড়াবার জন্যে। দুজনেই আমাদের শুভার্থী; সুতরাং আমাদের একটা গতি না হওয়া পর্য্যন্ত দুজনকেই কোস্তাকুস্তি করতে হবে। আর কার গুঁতো বেশী মিষ্টি তা পরীক্ষা করবার আমাদের যথেষ্ট অবসর মিলবে। কাউণ্ট ওকুমা যদি হাওয়া বদলাবার জন্যে দিনকতক এ দেশে থেকে যান, তা'হলে বরাতের জোরে টিক্‌টিকির চাটনি জুটেও যেতে পারে। শেষে বলতে হবে—

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
কাল হলো তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে।

বিদেশী এঁড়ে গরু কেনবার জন্যে আর ঘরের তাঁত বিক্রি করা কেন ? নিজেদের যদি মর্দ্দানি না থাকে, ত পরের মর্দ্দানি ধার ক'রে আর কত কাল চলবে ?"

হলধর খুড়ো মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললেন—"তাই তো, পণ্ডিতজী, তুমি ভাবিয়ে তুললে যে! ঘরে ফিরে সেই বিদেশী বঁধুর প্রেমে যদি পড়তে হয়, তা'হলে জেনেরাল ডায়ার আর দোষ করলে কি ? তার চেয়ে আমি বলি কি, জনকত মডারেট আর ফিরিঙ্গিকে ধরে একদিন চুণোগলিতে স্বরাজ ঘোষণা করিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে লাট রিডিংকে বড়লাট আর লাট লিটনকে বাংলার লাট নির্ব্বাচন ক'রে ফেল। একবৃন্তে রাজভক্তি আর স্বরাজ দুই এক সঙ্গে ফুটে উঠবে।

হলধর খুড়োর অহিংসা

হলধর খুড়ো আহারাদি ক'রে ওঠবার সময় গদাইকে হুকুম করলেন—"ওরে একবার পাঁজিখানা দেখ ত! আজ চতুর্দ্দশী পড়েছে বলে' মনে হচ্চে; তা'হলে তো আমিষ-ভোজন আজ নিষিদ্ধ। তোরা যে এক রকম জোর করেই গলদা চিংড়ির ডালনা খাইয়ে দিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রে দিলি, এতে পরকালে তোদের কি অবস্থা হবে, তা একবার ভেবে দেখেছিস্ ?"

গদাই তাড়াতাড়ি পাঁজির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে—"না, খুড়ো, চতুর্দ্দশী পড়তে এখনো তিন অনুপল, আড়াই বিপল বাকি। সুতরাং আপনার ধর্ম্মটা খুব প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেছে। আর তা ছাড়া চিংড়ি মাছ ত খুব সাত্ত্বিক আহার; আমিষের মধ্যেই গণ্য নয়। দেখেছেন ত চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়ালেই একেবারেই অমল ধবল দিব্য কান্তি বেরিয়ে পড়ে। যা শ্বেতবর্ণ, তা যে সাত্ত্বিক, এ একেবারে শাস্ত্রের কথা।"

খুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন—"হাঁ, তা বটে, তা বটে! তবু দেখিস্ বাপু, আহার-বিহারের ব্যবস্থাগুলো তোরা একটু সাবধান হ'য়ে করিস্। দেখিস্ যেন আমার সাত্ত্বিকতা না নষ্ট হ'য়ে যায়। দেশ-কালের অবস্থা বুঝে' আজকাল আমি কায়মনোবাক্যে অহিংসা প্র্যাকটিস্ করছি তা ত জানিস্। রাত্রে মশা-ছারপোকার জ্বালায় ঘুম হয় না, কিন্তু ভয়ে মারতে পারিনে, পাছে মনে হিংসাবৃত্তি ঢুকে' যায়। একবার ছারপোকা মারতে আরম্ভ করলে শেষে কি করতে কি ক'রে ফেলবো তা ত বলা যায় না।"

গদাই বিনীত ভাবে বললে—"না খুড়ো, সে ভয় নেই। তোমার শরীরের গ্রন্থি সাত্ত্বিকতার প্রভাবে যে রকম শিথিল হ'য়ে এসেছে তাতে মশার অদৃষ্টে মৃত্যু লেখা না থাকলে সে আর তোমার হাতে মারা পড়বে না। তুমি মারতে গেলে সে হাসতে হাসতে উড়ে' চলে' যাবে।"

খুড়ো খুব অনাসক্ত ভাবে একটা হাই তুলতে তুলতে বল্‌লেন—"অহিংসা-সিদ্ধির লক্ষণই হচ্চে তাই।"

গদাই জোড়হস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, খুড়ো, তা'হলে আমাদের মত রাজসিক জীবগুলোর কি গতি হবে? রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হলে যদি মশাগুলোকে সাত্ত্বিক ভাবে ধরে' আস্তে আস্তে তাদের কাণ মলে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলেও কি ধর্ম্মে পতিত হবার ভয় আছে?"

খুড়ো বল্‌লেন—"বড় কঠিন কথা, গদাই; বড় কঠিন কথা জিজ্ঞেস করেছ। ও সম্বন্ধে অহিংসা-সংহিতায় কোনো অনুশাসন দেখতে পাওয়া যাচ্চে না। আসল কথা হচ্চে কি জান—মশা হলেন কৃষ্ণের জীব। সুতরাং তিনি যখন লীলাচ্ছলে তোমার অঙ্গে হুল ফোটাতে আরম্ভ করবেন, তখন তুমি সেই মশার অন্তর্য্যামী ভগবানকে প্রার্থনা দ্বারা তোমার দুঃখের কাহিনী জানিয়ে দিতে পার। খুব আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে যদি এ কাজ করো তা'হলে একদিন-না-একদিন মশা তোমার দুঃখে কাতর হয়ে অন্যত্র উড়ে যাবেন। তা না করে' তুমি যদি সরাসরি ব্যবস্থা করে' মশার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাও, তা'হলে বুঝতে হবে যে, মশার হৃদ্‌বিহারী ভগবানের ওপর তোমার শ্রদ্ধাভক্তি নেই; অর্থাৎ তুমি নাস্তিক; আর তোমার ব্যবহার হোলো petulant আর vindictive."

গদাই কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্‌লে—"না, না, ও-রকম ভীষণ অপবাদ আমায় দেবেন না। আপনি হলেন ভগবানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সুতরাং আপনি যদি বলেন যে, ভেড়ার দুঃখে বাঘের চোখ জলে ভেসে যাবে, বা মাছের শোকে বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করবে—তা সে কথা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হলেও আমি প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কোরবো, আর কেউ যদি বিশ্বাস করতে না চায় ত তার গলার কণ্ঠি ছিঁড়ে দেবো। আমি সুধু এই কথা জিজ্ঞেস করছিলুম যে, মশার অন্তর্য্যামী ভগবান সাড়া দিতে যদি একটু বিলম্ব করেন, তা'হলে মশা মশায়ের নাকটা বা কাণটা টেনে দিলে ভগবানের একটু শীঘ্র সাড়া দেবার সুবিধা হবে কি না।"

খুড়ো গদায়ের বিনয়ে প্রসন্ন হ'য়ে বললেন—"যদি দেখো মশার ভগবান সাড়া দেবার আগেই ম্যালেরিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করেছে, তখন না হয় মশাগুলোকে বস্তায় পুরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিও। বাংলাদেশের যা কিছু, সব সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবার খোলা হুকুম ত পাওয়াই গেছে।"

গদাই হাত জোড় করে' বল্‌লে—"ধন্য, খুড়ো, তুমিই ধন্য। তোমার মীমাংসা শুনে' আমার মলিন বুদ্ধি চক্‌চকে হ'য়ে উঠ্‌লো। যদি অভয় দাও, ত আর দু-একটা সন্দেহ ভঞ্জন করে' নিই।"

হলধর খুড়ো স্মিতবদনে বললেন—"বলো।"

গদাই জিজ্ঞেস করলে—"রামায়ণ-মহাভারতে অবতার পুরুষদের হিংসাবৃত্তি সম্বন্ধে যে-সব অকথা কুকথা শুনতে পাই, সে-গুলো কি সত্যি? রামচন্দ্র নাকি একলক্ষ পুত্র আর সওয়ালক্ষ নাতি সমেত রাবণ রাজার প্রতি অতি vindictive ব্যবহার করেছিলেন; আর সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলেন আর অসুরদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলেন, যা ঠিক অহিংস নয়?"

খুড়ো উত্তেজিত হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন—"তুই ও সেকেলে রামায়ণ মহাভারতগুলো পুড়িয়ে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দে। জানিস্ ত, বাল্মীকি মুনি আগে ছিল একটা গুণ্ডা। রামায়ণ লেখবার সময়ও তাহার গুণ্ডামি-বুদ্ধি ছাড়েনি, তাই রাম-চরিত্রে সে অমন কলঙ্ক দিয়ে গেছে। আসল গুজরাতী রামায়ণের আমি যখন বাংলা অনুবাদ বার করবো, তখন তুই তা পড়ে' দেখিস্। একটা সোজা কথা তোরা ভেবে দেখ্‌না যে, রামচন্দ্র যদি রাবণের বংশ লোপাট করেই দিয়ে গিয়ে থাকেন, তা'হলে দুনিয়ায় আবার এত রাক্ষস জন্মাল কোথা থেকে? আর শ্রীকৃষ্ণ রক্তপাতও করেন নি, অস্ত্রধারণও করেন নি। রথের চাকাটা ত আর Arms Actএর মধ্যে আসে না! আসল যা খাঁটি রামায়ণ আর মহাভারত, তা আমি তোদের আর একদিন শুনিয়ে দেবো। আজ এখন যা। আমি একটু ঘুমুই।"

সাত্ত্বিকতার সহজ পন্থা

কি হোলো পণ্ডিতজীর, কে জানে? চোরিচৌরার দুঃসংবাদ শুনে অবধি সেই যে তিনি তাঁর চামচিকি-বিনিন্দিত অনন্তশয্যা আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছেন, এই তিন দিন হোলো তাঁর নড়ন চড়ন নেই! ক্রমে খড়মের উপর আঙুলের

দাগের মত তাঁর শ্রীঅঙ্গের ছাপ মাথার বালিসে আর বিছানার্ তোষকে engraved হ'য়ে উঠ্‌লো, ঘরে এক ইঞ্চি পুরু ধুলো জমা হোলো; মাকড়শারা সুযোগ পেয়ে তাঁর টিকি থেকে দেওয়ালের কোণ পর্য্যন্ত অনেক রকম দুর্লভ স্বদেশী আর্টের সৃষ্টি করতে লাগ্‌লো। এমন কি তাঁর শ্রী-অঙ্গের হাইক্লাস ইয়োলো কাফ লেদারের মত রংটুকু ভুসো-পড়া লণ্ঠনের মত মলিন হ'য়ে গেল। আমরা সবাই ভাবিত হ'য়ে উঠলুম। পণ্ডিতজীর পরমভক্ত ভোজপুরী দরোয়ান রামশরণ সিং তো একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে একেবারে ঘেউ ঘেউ করে' কেঁদে ফেল্‌লে। বেচারীর ভয় হো'লো পাছে বাবাঠাকুর এইবার দেহ রক্ষা করে' দেন।

হলধর খুড়ো তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, রামশরণ, তুই ভাবিসনে। আমি পণ্ডিতজীর ঠিকুজী দেখেছি, তাঁর পরমায়ু ১০৮ বচ্ছর। ঐ যে ওঁর ভুঁড়িটি দেখছিস্, ওটি একটি Famine Insurance Fund। উনি যদি বছর কতক অনাহারে যোগ-নিদ্রায় পড়ে থাকেন, তবু ওঁর প্রাণবায়ু বা অপানবায়ু পথ হারিয়ে বেরিয়ে যাবে না। ওঁর অন্তরে অন্তরে জ্ঞান টন্‌টন করচে। বিশ্বাস না হয়, বরং দু-একটা রামচিমটি কেটে দেখ্‌তে পারিস্।

রামচিমটির নাম শুনেই হোক্, বা কোন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক কারণেই হোক, পণ্ডিতজী চক্ষুরুন্মীলন করে' উঠে বস্‌লেন। আমাদের উড়ে ঠাকুর চোল-গোবিন্দকে ডাক দিয়ে বল্‌লেন—"আমার জন্যে এক ছটাক আতপ চাল, আধ পয়সার আসল গরুর ঘি, আর পোন্ পয়সার কাঁচকলা নিয়ে আয়। আজ আমি হবিষ্যি কোর্‌বো।"

৮২৷৷৵০ ওজনের পাঁচপো চালের সোপকরণ অন্ন যে উদরে তলিয়ে যেত, সেখানে এক ছটাক হবিষ্যি কি রকম দিশেহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে, আমরা তাই ভেবে কাতর হ'য়ে পড়লুম। রামশরণ আবার ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লো। পণ্ডিতজী তখন সস্নেহে বল্‌লেন—'কাঁদিসনে, রামশরণ কাঁদিসনে। তোদের জন্যেই আমার এ কর্ম্মভোগ। এতদিন যে তোদের আসল রামায়ণ মহাভারত পড়ালুম, সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'য়ে গেল। তোদের মন থেকে এখনো রাগ-দ্বেষ গেল না। তোরা হুট করতেই লাঠি চালাস্ আর লোককে অগ্নিপক্ব করে' তুলিস্। এমন করলে দেশে স্বরাজই বা আস্‌বে কি করে, আর সত্যযুগই আস্‌বে কি করে'?

হলধর খুড়ো বল্‌লেন—"আমি সে দিন পাঁজিতে দেখ্‌লুম যে, সত্যযুগ আস্‌তে আর মাত্র হাজার কয়েক বৎসর বাকি। এ কটা দিন যদি সবাই মিলে যোগনিদ্রা দিতে পারে, তা'হলে আর স্বরাজের জন্যে ভাব্‌তে হয় না। ঘুম থেকে উঠ্‌লেই স্বরাজ পাকা খেজুরটির মত টুপ্ করে' গোঁফের ডগায় এসে পড়্‌বে।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"হ্যাঁ, তা হয় বটে; কিন্তু যোগনিদ্রা দেওয়া ত আর যার তার কাজ নয়। যাঁরা দেবার, তাঁরা ত দিচ্চেনই, এখন এই সব বাজে লোকগুলোকে নিয়ে করা যায় কি?"

খুড়োও তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে' বল্‌লেন—"তাই ত, করা যায় কি?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"বাংলাদেশের জন্যে বিশেষ কিছু ভাব্‌তে হবে না। ম্যালেরিয়ার কল্যাণে বাংলা প্রায় সাত্ত্বিক হ'য়ে পড়েছে। বাঙ্গালীর মহাভারত পড়া সার্থক হয়েছে। দেখ, যুধিষ্ঠির যখন সশরীরে স্বর্গে গেলেন, তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সবাই অর্দ্ধেক রাস্তায় কাৎ হ'য়ে পড়্‌লেন। সঙ্গে গেলেন শুধু কুকুর-রূপী ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যে কেন কুকুররূপী, তার মর্ম্ম শুধু বাঙ্গালীই বুঝেছে।"

হলধর খুড়ো বল্‌লেন—"আজ্ঞে হাঁ; ওটা যা বলেছেন, তা খুবই ঠিক। প্রভুর মুখের দিকে হাঁ করে' চেয়ে থাক্‌তে, পদলেহন করতে, উচ্ছিষ্ট খেতে আর স্বজাতিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে আমাদের আর জুড়ি নেই। কুকুর-রূপী ধর্ম্ম এবার ষোল আনা আমাদের কাঁধে ভর করেছেন।"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"সুতরাং বাঙ্গালীর জন্যে আমার ভাবনা নেই; তারা ত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গে যাবেই। কিন্তু যাদের দেশে ম্যালেরিয়া নেই, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নেই, যারা ঘড়পোড়ান মহাবীরের পূজো করে, এ যুগে তাদের গতি কি হবে? তাদের কি করে' সাত্ত্বিক করা যায়?"

হলধর খুড়ো বল্‌লেন—"আচ্ছা পণ্ডিতজী, ওদের দেশে হনুমানের পূজো উঠিয়ে দিয়ে যদি উড়িয়া জগন্নাথের পূজো প্রচলিত করা যায়, তাহলে শ্রীভগবানের ঠুঁটো রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওদের লাঠিধরা হাতগুলো ক্রমশঃ পঙ্গু হ'য়ে পড়্‌তে পারে না?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"ঠিক বলেছ। যতক্ষণ ওদের হাত আছে, ততক্ষণ ওদের সাত্ত্বিক হবার উপায় নেই। ওদের ঠুঁটো না করতে পারলে

দেশে আধ্যাত্মিক স্বরাজ আসবে না। হাত দুখানি ওদের যদি জগন্নাথ-মার্কা হ'য়ে যায়, তাহ'লে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের সময় আর শান্তি-ভঙ্গের ভয় থাকবে না। এদেশে ত তা'হলে স্বরাজ হবেই, তা ছাড়া দেশবিদেশে তখন প্রেমের বন্যা ছুটে পড়বে। আমি বেশ দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—ওদের সৎ দৃষ্টান্ত দেখে ফিরিঙ্গিদের মাথা থেকে হ্যাট উড়ে গিয়ে একেবারে মাদ্রাজী টিকি গজিয়ে উঠবে, মেম সাহেবদের মুখের পাউডার রসকলিতে পরিণত হবে। সব বিড়ালাক্ষী দাঁড়কাকাক্ষী হয়ে যাবে। ট্রাউসারগুলো কৌপীন আর কোটগুলো আলখেল্লা হ'য়ে যাবে। হাইলাণ্ডারেরা প্রেমের ভরে ধিন-তা-ধিনা করে' নাচতে থাকবে, তাদের রাইফেলগুলো বাঁশের বাঁশরী হ'য়ে দাঁড়াবে, আর বিলেত একেবারে নবদ্বীপ হ'য়ে পড়বে। ঠিক বলেছ খুড়ো, তোমার মেধঃ-নাড়ী খুলে' গেছে। এখন চল, টুঁটো জগন্নাথের মহিমা প্রচার করে' বেড়ান যাক্।"

——

আসল রামায়ণ

হলধর খুড়োকে একখানা পুঁথি বগলে করে ঘরে ঢুকতে দেখে, গদাই আব্দার ধরে' বোসলো—"খুড়ো, আজ তোমার রামায়ণ শোনাতেই হবে। আমি দু'হপ্তা ধরে হাঁ করে' বসে' আছি, আর এদিকে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই!"

হলধর খুড়ো পাঁজিখানা টেবিলের উপর রেখে বিরক্তির সুরে বল্‌লেন—"আর দুঃখের কথা বলিস্ কেন গদাই। ঘোষেদের ছোটগিন্নির বুড়ো বয়সে ধর্ম্মেকর্ম্মে মতিগতি হয়েছে, তাই তাঁকে মানভঞ্জনের পালা শোনাতে গেছলাম। কথায় বলে, বৃদ্ধা—"

গদাই শেষ কথাগুলো চাপা দিয়ে বল্‌ল—"ছোটগিন্নির কথা ছেড়ে দাও খুড়ো। তাঁর লীলার আদিও নেই, অন্তও নেই। তাঁর জন্যে ত আর রামায়ণ পাঠ বন্ধ থাকতে পারে না। তুমি আরম্ভ করে' দাও;"

খুড়ো প্রসন্ন হ'য়ে চেয়ারের উপর বসে পুঁথিখানি খুলতে খুলতে বল্‌লেন—"এ খাটি রামায়ণের প্রায় ষোল আনাই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। বেল্মিক মুনির রামায়ণের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। তবে এখানি যে রকম সাত্ত্বিক ছাঁচে ঢালা, তাতে এইখানিই যে আদি ও অকৃত্রিম, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। রামচরিত্র পড়লেই মনে হয়—হাঁ, এ রাম আমাদেরই অবতার বটে। আমাদের ধাতের সঙ্গে একেবারে খাপে খাপে মিলে যায়। এ রামের প্রকৃতি যেমন মধুর, তেমনি মোলায়েম।"

গদাই ভাবে বিভোর হ'য়ে বলে' উঠলো—"আহা, যেমন রামরম্ভা।"

ভাবগ্রাহী শ্রোতা পেয়ে হলধর খুড়ো আরম্ভ করলেন—

"শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যাপুরী আঁধার করে' দণ্ডকারণ্যের মাঝখানে আশ্রম তৈরি করে' বস্‌লেন, তখন তাঁর দিন কাটতে লাগলো মন্দ নয়। ভাই লক্ষ্মণ তীর-ধনুকগুলি ভেঙ্গে আশ্রমের চারিদিকে বেড়া দিলেন, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ না সেখানে ঢুকতে পায়। ভক্ত হনুমান কিষ্কিন্ধ্যা থেকে কলা, মূলা, বার্ত্তাকু সরবরাহ করতে লাগলেন। মা জানকী প্রভুর পদসেবা করেন আর মাঝে মাঝে চরকা কাটেন। স্বয়ং প্রভুপাদ আহার করেন, নিদ্রা যান, আর মাঝে মাঝে আশ্রিত বানরসঙ্ঘকে তত্ত্বোপদেশ দেন।

"কিন্তু বিধাতার এমনি কি বিড়ম্বনা—কলা মূলা খেয়ে খেয়ে মা জানকীর অরুচি হ'য়ে গেল। তিনি লক্ষ্মণকে একদিন চুপি চুপি বল্‌লেন—'লক্ষ্মণ, তোমরা অযোধ্যার লোক, তোমাদের কাঁচামূলা আর একটু নুন হলেই চলে; কিন্তু মিথিলায় আমাদের একটু আমিষ না হলে কোন জিনিষ মুখে রোচে না। একদিন গোদাবরীতে ছিপ ফেলে দুটো মাছ ধরে আনতে পারো না?' লক্ষ্মণ আমিষের নাম শুনেই কাণে আঙুল দিয়ে বল্‌লেন—'আর্য্যে! আমিষের দিকেই যদি মতিগতি থাকবে, তো আমরা রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হবো কেন? যদি অনুমতি দেন তো গোদাবরীর চড়া থেকে খুব সাত্ত্বিক পেঁয়াজ আপনাকে এনে দিতে পারি। কিন্তু আপনার জীব-হিংসার প্রস্তাব যদি আর্য্য একবার শুনতে পান, তো তিনি আমাদের ছেড়ে উদাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন।"

তখন মা জানকী পা ছড়িয়ে বসে' কাঁদতে কাঁদতে শিরে করাঘাত করতে লাগলেন। শেষে কেঁদে কেঁদে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন ঠিক করলেন যে, আশ্রম ত্যাগ করে বাপের বাড়ী চলে' যাবেন। মেয়ে মানুষের মন—অভিমান হ'লে ত আর রক্ষা নেই। লক্ষ্মণ যখন একটু

সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে বেরিয়েছেন, আর রামচন্দ্র ধ্যানস্থ হয়ে তামাকু সেবন করুচেন, তখন তিনি গয়নার পুঁটুলিটি বগলে করে' আশ্রমের খিড়কী-দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন। একে জঙ্গল, তায় রাত, তার ওপর স্ত্রীলোক। রাস্তা ভুলে তিনি উত্তর দিকে না গিয়ে একেবারে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে রাবণ রাজার মুল্লুকে গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে পাসপোর্ট নেই। সুতরাং রাবণ রাজার প্রহরী তাঁকে গ্রেপ্তার করে' একেবারে অশোক বনের অবলা-ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে হাজির।

"এদিকে রামচন্দ্রের মনে একটু চা খাবার অভিলাষ উদয় হওয়ায় যখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ হোলো, তখন তিনি দেখলেন যে, জানকীও আশ্রমে নেই, আর উনুনেও আগুন দেওয়া হয়নি। হাহাকার করে' তিনি আর্য্যসম্মত প্রথায় ভূমিতলে মূর্চ্ছা গেলেন। লক্ষ্মণ ফিরে এসে যখন মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে রামের মূর্চ্ছাভঙ্গ করুলেন, তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের গলা জড়িয়ে ধরে' কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন—'ভাই লক্ষ্মণ রে, সীতা বিহনে এই বয়সে বুঝি বা আমার বল্কল পরুতে হয়! হয় তুই সীতাকে খুঁজে এনে দে, নয় ত আমার আর-একটা বিয়ের জোগাড় কর।' লক্ষ্মণ আর্য্যপুত্রকে এই রকম বিহ্বল দেখে হনুমানকে স্মরণ করলেন। হনুমান এসে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বল্‌লেন—'কুছ পরোয়া নেই, আমি এখনি এর ব্যবস্থা করুছি।'

"হনুমানের যে কথা সেই কাজ। তিনি তড়াক্‌ করে' গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর চড়ে' দূরবীণে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল তন্ন তন্ন করে' খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন যে, রাবণ রাজার অবলা-ব্যারাকে চেড়ী-পরিবৃতা হ'য়ে মা জানকী 'হা আর্য্যপুত্র, হা নাথ' বলে বুক চাপড়াচ্ছেন আর বলুছেন—'আর আমি বাপের বাড়ী যাব না, আর মাছ খেতে চাইব না।'

'মা জানকীর এই অবস্থা দেখে ক্রোধে হনুমানের লাঙ্গুল দশ যোজন বিস্তৃত হয়ে পড়্‌লো। তিনি গন্ধমাদন থেকে নেমে পড়ে রামচন্দ্রের কাছে হাত জোড় করে' বল্‌লেন—'প্রভু, হুকুম দিন, এখনি আমি রাবণের দশটা মাথা ছিঁড়ে নিয়ে আসি।' রামচন্দ্র যুদ্ধ-সম্ভাবনা দেখে ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মুখে বললেন—হনুমান, তোমার ভক্তি দেখে আমি বিশেষ তুষ্ট হয়েছি, কিন্তু তোমার মন থেকে যতক্ষণ হিংসা-প্রবৃত্তি না যাচ্ছে, ততক্ষণ তুমি যুদ্ধ করুতে যেয়ো না। সাত্ত্বিক ভাবে যুদ্ধ যে করুবে, তার অঙ্গ হিম হ'য়ে যাওয়া চাই, তার রক্ত জল হ'য়ে যাওয়া চাই। অতএব তুমি প্রথমে তিন দিন উপবাস করো।'

"হনুমান জোড়হস্তে বললেন—প্রভুপাদ, ঐ কার্য্যটি এ অধমের দ্বারা হবে না। আমাদের বানর-গীতায় লেখা আছে—'আহারে নিধনং শ্রেয়ঃ অনাহারো ভয়াবহঃ।' খেতে খেতে যদি পেট ফেটেও যায়, তবু আহার ত্যাগ আমি করুতে পারিনে, যেহেতু শাস্ত্রেই লেখা আছে—

'ভোজনে চাধিকারস্তে মা হজমে কদাচন'

"রামচন্দ্র তখন বললেন—তাই ত, হনুমান, তুমি যে বিপদে ফেললে! তুমি রাবণের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ কর, লাঙুল আস্ফালন কর, তাতে ত আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তুমি যে অসাত্ত্বিক ভাবে রাবণের মাথা ছিঁড়ে ফেলবে, এতে ত আমি অনুমতি দিতে পাচ্চি নে। আচ্ছা, আমি স্বয়ং কি ভাবে সীতা উদ্ধার করি, তা তোমরা একবার দেখো।

"এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র গোদাবরীতে স্নান করে একখানি বিশুদ্ধ খদ্দর পরিধান করুলেন। তারপর দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসে রাবণকে কুকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত করুবার সংকল্প করে হ্রীং কটকটায়ৈ স্বাহা মন্ত্র জপ করুতে লাগ্‌লেন।

"চব্বিশ ঘণ্টা এই রকমে কেটে গেল। রামের নড়নও নেই চড়নও নেই। মুখও শুকিয়ে এসেছে। হনুমান লক্ষ্মণকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—ছোট প্রভু, রাবণ রাজা ভারি জবরদস্ত। তাকে অনুতপ্ত করার চেয়ে তপ্ত করে তোলা ঢের সোজা। আপনি যদি আমার লেজে এক আঁটি খড় বেঁধে একটা দেশালাই জেলে দেন, তা হ'লে খুব সহজে রাবণকে এক সঙ্গে তপ্ত ও অনুতপ্ত করে তুলতে পারি। কিন্তু দোহাই, দাদা, বড়-প্রভুর কাছে গিয়ে যেন চুক্‌লি কোরো না।'

"লক্ষ্মণ তাতেই সম্মত হ'য়ে হনুমানের লেজে খড় বেঁধে দেশালাই জেলে দিলেন। হনুমান ঝপাং করে' অশোক বনে লাফিয়ে পড়ে উল্লম্ফন, বিলম্ফন করুতে লাগলেন। চেড়ীরা ভয়ে যে যেখানে পারুলে পালালো, আর হনুমান গয়নার পুটুলি সমেত সীতা ঠাকরুণকে বগলে পুরে জয়রাম বলে' লাফ দিয়ে গোদাবরী তীরে এসে হাজির হলেন।

"মা জানকী ফিরে এসেই তাড়াতাড়ি একটু মিছরির সরবৎ তৈরী করে রামচন্দ্রের মুখের কাছে নিয়ে বললেন—নাথ, আমি এসেছি। রামচন্দ্র তখন পদ্মপলাশলোচন উন্মীলন করে হনুমানের দিকে চেয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললেন—দেখলে, soul forceএর কি তেজ।'

"হনুমান জোড়হস্ত হ'য়ে বলেন—"আজ্ঞে হাঁ, প্রভু, অধম বানর আমি আপনার মহিমা কি বঝবো? লেজের জ্বালা আমার যতদিন থাকবে, ততদিন এর তত্ত্ব আমি ভুলবো না।"

"হনুমান আবার এক লম্ফে কিষ্কিন্ধ্যায় চলে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে বলে গেলেন—দেখো ছোট-প্রভু, তোমরা দেবতা বলে তোমাদের একটু ভয় হয়। দেখো যেন বেইমানী করে বসো না। আর্য্য যদি টের পান যে, তাঁর soul force এর সঙ্গে খাদ মিশে গেছে, তা হ'লে হয় ত বলে বসবেন—এ সীতা-উদ্ধার শাস্ত্র-সম্মত হয় নি। সীতাকে আবার অশোক বনে রেখে এসো। তা'হলে কিন্তু তোমাতে আমাতে একচোট বোঝা পড়া হয়ে যাবে।"

লক্ষ্মণ জিভ কেটে বল্লেন—আরে রামচন্দ্র! তাও কি আমি পারি?

হনুমান অন্তরীক্ষে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বলে' গেলেন "—কিছু বলা যায় না; তোমরা দেবতা, সব পার।"

হলধর খুড়ো রামায়ণ পাঠ শেষ করে' পুঁথিখানি বন্ধ করলেন।

গদাই হাঁ করে' শুনছিল। এইবার জিজ্ঞেস্ করল—"আচ্ছা খুড়ো, বড় অবতার কে?—রাম না হনুমান?"

নবীন ভারতী

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেশ একটু ফুরফুরে হাওয়া বইছে দেখে মনে হোল—যাই একবার পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি। এই বুড়ো হাড়ে একটু মলয় পবন লাগালে পরে কোন্ না দু দশ বছর পরমায়ু বেড়ে যাবে? আস্তে আস্তে চাদরখানা কাঁধে ফেলে লাঠিগাছটা বগলে করে' পণ্ডিতজীর ঘরের কাছে উঁকি মারতে গিয়ে দেখি, দুটি ছেলে তক্তপোষের একধারে বসে, হাত-পা ছুঁড়ে' তুমুল বক্তৃতা সুরু করে' দিয়েছে, আর পণ্ডিতজী এক টিপ নস্য নিয়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে হাঁচ্‌বার উদ্যোগ করেছেন। আমাকে দেখেই পণ্ডিতজীর হাঁচিটা কাশিতে পরিণত হয়ে গেল। দম্ আটকান থেকে একটু সাম্‌লে উঠে পণ্ডিতজী বললেন—"আরে বোসো, ছেলেদের বক্তৃতা শুনে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-সঞ্চয় করে' নাও।"

বুড়ো হাড়ে মলয় পবন লাগান আর হোলো না। বসে পড়ে' জিজ্ঞেস করলুম—"ব্যাপারখানা কি?"

পণ্ডিতজী বললেন—"কি জানি, দাদা, তাই ত বোঝ্‌বার চেষ্টা করছি। পাঁচ-সাত জন বড় বড় স্বদেশী পণ্ডিত মিলে আবিষ্কার করেছেন যে, বাঙ্গালার ছেলেদের পেটে জাতীয়তা ঢোকাতে গেলে আগে তাদের শেখাতে হবে হিন্দুস্থানী। বাংলা বরং না শিখ্‌লেও চল্‌তে পারে, কিন্তু হিন্দুস্থানী শেখা চাইই চাই।'

পাশ থেকে একটি ছেলে ফোঁস করে' উঠ্‌ল। বল্‌লে—"দেখুন, ঐ narrownessটা আমাদের ছাড়্‌তে হবে। আমি বাঙ্গালী, কি পাঞ্জাবী, কি মারাঠী—সে-কথা এখন ভুলে গিয়ে একটা All-India consciousness গড়্‌তে হবে। আমরা এক না হলে যে কিছুই হবে না। এ সোজা কথাটা যে কেন ধরতে পারেন না, তা ত বুঝিনে।"

পণ্ডিতজী বক্তৃতার অবসরে আর এক টিপ নস্য নিয়ে বল্লেন "কি করবো, বাবা, আর দিন কত আগে বল্‌লেও বা হতো। এখন এই পঞ্চাশ বছর ভাত খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিটা এমনি ভেতো মেরে গেছে যে, তার মধ্যে ছাতু প্রবেশ করান মুস্কিল! ভাল কথা—ঐ All-India consciousness, ওটার বাংলা মানে কি হে?"

ছেলেটি খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"ওটার মানে কি জানেন—ওটা হচ্ছে কিনা—All-India consciouscss, অর্থাৎ—"

পণ্ডিতজী ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"অর্থাৎ?"

ছেলেটি একটু বিরক্ত হ'য়ে বললে, "অর্থাৎ বাংলারও নই, পাঞ্জাবেরও নই, মহারাষ্ট্রেরও নই —আমরা সারা ভারতের।"

পণ্ডিতজী চক্ষু ছাড়িয়ে রসগোল্লার মত করে' বললেন, "ও! এই কথা! আমরা গোলাপও নই, টগোরও নই, জুঁইও নই, এমন কি ঘেঁটুও নই, আমরা শুধু ফুল। একেবারে আকাশ-কুসুম! তা, তোমরা ফুলই বটে, শুধু বাংলায় নয়,

ইংরেজীতেও বটে। কিন্তু আমি—আমি বাঙ্গালী, আমার চৌদ্দপুরুষ বাঙ্গালী। আমার রক্ত, মাংস, হাড় বাংলার মাটী থেকে গড়া, বাঙ্গালীর ভাবনা-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় জড়ানো। আমি তোমাদের সখের একতার খাতিরে ত নিজেকে তুলো-ধোনা করে' উড়িয়ে দিতে পারিনে। তোমরা যাকে একতা বল্‌চ, সেটা এক হয়ে বেঁচে থাকা নয়, সেটা হচ্চে এক শ্মশানে গিয়ে মরা। সেটা মুক্তি নয়, লয়।"

পণ্ডিতজীর কথায় ছেলেটি যেন একটু হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে সে জিজ্ঞেস করলে—"আপনি কি বল্‌তে চান যে, আমরা বাঙ্গালী—এই সঙ্কীর্ণ ভাবটা গিয়ে যদি 'আমরা ভারতীয়' এই বড় ভাবটা আমাদের আসে, তা'হলে আমাদের মঙ্গল হবে না?"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"বাংলা বড় কি ভারত বড়, এ কথার উত্তর গজকাটী দিয়ে মেপে বলে' দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীত্ব বড় কি ভারতীয়ত্ব বড়, এ কথার উত্তর ও-রকম মেপে-জুপে বলা চলে না। দুধ থেকে দই, ক্ষীর, ছানা, সর, মাখন হয়েছে বলে, এ কথা বলা চলে না যে, এগুলো সব দুধের চেয়ে ছোট বা সঙ্কীর্ণ। বাংলা, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান, মহারাষ্ট্র, ইত্যাদি সব বাদ দিলে যেমন ভারতবর্ষ বলে' কিছু আর বাকি থাকে না, তেমনি বাঙ্গালীত্ব, হিন্দুস্থানীত্ব, পাঞ্জাবীত্ব—এ সমস্তগুলো বাদ দিলে তোমার All-India conciousnessটা অশ্বডিম্ব হ'য়ে দাঁড়ায়। ভারতের যা নিয়ে ভারতীয়ত্ব, সেই জিনিষটাই বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীত্ব, হিন্দুস্থানীর মধ্যে হিন্দুস্থানীত্ব, মারাঠীর মধ্যে মারাঠীত্ব হ'য়ে ফুটে উঠেছে। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভারতীয়ত্বও মারা যাবে। ভারতবর্ষের যেটা মানস রূপ, বাংলায় সেইটাই বাঙ্গালীত্ব হ'য়ে ফুটেছে। এটা ভৌগোলিক ব্যাপার নয় যে, ফুট ইঞ্চি দিয়ে মেপে এর মধ্যে ছোট-বড় ঠিক করবে।"

ছেলেটি একটু গুঁই-গাঁই করতে করতে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, তাও যদি হয় ত ভাষার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন—"আমরা যদি ছেলেবেলা থেকে গাধার দুধ খেয়ে মানুষ (?) না হতুম, তা'হলে আজ আর আমাদের এ কথাটা বোঝাবার দরকার হোতো না। যে-সব জাত বেঁচে আছে, তারা সবাই জানে—তাদের প্রাণ কোথায়, আর ভাষার সঙ্গে সেই প্রাণটার সম্বন্ধই বা কি? গলা টিপে ধরলে যেমন দম্ আট্‌কে মানুষের প্রাণটা বেরিয়ে যায়, ভাষাটাকে মেরে দিলেও তেমনি জাতটার প্রাণও বেরিয়ে যায়। পরাধীন জাতের যতক্ষণ নিজের ভাষা থাকে ততক্ষণ বেঁচে ওঠ্‌বার আশাও থাকে। দেখনি সেইজন্য জর্ম্মেনি পোলাণ্ডের ভাষা মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছিল, ইংলণ্ড আইরিষ ভাষা মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল? আর আজ যদি তোমরা ভারত-জোড়া এক ভাষা করবার খাতিরে বাংলা ভুল্‌তে আরম্ভ কর, তা'হলে তোমাদের দুর্দ্দশা দেখে শেয়াল-কুকুর কেঁদে যাবে।"

ছেলেটিও দেখলুম ছাড়বার পাত্র নয়। ভাষাতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে সে রাজনীতির ঘ'াড়ে লাফিয়ে পড়্‌লো। জিজ্ঞেস করলে—"এক ভাষা না হলে আমরা মিলব কি করে? আর না মিললে এ দেশের দুর্দ্দশা ঘুচ্‌বে কোথা থেকে?"

পণ্ডিতজী হেসে উঠে বললেন—"না বাবা, তোমাদের এঁটে ওঠা দায়! বিশ্ব-বিদ্যার নাম করে' যে তোমরা এত অবিদ্যা পেটে পুরে' বসে আছ, এ আমার জানা ছিল না। এই ত চোখের সামনে দেখ্‌লে এত বড় একটা লড়াই হ'য়ে গেল। ইংরেজ, ফরাসী, রুষ, জাপান, ইতালী, গ্রীস, সবাই মিলে জার্ম্মাণির সঙ্গে যুদ্ধ করলে, কৈ এক ভাষা নয় বলে ওদের একতার ত বাধা হয়নি। সব সৈন্যদের যদি একটা ভাষা শিখিয়ে তারপর যুদ্ধে পাঠান হতো, তা'হলেই কেল্লা ফতে হয়েছিল আর কি! আর একটা কথা মনে রেখো যে, সংখ্যায় বেশী হলেই শক্তি সব সময় বাড়ে না। এ জগতে বাঙ্গালীর চেয়ে ইংরেজের সংখ্যা বেশী নয়। ইংরেজ যে আধা দুনিয়ার ঘাড়ে চড়ে' বসে' আছে, আর আমরা যে তার বুটের তলায় পড়ে আছি—এর সঙ্গে সংখ্যাধিক্যের বড় একটা সম্বন্ধ নেই।"

আমি দেখলুম যে, কথা বাড়্‌তে বাড়্‌তে বেড়েই চলেছে। শেষে কি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বা'র হ'য়ে পড়বে? তাড়াতাড়ি বলে' উঠলুম—"থাক, দাদা, আজ এই পর্য্যন্ত। রাজনীতির চর্চ্চা কাল হলেও চলবে; কিন্তু এই ফুর্‌ফুরে মলয় পবন কাল নাও বইতে পারে।"